ফোমা গর্দিয়েফ

ফোমা গরদিয়েফ

মাকসিম গর্কি

অনুবাদ : সত্য গুপ্ত

সংস্কৃতি ভবন
১১৭, ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩

প্রথম প্রকাশ
১৫ই আগস্ট, ১৯৫৫

প্রকাশক
শ্রীনরেশচন্দ্র চৌধুরী
সংস্কৃতি ভবন
১১৭, ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩

মুদ্রক
শ্রীসুখলাল চট্টোপাধ্যায়
লোক-সেবক প্রেস,
৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা-১৪

কভার ব্লক ও মুদ্রণ
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
৭।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রচ্ছদপট
খালেদ চৌধুরী

পাঁচ টাকা

আন্তন পে. চেখভকে

মাকসিম গর্কি

॥ পরিচিতি ॥

ফোমা গরদিয়েফ ১৮৯৮ সালে লেখা। লেখকের হিসেবে গর্কি তখনো নবীন, কিন্তু প্রতিষ্ঠা তাঁর ইতিমধ্যেই দেশে-বিদেশে ছড়াতে শুরু করেছে। রুশ সাহিত্যের দুই দিকপাল তলস্তয় এবং চেখভ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক স্বাদ, রুশ জনসাধারণের গভীর অন্তস্থল থেকে মোচড় খেয়ে ওঠা সম্পূর্ণ পৃথক এক হৃদয়ের দেখা পেয়ে পাঠকদের বিস্ময়ের অবধি নেই। সেদিনকার সেই নবীন গর্কি-প্রতিভার তাজা ছোঁয়া এ-বইতে পাওয়া যাবে। রুদ্র এবং জীবন্ত, নির্মম এবং অভূতপূর্বতার বিরল প্রসাদগুণ এর পাতায়।

এতে গর্কি তাঁর ক্ষমাহীন আক্রমণের জন্য বেছে নিয়েছেন সেদিনকার রুশ পুঁজিবাদী শ্রেণীকে। উনিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থপাদ ছিল রুশ পুঁজিবাদের কাছে পৌষ মাস। সেকালের রাশিয়াকে পেছনে ফেলে কল-কারখানা ব্যবসা-বাণিজ্য আর কোম্পানি গড়ে তোলার সেদিন ধুম লেগেছে। ভলগার পাড়ে পাড়ে হাঁ করে আসা এই মুনাফার লালসার সামনে প্রবলতর স্পর্ধায় গর্কি দাঁড় করিয়েছেন এক অকুতোভয় যুবক ফোমাকে। ব্যবসায়ীর ঘরেই ফোমার জন্ম কিন্তু পিতৃকুলের বিরুদ্ধেই তার বিদ্রোহ, কারণ এই অমানুষিক আবিষ্কার তাকে খেপিয়ে তোলে—সে ব্যবসার মালিক নয় ব্যবসাই তার মালিক।

সেদিনকার পরিস্থিতিতে ফোমার নিঃসঙ্গ বিদ্রোহ পরাজিত হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ফোমার সমাজের কাছে ফোমার কণ্ঠে 'শেষের সেদিন ভয়ঙ্করের' হুঁশিয়ারি সেদিন বাতুলের প্রলাপ বলে ঠেকেছিল বটে। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে যে এমনকি প্রথম রুশ বিপ্লবেরও ছয় বছর আগেই পুঁজিবাদের নির্মম পতনের বাণী গর্কি পাঠকদের মনে অমনভাবে গেঁথে দিতে পেরেছিলেন কি করে।

ফোমা গরদিয়েফ রাশিয়ায় প্রথম প্রকাশিত হবার অল্পদিনের মধ্যেই বিদেশে এর অনুবাদ প্রকাশিত হতে শুরু করে। বর্তমান বইটি ১৯০১ সালে হারমান বের্নস্টাইন-কৃত ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাঙলা করা।

১

প্রায় বছর ষাটেক আগে, ভলগার পারে রূপকথার কাহিনীর মতো রাতারাতি যখন হাজার হাজার মানুষের ভাগ্য গড়ে উঠছিল, তরুণ ইগনাত গরদিয়েফ তখন ধনী সওদাগর ঝায়েফ-এর গাধাবোটে করত জল-ছেঁচার কাজ।

দৈত্যের মতো বিশাল, সুগঠিত দেহ, সুশ্রী চেহারা কিন্তু মোটেই বোকা-বোকা নয়। ইগনাত ছিল সেই জাতের মানুষ ভাগ্য-লক্ষ্মী যাদের পায়ে পায়ে ঘোরেন। অবশ্য তার কারণ এ নয় যে, তারা কোনো বিধিদত্ত শক্তির অধিকারী কিংবা যাকে বলে দারুণ অধ্যবসায়ী, তাই; বরং কারণ এই যে, অপরিমেয় উদ্যমশীলতার অধিকারী হওয়ার ফলে অভীপ্সিত লক্ষ্যপথে পৌঁছাতে ওদের উপায়ের জন্যে ভাবতে হয় না এতটুকুও। তাছাড়া, একমাত্র নিজেদের ইচ্ছা ছাড়া আর কোনো আইন-কানুনের ধারও ওরা বড়ো একটা ধারে না। কখনো কখনো খুব ভয়ের সঙ্গেই ওরা বলে থাকে বিবেকের কথা; কখনো বা সত্যি সত্যি বিবেকের সঙ্গে লড়াই করে নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করে তোলে, কিন্তু আসলে বিবেক বস্তুটা হচ্ছে দুর্বল-চিত্ত মানুষের কাছেই এক অপরাজেয় শক্তি; শক্তিমানেরা মুহূর্তেই তাকে পরাভূত করে নিজেদের ইচ্ছার দাসত্বে নিয়োজিত করে ফেলে। কেননা, নিজেদের অজ্ঞাতে, কেমন যেন সহজাত সংস্কারবশেই ওরা অনুভব করে যে, বিবেককে প্রশ্রয় কিংবা স্বাধীনতা দিলে পরে সমগ্র জীবনটাকেই গুঁড়িয়ে ফেলে দেবে। মাত্র কয়েকটা দিনই ওরা বলি দেয় বিবেকের পায়ে। যদি কখনো এমনও হয় যে বিবেক সাময়িকভাবে ওদের আত্মাকে পরাভূত করে ফেলল, তাতেও ওরা ভেঙে পড়েনা। পরাজয়ের ভিতরেও তেমনি সবল, তেমনি সতেজই থাকে, যেমন থাকে বিবেকের অনুশাসনহীন অবস্থায়।

চল্লিশ বছর বয়সে ইগনাত গরদিয়েফ নিজেই হয়ে উঠল তিনখানা স্টিমার ও দশখানা গাধাবোটের মালিক। ধনী ও বুদ্ধিমান বলে ভলগার তীরে এখন সে সুপরিচিত, সম্মানিত। কিন্তু সবাই ওর নাম দিয়েছে "খেপা"। কারণ, ওর জাতের অন্যান্য মানুষের মতো ইগনাতের জীবনধারা একই খাতে স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত হত না। থেকে থেকে ওর জীবন-স্রোতে ডেকে উঠত বান। আর তখন মুনাফা—যা নাকি ওর জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য, তাকে পর্যন্ত পরম অবহেলায় উপেক্ষা করে উন্মত্তবেগে কূল ছাপিয়ে বয়ে চলত। দেখে শুনে মনে হয় ওর ভিতরে একই সঙ্গে বাস করছে তিনজন গরদিয়েফ। কিংবা ওর দেহের ভিতরে রয়েছে তিনটে আত্মা। ঐ তিনটে আত্মার ভিতরে যেটা নাকি সবচেয়ে শক্তিশালী সেটা নিছক লোভী। ইগনাত যখন এর দাস তখন সে অদম্য কর্মোন্মাদনার প্রতীক। এই কর্মোন্মাদনা দিনে রাতে সব সময়েই ওর ভিতরে জ্বলতে থাকে। সম্পূর্ণ সমাহিত থাকে সে এই কর্মোন্মাদনায়। আর সর্বত্র দু'হাতে হাজার হাজার টাকা গ্রাস করতে থাকে। মনে হয় টাকার ঝনঝনানি কোনোদিনই ওর কাছে আর প্রতুল

হবে না। ভলগার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত সে জাল বুনে জাল পেতে চলেছে—সোনা-ধরা জাল।

গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ইগনাত শস্য কেনে, তারপর গাধাবোটে বোঝাই করে চালান দেয় রিবিন্স্ক-এ। এ করতে গিয়ে কখনো কখনো সে লুট করে, জোচ্চুরি করে, ঠকায়। কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই করে তার নিজের অজ্ঞাতে। যখন জানতে পারে, বিজয়গর্বে তখন সে ঐ প্রবঞ্চিত মানুষগুলোর প্রতি পরিহাসভরা উচ্চ হাসির দমকে ফেটে পড়ে। আর তখন বিচরণ করতে থাকে অন্ধ উন্মত্ত ধনতৃষ্ণার এক উত্তুঙ্গ কাব্যশিখরে।

ধন-শিকারে এতখানি শক্তি নিয়োগ করলেও বস্তুতপক্ষে ইগনাত নীচশ্রেণীর লোভী ছিল না। এক এক সময়ে সে তার সম্পত্তি সম্পর্কে এমন অকৃত্রিম নির্বিকার হয়ে উঠত যা নাকি অভাবনীয়, কল্পনাতীত। একবার, তখন ভলগার বুকে বরফ চলতে শুরু করেছে, ইগনাত দাঁড়িয়ে ছিল তীরে। খাড়া পাড়ের গায়ে আছড়ে আছড়ে বরফের চাপগুলো যখন ওর নতুন কেনা গাধাবোটখানাকে ভেঙে চুরমার করে ফেলতে লাগল, দেখতে দেখতে পরম উল্লাসে ইগনাত চিৎকার করে উঠল:

ঠিক হ্যায়! আবার! গুঁড়িয়ে ফেল! জোরসে!

আচ্ছা ইগনাত!—ওর বন্ধু মায়াকিন পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল,—বরফের চাপ-গুলো তো তোমার ব্যাগের প্রায় হাজার দশেক টাকা নষ্ট করে ফেলল, কি বলো?

ও কিছুনা ভাই, কিছুনা! দশ হাজারের বদলে আবার এক লাখ কামাবো। কিন্তু দেখ দেখি ভলগার কাণ্ডখানা! দেখ্‌ছ? কী চমৎকার! ছুরি দিয়ে দই কাটার মতো গোটা পৃথিবীটাকেই ও যেন কেটে দুখানা করে ফেলতে পারে। দেখ, দেখ, ঐ আমার "বয়ারিনা" একবারই মাত্র ভেসেছে জলে; তা বেশ, এখন ওর মৃত আত্মার জন্যে প্রার্থনা করতে হবে!

গাধাবোটখানা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ইগনাত আর মায়াকিন ভলগার তীরের একটা ছোট পানশালায় বসে ভদকা খেতে খেতে দেখতে লাগল "বয়ারিনা"র টুকরোগুলো কেমন করে ভাঙা বরফের চাপের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে দূরে।

বোটটার জন্যে খুব দুঃখ হচ্ছে নাকি ইগনাত?—প্রশ্ন করল মায়াকিন।

কেন? দুঃখ হবে কেন? ভলগা-ই দিয়েছিল ভলগা-ই আবার নিয়ে নিয়েছে। আমার হাত দুটো তো আর ছিঁড়ে নিয়ে যায়নি!

তবুও!

তবুও আবার কি? বরং এটা ভালো হল যে, চোখের সামনেই দেখলাম কেমন করে গেল। ভবিষ্যতের জন্যে এ একটা শিক্ষা হয়ে রইল। কিন্তু সেবার যখন আমার 'ভলগার' পুড়ে গেল, সত্যি খুবই দুঃখ পেয়েছিলাম। একটু চোখের দেখাও দেখতে পেলাম না! অন্ধকার রাতে জলের উপরে যখন ঐ বিরাট কাষ্ঠস্তূপ জ্বলছিল দাউ দাউ করে, কি চমৎকার দৃশ্যই না হয়েছিল! কি বলো? স্টিমারটা সত্যিই খুব বড়ো ছিল।

ওটার জন্যেও কি তোমার মনে দুঃখ হয়নি?

স্টিমারটার জন্যে? তা সত্যি কথা বলতে কি ওটার জন্যে খুবই দুঃখ হয়েছিল। পরে ভেবে দেখলাম দুঃখ পাওয়াটাই হচ্ছে নিছক বোকামি! কি লাভ? হয়তো কাঁদতেও পারতাম কিন্তু চোখের জলে তো আগুন নেভানো যায় না! পুড়ুক গে স্টিমার! তাছাড়া সব কিছুই যদি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত, তবুও কেবল-

মাত্র একবার থুথুই ফেলতাম। অন্তর যদি কর্মোন্মাদনায় জ্বলে ওঠে, সবকিছু আবার নতুন করে গড়ে তুলতে কতক্ষণ! নয় কি?

কথাটা ঠিক—প্রত্যুত্তরে একটু হেসে বলল মায়াকিন,—যা বলছ তা শক্তিমানেরই কথা বটে। যে লোক এমন করে বলতে পারে সে যদি সর্বস্বান্তও হয়ে যায়, তবুও আবার ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠবে।

হাজার হাজার টাকার ক্ষতি অমন দার্শনিকভাবে গ্রহণ করলেও ইগনাত খুব ভালো করেই বুঝত প্রতিটি পাই-এর মূল্য। ভিখারিদের দান-খয়রাত বড়ো একটা করত না; আর যদিও বা কখনো দান করত তো করত তাদেরই যারা সম্পূর্ণ কর্ম-ক্ষমতাহীন। অল্পস্বল্প কর্মক্ষম কোনো লোক যদি ওর কাছে ভিক্ষা চাইত, ধমকে উঠত ইগনাত, বলত—ভাগ! দূরে হ! তুইতো কাজ করতে পারিস, আমার নোকরের কাছে যা, তার সঙ্গে গোবর পরিষ্কার কর গে, আমি মজুরি দেবো'খন।

যখনই ইগনাত কাজের ভিতরে ডুবে যেত, মানুষের প্রতি তার মনোভাব হয়ে উঠত রুক্ষ, অনুকম্পাভরা। ধন-শিকারের সময়ে নিজেকে পর্যন্ত সে বিশ্রাম দিত না এতটুকুও। তারপর হঠাৎ একদিন,—সাধারণত এটা হতো বসন্তকালে, যখন পৃথিবীর সর্বকিছুই মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যে ভরপুর হয়ে উঠত আর মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ থেকে অন্তরে নেমে আসত কী যেন এক বন্য উন্মত্ততার বিপুল নিঃশ্বাস, তখন ইগনাত গরুদিয়েফের মনে হত সে যেন তার ব্যবসায়ের মনিব নয়, একটা হীন দাস মাত্র। কী এক সুগভীর চিন্তায় ডুবে যেত ইগনাত; মোটা রোমশ ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্নভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকাত নিজের দিকে আর দিনের পর দিন ক্রুদ্ধ গম্ভীর পদ-ক্ষেপে ফিরত পায়চারি করে। যেন মৌন নীরব মুখে কি একটা বস্তু চাইছে যা নাকি মুখ ফুটে বলতে পর্যন্ত ওর ভয় করছে। এ সব মিলে জাগিয়ে তুলত ওর অন্তরের অন্য আত্মাটাকে,—বুভুক্ষু জানোয়ারের উদ্দাম লালসাভরা আত্মা।

উদ্ধত মানুষবিদ্বেষী ইগনাত প্রচুর মদ খেতে শুরু করত। নেমে আসত এক নোংরা কলুষিত জীবনের পঙ্কিলতায়। আর সঙ্গীসাথীদেরও মদ খাইয়ে তুলত মাতাল করে। এক নিদারুণ আত্মভোলা বিস্মৃতির আনন্দে মশগুল হয়ে থাকত দিনরাত। নোংরামিভরা এক আগ্নেয়গিরির মতো কি যেন ওর অন্তরে টগবগ করে ফুটতে থাকত। তখন দেখলে মনে হয় যেন সে পাগলের মতো নিজেরই পরা এক সুকঠিন শিকলের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করছে প্রাণপণে। কিন্তু পারছে না কিছুতেই। , এমন শক্তি নেই ওর যে, সে শিকল ছিঁড়ে ফেলতে পারে। অত্যধিক মদ্যপান ও অনিদ্রায় ফুলে-ওঠা নোংরা মুখ, চোখদুটো পাগলের মতো ঘুরছে। হেঁড়ে গলায় হল্লা করতে করতে শহরের এক পানশালা থেকে অন্য পানশালায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায় ইগনাত। হৈহুল্লোড় করে। কখনো বা নাচে গ্রাম্য সংগীতের করুণ সুরে। আবার কখনো বা মারামারি করে। কিন্তু কোথাও কোনো কিছুতেই শান্তি পায় না।

একদিন এক নীতি-ভ্রষ্ট পুরুতের সঙ্গে ইগনাতের দেখা হল। গোলগাল চেহারার বেঁটে খাটো লোকটি, মাথাভরা টাক আর গায়ে ধর্মযাজকের ছেঁড়া পোশাক। জুতোর তলায় যেমন কাদামাটি আটকে থাকে সেদিন থেকে তেমনি করেই আটকে রইল লোকটা ইগনাতের সঙ্গে। ব্যক্তিত্ববিহীন ঐ বিকলাঙ্গ ঘৃণ্য জীবটা করত ভাঁড়ের অভিনয়। ইগনাত আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা মিলে ওর টাকে মাখিয়ে দিত সর্ষের কাঁই, হাঁটাত চার হাতপায়ে পশুর মতো, আর পাঁচমিশালী মদের তলানি গিলিয়ে নাচাত বাঁদর নাচ। নীরবে বিনা প্রতিবাদে সব কিছুই করে যেত লোকটা, কেবল একটা নির্বোধ বোকা-বোকা হাসি লেগে থাকত ওর বলিকুঞ্চিত মুখের উপরে।

ওকে যা বা বলা হত সবকিছু করার পরে হাত পেতে বলতঃ দাও একটা টাকা। সবাই ওকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত, কখনো কখনো বা গোটা কয়েক পয়সা ছুঁড়ে দিত আবার কখনো বা দিত না কিছুই। কিন্তু এক এক সময়ে এমনও হত যে, ওরা দশটাকার একটা গোটা নোট কিংবা আরও বেশি ছুঁড়ে দিত।

ওরে ব্যাটা ঘৃণ্য জীব—একদিন গর্জে উঠে বলল ইগনাত,—বল ব্যাটা তুই কে?

দারুণ ঘাবড়ে গেল পুরুত, তারপর ইগনাতের সামনে এগিয়ে এসে মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বল তুই কে, বল?—আবার গর্জে উঠল ইগনাত।

আমি একটা মানুষ, পাঁচজনের লাথি-ঝাঁটা খেতেই পড়ে আছি।—প্রত্যুত্তরে বলল পুরুত। সবাই হেসে উঠল ওর কথায়।

তুই কি একটা পাজী?—রুক্ষকণ্ঠে আবার প্রশ্ন করল ইগনাত।

পাজী? আমি গরিব আর দুর্বল এরই জন্যে কি?

এদিকে আয়, শোন!—ইগনাত ওকে কাছে ডাকল।—আয়, আমার পাশে এসে ব'স!

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পুরুত মাতাল সওদাগরের আরো কাছে এসে মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমার পাশে ব'স!—বলতে বলতে ইগনাত ভীত পুরুতের হাত ধরে টেনে এনে নিজের পাশে বসাল।

তুই হচ্ছিস আমার আপনজন—নিকট আত্মীয়। আমিও একটা পাজী। তুই অভাবের জন্যে, আর আমি স্বভাবের জন্যে—অসচ্চরিত্রতার জন্যে। আমি যে পাজী তার কারণ হচ্ছে দুঃখ, বুঝেছিস?

বুঝেছি।—অস্ফুট নম্রকণ্ঠে বলল পুরুত। সাঙ্গোপাঙ্গের দল আবার হেসে উঠল হিঃ হিঃ করে।

বুঝলি তো, আমি কি?

বুঝলাম।

বেশ, তবে বল, "ইগনাত তুই একটা আস্ত পাজী!"

কিন্তু কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারল না পুরুত। কেবল ভীত বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে ইগনাতের বিশাল দেহটার পানে তাকিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগল।

মেঘগর্জনের মতো ফেটে পড়ল সঙ্গী-সাথীদের উৎকট উচ্চ হাসির উন্মত্ত কোলাহল। কিন্তু কিছুতেই যখন পুরুতকে দিয়ে নিজেকে গাল পাড়াতে পারল না, তখন ইগনাত জিজ্ঞাসা করল :

টাকা নিবি?

হাঁ,—তিলমাত্র ইতস্তত না করেই জবাব দিল পুরুত।

তোর এতো টাকার দরকার কিসের রে?

কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না পুরুত।

ইগনাত ওর জামার কলার ধরে জোরে জোরে কয়েকবার ঝাঁকুনি দিতেই পুরুতের নোংরা কুৎসিত দুটো ঠোঁটের ফাঁক থেকে ঝরে পড়তে লাগল কথা। বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে ফিস্ ফিস্ করে বলল : "একটা মেয়ে আছে আমার, ষোলো বছর বয়েস; আছে এখন সেমিনারিতে। ও যখন চলে আসবে আব্রু রক্ষা করার মতো এক ফালি নেকড়াও খুঁজে পাবে না ঘরে।

বটে!—ইগনাত ওর জামার কলারটা ছেড়ে দিল তারপর থমথমে গম্ভীর মুখে চুপ করে বসে থেকে কি যেন এক গভীর চিন্তার ভিতর ডুবে গেল। থেকে থেকে কেবলমাত্র ওর দুটো চোখের স্থির দৃষ্টি পুরুতের মুখের দিকে নিবদ্ধ হতে লাগল। হঠাৎ এক সময়ে ওর চোখদুটো চাপা হাসির ঝলকে চক্‌চক্‌ করে উঠল, বলল : মিথ্যা কথা বলছিস, ব্যাটা মাতাল?

নীরবে পুরুত ক্রুশ চিহ্ন আঁকল—ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জানাল নমস্কার—মাথাটা আপনা থেকে নত হয়ে ঝুঁকে পড়ল বুকের উপর।

না, কথাটা সত্যি।—ইগনাতের সাঙ্গোপাঙ্গের দলের ভিতর থেকে পুরুতের কথার সমর্থন করে কে যেন বলে উঠল।

সত্যি? বেশ; ভালো কথা।—টেবিলের উপরে সজোরে এক ঘুসি মেরে বলে উঠল ইগনাত।

এই শোন! তোর মেয়েটাকে আমার কাছে বেচে দে। বল, কত নিবি?

মাথা নাড়তে নাড়তে শিউরে উঠে পুরুত দু'পা পেছিয়ে গেল।

এক হাজার!

পুরুতকে অমন করে শিউরে উঠতে দেখে সাঙ্গোপাঙ্গের দল খিল খিল করে হেসে উঠল, যেন কেউ ঠাণ্ডাজল ঢেলে দিয়েছে ওর গায়ে।

দু হাজার?—আবার সগর্জনে হেঁকে উঠল ইগনাত। ওর দুটো চোখ জ্বলছে।

হল কি আপনার? এ কেমন কথা?—ইগনাতের দিকে দুটো হাত বাড়িয়ে দিয়ে বিড় বিড় করে বলে উঠল পুরুত।

তিন হাজার?

ইগনাত মাৎভিয়েইফ!—রিনরিনে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল পুরুত,—দোহাই ঈশ্বরের! দোহাই খ্রীস্টের! ঢের হয়েছে, খুব, আর না! থামুন! বেচবো। মেয়েটির ভালোর জন্যেই ওকে আমি বেচে দেবো!

পুরুতের রুগ্ন, শীর্ণ, তীক্ষ্ণ কণ্ঠের আর্ত চিৎকারের ভিতর দিয়ে যেন জেগে উঠছে কোন্‌ এক অদৃশ্য ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কঠোর তিরস্কার,—সুতীব্র ভর্ৎসনা-ভরা শাসানি। ওর দুটো চোখের মণি যেন জ্বলন্ত কয়লার মতো—জ্বলছে গন্‌ গন্‌ করে, ইতিপূর্বে যেমনটি আর দেখেনি কেউ কোনোদিন। কিন্তু মাতালের দলের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই সে দিকে, মূর্খের মতো তেমনি হেসে গড়িয়ে পড়ছে এ ওর গায়ে।

চুপ!—মুহূর্তে ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো সোজা হয়ে দাঁড়াল ইগনাত তারপর কঠোর সুরে ধমকে উঠল। ওর দুটো চোখের ভিতর থেকেও যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে আগুনের শিখা।

শয়তানের দল! দেখতে পাচ্ছিস না কি হচ্ছে এখানে? এতে যে-কোনো মানুষের চোখে জল আসে আর তোরা কিনা হাসছিস হিঃ হিঃ করে!

ইগনাত পুরুতের সামনে এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসল, তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলল : পিতা! দেখলে তো, কী ভীষণ পাজী লোক আমি! বেশ, এবার আমার মুখে থুথু দাও!

অকস্মাৎ কি যেন একটা অতি কুৎসিত ব্যাপার ঘটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পুরুতও হাঁটু গেড়ে ইগনাতের সামনে বসে পড়ল, তারপর একটা অতিকায় কচ্ছপের মতো মেঝের উপরে হামাগুড়ি দিতে দিতে ইগনাতের পায়ের কাছে এগিয়ে এসে ওর হাঁটুর উপরে চুম্বন করতে করতে অস্ফুট কণ্ঠে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কি যেন বলতে

লাগল বিড়বিড় করে।

ঝ্ুঁকে পড়ে ইগনাত মেঝের উপর থেকে ওকে টেনে তুলল তারপর কখনো বা আদেশভরা কণ্ঠে কখনো বা অনুরোধভরা মিনতির সুরে বলতে লাগল : দাও, থুথু দাও! আমার এই দুটো নির্লজ্জ চোখের উপরে থুথু ছিটিয়ে দাও!

ইগনাতের জলদগম্ভীর কণ্ঠের স্বরে মুহূর্তের জন্যে সঙ্গীসাথীর দল কেমন বিমূঢ় হয়ে পড়ল; স্তব্ধ হয়ে গেল ক্ষণিকের জন্যে ওদের মুখের উচ্ছলতা, কিন্তু পরক্ষণেই আবার ওরা এমন জোরে হেসে উঠল যে সে হাসির শব্দে পানশালার জানালা সার্শিগুলো পর্যন্ত বেজে উঠল ঝন্‌ঝন করে।

তোকে একশ টাকা দেবো, দে, থুথু দে!

কিন্তু পুরুত তেমনি মেঝের উপরে পড়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। হয়তো বা ভয়ে, হয়তো বা আনন্দে। কারণ, ঐ লোকটা কিনা অমন করে অনুরোধ করছে ওকে নিজেকে অপমান করাবার জন্যে!

অবশেষে ইগনাত উঠে দাঁড়াল; তারপর পুরুতকে একটা লাথি মেরে একতাড়া নোট ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে নীরবে একটু ক্লিষ্ট হাসি হাসল।

ইতর! ছোটলোক! এমন মানুষের কাছেও কেউ নাকি আবার অনুশোচনা করতে পারে? অনুশোচনার নামে কেউ পায় ভয়, কেউ বা আবার পাপীকে করে উপহাস। নাঃ, আর একটু হলেই বুকের বোঝাটা খালাস করে দিয়েছিলাম আর কি। বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল, ভাবলাম অনুতাপ করি! কিন্তু না, ওযে এমন তা ভাবতেও পারিনি! ঠিক তাই! দূর হ' এখান থেকে! আর কোনোদিনও যেন তোর মুখ না দেখতে পাই, বুঝলি?

ও! কি অদ্ভুত লোক!—কেমন যেন একটু হকচকিয়ে গিয়েই বলে উঠল সঙ্গীসাথীর দল।

শহরময় একটা কিংবদন্তীর মতোই প্রচলিত ইগনাতের পানোৎসবের কাহিনী। সবাই ওকে গাল পাড়ে, তীব্র কঠিন ভাষায়, কিন্তু পানোৎসবের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে না কেউ। এমনি করে কেটে যায় কয়েক সপ্তাহ।

অবশেষে অতি অপ্রত্যাশিতভাবেই একদিন ইগনাত বাড়ি ফিরে আসে। যদিও তখনো ওর গা থেকে মদের গন্ধ মিলিয়ে যায় না, কিন্তু মিইয়ে আসে উন্দামতা—আসে শান্ত হয়ে। লজ্জা-সঙ্কুচিত চোখ মাটির দিকে নিবদ্ধ করে নীরব নতমুখে শুনে যায় স্ত্রীর ভর্ৎসনা। তারপর নিরীহ মেষ-শাবকের মতোই ধীর নম্র পায়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকে দোরে খিল এঁটে দেয়। বন্ধ-ঘরে ক্রুশের সামনে হাঁটু গেড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে বসে থাকে। হাতদুটো অসহায়ভাবে ঝুলে পড়ে পাশে, পিঠটা বেঁকে ঝুঁকে পড়ে; কথাহারা মৌন মুখ, বুঝিবা প্রার্থনার বাণী উচ্চারণ করতেও পাচ্ছে দারুণ ভয়। নিঃশব্দে পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে ওর স্ত্রী দোরে কান পাতে। দোরের ওপাশ থেকে ভেসে আসে দীর্ঘনিঃশ্বাসের ভারি শব্দ—রুগ্ন ঘোড়ার শ্রান্ত দীর্ঘশ্বাসের মতো।

হে ঈশ্বর! তুমি দেখ—দুটো হাত চওড়া বুকের উপরে সবলে চেপে ধরে কম্পিত কণ্ঠে ফিস্ ফিস্ করে বলে ওঠে ইগনাত।

অনুতাপের ক'দিন কেবলমাত্র জল আর রাইয়ের রুটি ছাড়া ইগনাত খায় না আর কিছু। সকাল বেলা ওর স্ত্রী বড়ো এক বোতল জল আর পাউন্ড দেড়েকের একটা বড়ো রুটি আর নুন রেখে আসে দোর-গোড়ায়। দোর খুলে ইগনাত ওগুলো নিয়ে আবার দোর বন্ধ করে দেয়। এ সময়ে কেউ ওকে বিরক্ত করে না, সবাই এড়িয়ে চলে।

কয়েকদিন পরে ইগনাত আবার এসে হাজির হয় বাজারে। হাসে, ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে, আর করে শস্য কেনাবেচার চুক্তি সম্পাদন। ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপারে শিকারী বাজের মতো এমন সুতীক্ষ্ম দৃষ্টি, এমন সুকৌশলী বিশেষজ্ঞ খুব অল্পই দেখা যায়।

কিন্তু ইগনাতের জীবনের সমস্ত কাজকর্মের ভিতরে সব সময়েই জেগে থাকে একটি অত্যুগ্র ব্যাকুল কামনা—একটি পুত্রের কামনা। যতই বয়স বাড়ছে, কামনার তীব্রতাও বেড়ে যাচ্ছে ততই। প্রায়ই এ সম্পর্কে স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে। সকালে চায়ের সময়ে, কিংবা দুপুরে খাবার সময়ে বিমর্ষ দৃষ্টি মেলে ইগনাত ওর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকে। ইগনাতের স্ত্রী—মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, মুখখানা লাল, চোখ দুটো ঘুমন্ত, স্বপ্নাতুর।

কিছুক্ষণ স্ত্রীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে এক সময়ে প্রশ্ন করে ইগনাত : কিরে কিছু মনে হচ্ছে কি?

হবে না কেন, তোমার হাতের মুঠোগুলো তো সোজা নয়, ডাম্বেলের মতো!

কি বলছি, বুঝতে পারছিস না, বেকুফ?

অমন হাতের কিলঘুষি খেলে কি আর কারুর পেটে ছেলে আসে?

না, কিল-ঘুষির জন্যেই যে তোর পেটে ছেলে আসছে না, তা নয়; ছেলে হয় না বেশি খাস বলে। রকমারি খাবার দিয়ে পেটটা এমন করে ঠেসে বোঝাই করে রাখিস যে, পেটে ছেলে আসার আর জায়গা থাকে না।

তা বৈকি, আমি যেন কোনোদিন আর তোমার সন্তান পেটে ধরিনি?

ধরেছিস তো কতোগুলো মেয়ে,—বিরক্তিভরা কণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠল ইগনাত।—আমি চাই একটি ছেলে। বুঝলি? একটি ছেলে,—যে হবে আমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। মরবার সময়ে কার হাতে তুলে দিয়ে যাবো আমার এ ঐশ্বর্য, ধনসম্পদ? কে করবে আমার শ্রাদ্ধ-শান্তি? সমস্ত বিষয়-আশয় কি মঠে দান করে যাবো ভেবেছিস? ঢের দিয়েছি ওদের। না ভাবছিস সবকিছু তোকেই দিয়ে যাবো? তীর্থ-ধর্ম করার মানুষই বটে তুই! গির্জায় গিয়েও তোর মনটা পড়ে থাকে মাছের কালিয়ার দিকে। আমি মরে গেলেই তো তুই আবার বিয়ে করবি আর আমার সমস্ত বিষয়সম্পত্তি টাকাকড়ি পড়বে গিয়ে একটা মূর্খের হাতে। এরই জন্যে কি আমি এমন মুখে রক্ত তুলে খেটে মরছি?

এক নিদারুণ তিক্ত বিক্ষোভে ইগনাতের অন্তর ভারি হয়ে ওঠে। বুঝিবা একটি ছেলে—একটি পুত্রসন্তান, একটি উত্তরাধিকারী ছাড়া ওর সমস্ত জীবন ব্যর্থ, নিষ্ফল, লক্ষ্যহীন।

দীর্ঘ ন'বছরের বিবাহিত জীবনে ইগনাতের স্ত্রীর গর্ভে চারটি কন্যাসন্তান জন্মে। কিন্তু সবকটিই মারা যায়। প্রত্যেকবার সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সময়ে ব্যাকুল প্রতীক্ষমানতায় কম্পিত অন্তরে ইগনাতের কাটত দিন। কিন্তু তাদের মৃত্যুতে তেমন বিশেষ বিচলিত হত না, শোক প্রকাশ করত না। কেননা তারা নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় ওর কাছে। বিয়ের দ্বিতীয় বছর থেকেই বৌকে ধরে মারপিট করতে শুরু করল। অবশ্য প্রথম প্রথম করত মত্ত অবস্থায়, বিশেষ কোনো বিদ্বেষের মনোভাব ছাড়াই; ঐ যে কথায় বলে, "বৌকে ভালোবাসবে প্রাণের মতো, কিন্তু ঝাঁকুনিটা দেবে ঠিক ন্যাসপাতি গাছের মতো"—তখনকার মারধোরটা ছিল ঐ প্রবাদ-বাক্যের নিয়ম রক্ষার মতোই। কিন্তু প্রত্যেকবার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যখনই ওর আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে যেতে লাগল, স্ত্রীর প্রতি ওর ঘৃণা ততই

বেড়ে যেতে লাগল। আর যখন খুশি তখনই বৌকে ধরে ধরে মারতে শুরু করল পেটে ছেলে না-ধরার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে।

একবার, ব্যবসাসংক্রান্ত কাজে ইগনাত তখন সামারাস্ক্-এ। বাড়ি থেকে এক আত্মীয়ের তার পেল যে, ওর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। ক্রুশ চিহ্ন এ'কে ইগনাত গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ বসে রইল, তারপর বন্ধু মায়াকিনকে লিখল: আমার অনুপস্থিতিতেই ওর শেষকৃত্য সম্পন্ন করো আর বিষয়সম্পত্তির দিকে নজর রেখো।

তারপর ইগনাত গির্জায় গিয়ে মৃতের আত্মার জন্যে প্রার্থনা করল। আকুলিনার আত্মার শান্তি ও সদ্গতির জন্যে প্রার্থনা শেষ করে ভাবতে আরম্ভ করল, যত শীঘ্র সম্ভব আবার বিয়ে করা একান্ত দরকার।

ইগনাতের বয়স তখন তেতাল্লিশ। লম্বা সুগঠিত দেহ, প্রশস্ত কাঁধ, বিশপের সহকারী আচার্যের মতো রুক্ষ গম্ভীর কণ্ঠস্বর, কালো মোটা ভ্রুর নিচে বুদ্ধিদীপ্ত সাহসী একজোড়া চোখ, কালো দাড়িগোঁফে সমাচ্ছন্ন রোদে-পোড়া মুখ, সবমিলে তেজস্বী চেহারার খাঁটি রুশীয় স্বাস্থ্যসমুজ্জ্বল সৌন্দর্যের প্রতীক। ওর স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতি, গর্বিত মন্থর পদক্ষেপের ভিতর দিয়ে ফুটে ওঠে আত্মসচেতনতার ভাব, গভীর আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা। মেয়েরা ওকে পছন্দ করে খুবই আর ইগনাতও তাদের মোটেই এড়িয়ে চলে না।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর ছ'মাস পেরুতে না পেরুতেই ইগনাত এক উরাল কশাকের মেয়ের প্রেমে পড়ল। পাগলাটে বলে উরাল অঞ্চলেও ইগনাত পরিচিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেয়ের বাপ মেয়েকে ওর সঙ্গে বিয়ে দিল। শরতের প্রথমে ইগনাত তার কশাক বৌ নিয়ে ঘরে ফিরে এল। লম্বা শক্ত গড়ন, সুন্দর চেহারা, বিশাল আয়ত দুটি নীল চোখ, বাদামি রঙের লম্বা বেণী। ইগনাতের সুগঠিত সুন্দর চেহারার পাশে বেশ মানানসই। সুন্দরী স্ত্রী পেয়ে ইগনাতও খুশি, মনে মনে গর্বিত। সুস্থ সবল বলিষ্ঠ পুরুষের উষ্ণ গভীর ভালোবাসা উজাড় করে ঢেলে দিল ইগনাত। কিন্তু কিছুদিনের ভিতরেই স্ত্রীর সম্পর্কে ইগনাত চিন্তিত হয়ে পড়ল। তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগল তার হাবভাব।

ক্বচিৎ কখনো নাতালিয়ার মুখে দেখা যায় হাসির রেখা। কি যেন এক সুগভীর চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকে সারাক্ষণ—কি এক অজ্ঞেয় অজানার ধ্যানে মগ্ন হয়ে। থেকে থেকে ওর দুটি আয়ত নীল চোখের ভিতর থেকে এক মানববিদ্বেষী ঘৃণার প্রদীপ্ত শিখা চক্‌চক্ করে ওঠে। ঘরকন্নার কাজ থেকে যখনই মুক্তি পায়, বড়ো ঘরটার খোলা জানালার পাশে গিয়ে চুপ করে বসে থাকে নাতালিয়া, আর দু'তিন ঘণ্টা ঠিক তেমনি মরে নীরবে বসে থাকে। রাস্তার দিকে মুখ করে বসে থাকলেও ওর দুটি চোখের দৃষ্টি মনে হয় যেন সবকিছু চলমান বস্তু সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন; গভীর অচঞ্চল দৃষ্টি মেলে যেন সে তার নিজের অন্তরের অন্তস্তলের পানে তাকিয়ে রয়েছে। এমন কি ওর হাঁটা-চলার ধরনটি পর্যন্ত অদ্ভুত। প্রশস্ত ঘরের ভিতরে অতি ধীরে সতর্ক পদক্ষেপে চলাফেরা করে নাতালিয়া, যেন কি এক অদৃশ্য বস্তু প্রতি পদক্ষেপে ওর সহজ স্বচ্ছন্দ গতিপথে দিচ্ছে বাধা। নানান রকমের শৌখিন আসবাবে ভরা ওদের ঘর; সব কিছুই যেন তারস্বরে ঘোষণা করছে গৃহস্বামীর বিপুল ঐশ্বর্যের কথা। কিন্তু ইগনাতের কশাক স্ত্রী ঐ সব মূল্যবান আসবাব রুপোর বাসনপত্রের পাশ দিয়ে এমন সলজ্জ সংকুচিত পায়ে চলাফেরা করে যেন ওর ভয় হয় পাছে ওগুলো ওর গলা টিপে ধরবে। বস্তুত এই কোলাহলমুখর ব্যবসা-বাণিজ্যের শহর ঐ নীরব মৌনাচারী নারীর মনকে এতটুকুও আকর্ষণ করতে

পারেনি। যখনই নাতালিয়া স্বামীর সঙ্গে গাড়িতে বেড়াতে বেরোয়, ওর চোখের দৃষ্টি নিবন্ধ থাকে ড্রাইভারের পিঠের উপর। কিংবা ওকে নিয়ে ওর স্বামী যখন কোনো বন্ধুবান্ধবের বাড়ি বেড়াতে যায়, সেখানে গিয়েও ওর আচরণ ঘরেরই মতো অদ্ভুত। আবার যখন কোনো অতিথি ওদের বাড়িতে আসে, পরম উৎসাহে নাতালিয়া তাদের খানাপিনার ব্যবস্থা করে, কিন্তু কারু কোনো কথায়, কোনো বিষয়েই কোনো উৎসাহ প্রকাশ করে না কিংবা পক্ষপাতিত্বও করত না কারুর প্রতি এতটুকুও। কেবল মাত্র সুরসিক মায়াকিন কখনো কখনো ওর মুখে ফুটিয়ে তুলত ঈষৎ হাসির রেখা, কিন্তু সে হাসি ছায়ার মতোই ম্লান, অস্পষ্ট।

মেয়েমানুষ নয়, একটা গাছ!—নাতালিয়ার সম্পর্কে বলত মায়াকিন।—কিন্তু জীবনটাই হচ্ছে একটা অনির্বাণ কাষ্ঠস্তূপ, সবাই আমরা কোনো-না-কোনো সময়ে জ্বলে উঠি; এও একদিন জ্বলে উঠবে। একটু সবুর করো ভায়া, সময় দাও, তখন দেখবে কি সুন্দর হয়েই না ও প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে।

এই!—পরিহাসভরা কণ্ঠে বলত ইগনাত,—রাতদিন কি অত ভাবো, বলো তো? বাড়ির জন্যে মন কেমন করে? একটু হাসো দেখি!

শান্ত দৃষ্টি মেলে নাতালিয়া ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকে।

তুমি বড়ো ঘন ঘন গির্জায় যাও। সবুর করো, পাপের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করার ঢের সময় পাবে। তার আগে পাপ তো করো। জানো তো পাপ না করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না। আবার প্রায়শ্চিত্ত না করলে মুক্তির পথও তৈরি হয় না। যতোদিন বয়েস কম আছে পাপ করে নাও। চলো গাড়ি করে একটু বেড়িয়ে আসিগে, যাবে?

না বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে না।

পাশে বসে ইগনাত ওকে ঘন আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নেয়। কিন্তু নাতালিয়া ঠাণ্ডা, প্রতি-আলিঙ্গনে ওকে জড়িয়ে ধরে সত্য, কিন্তু সে আলিঙ্গন কেমন যেন যান্ত্রিক, উত্তাপবিহীন।

অপলকদৃষ্টিতে নাতালিয়ার দুটি চোখের পরে চোখ রেখে প্রশ্ন করে ইগনাত: নাতালিয়া! বলো দেখি কেন তুমি এতো বিষন্ন, এমন মনমরা হয়ে থাকো? খুবই একা একা লাগে বুঝি এখানে?

না তো।—সংক্ষেপে জবাব দেয় নাতালিয়া।

তবে কেন অমন করো? আত্মীয়স্বজনের জন্যে মন কেমন করে?

না, ওসব কিছুই না।

তবে সব সময়ে ভাবো কী?

কৈ, ভাবি না তো কিছু।

তবে কী?

না, ও কিছু না, কিছু না।

বহু আয়াসে একবার ইগনাত ওর কাছ থেকে খানিকটা স্পষ্ট কথা আদায় করতে পারল।

কেমন যেন একটা সংশয় এসে আমার ভিতরে বাসা বেঁধেছে, আর সে সংশয় আমার দৃষ্টিকেও আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আমার কেবলই মনে হয় এসব যা দেখছি কিছুই প্রকৃত নয়—বলতে বলতে নাতালিয়া হাত তুলে নিজের চার পাশের আসবাব-পত্রের দিকে ঘুরিয়ে দেখাল।

ইগনাত ওর কথায় তেমন কোনো গুরুত্ব না দিয়ে হাসতে হাসতে বলল,—ও কথার কোনো মানেই নেই। এখানে যা কিছু দেখছ সবই খাঁটি জিনিস। সব

কিছুই দামী আর সাচ্চা। তুমি যদি এসব না চাও তবে আমি সবকিছু পুড়িয়ে ফেলে দেবো, বেচে দেবো, দান করে দেবো লোক ডেকে এনে। তারপর আবার নতুন করে কিনে আনবো সব। তুমি কি তাই চাও?

কেন?—শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করে নাতালিয়া।

অবাক হয়ে যায় ইগনাত। কেমন করে এই অল্প বয়সে, স্বাস্থ্য ও যৌবনে পরিপূর্ণ একটি তরুণী এমন এক নিদ্রালু ভাবাবেশে বিভোর হয়ে থাকে সারাক্ষণ। নেই কোনো কিছুর উপরে আকর্ষণ, নেই কোনো মোহ, কেবলমাত্র গির্জায় ছাড়া যায় না আর কোথাও, সবাইকে চলে এড়িয়ে।

ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে ইগনাত : একটু সবুর করো, একটা ছেলে হোক আগে তখন দেখবে সবকিছু, জীবনের সমস্ত ধারাটাই গেছে বদলে। এখন সারাক্ষণ তোমার মন ভারী হয়ে থাকে তার কারণ, ভাবনা চিন্তা করার মতো কোনো অবলম্বনই তো নেই এখন তোমার সামনে। ও এসে তোমাকে জ্বালাতন করে তুলবে, তখন দেখো ভাববার আর এতটুকু অবসরও তুমি পাবে না। তুমি তোমার পেটে ধরবে আমার ছেলে, ধরবে না?

ঈশ্বরের দয়া!—প্রত্যুত্তরে মাথা নিচু করে জবাব দেয় নাতালিয়া।

আচ্ছা বলো দেখি কেন তুমি অমন গোমড়া মুখ করে থাকো? হাঁটো চলো তাও এমনভাবে যেন তোমার পায়ের তলায় কাচ রয়েছে। তাকাও যেন কারুর জীবন ধ্বংস করে দিয়েছ। এমন জোয়ান মেয়েমানুষ কিন্তু কোনো কিছুতেই যেন তোমার কোনো স্পৃহা নেই, নেই রুচি। কি বোকা তুমি!

একদিন মাতাল হয়ে ফিরে এসে ইগনাত নাতালিয়াকে আলিঙ্গন করতে শুরু করল। কিন্তু নাতালিয়া দূরে সরে গেল। দারুণ রেগে গেল ইগনাত। তারপর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল : বোকামি করো না নাতালিয়া, এদিকে তাকাও!

মুখ ফিরিয়ে নাতালিয়া ইগনাতের মুখের দিকে তাকাল।

তারপর?

নাতালিয়ার প্রশ্ন ও দুচোখের নির্ভীক দৃষ্টি ইগনাতকে ক্ষেপিয়ে তুলল।

কী?—গর্জে উঠল ইগনাত; ওর কাছে এগিয়ে গেল।

খুন করবে নাকি আমাকে?—স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ইগনাতের চোখের দিকে অপলক দৃষ্টি মেলে প্রশ্ন করল নাতালিয়া।

ওর রাগের সামনে মানুষ ভয়ে কাঁপতে থাকে—এই দেখতেই অভ্যস্ত ছিল ইগনাত, কিন্তু নাতালিয়ার স্থির শান্ত মূর্তি কেমন যেন অদ্ভুত লাগল ওর কাছে। মনে মনে দারুণ আহত হল ইগনাত।

বটে!—চিৎকার করে উঠে ইগনাত ওকে মারার জন্য হাত তুলল। ধীরে কিন্তু ঠিক সময়মতো কৌশলে নাতালিয়া ওর আঘাত এড়িয়ে হাতটা ধরে ফেলল। তারপর হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তেমনি স্থির অকম্পিত কণ্ঠে বলল : খবর্দার বলছি আমার গায়ে হাত দিতে এসো না। কিছুতেই আমি তোমাকে আমার কাছে আসতে দেবো না।

কুঁচকে ছোট হয়ে উঠেছে নাতালিয়ার দুটো চোখ আর তারি ভিতরে চক্ চক্ করে উঠছে ইস্পাতের মতো তীক্ষ্ণ শানিত দৃষ্টি। নাতালিয়ার চোখের সেই দৃষ্টির পানে তাকিয়ে ইগনাত বুঝল যে এ বড়ো শক্ত ঠাঁই। যদি ইচ্ছা না করে প্রাণ গেলেও ওর কাছে ঘেঁসতে দেবে না!

বটে!—আপন মনে গজ্ গজ্ করতে করতে ইগনাত চলে গেল।

কোনো কাজে একবার পরাজিত হওয়ার পর সে কাজে আবার হাত দেয়া ইগনাতের স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু কিছুতেই এটা সে সহ্য করতে পারছিল না যে একটা মেয়েমানুষ—যে নাকি ওর নিজের স্ত্রী—সে পর্যন্ত ওর কাছে নতি স্বীকার করবে না। এতে ওর নিজের কাছেই নিজেকে ছোট করে ফেলল। সেদিন থেকে ইগনাত বুঝতে আরম্ভ করল যে এখন থেকে ওর স্ত্রী আর কোনো কিছুতেই ওর কাছে মাথা নোয়াবে না। দুজনার ভিতরে শুরু হল এক কঠিন সংগ্রাম।

আচ্ছা দেখা যাক কে কাকে হারাতে পারে!—একান্ত ঔৎসুক্যভরা তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবল ইগনাত, একটা কলহের জন্য অন্তরে অন্তরে জেগে উঠল তীব্র আকাঙ্ক্ষা, যাতে করে শীঘ্রই জয়লাভ করতে পারে ইগনাত, উপভোগ করতে পারে জয়ের আনন্দ।

কিন্তু দিন চারেক পরে একদিন নাতালিয়া ওকে জানাল যে সে অন্তঃসত্ত্বা।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে ইগনাত দৃঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল নাতালিয়াকে। তারপর অস্ফুট গদগদ কণ্ঠে ওর কানে কানে বলতে লাগল :

তুমি খুব ভালো মেয়ে—লক্ষ্মী মেয়ে তুমি নাতালিয়া! যদি তোমার পেটে ছেলে হয় আমি তোমাকে ঐশ্বর্যশালী করে দেবো। সত্যি করে বলছি তোমার গোলাম হয়ে থাকবো চিরকাল। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, তোমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে থাকবো, ইচ্ছে হলে তুমি আমার দেহের উপর দিয়ে হেঁটে যাবে!

সে তো আর আমাদের শক্তির ভিতরে নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছে।—প্রত্যুত্তরে তেমনি অনুচ্চ কণ্ঠে বলল নাতালিয়া।

হাঁ ঈশ্বরের ইচ্ছে!—তিক্তকণ্ঠে বলে উঠল ইগনাত। তারপর বিমর্ষ মুখে নাতালিয়ার হাতখানা ছেড়ে দিল।

সেই মুহূর্ত থেকে স্ত্রীকে ইগনাত কচি শিশুর মতোই চোখে চোখে রাখতে লাগল।

জানালার সামনে গিয়ে বসে থাকো কেন? দেখছো না, বুকেপিঠে ঠাণ্ডা লেগে যাবে! অসুখ করবে!—কখনো কড়া কখনো মোলায়েম সুরে বলত ইগনাত।

আঃ! সিঁড়ি দিয়ে অমন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছ কেন? চোট লাগবে না? একটু বেশি করে খেও, বুঝলে, দুজনের মতো, যাতে পেটেরটাও বেশ খেতে পায়।......

তারপর যে দিন প্রসবকাল উপস্থিত হল, সে দিন শরতের সকাল। প্রসব-বেদনার প্রথম চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই ইগনাতের চোখমুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। আপন মনে বিড়বিড় করে কি যেন বলতে আরম্ভ করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শোবার ঘর, যেখানে প্রসববেদনায় ওর স্ত্রী আকুলিবিকুলি করছে, সে ঘর ছেড়ে হাত নাড়তে নাড়তে চলে গেল। সেখান থেকে সোজা নিচে এসে ওর মৃত মায়ের ছোট্ট উপাসনার ঘরে গিয়ে ঢুকে টেবিলের সামনে বসে ভদকা আনতে হুকুম করল। দারুণভাবে মদ খেতে খেতে শুনতে লাগল উপর থেকে ভেসে আসা স্ত্রীর কাতর কাত্‌রানির শব্দ। ঘরের এক কোণে স্বল্পালোকের আধো আলোছায়ায় নীরব ঔদাসীন্যে দাঁড়িয়ে আইকন। মাথার উপরে জেগে উঠছে পায়ের শব্দ। কি যেন একটা ভারি জিনিস মেঝের এপাশ থেকে ওপাশে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। জেগে উঠছে থালাবাসনের ঝন্‌ঝন্ শব্দ। লোকজন দ্রুত ওঠানামা করছে সিঁড়ি বেয়ে। সব কিছুই যেন ঘটে চলেছে অসম্ভব দ্রুততায়। কিন্তু তবুও সময় যেন চলেছে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে,

হামাগুড়ি দিয়ে। ইগনাত শুনতে পাচ্ছে উপরে বহুকণ্ঠের মিলিত শব্দ।

মনে হচ্ছে এভাবে প্রসব হবেনা। প্রভুর দোর খুলে দেবার জন্যে কাউকে গির্জায় পাঠালে হত।

ভেনুস্কা বাড়ির একজন আশ্রিতা। ইগনাত শুনতে পেল সে পাশের ঘরে এসে চাপাগলায় জোরে জোরে প্রার্থনা করতে শুরু করেছে :

হে ঈশ্বর! আমাদের প্রভু! স্বকীয় মহিমায় স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ হও! হে পবিত্র কুমারী মাতার গর্ভজ সন্তান! তুমি নিজ মহিমায় মানুষের অসহায়তাকে স্বর্গীয় করে তোলো! তোমার অনুগত ভৃত্যদের ক্ষমা করো!

অকস্মাৎ সমস্ত শব্দ সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে জেগে উঠল একটা হৃদয়বিদারক অমানুষিক চিৎকার। পরক্ষণেই একটা একটানা কাতর কাতরানি গোধূলির ম্লান আলোর সংগে ঘরখানাকে প্লাবিত করে ভাসতে ভাসতে কোণের দিকে গিয়ে বিলীন হয়ে গেল। তীব্র দৃষ্টিতে ইগনাত আইকনের দিকে তাকাল। ওর বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস।

আবার মেয়ে,—তাও কি সম্ভব?

এক সময়ে ইগনাত উঠে দাঁড়াল, তারপর বোকার মতো ঘরের মাঝখানে নীরবে ক্রুশ এঁকে আইকনের সামনে এসে মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ তেমনি-ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আবার টেবিলের কাছে ফিরে এসে ভদকা খেতে শুরু করল। কিন্তু এতক্ষণ ভদকা টেনেও একটুও নেশা হয়নি ওর। ভদকা খেতে খেতে এক-সময়ে ঝিমিয়ে পড়ল ইগনাত। এমনি করে কেটে গেল গোটারাত ও তারপরের দিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত।

অবশেষে দাই দ্রুতপায়ে নিচে নেমে এসে খুশিভরা মিহি সুরে চিৎকার করে বলল : অভিনন্দন, ছেলে হয়েছে, ইগনাত মাত্‌ভিয়েইচ্!

মিথ্যা কথা বলছ!—প্রত্যুত্তরে নীরস কণ্ঠে বলল ইগনাত।

কি হয়েছে আপনার বাতুশ্‌কা!

বিশাল বুকের সবটুকু শক্তি এক করে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে হাঁটু গেড়ে বসল ইগনাত, তারপর হাতদুটো দৃঢ়ভাবে বুকে চেপে ধরে কম্পিত কণ্ঠে বিড়বিড় করে বলতে লাগল :

ধন্যবাদ ঈশ্বর! বুঝলাম, আমার বংশ নির্বংশ হয়ে যায় এটা তোমার অভিপ্রেত নয়। তোমার কাছে আমার যা কিছু পাপ তার প্রায়শ্চিত্ত না হয়ে যাবেনা। তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, হে প্রভু, আঃ!—তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সোরগোল তুলে হুকুম দিতে আরম্ভ করল :

ওহে, একজন পুরুত ডেকে আনার জন্যে কাউকে সেণ্টনিকোলাসে পাঠাও। গিয়ে বলুক, ইগনাত মাতভিয়েইচ্ এক্ষুনি তাকে ডাকছে। এসে আমার স্ত্রীর জন্যে প্রার্থনা করুক।

পরিচারিকা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে খবর দিল :

ইগনাত মাতভিয়েইচ্, নাতালিয়া ফোমিনিচ্‌না এক্ষুনি আপনাকে ডাকছেন। তাঁর শরীর খুবই খারাপ লাগছে।

খারাপ! কেন খারাপ লাগছে? এক্ষুনি সেরে যাবে'খন।—চিৎকার করে বলে উঠল ইগনাত।—বলোগে আমি এক্ষুনি আসছি। হাঁ, আর বোলো ও খুব ভালো মেয়ে। এক্ষুনি আমি ওর জন্যে একটা উপহার নিয়ে এসে দেখা করছি। আর শোন্ পুরুত আসছে, তাঁর জন্যে কিছু খাবারদাবারের ব্যবস্থা করে রাখ্‌গে।

আর কাউকে পাঠিয়ে দে মায়াকিনকে ডেকে আনুক।

ইগনাতের বিশাল শরীরটা বুঝিবা আরো বড়ো হয়ে উঠেছে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে চঞ্চল পায়ে ঘরময় পায়চারি করে ফিরছে। কখনো হাসছে বোকার মতো, কখনো হাত কচলাচ্ছে, পরক্ষণেই গভীর দৃষ্টি মেলে আইকনের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে ক্রুশ করছে।

অবশেষে ইগনাত উপরে স্ত্রীর কাছে এল।

ওর দৃষ্টি প্রথমেই পড়ল গিয়ে লালটুকটুকে ছোট্ট দেহটির দিকে। গামলার জলে দাই তখন শিশুটিকে স্নান করাচ্ছিল। শিশুটিকে দেখে ইগনাত পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর হাতদুটো পিছনে নিয়ে একান্ত সন্তর্পণে পা টিপে টিপে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে শিশুটির কাছে এগিয়ে এল। জলের ভিতরে ক্ষুদে মানুষটি তখন খলবল করতে করতে কাঁদছিল চিৎকার করে—নগ্ন অসহায়।

দেখো, খুব সাবধানে ধরো, গায়ে তো এখানো হাড় হয়নি!—দুইয়ের উদ্দেশে কোমল কণ্ঠে বলল ইগনাত।

পরম নিপুণতায় শিশুটিকে এহাত থেকে ওহাতে নিতে নিতে ফোকলা দাঁতে একগাল হেসে বলল দাই ঃ আপনি আপনার বৌয়ের কাছে যান দেখি এখন।

একান্ত বাধ্য ছেলেটির মতো ইগনাত নাতালিয়ার কাছে এগিয়ে যেতে যেতে প্রশ্ন করল ঃ কেমন আছো নাতালিয়া? নাতালিয়ার বিছানার পাশে এগিয়ে এসে মশারিটা সরিয়ে দাঁড়াল ইগনাত।

আমি আর বাঁচবো না—শুক্‌নো ভাঙা গলায় অস্ফুট স্বরে বলল নাতালিয়া।

ধব্‌ধবে শাদা বালিশের ভিতরে ডুবে যাওয়া শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের চার পাশে মরা সাপের মতো ছড়িয়ে রয়েছে গোছা গোছা কালো চুল। পলকহীন চোখের স্থির দৃষ্টি মেলে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল ইগনাত। হলদে নির্জীব প্রাণহীন মুখ, আয়ত চোখের কোলে গভীর কালি-রেখা,—কেমন যেন অদ্ভুত অপরিচিত মনে হচ্ছে ইগনাতের। ঐ দুটি আয়ত বিশাল চোখের নিশ্চল দৃষ্টি যেন কোন দূর দূরান্তে নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে—ইগনাতের মনে হচ্ছে ও চোখ দুটিও তার সম্পূর্ণ অচেনা। ইতিপূর্বের জেগে ওঠা আনন্দের স্পন্দন থামিয়ে দিয়ে ইগনাতের সমস্ত অন্তর যেন এক অজানা আশঙ্কায় বেদনায় মুচড়ে উঠল।

আমি আর বাঁচবো না।

নাতালিয়ার ঠোঁট দুটো নীল, ঠাণ্ডা। ইগনাত যখন ঠোঁট দিয়ে নাতালিয়ার ঠোঁট দুটো স্পর্শ করল, বুঝতে পারল মৃত্যু ইতিমধ্যেই ওর দেহের ভিতরে এসে বাসা বেঁধেছে।

হা ঈশ্বর! ভীত শঙ্কিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ইগনাত। মনে হল বুঝিবা এক নিদারুণ ভীতি টিপে ধরেছে ওর কণ্ঠনালী, রুদ্ধ হয়ে আসছে শ্বাস।

নাতাশা! ওর কি হবে? ওকে যে লালনপালন করে মানুষ করে তুলতে হবে! কি হয়েছে তোমার? স্ত্রীর সামনে প্রায় কেঁদে ফেলল ইগনাত।

ওদিকেই দাই শিশুটিকে নিয়ে ব্যস্ত। ক্রন্দনরত শিশুটিকে দোল দিতে দিতে শান্ত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু কোনো কিছুই ইগনাতের কানে পৌঁছাচ্ছে না। কিছুতেই যেন সে স্ত্রীর মৃত্যুমলিন বিবর্ণ মুখের দিক থেকে পারছে না চোখ ফিরিয়ে নিতে। নাতালিয়ার ঠোঁটদুটো নড়ছে, অস্ফুটকণ্ঠে কি যেন বলছে বিড় বিড় করে; শুনতে পাচ্ছে ইগনাত, কিন্তু কি বলছে কিছুই ওর বোধগম্য হচ্ছেনা।

নাতালিয়ার বিছানার পাশে বসে পড়ে হতাশাভরা ভীত কণ্ঠে বলতে লাগল : একটু ভেবে দেখ নাতালিয়া, তোমাকে ছাড়া কিছুতেই ও বেঁচে থাকতে পারে না। ওযে নেহাত শিশু! মনে জোর আনো নাতালিয়া। দূর করে দাও ওসব চিন্তা মন থেকে! দূর করে দাও!

বলার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারছে ইগনাত যে ওকথা নেহাত অর্থহীন, অবান্তর, বাজে কথা। ভিতর থেকে উথলে উঠছে কান্নার সমুদ্র; কি যেন একটা অনভূতি বুকের ভিতর থেকে ঠেলে ঠেলে উঠছে—পাথরের মতো ভারি, বরফের মতো ঠাণ্ডা।

ক্ষমা করো! বিদায়! সাবধানে থেকো। ওকে দেখো, আর মদ খেও না।—মৃদু অস্ফুট কণ্ঠে বলল নাতালিয়া।

পুরুত এল। কি দিয়ে যেন নাতালিয়ার মৃত্যুমলিন মুখখানা ঢেকে দিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে করুণ মৃদু কণ্ঠে প্রার্থনা করতে লাগল : হে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান! তুমিই সৃষ্টি করো সব রোগ ব্যাধি আবার তুমিই তা নিরাময় করো। তোমার দাসী নাতালিয়া, এইমাত্র যে একটি শিশুর জন্ম দিল, তাকে তার এই রোগশয্যা থেকে নিরাময় করো! কারণ, ডেভিডের কথাঃ আমরা তোমার নিয়ম-শৃঙ্খলা ভাঙি, তোমার চোখে আমরা দুষ্ট......

বার বার ভেঙে পড়ছে বৃদ্ধের কণ্ঠ, কঠিন হয়ে উঠছে শীর্ণ মুখখানা। তার পোশাকপরিচ্ছদের ভিতর থেকে ভেসে আসছে পাহাড়ী গোলাপের গন্ধ।

...ওর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া সন্তানটিকে রক্ষা করো, রক্ষা করো তাকে সমস্ত প্রলোভন, সমস্ত নিষ্ঠুরতা, সকল রকমের ঝড়-ঝাপ্‌টার হাত থেকে; দুষ্ট গ্রহের কবল থেকে রক্ষা করো দিনরাত।......

প্রার্থনা শুনতে শুনতে ইগনাত নীরবে কাঁদতে লাগল। বড়ো বড়ো ফোঁটায় ঝরে পড়তে লাগল উষ্ণ চোখের জল স্ত্রীর হাতের উপরে। কিন্তু সে হাত অনু-ভূতিহীন। এতটুকুও বুঝতে পারল না নাতালিয়া যে তার হাতের উপরে পড়ছে চোখের জল। তেমনি অসাড় নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে পড়ে; হাতের চামড়ায় জেগে উঠছে না এতটুকুও স্পন্দন ঝরেপড়া চোখের জলের উষ্ণ স্পর্শে।

প্রার্থনার শেষে নাতালিয়া জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। তার পরের দিন ওর মৃত্যু হল। আর একটি কথাও বলেনি, যেমন নীরবে থাকত তেমনি নীরবেই চলে গেল।

জাঁকজমকের সঙ্গে নাতালিয়ার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে ইগনাত ছেলের নামকরণ করল। ওর নাম রাখল ফোমা। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইগনাত ছেলেটিকে তার ধর্মবাপ, ইগনাতের পুরানো বন্ধু মায়াকিনের সংসারে রাখল প্রতিপালনের জন্যে। মায়াকিনের স্ত্রীও কয়েকদিন আগে একটি সন্তান প্রসব করেছে।

স্ত্রীর মৃত্যু ইগনাতের ঘন কালো চাপদাড়ির অনেকগুলোকেই ধূসর করে দিয়ে গেল, কিন্তু ওর চোখের শাণিত কঠোর দৃষ্টির ভিতরে এল এক নতুন পরিবর্তন—ধীর, স্নিগ্ধ, কোমল সে অভিব্যক্তি।

২

বিস্তৃতশাখা বিশাল শালবনের বেড়ায় ঘেরা একটা বড়ো দোতলা বাড়িতে বাস করে মায়াকিন। জানালা-ঢাকা সুবিন্যস্ত সতেজ শাখায় বুনেছে গভীর ছায়াজাল; আর তারই ফাঁকে ফাঁকে উঁকিঝুঁকি মারছে চূর্ণ আলোর রেখা। পড়ছে ছড়িয়ে এসে ছোট কামরাটির ভিতরে যেখানে বাক্সবিছানা আসবাবপত্রে ঠাসাঠাসি হয়ে বিরাজ করছে এক রুক্ষ বিষাদময় অন্ধকার। পরিবারটি দারুণ ধর্মনিষ্ঠ। মোম আর পাহাড়ী গোলাপের গন্ধের সঙ্গে জ্বলন্ত প্রদীপের পোড়া তেলের গন্ধ মিশে ঘর-খানি পরিপূর্ণ; অনুতাপের দীর্ঘশ্বাস আর প্রার্থনার সুরে বাতাস ভারাক্রান্ত। গৃহবাসীদের অন্তরের স্বাধীন সত্তা স্বেচ্ছায় বিলীন করে দিয়ে হয় ধর্মানুষ্ঠানের উৎসব। আধো অন্ধকারে হাঁপিয়ে ওঠা ভারি আবহাওয়ার ভিতরে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে চলাফেরা করে বাড়ির মেয়েরা। পরনে তাদের কালো পোশাক, পায়ে নরম চটি আর চোখে মুখে অনুতাপের চিহ্ন।

ইয়াকভ তারাসোভিচ্ মায়াকিনের পরিবারের পরিজনদের ভিতরে আছে সে নিজে, তার স্ত্রী ও একটি মেয়ে; আর আছে দূরসম্পর্কীয়া পাঁচটি স্ত্রীলোক। ওদের ভিতরে সবচাইতে যেটি ছোট তার বয়েস চৌত্রিশ। সবাই ওরা গৃহকর্ত্রী আন্তোনিনা ইভানভ্নার অনুগত। আন্তোনিনা ইভানভ্না দীর্ঘতনু, কৃশাঙ্গী; ঘন বাদামী রংয়ের বুদ্ধিদীপ্ত প্রভুত্বব্যঞ্জক চোখ।

মায়াকিনের একটি ছেলে আছে, নাম তারাস। কিন্তু এ বাড়িতে কেউ তার নামটি পর্যন্ত মুখে আনেনা। সবাই জানে, উনিশ বছর বয়সে সে মস্কো যায় উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্যে। তিন বছর পরে বাপের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে সেখানে বিয়ে করে। ফলে ইয়াকভ তাকে করে ত্যাজ্যপুত্র। চিহ্নটুক পর্যন্ত না রেখে তারাস নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মুছে নিয়ে গেল। সেই থেকে ওর কোনো খোঁজ নেই। জনশ্রুতি কি একটা অপরাধে ও এখন সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত।

ইয়াকভ মায়াকিনের চেহারাটা অদ্ভুত, বেঁটে, রোগা অথচ সজীব। শীর্ণ এক-গোছা লাল দাড়ি, সবুজ রঙ-এর দুটো ধূর্ত চোখ। যখন তাকায়, মনে হয় যেন ওর চোখদুটো প্রত্যেকটি লোককে ডেকে বলছে ঃ

'কিছু ভেবো না মশাই, অস্থির হয়োনা, কি উদ্দেশ্যে তুমি এসেছ তা আমি জানি; তবুও যতক্ষণ তুমি আমাকে বিরক্ত না করবে আমিও তোমাকে পথে বসাবোনা।'

ওর মাথাটা ডিমের মতো আর অসম্ভব রকমের বড়ো। বলিরেখায় ভরা উঁচু কপাল মাথার টাকের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। দেখলে মনে হয় ওর দুটো মুখ— একটা খোলা, বুদ্ধিদীপ্ত, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, দীর্ঘ খাড়া নাক। ঐ নাকের উপরে যেন রয়েছে আর একখানা মুখ—চোখহীন মুখবিবরহীন বলিরেখায় সমাচ্ছন্ন। ঐ

বলিরেখার অন্তরালে মায়াকিন যেন লুকিয়ে রেখেছে দুটো চোখ আর ঠোঁট কোনো একটা বিশেষ সময়ের জন্যে। যখন সমুপস্থিত হবে সেই সময় তখন সে অন্য এক দৃষ্টি নিয়ে তাকাবে দুনিয়ার দিকে আর হাসবে আর এক ধরনের বিচিত্র হাসি।

একটা দাঁড়-কলের মালিক মায়াকিন, শহরের মধ্যে জাহাজঘাটার কাছে তার গুদাম, ছাদ-পর্যন্ত-ঠাসা নানারকম দাঁড়কাছিতে বোঝাই। পাশেই কাচের দরজা-ওয়ালা ছোট একটি ঘর। ঘরের ভিতরে পুরানো জীর্ণ একটি টেবিল আর তারই সামনে অয়েল-ক্লথ-মোড়া একখানা চেয়ার। মায়াকিন ঐ চেয়ারটার উপরে বসে থাকে সারাদিন, একটু একটু করে চা খায় আর পড়ে "মস্কভ্স্কায়া ভেদমস্তি"। বছরের পর বছর জীবনভোর সে ঐ কাগজখানার গ্রাহক।

ব্যবসায়ীমহলে মায়াকিন খুবই সম্মানিত। মাথাওয়ালা লোক বলে খ্যাতি অপরিসীম। নিজের বংশের প্রাচীন বনেদীত্ব নিয়ে গর্ব করতে ভালোবাসে। প্রায়ই গম্ভীর কণ্ঠে বলে থাকে : আমরা মায়াকিনেরা মায়ের অর্থাৎ ক্যাথারিনের আমল থেকে ব্যবসায়ী। সুতরাং আমার দেহে আছে খাঁটি বনেদী রক্ত।

ইগনাত গরদিয়েফের শিশুপুত্রটি মায়াকিনের পরিবারে প্রতিপালিত হল ছ' বছর। ফোমার বয়েস এখন সাত। কিন্তু ইতিমধ্যেই ওর বিরাট মাথা, চওড়া কাঁধ, বাদামের মতো দুটো চোখের গভীর দৃষ্টি সব মিলে ওকে বয়সের তুলনায় ঢের বড়ো দেখায়। শান্ত স্বল্পভাষী একগুঁয়ে ফোমা মায়াকিনের মেয়ে লিউবার সঙ্গে খেলা করতো সারাদিন। একটি আত্মীয়া ওদের দেখাশুনা করত। মেয়েটি মোটা, বসন্তের দাগে ভরা মুখ, চিরকুমারী। সবাই ওর নাম দিয়েছিল 'বুজিয়া'। হাবাগোবা একটি ভীরু জীব। এমন কি বাচ্চাদের সঙ্গেও কথা বলত এক অক্ষরে ফিস্ ফিস্ করে। প্রার্থনা মুখস্থ করতেই তার কেটে যেত দিনরাত। তাই ফোমাকে রূপকথা শোনাবার আর তার অবসর মিলত না।

ছোট মেয়েটির সঙ্গে ফোমার খুব ভাব। কিন্তু মেয়েটি যখনই রাগত কিম্বা ওকে খ্যাপাত, মুহূর্তে ফোমার মুখখানা নীল হয়ে উঠত, নাকের বাঁশি দুটো কাঁপতে আরম্ভ করত আর অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকত মেয়েটির দিকে। তারপর এক সময়ে মেয়েটিকে ধরে লাগাত বেদম মার। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে নালিশ করত মায়ের কাছে। কিন্তু আন্তনিনা ফোমাকে ভালোবাসত খুব, তাই মেয়ের অভিযোগ তেমন আমলে আনত না। ফলে ওদের বন্ধুত্ব আরো গাঢ় আরো গভীর হয়ে উঠত।

একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন দিন কেটে চলে ফোমার। ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে এসে বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে বুজিয়ার অস্ফুট কণ্ঠের সঙ্গে সুর মিলিয়ে করে প্রার্থনা; তারপর অনেকগুলো কেক্ বিস্কুটের সঙ্গে খায় চা। চা খাবার পর গরমের দিন হলে ওরা যায় যেখানে বেড়াটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে একটা গভীর পাহাড়ী খাদের ভিতরে। খাদের অন্ধকার স্যাঁৎসেতে তলার দিকে তাকিয়ে ওদের গা ছম্‌ছম্ করে ওঠে। বাচ্চাদের ঐ খাদের পারে যাওয়া ছিল বারণ। তাই ঐ খাদটা সম্পর্কে ওদের মনে ছিল নিদারুণ ভীতি। শীতকালে যখন বাইরে দারুণ শীত, চায়ের সময় থেকে দুপুরের খাবার সময় পর্যন্ত ওরা খেলত ঘরে বসে। নইলে উঠোনে গিয়ে বরফের স্তূপের উপরে উঠে গড়িয়ে নেমে এসে এসে করত খেলা।

ওদের দুপুরের খাওয়াটা ছিল "খাঁটি রুশ ধরনের"—বলত মায়াকিন। প্রথমে বড়ো একটা গামলায় করে এক গামলা চর্বিমেশানো টক কপির ঝোল, সঙ্গে রাইয়ের বিস্কুট। কিন্তু এর সঙ্গে থাকত না মাংস। পরে ঐ ঝোলই খেত আবার ছোট

ছোট মাংসের টুকরো ফেলে দিয়ে। তারপর শুয়োর, হাঁস কিম্বা বাছুরের ভাজা মাংসের সঙ্গে খেত মণ্ড। পরে চাউচাউ-এর সঙ্গে আবার ঝোল, সবশেষে মিষ্টি আর ফল। খাওয়ার শেষে খেত করঞ্জার শরবত। আন্তোনিনা ইভানোভ্‌নার ভাণ্ডারে মজুদ থাকত নানা রকমের শরবত। ওরা খেত নীরবে, কেবলমাত্র থেকে থেকে জেগে উঠত ক্লান্তির দীর্ঘশ্বাস। ছেলেরা খেত আলাদা পাত্রে, কিন্তু বড়োরা এক পাত্র থেকেই তুলে নিয়ে নিয়ে খেত। আকণ্ঠ খেয়ে ওরা ঘুমোতো। তারপর দু'তিন ঘণ্টা মায়াকিনের বাড়িতে ঘুমন্ত মানুষের দীর্ঘনিঃশ্বাস আর নাক ডাকার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যেত না।

ঘুম থেকে উঠে আবার চা খেত, তারপর স্থানীয় খবরাখবর নিয়ে করত আলোচনা, গল্পগুজব। ওদের আলোচনার বিষয় কখনো হত গির্জার গায়ক, ধর্মযাজক, কখনো কোনো বিয়েসাদী বা কোনো ব্যবসায়ীর অসচ্চরিত্রতা।

চা খাওয়া হয়ে গেলে পর মায়াকিন বলত তার স্ত্রীকে ঃ

কৈ গিন্নী, বাইবেলখানা দাও দেখি আমার হাতে!

ইয়াকভ তারাসোভিচ বেশিরভাগ সময়েই পড়ত জব-এর বই। লম্বা নাকের উপরে রুপোর ফ্রেমের মোটা চশমা এ'টে প্রথমে দেখে নিত শ্রোতারা সবাই তাদের নিজের নিজের জায়গায় উপস্থিত আছে কিনা।

সবাই এসে'বসে নিজের নিজের জায়গায়। সবার মুখের উপরেই ফুটে ওঠে সেই পরিচিত ভীতিমাখা নির্বোধ করুণ অভিব্যক্তি।

উজদেশে বাস করত একটা লোক—কর্কশ, মোটা গলায় শুরু করে মায়াকিন। ঘরের এক কোণে একটা সোফার উপরে লিউবার পাশে বসে শোনে ফোমা। ও জানে, একটু পরেই ওর ধর্মবাবা পড়া থামিয়ে টাকের উপরে হাত বুলোতে শুরু করবেন। বসে শুনতে শুনতে ফোমা কল্পনায় উজদেশের সেই লোকটির ছবি এ'কে চলে মনে মনে। লোকটা বিরাট লম্বা। ত্রাণকর্তার প্রতিমূর্তির মতো মস্ত বড়ো বড়ো দুটো চোখ। পিতলের বড়ো জয়ঢাকের আওয়াজের মতো গলার স্বর—যে রকম জয়ঢাক বাজায় সৈনিকেরা তাদের ছাউনিতে। ক্রমেই লোকটা বড়ো হতে থাকে। তার মাথা গিয়ে ঠেকে আকাশে। তারপর হাত দুটো মেঘের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে মেঘগুলোকে ছি'ড়ে-খুড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়ে ভয়ঙ্কর গর্জনে চিৎকার করে বলে ওঠে ঃ কেন মানুষকে দেওয়া হল আলো, পথ যার প্রচ্ছন্ন? আর ঈশ্বর নিজেই যাদের রেখেছেন কাঁটার বেড়ার ভিতরে বন্দী করে?

ফোমার অন্তর জুড়ে নেমে আসে ভয়, সর্বাঙ্গ কে'পে ওঠে। চোখের ঘুম যায় পালিয়ে। শুনতে পায় ওর ধর্ম-বাবার কণ্ঠস্বর। দাড়ির গোছা মুঠো মুঠো করে টানতে টানতে মৃদু হাসিভরা মুখে বলে চলেছেন ঃ দেখো দেখি লোকটা কী দুঃসাহসী! কী ধৃষ্ট!

শিশু ফোমা জানে ওর ধর্ম-বাবা বলছেন উজদেশের সেই লোকটার কথা। তাঁর মুখের উপরে ফুটে-ওঠা ঐ হাসির ছটায় দূর হয়ে যায় ফোমার মনে জেগে-ওঠা ভয়।

তাহলে পারবে না লোকটা আকাশটাকে ভেঙে ফেলতে—পারবে না গুঁড়িয়ে দিতে তার ঐ বিশাল ভয়ঙ্কর হাতদুটো দিয়ে।

আবার ফোমার মানসপটে ভেসে ওঠে ঐ লোকটার ছবি—মাটির উপরে বসে রয়েছে লোকটা। ওর গায়ের মাংসে পোকা থক থক করছে। ধুলো-কাদা মাখা। খসে খসে পড়ছে গায়ের চামড়া। কিন্তু এখন ওর চেহারা শীর্ণ—দীনহীন, গির্জার

হাতার ভিক্ষুকের মতো অসহায়।

এবার সে বলে : মানুষ কি যে তার দেহমন পবিত্র থাকবে? তাছাড়া জন্ম যার নারীর গর্ভে সে থাকবে সৎ, নিষ্পাপ?

এই কথাই বলল গিয়ে সে ঈশ্বরের কাছে—উৎসাহভরা কণ্ঠে ব্যাখ্যা করে বলে মায়াকিন।

কেমন করে আমি থাকবো নিষ্পাপ, যখন আমার দেহটাই রক্ত-মাংসে গড়া?—বলল লোকটা।

এই প্রশ্নটাই করল গিয়ে সে ঈশ্বরের কাছে। কেমন করে তা সম্ভব?

তারপর বিজয়গর্বে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে পাঠক শ্রোতাদের মুখের দিকে ঘুরে ঘুরে তাকায়।

ধার্মিক লোকটি তা অর্জন করেছিল—প্রত্যুত্তরে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে শ্রোতারা বলে।

মূর্খ! যাও বরং ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াওগে।—মৃদু হেসে ওদের দিকে তাকিয়ে বলে ইয়াকভ মায়াকিন।

ইগনাত রোজই আসে মায়াকিনের বাড়ি। ছেলের জন্যে নিয়ে আসে নানা-রকমের খেলনা। তাকে কোলে তুলে নিয়ে পরম স্নেহে বুকে চেপে ধরে। কিন্তু থেকে থেকে কেমন যেন একটা চাপা অস্বস্তি গুমরে ওঠে ওর বুকের ভিতরে। দারুণ বিরক্ত হয়ে ওঠে, বলে : অমন জুজু হয়ে থাকিস কেন খোকা? কেন অত কম হাসিস?

ইগনাতের কণ্ঠে ফেনিয়ে ওঠে অভিযোগ। মায়াকিনের কাছে বলে : ভয় হয় ছেলেটা না পাছে তার মায়ের মতো হয়ে ওঠে! ওর চোখদুটো কেমন ম্লান, বিষাদমাখা!

বড্ডো অল্পেই উতলা হয়ে উঠেছ দেখছি।—প্রত্যুত্তরে একটু হেসে বলে মায়াকিন।

মায়াকিনও ফোমাকে ভালোবাসে খুব। তাই ইগনাত যখন বলল যে, ফোমাকে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবে মায়াকিনের মনে খুবই দুঃখ হল।

এখন এখানেই রাখো ওকে।—কাতরকণ্ঠে অনুরোধ করল মায়াকিন।—এখানে থাকতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে কিনা! ঐ দেখো, কাঁদছে।

কান্না ভুলে যাবে। তোমার কাছে রাখার জন্যে তো আর আমি ছেলে পয়দা করিনি! এ বাড়ির আবহাওয়া ভালো নয়। সেকেলে সন্ন্যাসীদের আশ্রমের মতোই বিরক্তিকর। শিশুদের পক্ষে সেটা খুবই খারাপ। তাছাড়া ওকে ছাড়া আমিও তো একা। ঘরে আসি, ঘর শূন্য। কিছুই নেই সেখানে, কোনো আকর্ষণই নেই। সমস্ত বাড়িঘর নিয়ে ওর জন্যে এখানে এসে উঠি তাওতো আর সম্ভব নয়! ছেলের জন্যে আমি নই, আমার জন্যে ছেলে। সুতরাং......তাছাড়া আমার দিদি এসেছেন, ওকে দেখাশোনা করার লোকের অভাব হবে না।

শিশু ফোমা এলো তার বাবার ঘরে। এক অদ্ভুত চেহারার বৃদ্ধার সঙ্গে হল ওর পরিচয়। বড়শির মতো বাঁকানো লম্বা নাক, একটিও দাঁত নেই মুখে। কুঁজো হয়ে পড়েছে পিঠ। ধূসর রঙের পোশাক আর পাকা চুলের উপরে সিল্কের কালো টুপি। প্রথম দর্শনে আদৌ খুশি হয়ে উঠল না ফোমা। বরং তাঁকে দেখে ওর মনে কেমন যেন একটু ভয়ের সঞ্চার হল। কিন্তু বৃদ্ধার বলি-কুঞ্চিত মুখের উপরে স্নেহক্ষরা কালো দুটি চোখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই পরম নির্ভরতায় তক্ষুনি ফোমা

তাঁর কোলে মাথা গুঁজে শুয়ে পড়ল।

আহা রে আমার মা-মরা রোগা কাঁচটা!—নরম ভেলভেটের মতো কোমল সুরে বলতে বলতে বৃদ্ধা পরম আদরে ওর গালের উপরে মৃদু মৃদু টোকা দিতে লাগল। —সারাক্ষণ আমার কাছে কাছে থেকো লক্ষ্মীটি!

বৃদ্ধার আলিঙ্গনের ভিতরে রয়েছে কেমন যেন এক সুমধুর কোমলতা যার স্পর্শ ফোমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। দুটি চোখের আকাঙ্ক্ষাভরা উৎসুক দৃষ্টি মেলে ফোমা তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধার চোখের দিকে। বৃদ্ধা ওকে এমন এক জগতে নিয়ে আসে, এতাবতকাল যা ছিল ফোমার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। প্রথম দিনই রাত্রে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বৃদ্ধা এসে বসল ওর পাশে, তারপর মুখের কাছে মুখ এনে ঝুঁকে পড়ে বলল ঃ গল্প বলি, শুনবে ফামুশ্‌কা?

সেদিন থেকে রোজই বৃদ্ধার মখমলের মতো কোমল মসৃণ কণ্ঠের সুর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে ফোমা। বৃদ্ধার কণ্ঠ ফোমার চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলত এক ঐন্দ্রজালিক জীবনের ছবি। দৈত্যেরা পরাজিত করছে দানবদের, বুদ্ধিমতী রাজকন্যা, বোকারা হয়ে উঠছে বুদ্ধিমান। মুগ্ধ বালকের কল্পনায় ভিড় করে আসে কত অভিনব অদ্ভুত মানুষের দল। আর ওর শিশুমন জাতীয় সৃজনশক্তির অপূর্ব সৌন্দর্যে ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

অফুরন্ত ছিল বৃদ্ধার স্মৃতি আর কল্পনার ভাণ্ডার। গভীর ঘুমের ভিতরে প্রায়ই বৃদ্ধা আসত ফোমার কাছে, কখনো রূপকথার ডাইনি বুড়ির রূপ ধরে—দয়াবতী স্নেহশীলা ডাইনি বুড়ির রূপে, আবার কখনো আসত সমস্ত জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রীদেবী সুন্দরী ভাসিলিসার রূপ ধরে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দুটি চোখের বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে ফোমা ঘরের ভিতরের ঘন অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে থাকে আর দেখে বিগ্রহের সামনের ক্ষীণ প্রদীপ-শিখায় অন্ধকারের কম্পিত শিহরণ। রূপকথার রাজ্যের বিস্ময়কর ছবিতে ভরে ওঠে ঐ নিকষ অন্ধকার। মৌন মূক জীবন্ত ছায়ামূর্তিগুলো দেয়াল বেয়ে নেমে এসে মেঝের উপরে করত চলাফেরা। চোখের সামনের ঐ চলমান জীবন্ত মূর্তিগুলো ফোমার অন্তরে এক ভয়ে ভরা আনন্দের অপূর্ব শিহরণ জাগিয়ে তুলত। রূপে রঙে ঐ মূর্তিগুলোকে গড়ে তোলার পর ফোমা তাদের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করত; কিন্তু পরক্ষণে এক নিমেষেই তাদের আবার ফেলত ধ্বংস করে। তারপর আবার নতুন কিছু একটা ভেসে উঠত ওর কালো দুটো চোখের সামনে,—আরো শিশুসুলভ, আরো সরল, সহজ, অগভীর। একাকিত্ব আর অন্ধকার মিলে ফোমার অন্তরে জাগিয়ে তুলত কেমন যেন এক বেদনা-ভরা ব্যাকুল প্রতীক্ষমানতা, এক অদম্য ঔৎসুক্য উঠত জেগে; বাধ্য করত ওকে ঐ অন্ধকার কোণের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখতে কী লুকিয়ে আছে ঐ ঘন অন্ধকারের যবনিকার ওপাশে। গিয়ে দেখত কিছুই নেই; কিন্তু তবুও কিছু একটা দেখতে পাবার আশা জেগে থাকত ওর মনে।

বাবাকে ফোমা ভয় করত খুব আর করত শ্রদ্ধা। ইগনাতের বিশাল দেহ, ঢাকের আওয়াজের মতো গম্ভীর কণ্ঠস্বর, দাড়িগোঁফে ভরা মুখ, ধূসর চুলেভরা মাথা, দীর্ঘ বলিষ্ঠ বাহু আর দুচোখের দীপ্ত চাউনি, সব মিলে ফোমার মনে হত যেন রূপকথার ডাকাত।

ইগনাতের গম্ভীর গলার আওয়াজ আর তার ভারি পায়ের শব্দ শুনলেই ফোমার সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে। কিন্তু যখন ওর বাবা স্নেহভরা মৃদু হাসি হেসে মোটাগলায় আদর করে কথা বলে, ওকে কোলে তুলে নেয়, কিংবা বিশাল দুটো হাতে ওকে উঁচুতে

তুলে ধরে, ফোমার ভয় যায় ভেঙে।

ফোমার বয়েস তখন আট বছর। দীর্ঘদিন পরে বিদেশ থেকে বাড়ি এলে পর ফোমা তার বাবাকে প্রশ্ন করল :

কোথায় গিয়েছিলে তুমি বাবা?

ভলগায়।

সেখানে গিয়ে কি তুমি ডাকাতি করতে?

কী?—জড়িত স্বরে প্রশ্ন করল ইগনাত। ওর ভ্রূ-দুটো কুঁচকে উঠল।

তুমি কি ডাকাত নও বাবা? আমি জানি—দুষ্টুমিভরা দুটো চোখের দৃষ্টি মেলে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল ফোমা; যেন সে তার বাবার জীবনের গোপনতম কথাটি জেনে ফেলেছে এমনি খুশি-উচ্ছল ভাব।

আমি একজন ব্যবসায়ী।—রুক্ষ কণ্ঠে বলল ইগনাত। পরক্ষণেই স্নেহের হাসি হেসে বলল : আর তুই একটা বোকা ছেলে। আমি গমের ব্যবসা করি, জাহাজ চালাই। "ইয়েরমাক" জাহাজটা দেখিসনি? ওটা আমারই জাহাজ। আর তোরও।

ওটা তো খুউব মস্তো বড়ো জাহাজ!—একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল ফোমা।

হাঁ, তোকে আমি একটা ছোট্ট জাহাজ কিনে দেবো। তুই ছোট্ট কিনা তাই। কি বলিস, চাই নাকি একটা?

হাঁ দাও।—সম্মতি জানাল ফোমা। কিন্তু তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে কি যেন ভেবে নিয়ে বিষণ্ণ মুখে বলে উঠল :

আমি ভেবেছিলাম তুমি ডাকাত কিংবা একটা দৈত্য।

বল্লামইতো আমি ব্যবসায়ী।—ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলল ইগনাত। ওর চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠল কেমন যেন একটু অসন্তুষ্টির ভাব—একটা আতঙ্কমাখা ভীরুতা।

রুটিওয়ালা ফিঅদর ঠাকুর্দার মতো?—একটু ভেবে আবার প্রশ্ন করল ফোমা।

হাঁ, তারই মতো। কিন্তু তার চাইতে আমি ধনী এই যা প্রভেদ। ফিঅদরের চাইতে আমার বেশি টাকা আছে।

অনেক অনেক টাকা আছে তোমার?

হাঁ, কারুর কারুর আরো বেশি আছে।

কতো পিপে টাকা আছে তোমার?

কী কতো?

টাকা।

বোকা ছেলে, টাকা কি পিপে দিয়ে মাপে নাকি?

তবে কি দিয়ে?—পরম উৎসাহে বলে উঠল ফোমা। তারপর বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি করে বলে যেতে লাগল :

ডাকাত মাক্সিম্কা একদিন এক শহরে গিয়ে হাজির। তারপর এক ধনীর সমস্ত টাকাকড়ি কেড়ে নিয়ে বারোটা পিপে বোঝাই করল। আর একটা গির্জা থেকে লুট করল অনেক রুপোর বাসনপত্র। ভয় পেয়ে একটা লোক চেঁচিয়ে উঠতেই হাতের তলোয়ার দিয়ে সে তার মাথাটা কেটে ফেলল।

তোর পিসিমা বলেছেন বুঝি?—বালকের উৎসাহ উদ্দীপনায় মুগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করল ইগনাত।

হাঁ, কেন?

কিছু না, এমনি!—প্রত্যুত্তরে একটু হেসে বলল ইগনাত,—তাই বুঝি তুই

ভেবেছিলি, তোর বাবাও একটা ডাকাত?

হয়তো আগে ডাকাত ছিলে,—অনেক অনেক দিন আগে?—আবার ফোমা তার নিজের কথায় ফিরে এল। যেন তার ঐ প্রশ্নের জবাবে 'হাঁ' শুনতে পেলেই খুশি হয় খুব।

না, কোনোদিনও আমি ডাকাত ছিলাম না। যাকগে, ওকথায় কাজ নেই।

কোনোদিনও না?

বললামইতো, কোনোদিনই ছিলাম না। কি অদ্ভুত ছেলে তুই! ডাকাত হওয়াটা কি ভালো কথা নাকি? ওরা সব পাপী—ঐ যারা ডাকাত, তারা। ওরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না—গির্জায় পর্যন্ত ডাকাতি করে। গির্জায় সবাই ওদের অভিশাপ দেয়। হাঁ, দেখ খোকা, শিগ্‌গিরই তোর হাতেখড়ি হবে। আর ক'দিন পরেই পড়বি তুই ন' বছরে। ভগবানের নাম নিয়ে লেখাপড়া আরম্ভ করে দে। শীতকালটা মন দিয়ে লেখাপড়া কর, তারপর বসন্তকালে আমি তোকে বেড়াতে নিয়ে যাবো ভল্‌গায়।

আমি কি ইস্কুলে যাবো? ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল ফোমা।

প্রথমে তুই বাড়িতেই পড়বি—পিসিমার কাছে।

কিছুদিন পরে, রোজ সকালে উঠে বালক ফোমা পিসিমার কাছে টেবিলের সামনে বসে স্লাভ বর্ণমালা মুখস্থ করতে আরম্ভ করল। আজ, বুকি, ভেদী; তারপর ব্রা, গ্রা, দ্রা এই পর্যন্ত এসেই হেসে গড়িয়ে পড়ত ফোমা। কিন্তু অতি সহজে অল্প কিছুদিনের ভিতরেই সে বর্ণমালা আয়ত্ত করে ফেলল। তারপর শিখে ফেলল খ্রীষ্টস্তোত্র গ্রন্থের অধ্যায়ের প্রথম স্তোত্রটি :

সে-ই সুখী এ জগতে যে কখনো অনৈশ্বরিক বুদ্ধিতে পরিচালিত হয়নি।

ঠিক হয়েছে, চমৎকার! লক্ষ্মীছেলে! ঠিক হয়েছে ফামুশ্‌কা!—বালকের দ্রুত উন্নতিতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে আবেগভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন পিসিমা।

লক্ষ্মী ছেলে, ফোমা!—ছেলের পড়াশুনোয় উন্নতির কথা শুনে খুশি হয়ে বলল ইগনাত।—বসন্তকালে আমরা আস্ত্রখান যাবো মাছ আনতে। তারপর শরতকাল এলে তোকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেবো।

পাহাড়ের উপর থেকে ছেড়ে দেওয়া বলের মতো গড়িয়ে চলেছে বালক ফোমার জীবন। পিসিমা একাধারে ওর শিক্ষয়িত্রী আর খেলার সাথী। কখনো কখনো আসত লিউবা মায়াকিন। ওদের সঙ্গে বৃদ্ধা ওদেরই একজন বনে যেতেন। তিন জনে মিলে খেলত লুকোচুরি, খেলত কানামাছি। কানামাছি হয়ে আনফিসা যখন রুমালে চোখ বেঁধে হাত বাড়িয়ে পা টিপে টিপে আসতেন ঘরের ভিতরে, তারপর চেয়ারে টেবিলে ঠোক্কর খেতে খেতে ঘরের কোণে কোণে আতিপাতি করে ওদের খুঁজে বেড়াতেন আর বলতেন : আঃ! কোথায় গিয়ে যে লুকোল খুদে শয়তান-গুলো, অ্যাঁ!—দারুণ খুশি হয়ে উঠত ওরা।

বৃদ্ধার যৌবনোচ্ছল অন্তর-ভরা জরাজীর্ণ দেহে সূর্যের আলোর ঝিলিমিলি এসে পড়ত ছড়িয়ে।

খুব ভোরে উঠে ইগনাত চলে যেত বিনিময় কেন্দ্রে। কোনো কোনো দিন থাকত সেখানে সন্ধ্যা পর্যন্ত। সন্ধ্যার পর কখনো যেত শহরের মন্ত্রণাসভায় কিংবা কারুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে। কোনো কোনোদিন ফিরত মাতাল হয়ে। এরকম অবস্থায় প্রথম প্রথম দারুণ ভয় পেত ফোমা। ছুটে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে বসে থাকত।

কিন্তু ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে উঠল, আর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে বুঝতে পারল যে, মাতাল অবস্থায় ওর বাবা স্বাভাবিক অবস্থায় চাইতে আরো অনেক বেশি ভালো হয়ে ওঠেন, —যেন আরো বেশি স্নেহশীল, আরো সহজ, খানিকটা আমুদে। যদি এমন কখনো ঘটত যে সে রাত্রে ফিরেছে মাতাল হয়ে, ফোমার ঘুম ভেঙে যেত তার বাবার ঢাকের মতো গলার আওয়াজ। বলত : আনফিসা! লক্ষ্মী দিদি আমার, দোর খোলো! একটিবারের জন্যে আমাকে ভিতরে যেতে দাও ছেলেটার কাছে! মাত্র একটিবারের জন্যে যেতে দাও আমাকে আমার বংশধরের কাছে!

প্রত্যুত্তরে কান্নাভরা ভর্ৎসনার সুরে বলত ওর পিসিমা :

যা যা! দূর হয়ে যা! ঘুমোগে এখন, অভিশপ্ত শয়তান! আবার তুই মদ গিলে এসেছিস্, অ্যাঁ! বুড়ো তো হয়েছিস না কি?

আনফিসা! একটা চোখের কোণে এই একটুখানিও কি দেখতে পাবো না ছেলেটাকে?

ফোমা জানে কিছুতেই আনফিসা ওকে দেবে না ঘরে আসতে, তাই পরক্ষণেই সে আবার পড়ত ঘুমিয়ে। কিন্তু যেদিন ইগনাত দিনের বেলায় ফিরত মাতাল হয়ে, এসেই সে তার বিশাল হাতের মুঠোয় খপ্ করে ধরে ফেলত ফোমাকে। তারপর তাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে মত্ত কণ্ঠের খুশিভরা দরাজ হাসি হাসতে হাসতে বলত :

ফোমা, কি চাই তোমার বলো! উপহার? খেলনা? কি চাই বলো! জেনে রেখো দুনিয়ায় এমন কিছু নেই যা নাকি আমি তোমাকে কিনে দিতে পারি না। লক্ষ লক্ষ টাকা আছে আমার হাঃ হাঃ হাঃ! আরো হবে, অনেক অনেক! বুঝেছ? এ সবকিছুই তোমার, হাঃ হাঃ হাঃ!

তারপর হঠাৎ দম্‌কা হাওয়ায় মোমের বাতি যেমন করে নিভে যায়, ইগনাতের সমস্ত উৎসাহ উদ্দীপনাও তেমনি মুহূর্তে নিভে যেত। ওর রক্তিম মুখখানা কাঁপতে শুরু করত, চোখদুটো জ্বালা করে লাল হয়ে উঠে জলে ভরে উঠত, ঠোঁট-দুটো বিস্তৃত হয়ে কি এক বেদনাভরা ম্লান হাসিতে উঠত বেঁকে।

আনফিসা! ও যদি মরে যায়, কি করবো আমি তখন?

কিন্তু কথাটা বলে ফেলেই নিদারুণ ক্রোধে জ্বলে উঠত ইগনাত।

তবে এ সবকিছুই আমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেবো। ধ্বংস করে ফেলবো সবকিছু। উড়িয়ে দেবো ডিনামাইট দিয়ে!

ঢের হয়েছে, পাজী নচ্ছার কোথাকার! ছেলেটাকে কি তুই ভয় পাওয়াতে চাস? —ঝঙ্কার দিয়ে উঠত আনফিসা।—একটা শক্ত ব্যামো হোক তাই চাস?

এইটুকুই যথেষ্ট। বিড়বিড় করতে করতে তক্ষুনি ইগনাত ছুটে বেরিয়ে যেত ঘর থেকে : বেশ, বেশ, বেশ! যাচ্ছি আমি বাপু, চলে যাচ্ছি! আর চেঁচামেচি করো না, সোরগোল বাঁধিও না! ভয় পাইয়ে দিও না ছেলেটাকে!

আর যদি ফোমার একটু অসুখ করল, সমস্ত কাজকর্ম ফেলে রেখে ওর বাবা এসে বসত ঘরে। এক মুহূর্তের জন্যেও নড়ত না ঘর থেকে। আর নানান রকমের অর্থহীন প্রশ্ন ও উপদেশে বোন ও ছেলেকে উত্যক্ত করে তুলত।

কেন তুই দয়াময় প্রভুকে বিরক্ত করছিস বল তো?—বলত আনফিসা।—সাবধান, তোর অভিযোগ তাঁর কানে পৌঁছবে। আর তাঁর করুণার বিরুদ্ধে তোর এই অভিযোগের জন্যে কঠিন শাস্তি পেতে হবে তোকে।

অ্যাঁ দিদি!—গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলে উঠত ইগনাত,—যদি তাই ঘটে?

আমার সমস্ত জীবন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে—যাবে ধূলিসাৎ হয়ে। কিসের জন্যে তখন আর আমি বেঁচে থাকবো? কেউ তা জানে না।

এই ধরনের ঘটনায়, আর ওর বাবার মুহুর্মুহু ভাব ও মেজাজের পরিবর্তনে প্রথম প্রথম দারুণ ভয় পেয়ে যেত ফোমা। কিন্তু ক্রমেই অভ্যস্ত হয়ে গেল। তারপর কোনোদিন যদি জানলা দিয়ে দেখতে পেত, ওর বাবা বাড়ি এসেছে, কিন্তু কিছুতেই নামতে পারছে না গাড়ি থেকে, পরম নির্বিকারভাবে বলে উঠত ফোমা ঃ পিসিমা, বাবা আবার এসেছে মাতাল হয়ে।

* * *

এল বসন্তকাল। প্রতিশ্রুতি মতো ইগনাত ছেলেকে নিয়ে তার একটা স্টিমারে চড়ে বসল। অজস্র ভাবসম্পদভরা এক নতুন জীবন, নতুন রূপ খুলে গেল ফোমার চোখের সামনে।

গরুদিয়েফ-এর বিরাট শক্তিশালী সুন্দর জাহাজ 'ইয়েরমাক' স্রোতের সঙ্গে দ্রুত চলেছে ভেসে। সুন্দরী প্রমত্তা ভল্‌গার দুই তীর ধীরে ধীরে পিছনে সরে যাচ্ছে। বাঁ দিকের সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে—যেন আকাশের সঙ্গে মেশা দিগন্তপ্রসারী হলুদ বর্ণের এক বহুমূল্য গালিচা রয়েছে পাতা। ডান দিকের তীর খাড়া উঁচু, ঘন বনে সমাচ্ছন্ন—গাছগুলো যেন আকাশের দিকে মাথা উঁচিয়ে গভীর তন্দ্রায় মগ্ন।

বিশাল বিস্তৃত-বক্ষ নদী দুই তীরের ভিতর দিয়ে সগৌরবে প্রবাহমান। ধীর নিঃশব্দ গতিতে বয়ে চলেছে জলস্রোত, নিজের অপ্রতিহত শক্তি সম্পর্কে সচেতন। পাহাড়ী তীরের কালো ছায়া পড়েছে নদীর বুকে। বাঁ-পাড়ে বালু আর গোচারণ মাঠের সবুজ পাড় দেওয়া সোনালী গালিচা। কখনো কখনো পাহাড়ের উপরে বা মাঠের কিনারে দেখা যায় গ্রাম—ঘরের জানলার কাছে আর খড়ের চালে প্রতিফলিত সূর্যের আলোর সমারোহ। কখনো বা ঘন বনের ফাঁকে দেখা দেয় গির্জার চূড়ার ক্রুশচিহ্ন আর হাওয়ায়-ঘোরা জাঁতা কলের ঘূর্ণ্যমান ধূসর পাখা। দেখা যায় কারখানার আকাশ-ছোঁয়া চিমনিমুখে মেঘের মতো ঘন কালো ধোঁয়া উড়ে চলেছে আকাশ পথে। লাল, নীল আর শাদা জামাপরা শিশুর দল ভিড় করে এসে দাঁড়ায় তীরে আর কলরব তুলে চিৎকার করে নদীর শান্ত নিস্তব্ধতা ভঙ্গকারী স্টিমারটার উদ্দেশ্যে। স্টিমারের ঘূর্ণ্যমান চাকার তলা থেকে জেগে উঠে সুন্দর ঢেউগুলি ছুটে চলে তীরের ঐ ভিড়-করে-দাঁড়ানো শিশুদের পায়ের দিকে লক্ষ্য করে। তারপর জল ছিটিয়ে আছড়ে পড়ে পাড়ের গায়ে। কখনো বা নৌকোয় চড়ে ছেলের দল দোলনার মতো ঢেউয়ের দোলায় দোল খেতে খেতে চলে যায় মাঝ-দরিয়ায়। পাড়ের গাছগুলো দাঁড়িয়ে থাকে জলের উপর। যখন প্রবল জলোচ্ছ্বাসে স্ফীত হয়ে ওঠে নদীর বুক গাছগুলো যায় ডুবে, তারপর জলের বুকে দ্বীপের মতো ভাসতে থাকে। তীর থেকে ভেসে আসে গানের বিষাদমাখা করুণ সুর ঃ ও, ও-ও-ও আর একবার......

ভাসমান ভেলার পাশ বেয়ে জল ছিটিয়ে এগিয়ে চলেছে স্টিমার। ঢেউয়ের আঘাতে কড়ি-বর্গাগুলি অবিশ্রাম বেজে চলেছে ঝন্‌ঝন্‌ করে। ভেলার উপরের নীলকোর্তা-পরা মানুষগুলো কখনো বা ওঠে হেসে কখনো বা চিৎকার করে কি যেন বলাবলি করে। বিরাট সুন্দর জাহাজখানা পাশ ঘেঁসে এগিয়ে চলে নদীর বুকে। উলটো দিক থেকে এগিয়ে আসে একখানা যাত্রীবাহী স্টিমার—বেজে ওঠে বাঁশি, প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যায় পাহাড়ী তীরের ঘন বনানীর অন্তরালে। বিপরীতগামী দুটি জাহাজের চলার বেগে নদীর মাঝখানের ঢেউ-

গুলি বিক্ষুব্ধ হয়ে আছড়ে পড়ছে স্টিমারের গায়ে। নাগরদোলার মতো দুলে উঠছে স্টিমারগুলো। তীরে পাহাড়ী ঢালুর উপরে কোথাও বা রবিশস্যের হলুদে গালিচা, কোথাও বা কর্ষিত জমির বাদামী রেখা আবার কোথাও বা বসন্তকালীন ফসল বোনার জন্যে চষা খেতের কালো ফালি। আকাশের নীল চাঁদোয়ার বুকে ছোট ছোট কালো বিন্দুর মতো ঐ খেতের উপরে উড়ছে পাখির ঝাঁক। কাছেই চরছে এক পাল মেষ। দূর থেকে মনে হচ্ছে শিশুর খেলনার মতো। লাঠির উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রাখাল তাকিয়ে রয়েছে নদীর দিকে।

স্বচ্ছ জলের কিরণছটা—সর্বত্র অবাধ মুক্তি, অবাধ স্বাধীনতা। মনোহর হরিৎ মাঠ আর নির্মল আকাশের সুনিবিড় নীলিমা। জলের শান্ত মন্থর গতির ভিতরে যেন অনুভূত হচ্ছে এক অবরুদ্ধ শক্তির আবেগময় স্পন্দন। মাথার উপরে নব-বসন্তের সূর্যালোক; বাতাস ফার-গাছ আর নব-পল্লবিত পল্লবের মদির গন্ধে আকুল। প্রতিমুহূর্তে উন্মোচিত হচ্ছে নতুন নতুন ছবি—প্রতিমুহূর্তেই নদীর তীরগুলো যেন চোখ ও অন্তরকে ঐ আলিঙ্গনভরা অপরূপ সৌন্দর্যে ভরপুর করে তুলছে।

সমস্ত পরিবেশ, সবকিছু ঘিরে কেমন যেন এক অলস মন্থরতা—সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতি, সমস্ত মানুষ যেন এক শ্লথ মন্থরতায় চলেছে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে। কিন্তু সেই অলস মন্থরতার ভিতরে রয়েছে এক দীপ্ত সৌন্দর্য। মনে হয় ঐ মন্থরতার সুগভীর অভ্যন্তরে সুপ্ত রয়েছে এক অমিত শক্তি—কিন্তু এখনো যেন রয়েছে অচেতন, মোহাচ্ছন্ন, যেন স্পৃহাহীন, লক্ষ্যহীন। তন্দ্রামগ্ন জীবনের এই চেতনাহীনতা যেন দূরের ঐ সুন্দর পাহাড়ী ঢালুর উপরে বিছিয়ে দিয়েছে এক বেদনা ভরা ম্লান ছায়া। তীর থেকে বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসা কোকিলের কণ্ঠস্বরেও রয়েছে কেমন যেন এক প্রতীক্ষাভরা বিনীত সহনশীলতা, অভিনব উদ্দীপনাভরা মৌন আশা। ওর বিষাদমাখা গানের করুণ মূর্ছনায় যেন ধ্বনিত হয়ে উঠছে সাহায্যের আবেদনভরা ব্যাকুল মিনতি। আবার কখনো বা সে সুরে বেজে ওঠে হতাশা। প্রত্যুত্তরে নদীর বুক মথিত করে জেগে ওঠে দীর্ঘশ্বাস। নেমে আসে নীরবতা।

সমস্ত দিন ফোমা ক্যাপ্টেনের ব্রিজের কাছে ওর বাবার পাশটিতে চুপ করে বসে থাকে। তীরের সীমাহীন সামগ্রিক দৃশ্যাবলীর দিকে নীরব মৌনমুখে বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে থাকে তাকিয়ে। ওর মনে হয় যেন জাদুকর ও দৈত্যের দেশ—রূপকথার রাজ্যের এক রূপোলি রাজপথের উপর দিয়ে চলেছে হেঁটে। কখনো কখনো যা-কিছু দেখে তারই সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বাবাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। সানন্দে সচেতনভাবে ইগনাত ওর প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে চলে। কিন্তু ফোমার শিশুমন তার জবাবে সন্তুষ্ট হয় না। তার জবাবের ভিতরে খুঁজে পায় না কোনো মজার কথা—কিংবা বোধগম্যও হয় না ফোমার, যা শুনতে চায় তা পায় না।

একদিন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বাবাকে বলল ফোমা :

পিসিমা তোমার চেয়ে ভালো জানে।

কি জানে? —মৃদু হেসে প্রশ্ন করল ইগনাত।

সবকিছু। —প্রত্যয়ভরা সুরে জবাব দিল বালক।

কোনো আশ্চর্য নগরীর দেখা পায় না ফোমা। নদীর তীরে প্রায়ই মাঝে মাঝে দেখা দেয় শহর কিন্তু তা ঠিক ওদের নিজেদের শহরেরই মতো। কোনোটা হয়তো বা একটু বড়ো আর কোনোটা একটু ছোট। কিন্তু তেমনই লোকজন, বাড়িঘর, গির্জা। বাবার সঙ্গে গিয়ে দেখে খুব ভালো করে, কিন্তু অসন্তুষ্ট হয়ে ক্লান্ত বিষণ্ণ মনে ফিরে আসে স্টিমারে।

কাল আমরা গিয়ে পেঁছিবো আস্ত্রাখানে।—একদিন ইগনাত বলল ফোমাকে।
সেটা কি অন্য শহরেরই মতো?
নিশ্চয়ই। তাছাড়া আর কেমন হবে?
আস্ত্রাখান-এর পরে কি?
সমুদ্র। কাস্পিয়ান সমুদ্র বলে সেটাকে।
কি আছে সমুদ্রে?
মাছ। কি অদ্ভুত ছেলে! জলে আর কি থাকে?
সেখানে জলের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে 'কিতেঝ্' শহর।
সেকথা আলাদা। কিতেঝ্ শহর। কেবলমাত্র ধার্মিক লোকেরা বাস করে সেখানে।
সমুদ্রে আর কোনো এমন শহর নেই যেখানে কেবল ধার্মিক লোকের বাস?
না।—একটু চুপ করে থেকে বলল ইগনাত। তারপর আবার বলে উঠল:
সমুদ্রের জল লোনা, কেউ তা মুখে দিতে পারে না।
সমুদ্রের ওপারে কি আরো দেশ আছে?
নিশ্চয়ই। সমুদ্রেরও তো শেষ আছে। সমুদ্র হচ্ছে একটা বাটির মতো।
সেখানে আরো শহর আছে?
আরো শহর, নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সে দেশ আমাদের নয়। সেটা হল পারসীদের। বাজারে দেখনি পারসীদের ফল বেচতে?
হাঁ, দেখেছি ওদের।—প্রত্যুত্তরে বলল ফোমা, তারপর কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে লাগল।
আর একদিন ফোমা তার বাবাকে জিজ্ঞেস করল: আরো অনেক অনেক দেশ আছে?
পৃথিবীটা অনেক বড়ো বুঝলে খোকা! যদি তুমি হাঁটতে শুরু করো তবে দশ বছরেও পৃথিবীটার চারদিক ঘুরে আসতে পারবে না।
অনেকক্ষণ ধরে ইগনাত পুত্রের সঙ্গে পৃথিবীর আকার সম্পর্কে করল আলোচনা। অবশেষে বলল: কিন্তু তবুও কেউ সঠিক করে বলতে পারে না পৃথিবীটা সত্যিসত্যিই কতো বড়ো কিংবা কোথায় এর শেষ।
আচ্ছা পৃথিবীর সবকিছু কি একই রকম দেখতে?
তার মানে?
এই শহর আর অন্যান্য সবকিছু?
হাঁ, নিশ্চয়ই, শহর তো শহরেরই মতো দেখতে। সেখানে রাস্তাঘাট আছে, বাড়িঘর আছে—আছে যা কিছু প্রয়োজনীয় সব।
এমনি ধরনের বারকয়েক আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের পর বালক ফোমা আর তেমনি করে কালো চোখের প্রশ্নভরা দৃষ্টি মেলে দূরের পানে তাকিয়ে থাকত না।
জাহাজের নাবিকেরা ফোমাকে ভালোবাসে আর ফোমাও ঐ রোদে-পোড়া জলে-ভেজা চমৎকার মানুষগুলোকে পছন্দ করে খুব। তারা ওর সঙ্গে হাসে খেলা করে। মাছ ধরার ছিপ বানিয়ে দেয়, গড়ে দেয় নৌকা গাছের বাকল কেটে, খেলে; আর যখন ইগনাত চলে যেত শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে ওরা ফোমাকে বেড়িয়ে আনত নৌকা করে নোঙরঘাটার আশ্‌পাশে। ফোমা শুনত, প্রায়ই ওরা আলোচনা করে ওর বাবার সম্পর্কে। কিন্তু কখনো সে সব কথায় কান দিত না, বা বলতও না কিছু ওর বাবার কাছে কি শুনেছে ওদের মুখে। কিন্তু আস্ত্রাখানে থাকতে

থাকতেই একদিন তখন স্টিমারে জ্বালানি কাঠ বোঝাই হচ্ছিল। ফোমা শুনতে পেল মিস্ত্রি পেত্রভিচ্-এর গলা ঃ

এই এতগুলি কাঠ বোঝাই করার হুকুম দিয়েছে। কি অসম্ভব লোক! এদিকে জাহাজের ডেক পর্যন্ত ঠেলে বোঝাই দেয়ার হুকুম দেবে তারপর আবার গাল পাড়বে যে ঘন ঘন যন্ত্রপাতি ভাঙছে বলে, কিংবা গজ্ গজ্ করবে যে, ব্যাটারা তোরা বেপরোয়া তেল ঢালিস!

এগুলো হচ্ছে ওর দুর্দান্ত লোভের ফল।—রুক্ষকণ্ঠে বলল একটি বুড়ো নাবিক।—এখানে জ্বালানি কাঠ সস্তা, তবে আর কি যতো পারো বোঝাই করো! শয়তানটা দারুণ লোভী!

সত্যি কী ভীষণ লোভী লোকটা!

বার বার ঐ একই কথাটার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় কথাটা ফোমার স্মৃতিতে গেঁথে গেল। সন্ধ্যায় খেতে বসে হঠাৎ ফোমা তার বাবাকে জিজ্ঞেস করল ঃ

বাবা!

কেন?

তুমি কি লোভী?

তারপর বাবার প্রশ্নের উত্তরে ফোমা বলল ঐ বুড়ো নাবিক আর মিস্ত্রির ভিতরের আলোচনার কথা। ইগনাতের মুখখানা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল; দারুণ ক্রোধে চোখ-দুটো জ্বলতে লাগল।

বটে, তাই!—মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠল ইগনাত।—যাকগে, ওসব কথায় তুই কান দিস না। ওরা তোর সমপর্যায়ের লোক নয়, ওদের সঙ্গে অত মেলামেশা করিস না। তুই হলি গে ওদের মনিব, আর ওরা তোর চাকর, বুঝলি? ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে আমি ওদের সবকটাকে তাড়িয়ে দিতে পারি। ওদের মতো লোক পথে-ঘাটে মেলে কুকুরের মতো, বুঝলি? আমার সম্পর্কে অনেক সময় ওরা অনেক খারাপ কথা বলতে পারে কিন্তু কেন বলে জানিস?—বলে আমি ওদের মনিব বলে। এসব কথা ওঠে এইজন্যে যে, আমি ধনী, ভাগ্যবান। ধনীদের সবাই হিংসা করে। সুখী লোক সবারই শত্রু।

দিন দুই পরে একজন নতুন পাইলট ও একজন নতুন মিস্ত্রি এল জাহাজে।

ইয়াকভ কোথায়?—জিজ্ঞেস করল ফোমা।

তাকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি। হুকুম দিয়েছি চলে যেতে।

সেই জন্যে?—আবার প্রশ্ন করল ফোমা।

হাঁ, সেই জন্যেই।

আর পেত্রভিচ্, তাকেও?

হাঁ তাকেও তাড়িয়ে দিয়েছি।

ওর বাবার যে এতো তাড়াতাড়ি লোক বদল করবার ক্ষমতা আছে এটা জানতে পেরে ফোমা দারুণ খুশি হয়ে উঠল মনে মনে। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে নীরবে একটু হাসল তারপর ডেকের উপরে বেরিয়ে এসে যেখানে একটি নাবিক বসে দড়ির পাক খুলে ছোঁচ তৈরি করছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়াল।

জানো, আমাদের একজন নতুন পাইলট এসেছে।—বলল ফোমা।

জানি। ঈশ্বর তোমাকে সুস্থ রাখুন ফোমা ইগনাতিচ! ঘুম ভালো হয়েছিল তো?

একজন নতুন মিস্ত্রিও এসেছে।

হাঁ, একজন নতুন মিস্ত্রিও এসেছে। পেত্রভিচের জন্যে কি দুঃখ হয় তোমার?

না।

সত্যি? কিন্তু সে তো তোমাকে কতো ভালোবাসত।

বেশ, কিন্তু কেন সে আমার বাবাকে গাল পেড়েছিল?

বটে? সে কি গাল দিয়েছিল নাকি?

নিশ্চয়ই, আমি নিজের কানে শুনেছি যে।

হুঃ! তোমার বাবাও শুনেছিলেন বুঝি?

না তো, আমি তাঁকে বলেছি।

তুমি—তাই বলো,—জড়িত কণ্ঠে বলল নাবিকটি তারপর চুপ করে নিজের কাজ করতে লাগল।

আর বাবা আমাকে কি বলেছেন জানো, বলেছেন,—তুমি হলে এখানকার মনিব, ইচ্ছে করলে তুমি সব্বাইকে তাড়িয়ে দিতে পারো।

ঠিক।—গম্ভীর বিষন্ন দৃষ্টিতে বালকের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল নাবিকটি। সগর্বে, পরম উৎসাহে বালক বলে চলেছে তার ক্ষমতার কথা। কিন্তু সেদিন থেকে ফোমা দেখল নাবিকেরা আর ওর সঙ্গে আগের মতো ব্যবহার করে না। কেউ কেউ যেন ওকে খুশি করতে আরো বেশি বিনীত ব্যবহার করে। কিন্তু অন্য সবাই যেন পারতপক্ষে কথাই বলতে চায় না ওর সঙ্গে। গ্রাহ্য করে না, আদৌ আমল দেয় না ওকে। যখন কথা বলে, বলে রাগত স্বরে—আগের মতো আর আদর করে কথা বলে না। ডেক ধোয়ার সময়ে দাঁড়িয়ে দেখতে ভালোবাসত ফোমা ঃ পাজামা হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে তুলে, কিংবা খুলে রেখে নাবিকেরা ন্যাতা আর ব্রুশ নিয়ে নিপুণভাবে বালতি থেকে জল ঢালতে ঢালতে সমস্ত ডেকময় করে ছোটাছুটি। একে অন্যের গায়ে দেয় জল ছিটিয়ে, হাসে, হল্লা করে, পিছলে পড়ে। চারদিকে বয়ে চলে জলস্রোত। ঘোলাটে জলের শব্দের সঙ্গে মিশে জেগে ওঠে মানুষের কণ্ঠের সজীব কোলাহল। আগে কখনো ফোমা নাবিকদের ঐ খেলাচ্ছলে হালকা কাজ করার ব্যাপারে কিছুই বলত না বরং কখনো কখনো সেও গিয়ে জুটে যেত ওদের সঙ্গে। নাবিকদের গায়ে জল ছিটিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে ছুটে পালিয়ে যেত, যখন পাল্টা ওরাও ভয় দেখাত ওর গায়ে জল ঢেলে দেবে বলে। কিন্তু ইয়াকভ আর পেত্রভিচের জবাব হয়ে যাবার পর ফোমার মনে হল সে যেন সবারই শত্রু হয়ে উঠেছে। কেউ আর ওর সঙ্গে খেলা করে না, কেউ আর ওর সঙ্গে করে না সস্নেহ ব্যবহার। বিস্মিত বিমর্ষ ফোমা ডেক ছেড়ে চাকা ঘরের সামনে গিয়ে আহত অন্তরে দূরের সবুজ পাড়ের ওপাশের ঘন বনানীর দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। নিচে ডেকের উপরে খেলাচ্ছলে তখনো চলেছে জল ছিটানো, জেগে উঠছে নাবিকদের খুশিভরা উচ্ছল কণ্ঠের উচ্চ হাসি। ফোমার ইচ্ছে হয় ওদের কাছে ছুটে যায়, কিন্তু পারে না—কিসে যেন ওকে বাধা দেয়।

যতদূরে সম্ভব ওদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকবে—মনে পড়ল বাবার উপদেশ; —'তুই হলিগে ওদের মনিব।'...পরক্ষণেই ওর ইচ্ছে হল গিয়ে কড়া ধমক দেয় নাবিকদের, গাল পাড়ে, যেমন করে ওর বাবা ওদের গাল পাড়ে, ধমকায়। কিন্তু কি বলে ধমকাবে—বহুক্ষণ ধরে ভেবে ভেবেও উপযুক্ত কোনো কথা খুঁজে পায় না ফোমা। কেটে গেল আরো দু'তিন দিন। এতক্ষণে নিঃসন্দেহ হয়ে গেল ফোমা যে নাবিকেরা আর ওকে আগের মতো মোটেই পছন্দ করে না। স্টিমারে একান্ত একাকী মনে হতে লাগল ওর নিজেকে। আর এই নবজাগ্রত চেতনার কুয়াশা ভেদ

করে ফোমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল আনফিসা পিসির স্নেহভরা কমনীয় মুখ—তার মুখের রূপকথা, তার কোমল হাসির ঝঙ্কার, যা নাকি ওর অন্তর আনন্দভরা উষ্ণতায় ভরপুর করে তুলত। এখনো ফোমা বাস করে রূপকথার রাজ্যে। কিন্তু বাস্তবের কঠোর নির্মম হাত বালকের চোখের সামনের সেই অপরূপ সূক্ষ্ম পর্দাখানা ইতিমধ্যেই ছিঁড়ে ফেলতে শুরু করেছে। মিস্ত্রি ও পাইলটের সেই ঘটনা ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল পারিপার্শ্বিকের দিকে। আরো তীক্ষ্ম হয়ে উঠল ফোমার দৃষ্টি। আর সেই দৃষ্টিভরে জেগে উঠল এক সচেতন অনুসন্ধিৎসা। কোন্ কলকবজায় নির্ধারিত হয় মানুষের কাজকর্ম—বাবার কাছের প্রশ্নের ভিতর দিয়ে ধ্বনিত হয়ে ওঠে জানবার বুঝবার জন্য এক আকুল আকাঙ্ক্ষা।

একদিন ওর চোখের সামনেই ঘটল একটা ঘটনা। নাবিকেরা কাঠ বোঝাই করছিল জাহাজে। ওদের ভিতরে সবচাইতে যার বয়েস কম তার নাম হল ইয়েফিম। মাথা-ভরা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। ডেকের উপর দিয়ে ঠেলায় করে কাঠ বয়ে নিয়ে যেতে যেতে ক্রুদ্ধকণ্ঠে চিৎকার করে বলে উঠল ঃ

নাঃ, লোকটার বিবেক-বিবেচনা বলতে কিছু নেই। নাবিক—তার কি কাজ সে তো জানে সবাই পরিষ্কার। না, তার বদলে কাঠ বও—ধন্যবাদ! তার মানে হল, গায়ের চামড়া খুলে নেওয়া, অথচ সেটা আমি বিক্রি করিনি। বিবেক বলে কোনো পদার্থ যদি থাকে লোকটার! মনে ভাবে আমাদের জীবন নিংড়ে নিংড়ে রস বের করে নেওয়াটাই বুঝি বুদ্ধিমানের কাজ।

বালক ফোমা শুনল ওর অভিযোগ আর বুঝতে পারল কথাগুলো বলছে সে ওর বাবার উদ্দেশ্যে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করল যে ইয়েফিম গজ্ গজ্ করছে সত্য কিন্তু অন্যের চাইতে ঢের বেশি কাঠ সে আনছে তার ঠেলায় বোঝাই করে আর চলছেও অন্যের চাইতে তাড়াতাড়ি। ইয়েফিমের কথার জবাবে কোনো নাবিকই বলছে না একটিও কথা। এমনকি যারা ওর সঙ্গে কাজ করছে তারাও রয়েছে মুখ বুজে। কেবলমাত্র মাঝে মাঝে ইয়েফিমের ঠেলায় অত বেশি বেশি কাঠ বোঝাই করার বিরুদ্ধে তুলছে মৃদু প্রতিবাদ।

ঢের হয়েছে—বিরক্তিভরা গোমড়ামুখে হয়তো বলে উঠল কেউ।—ঘোড়ার পিঠে বোঝা চাপাচ্ছ না সেটা যেন খেয়াল থাকে।

চুপ করে থাক! তোকে জোতা হয়েছে গাড়িতে, পা না ছুঁড়ে গাড়ি টান! তোর গায়ের রক্ত যদি চুষেও নেয় মুখ বুজে চুপ করে থাকবি। বলবার কি আছে রে তোর?

হঠাৎ বেরিয়ে এল ইগনাত। তারপর নাবিকদের সামনে গিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করল ঃ কী বলছিলি তোরা?

বলছিলাম আমি, জেনেশুনেই বলছিলাম—একটু ইতস্তত করে জবাব দিল ইয়েফিম।—এমন কোনো চুক্তি করিনি যে কথা বলতে পারবো না।

কিন্তু কে তোদের রক্ত চুষে খাচ্ছে?—দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে প্রশ্ন করল ইগনাত।

নাবিকটি বুঝল, হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে সে। কিন্তু যখন দেখল যে আর কোনো উপায় নেই, তখন হাতের কাঠ ফেলে দিয়ে প্যান্টে হাত মুছতে মুছতে ইগনাতের মুখের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সাহস করে বলল ঃ

কেন কিছু অন্যায় বলেছি কি আমি? চুষে খাচ্ছেন না আপনি রক্ত?

আমি?

হাঁ, আপনি।

ফোমা দেখল তার বাবার হাতদুটো দুলে উঠছে। পরক্ষণেই একটা বিরাট ঘুষির শব্দের সঙ্গে নাবিকটি আছড়ে পড়ল কাঠের উপর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে উঠে দাঁড়িয়ে নীরবে কাজ করতে আরম্ভ করে দিল। মুখ ফেটে গড়িয়ে নেমে আসছে রক্তের ধারা। বার্চের শাদা বাকলের উপরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। জামার হাতা দিয়ে মুখের রক্ত মুছে হাতাটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল, পরক্ষণেই একটা বুক-চেরা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নীরব নতমুখে ফোমার পাশ দিয়ে ঠেলাগাড়িটা ঠেলে নিয়ে চলে গেল। ফোমা দেখল ওর নাকের দুপাশে বড়ো বড়ো দুফোঁটা জল টল্‌টল্‌ করছে।

দুপুরে খাবার সময়ে গম্ভীর চিন্তিত মুখে ফোমা এসে বসল টেবিলে। থেকে থেকে ভীত শঙ্কিত দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছে তার বাবার মুখের দিকে।

অমন করে কপাল কুঁচকে আছিস কেন?—জিজ্ঞেস করল ওর বাবা নরম সুরে।

কপাল কুঁচকে?

অসুখ করেছে নাকি?

না।

সাবধানে থাকিস, একটু কিছু হলেই বলবি আমাকে।

তুমি খুব জোয়ান—কি যেন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বলে উঠল ফোমা।

আমি? তা অবশ্য ঠিক, ঈশ্বর দয়া করে শক্তি দিয়েছেন আমাকে।

কী ভীষণ জোরে মারলে ওকে!—মাথা নিচু করে অস্ফুট কণ্ঠে বলল ফোমা।

ঝোলে এক টুকরো রুটি ভিজিয়ে সবে মাত্র মুখে তুলতে যাচ্ছিল ইগনাত, পুত্রের কথায় মাঝপথেই তার হাতখানা থেমে গেল। প্রশ্নভরা দৃষ্টি মেলে ফোমার আনত মুখের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ

তুই কি ইয়েফিমের কথা বলছিস?

হাঁ, ওর মুখ কেটে রক্ত পড়ছিল, আর কি রকম করে কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিল!—মৃদুকণ্ঠে বলল ফোমা।

হুঁ,—এক টুকরো রুটি মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে বলল ইগনাত,—বটে, তোর দুঃখ হচ্ছে বুঝি?

হুঁ।—প্রত্যুত্তরে বলল ফোমা। ওর কণ্ঠে কান্নার সুর।

আচ্ছা। তাহলে ঐ ধরনের ছেলে তুই।—বলল ইগনাত। তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে, মদের গ্লাসে একগ্লাস ভদ্‌কা ঢেলে এক চুমুকে নিঃশেষ করে দিয়ে, মৃদু ভর্ৎসনা-ভরা রুক্ষকণ্ঠে বলল ঃ ওর জন্য তোর মন খারাপ করার কোনো কারণ নেই। ও যা খুশি তাই বলে যাচ্ছিল আর তার জন্যে পেয়েছে উপযুক্ত শাস্তি। ছেলেটা ভালো, তা আমি জানি; শক্তি আছে, পরিশ্রমী, তাছাড়া নির্বোধও নয়। কিন্তু তা'বলে মুখে মুখে তর্ক করার অধিকার ওর নেই। আমি বলতে পারি যা খুশি, কারণ আমি মনিব। মনিব হওয়া সহজ কথা নয়। একটা ঘুষিতে ও মরে যাবে না কিন্তু কিছুটা আক্কেল বাড়বে। এই হচ্ছে পথ। বুঝেছিস ফোমা! তুই এখনো নেহাত বাচ্চা, এসব বুঝবি না এখন। আমি শিখিয়ে দেবো কেমন করে বাঁচতে হয় দুনিয়ায়। হয়তো এমনও হতে পারে আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে।—বলতে বলতে ইগনাত চুপ করে গেল। নীরবে আর খানিকটা ভদ্‌কা ঢেলে পান করল, তারপর যেন আপন মনেই বলে চলল ঃ

মানুষকে দয়া করাটা খুবই উচিত। কিন্তু সে দয়া করতে হয় বিচার-বিবেচনা

করে। প্রথমে দেখবি লোকটার ভিতরে কি কি গুণ আছে। খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবি সেটা। তারপর দেখবি কেমন করে সেই গুণগুলোকে কাজে লাগানো যায়। যদি দেখিস, লোকটার শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে—তখনই তাকে দয়া করবি, সাহায্য করবি। কিন্তু যদি সে দুর্বল হয়, অযোগ্য হয় কাজকর্মের, তার গায়ে থুথু দিয়ে এগিয়ে চলে যাবি। মনে রাখিস, যে লোক সব সময়ে সবকিছুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে, সে অপদার্থ, কোনো কাজেরই যোগ্য নয় সে। তাকে সাহায্য করেও তার ভালো করতে পারবি না। এসব লোকের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর মানে এদের স্বভাব আরো বিগড়ে দেয়া—নষ্ট করে ফেলা। তোর ধর্ম-বাবার ঘরে অনেক রকমের লোক দেখে থাকবি, আশ্রিত, ইতর ছোটলোকের দল—তাদের কথা ভুলে যা। তারা মানুষ নয়, মানুষের খোলস মাত্র—নিষ্কর্মা অপদার্থের দল। ভগবান লাভের উদ্দেশ্যেও ওরা বেঁচে থাকে না, কারণ ওদের ভগবানও নেই। মিছেই ওরা ভগবানের নাম নেয়। অবশ্য, ভগবানের নাম নেয় ওরা নির্বোধের অন্তরে দয়ার উদ্রেক করাতে আর তাতে করে নিজেদের পেট ভরাতে। কেবলমাত্র নিজেদের পেট ভরানোর জন্যেই ওরা বেঁচে থাকে—খাবে-দাবে ঘুমোবে আর সবকিছু নিয়েই করবে অভিযোগ। এ ছাড়া আর কোনো কর্ম নেই ওদের। ওরা যা করে, সেটা হল আত্মাকে ধ্বংস করার কাজ। যদি কখনো ওরা তোর পথের সামনে এসে পড়ে, দু' পায়ে মাড়িয়ে চলে যাবি। একগাদা পচা আতার ভিতরে একটা ভালো আতা রাখলে সেটায়ও যেমন পচন ধরে—ওদের ভিতরে ভালো লোক পড়লেও তেমনি নষ্ট হয়ে যায়। আর তাতে কারুরই কোনো লাভ হয় না। তোর বয়েসটা নেহাত কম, আর সেখানেই হয়েছে মুশকিল। আমার কথা এখন তুই বুঝবি না। শোন, তাকেই সাহায্য করবি, দুঃখের ভিতরে পড়েও যে থাকে দৃঢ়, শক্ত, অনমনীয়। হয়তো সে নাও চাইতে পারে তোর সাহায্য, কিন্তু নিজে থেকেই নজর রাখবি তার উপর—না চাইলেও তাকে সাহায্য করবি। আর যদি তার আত্ম-মর্যাদাজ্ঞান খুব তীক্ষ্ন হয়—সাহায্য করতে গেলে যদি তার মনে আঘাত লাগে, তবে এমনভাবে সাহায্য করবি যাতে সে না টের পায়—বুঝতে না পারে যে তুই তাকে সাহায্য করছিস। এমনি করে বুদ্ধি করেই করবি কাজ।

ধর যেমন দুখানা তক্তা কাদায় পড়ে গেছে—একটা পচা, একটা ভালো। কি করবি তখন? পচা তক্তাটা কি কাজে আসবে? ওটাকে ছেড়ে দিবি—থাক না পড়ে ওটা কাদায়। ওটার উপর দিয়ে হেঁটে যা, যাতে পায়ে কাদা না লাগে। কিন্তু যে তক্তাটা ভালো, সেটাকে তুলে এনে রোদে দে। যদি তোর নিজের কোনো কাজে নাও আসে, অন্যের কাজে আসতে পারে। এ-ই হচ্ছে সংসারের নিয়ম। আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোন, আর মনে রেখে দিস। ইয়েফিমের উপরে দয়া দেখাবার, ওর জন্যে দুঃখিত হবার কোনো কারণ নেই। সে শক্ত-সবল-সমর্থ মানুষ—তার নিজের মূল্য সে খুব ভালো করেই বোঝে। ওর মুখে একটা ঘুষি মারলেও ওর আত্মা পরাজিত হবে না, নুয়ে পড়বে না। আর এক হপ্তা ওকে আমি দেখবো, তারপর ওকে দেবো হালে। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি ও একজন দক্ষ পাইলট হবে। তরাপর যদি ওকে ক্যাপ্টেনের কাজে লাগাও ও সাহস হারাবে না, ভয় পাবে না। অচিরেই সে একজন সুদক্ষ ক্যাপ্টেন হয়ে উঠবে। এমনি করেই মানুষ বড়ো হয়ে ওঠে। আমি নিজেও এই শিক্ষার ভিতর দিয়ে মানুষ হয়ে উঠেছি। বুঝলি? জীবনটা সবার কাছে ঠিক স্নেহশীলা মায়ের মতো নয়—রক্ষিতারই মতো দোহন-শীলা।

ঘণ্টা দুই ধরে ইগনাত ছেলের সঙ্গে করল আলোচনা। বলল তার নিজের জীবনের কথা—যুবক বয়সের কথা—বলল নিজের কঠোর পরিশ্রমশীলতার কথা। বলল অন্যান্য অনেক লোকের কথা—তাদের উদ্যম, তাদের অদম্য শক্তির কথা। তাদের দুর্বলতার কথা। তারপর বলল—কেমন করে একজন সাধারণ মজুর থেকে আজ সে নিজে এত বড়ো একটা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়ে উঠেছে।

নীরবে ফোমা শুনছিল ওর কথা। থেকে থেকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছিল ইগনাতের মুখের দিকে আর সবটুকু অন্তর দিয়ে অনুভব করছিল যে ওর বাবা ক্রমেই ওর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছেন, আসছেন আরো কাছে, একান্ত অন্তরঙ্গ হয়ে। যদিও ওর বাবার গল্পের ভিতরে আনফিসা পিসির বলা রূপকথার মতো অমন টইটম্বুর বিষয়বস্তু নেই একথা সত্য কিন্তু তবুও এ গল্পের ভিতরেও কি যেন এমন একটা আরো নতুন আরো স্পষ্ট বোধগম্য বিষয়বস্তু আছে যা নাকি তেমনি মনোমুগ্ধকর, তেমনি আকর্ষণভরা। কি যেন এক শক্তিশালী উষ্ণতা ওর হৃদয়টুকু ভরে স্পন্দিত হতে লাগল আর ওর সমস্ত মনপ্রাণ বাবার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়তে লাগল।

ছেলের চোখে তার অন্তরের ভাবধারা প্রতিফলিত হতে দেখে বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ল ইগনাত। অকস্মাৎ ইগনাত উঠে দাঁড়াল তারপর ছেলের কাছে এগিয়ে এসে তাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বুকের ভিতরে জড়িয়ে ধরল। ফোমাও দু'হাতে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে তার গালটা বাবার গালের সঙ্গে চেপে ধরল।

খোকা—সোনা আমার! মানিক আমার!—অস্ফুট জড়িত কণ্ঠে বলতে লাগল ইগনাত—ধন আমার! আমি বেঁচে থাকতে থাকতে শিখে নাও মানিক! ওঃ! সংসারে বেঁচে থাকাটা বড্ডো কঠিন!

বাবার স্নেহমাখা অস্ফুট কণ্ঠের জড়িত সুরে ফোমার শিশু-হৃদয় কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে পড়ে রইল আর দু'গাল বেয়ে নেমে এল চোখের জলের উষ্ণ ধারা।

এর আগে আর কোনোদিন ইগনাত তার ছেলের মনে কোনো বিশেষ ভাবধারা, কোনো বিশেষ অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে প্রয়াস পায়নি। বালক ফোমা ক্রমেই তার বাবার অনুরক্ত হয়ে পড়ল। আগে আগে বাবার বিরাট শরীরটার দিকে তাকিয়ে ওর ক্লান্তি আসত, ভয়ও করত মনে মনে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথাও বুঝত যে, ও যা কিছুই চাক না কেন, যেমন করে হোক ওর বাবা ওর সে ইচ্ছে পূরণ করবেনই। কখনো কখনো ইগনাত দু'দিন চারদিন, এক হপ্তা এমনকি গোটা গরমের কালটাই বাইরে বাইরে কাটাত। কিন্তু পিসিমা আনফিসার প্রতি ভালোবাসায় এমনই মশগুল হয়ে থাকত ফোমা যে বাবার অনুপস্থিতি আদৌ ওর নজরে আসত না। যখন ইগনাত বাড়ি ফিরে আসত, দারুণ খুশি হয়ে উঠত ফোমা। কিন্তু ওর সে খুশি হয়ে ওঠাটা বাবার বাড়ি ফিরে আসার জন্যে, না সে যে-সব খেলনা কিনে আনত তারই জন্যে সেটা তেমন বুঝে উঠতে পারত না ফোমা। কিন্তু এখন ইগনাতকে দেখবামাত্র দৌড়ে ছুটে আসে ফোমা, দু'হাতে তার হাতখানা জড়িয়ে ধরে চোখে চোখ রেখে হেসে ওঠে। যদি কখনো একসঙ্গে দু'তিন ঘণ্টা বাবাকে দেখতে না পায় ওর মন খারাপ হয়ে ওঠে—ভাবতে শুরু করে। বাবা ওর কাছে খুবই মজার—আনন্দের প্রতীক, সে ওর শিশুমনে জাগিয়ে তুলেছে ঔৎসুক্য, জাগিয়ে তুলেছে ওর মনে তার নিজের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা। যখনই দু'জনে এক সঙ্গে থাকে ফোমা তার বাবাকে বলে : বাবা, তোমার নিজের গল্প বলো না!

ভলগার বুক বেয়ে এগিয়ে চলেছে স্টিমার। শ্রাবণের এক গুমোট রাত। ঘন কালো মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ। ভলগার বুক নিস্তরঙ্গ, শান্ত, গম্ভীর—বুঝিবা কোনো ভয়ঙ্কর বিপদের পূর্বাভাস। ওরা এসে পৌঁছল কাজানে। তারপর উস্‌লন-এর কাছে একটা বিরাট নৌ-বহরের শেষ প্রান্তে ফেলল নোঙর। শিকলের ঝন্‌ঝন্‌ আর কোলাহল, চিৎকারে ফোমার ঘুম ভেঙে গেল। জানালার পথে তাকিয়ে দেখল, বহুদূরে একটা ছোট আলো মিট্‌ মিট্‌ করে জ্বলছে। চতুর্দিকে তেলের মতো ঘন কালো জল, আর কিছুই যায় না দেখা। নিদারুণ ভয়ে কেঁপে উঠল ফোমার বুক। কান খাড়া করে একান্ত একাগ্রতার সঙ্গে কি যেন শুনতে লাগল। বহুদূর থেকে ভেসে আসছে অতি ক্ষীণ, অস্পষ্ট একটা গানের সুর—গমনশীল যাত্রীদের একঘেয়ে করুণ সুরের মতো, যে সুরে পাহারাওয়ালারা ডাকে পরস্পর পরস্পরকে। ক্রুদ্ধ স্টিমারটা হিসিয়ে উঠে ছাড়ছে বাষ্প-নিঃশ্বাস। নদীর বিষণ্ণ কালো জল নীরবে চলকে উঠছে স্টিমারের গা বেয়ে। স্থির অপলক দৃষ্টি মেলে বালক সেই নিকষ কালো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ব্যথায় টন টন করে উঠল চোখ। এতক্ষণে দেখতে পেল কতগুলি কালো স্তূপ আর উপরে ক্ষীণ আলো মিট্‌ মিট্‌ করে জ্বলছে। ফোমা বুঝল ওগুলো গাধাবোট। কিন্তু তবুও ওর ভয় দূরে হল না। দ্রুতগতিতে স্পন্দিত হচ্ছে বুক, আর কল্পনাভরা মানস চোখের দৃষ্টি ভরে জেগে উঠছে কালো কালো সব ভয়ঙ্কর মূর্তি।

ও-ও-ও—দূর থেকে ভেসে এল একটা একটানা কাতর গোঙানির শব্দ; পরক্ষণেই করুণ আর্তনাদে ভেঙে পড়েই গেল মিলিয়ে।

কে যেন ডেকের উপর দিয়ে স্টিমারের ওপাশে চলে গেল।

ও-ও-ও—আবার জেগে উঠল সেই শব্দ কিন্তু এবার আরো কাছে।

ইয়েফিম!—চাপাকণ্ঠে কে যেন ডেকে উঠল ডেকের উপরে। কিন্তু এবার আরো কাছে।

ইয়েফিমকা!

কি?

উঁ!

ওঠ শয়তান! ওঠ! আঁকশি নে।

ও-ও-ও—কাছেই কে যেন গোঙাচ্ছে। ভয়ে কেঁপে উঠল ফোমা, পেছিয়ে এল জানালার কাছ থেকে।

ঐ অদ্ভুত শব্দটা ক্রমেই যেন আসছে এগিয়ে; স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে তারপর অস্ফুট কান্নায় ভেঙে পড়ে নিকষ অন্ধকারের বুকে যাচ্ছে মিলিয়ে। ডেকের উপরে জেগে উঠল শঙ্কিত কণ্ঠের চাপা গুঞ্জন।

ইয়েফিমকা! ওরে ওঠ! এক অতিথি ভেসে এসেছে।

কোথায়?—জেগে উঠল চকিত কণ্ঠের প্রশ্ন। খালি পায়ে ডেকের উপরে দ্রুত চলাফেরার শব্দের সঙ্গে মিশে জেগে উঠছে চাপা কণ্ঠের কোলাহল। দুটো আঁকশি ফোমার মুখের সামনে দিয়ে প্রায় নিঃশব্দে নেমে গেল জলের ভিতরে।

অ-তি-থি!—কাছেই কে যেন কাঁদছে গুমরে গুমরে।

জেগে উঠছে শান্ত জলের আছড়ে পড়া অদ্ভুত প্রতিধ্বনি।

ঐ করুণ কান্নার সুরে ফোমার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। কিন্তু কিছুতেই যেন সে তার হাত সরিয়ে নিতে পারছে না জানালার উপর থেকে,—পারছে না জলের উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে।

লণ্ঠন জ্বালো। নইলে দেখা যাবে না।

সোজাসুজি।

ক্ষীণ আলোর রেখা ছড়িয়ে পড়ল জলে। ফোমা দেখল, নিস্তরঙ্গ জল নীরবে দুলছে, পরক্ষণেই একটা ছোট্ট ঢেউ ভেসে যেতেই সেই শান্ত জলরাশি যেন তীব্র ব্যথায় কেঁপে উঠল।

দেখ! দেখ!—শঙ্কিত কণ্ঠের চাপা গুঞ্জন জেগে উঠল ডেকের উপরে।

ঠিক সেই মুহূর্তে একখানা বড়ো ভয়ঙ্কর মানুষের মুখ ফুটে উঠল আলোর ভিতরে—শাদা দাঁত, পাটিদুটো দৃঢ়সংলগ্ন। মুখখানা জলের উপরে ভাসতে ভাসতে মৃদু মৃদু দুলছে। দাঁতগুলো যেন তাকিয়ে রয়েছে ফোমার মুখের দিকে আর হেসে হেসে বলছে ঃ

খোকা, খোকা, বড্ডো ঠাণ্ডা। বিদায়!

নৌকার আঁকশিদুটো আবার নড়ে উঠল। একবার উঠছে উপরের দিকে পরক্ষণেই আবার নেমে যাচ্ছে জলে। একান্ত সতর্কতার সঙ্গে কী যেন ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে।

ঠেলে দে! ঠেল! সাবধান, দেখিস যেন চাকার ভিতর গিয়ে না ঢোকে।

তবে তুই নিজেই ঠেল না?

আবার দ্রুত নেমে আসে আঁকশিটা। স্টিমারের গায়ে ঘসা লেগে জেগে ওঠে শব্দ—যেন কেউ দাঁতে দাঁত ঘসছে কিড়মিড় করে। কিছুতেই ফোমা পারছে না চোখ বুজতে—পারছে না চোখ ফিরিয়ে নিতে। ডেকের উপরে বহুলোকের পায়ের শব্দ উঠছে জেগে, এগিয়ে যাচ্ছে গলুই-এর দিকে। আবার জেগে উঠছে সেই অস্ফুট কান্নাভরা করুণ সুর ঃ

এক অ-তি-থি!

বাবা!—তীক্ষ্ণ রিনরিনে সুরে ডেকে উঠল ফোমা।

লাফিয়ে উঠে ত্রস্তে ছুটে এসে ওর কাছে দাঁড়াল বাবা।

ওটা কী? কী করছে ওরা ওখানে?—ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করল ফোমা।

বন্য গর্জনে হুঙ্কার দিয়ে উঠে ইগনাত ছুটে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে, পরক্ষণেই আবার এসে ঢুকল।

ভয় পেয়েছ? ও কিছু না।—ফোমাকে কোলে তুলে নিয়ে বলল ইগনাত ঃ এসো, আমার সঙ্গে শোবে।

ওটা কী?—শান্ত কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করল ফোমা।

ও কিছু না। জলেডোবা একটা মানুষ। লোকটা জলে ডুবে মরেছে, তাই ভেসে যাচ্ছে। ও কিছু না। এতক্ষণে অনেক দূরে ভেসে চলে গেছে।

ওরা কেন ঠেলে দিচ্ছিল?—ভয়ে চোখ বুজে বাবার বুকের ভিতরে দৃঢ়ভাবে লেপ্টে গিয়ে প্রশ্ন করল ফোমা।

দরকার ছিল ঠেলে দেয়া। নইলে স্রোতের টানে লোকটা চাকার তলায় গিয়ে পড়তে পারত। ধরো যদি আমাদের স্টিমারের চাকায় গিয়েই আটকাত, কাল নিশ্চয়ই সেটা পুলিশের চোখে পড়ত আর আমাদের মিথ্যে হয়রানি হতে হত। অনুসন্ধানের জন্য আট্‌কে রাখত আমাদের। তাই আমরা ওটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছি। কী আর হয়েছে তাতে? ও তো একটা মরা মানুষ। ব্যথা তো আর পায়নি! কিংবা ওর মনেও আঘাত দেয়া হয়নি। নইলে লাভের মধ্যে হত এই যারা বেঁচে আছে, অনর্থক ঝঞ্ঝাট হত তাদের। যাক্‌গে এখন ঘুমোও।

তাহলে এমনি করেই ভেসে যাবে লোকটা?

হাঁ, এমনি করেই ভাসতে ভাসতে চলে যাবে। তারপর কেউ হয়তো তুলে কবর দেবে।

বাবার বুকের উত্তাপে ফোমার অন্তরের জমে-ওঠা ভয় এতক্ষণে গলতে শুরু করল। কিন্তু তখনো ওর চোখের সামনে কালো জলের উপরে ভাসমান বিদ্রূপের হাসিভরা সেই ভয়ঙ্কর মুখখানা যেন থেকে থেকে ভেসে উঠতে লাগল।

কে ও লোকটা?

ভগবান জানেন কে! প্রার্থনা করো ঃ হে প্রভু! ওর আত্মাকে শান্তি দাও!

হে প্রভু! ওর আত্মাকে শান্তি দাও।—ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল ফোমা।

ঠিক হয়েছে। আর ভয়ের কিছু নেই। এবার ঘুমোও! এতক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে আর চলেছে ভেসে ভেসে। হাঁ দেখো, যখন জাহাজের কিনারার দিকে যাবে খুব সাবধান! নইলে জলের ভিতরে পড়ে যেতে পারো। ঈশ্বর না করুন! —আর......

ও লোকটা কি পড়ে গিয়েছিল?

তা ছাড়া কী? হয়তো খুব মাতাল হয়ে পড়েছিল তারপরই—ব্যস, খতম। কিংবা হয়তো জলে ঝাঁপ দেয় তারপর ডুবে মরে। জীবনটা এমনভাবে গঠিত যে সময়ে মৃত্যুটাই যেন ছুটি—যেন আশীর্বাদ সবারই পক্ষে।

বাবা?

ঘুমোও, ঘুমোও এবার লক্ষ্মীটি।

৩

প্রথম দিন স্কুলে এসেই কেমন যেন ভড়কে গেল ফোমা—ছেলেদের দুষ্টুমি, হৈ-হল্লা করে খেলায়, চিৎকারে কেমন যেন পড়ল দিশেহারা হয়ে। এক দঙ্গল ছেলের ভিতর থেকে ও বেছে নিল দুটি বন্ধু। প্রথম দর্শনেই ছেলেদুটিকে ওর ভালো লেগে গেল অন্য সবার চাইতে বেশি। একটি বসে ওর সামনে। ফোমা লক্ষ্য করে দেখল ছেলেটির চওড়া পিঠ, ছিট্ ছিট্ দাগেভরা পরিপুষ্ট ঘাড়, শোরের কুচির মতো খাড়া খাড়া কটা চুলেভরা মাথাটার পিছন দিক মিহি করে ছাঁটা।

মাস্টার মশাই—মাথাভরা টাক, নিচের ঠোঁটটা পড়েছে ঝুলে,—যখন ডাক দিলেন, —আফ্রিকান স্মলিন! কটাচুল ছেলেটি ধীরে উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে গেল মাস্টার মশাইয়ের সামনে, তারপর শান্ত চোখের দৃষ্টি মেলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মাস্টার মশাই যখন প্রশ্নটা বললেন, ছেলেটি মন দিয়ে শুনে নিয়ে সাবধানে চক দিয়ে ব্ল্যাক-বোর্ডের উপরে বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখতে আরম্ভ করল।

বেশ, বেশ,—বললেন মাস্টার মশাই।—ইয়ঝভ নিকোলাই এগিয়ে এস!

ইঁদুরের-মতো-কালো-কুতকুতে-চোখ ছোট্ট একটি চঞ্চল ছেলে ফোমার পাশ থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর চারদিকে তাকাতে তাকাতে সবকিছুর সঙ্গে ঠোক্কর খেতে খেতে দুসারের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল। ব্ল্যাক-বোর্ডের সামনে এসে ছেলেটি চকটা তুলে নিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়াল তারপর সশব্দে আঁক কষতে শুরু করে দিল। ভাঙা চকের গুঁড়ো পড়ছে ঝরে আর তারই ভিতর দিয়ে ফুটে উঠছে খুদে খুদে অস্পষ্ট অক্ষর।

আঃ! অত জোরে না, অত জোরে না!—ক্লান্ত চোখদুটো কুঁচকে শীর্ণ হলদে মুখখানা বিকৃত করে বলে উঠলেন মাস্টার মশাই।

রিনরিনে কণ্ঠে দ্রুত বলে চলেছে ইয়ঝভ : তাহলে আমরা পেলাম যে প্রথম ফেরিওয়ালা লাভ করল সতেরো পয়সা।

হয়েছে, হয়েছে,—আচ্ছা গরদিয়েফ! তুমি বলো তো দ্বিতীয় ফেরিওয়ালা কতো লাভ করল বের করতে হলে কী করতে হবে?

ফোমা এতক্ষণ বিভিন্ন রকমের ছেলেদের হাবভাব লক্ষ্য করে দেখছিল, প্রশ্ন শুনে উঠে দাঁড়িয়ে চুপ করে রইল।

জানো না? কেমন করে করবে বলো তো? আচ্ছা, স্মলিন বুঝিয়ে দাও ওকে।

সযত্নে আঙুল থেকে চকের দাগ মুছে, ঝাড়নখানা সরিয়ে রেখে ফোমার দিকে না তাকিয়েই স্মলিন আঁকটা কষে ফেলল। তারপর আবার হাত মুছতে লাগল। ইয়ঝভ ততক্ষণে মুচকি হেসে লাফাতে লাফাতে তার নিজের জায়গায় ফিরে এসেছে।

এই ছোঁড়া!—ফোমার পাশে বসে পড়ে কনুই দিয়ে ওর পাঁজরায় একটা গুঁতো

দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল: জানিস না কেনে? সবশুদ্ধু কত হল বল দেখি? ত্রিশ পয়সা। দুজন ফেরিওলা। একজনে লাভ করল সতেরো পয়সা, তাহলে আর জন কত লাভ করবে?

জানি।—তেমনি অনুচ্চ কণ্ঠে ফিস্ ফিস্ করে জবাব দিল ফোমা। তারপর কেমন যেন একটু বিব্রত মুখে তাকাল স্মলিনের মুখের দিকে। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে আসছে স্মলিন তার নিজের জায়গায়। স্মলিনের গোলগাল মুখ, চঞ্চল নীল চোখ, আর চর্বিভরা থলথলে চেহারা কেমন যেন ভালো লাগল না ফোমার।

ইয়ঝভ ফোমার পায়ে একটা চিম্‌টি কেটে প্রশ্ন করল:

কার ছেলেরে তুই? খ্যাপার?

হাঁ।

তাই বল! আচ্ছা রোজ আমি তোর পড়া বলে দেবো তাই কি চাস্?

হুঁ।

বেশ তার বদলে কী দিবি তুই আমাকে?

তুই সবকিছুই জানিস নাকি?

আমি? আমি হচ্ছি এখানকার সেরা ছেলে। আচ্ছা নিজের চোখেই দেখতে পাবি'খন।

এই কী হচ্ছে ওখানে? ইয়ঝভ, আবার তুই কথা বলছিস?—মৃদুকণ্ঠে ধমকে উঠলেন মাস্টার মশাই।

ইয়ঝভ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল: আমি নই, ইভান আন্দ্রেইচ! গরদিয়েফ।

ওরা দুজনেই কথা বলছিল ফিস্ ফিস্ করে। ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে বলল স্মলিন।

মুখ বিকৃত করে মোটা মোটা ঠোঁটদুটো নাড়তে নাড়তে মাস্টার মশাই ওদের সবাইকে তিরস্কার করলেন। কিন্তু তাঁর তিরস্কারে কোনোই ফল হল না। পরক্ষণেই ইয়ঝভ আবার ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠল:

আচ্ছা স্মলিন, মনে থাকে যেন! তোর এই নালিশ করার কথাটা মনে রইল আমার!

রইল তো রইল, বয়ে গেল আমার! কেন তুই নতুন ছেলেটার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিলি?—ইয়ঝভের দিকে ফিরে না তাকিয়েই তেমনি অনুচ্চ কণ্ঠে জবাব দিল স্মলিন।

বেশ, বেশ, দেখা যাবে!

প্রশ্নভরা দৃষ্টি মেলে ফোমা তার পাশের ঐ ধূর্ত ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওর মনে হতে লাগল এই মুহূর্তে ওর কাছ থেকে যতদূর সম্ভব দূরে সরে যায়। টিফিনের সময়ে ইয়ঝভের কাছ থেকে ফোমা শুনল যে স্মলিনও বড়লোকের ছেলে—ওর বাবা চামড়ার ব্যবসায়ী। আর ইয়ঝভ নিজে হচ্ছে গরিব—আদালতের এক পেয়াদার ছেলে। ও যে গরিব তার প্রমাণ ওর জামা-কাপড়েই প্রত্যক্ষ—জীর্ণ ধূসর পোশাক, হাতের কনুই আর হাঁটুর কাছে তালিমারা। রক্তহীন ক্ষুধার্ত মুখ, হাড়জিরজিরে ছোট্ট চেহারা। ছেলেটা কথা বলে ভাঙা কাঁসির মতো খ্যান্‌খেনে গলায় বিকৃত মুখভঙ্গি করে আর এমন সমস্ত ভাষা ব্যবহার করে যার অর্থ একমাত্র ওর নিজের কাছেই বোধগম্য।

আয় আমরা বন্ধু পাতাই! ইয়ঝভ বলল ফোমাকে।

কেন তুই আমার নামে মাস্টারের কাছে নালিশ করেছিলি?—সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ইয়ঝভের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল ফোমা।

ওঃ তাই বল! তোর তাতে কী এল-গেল? একে তুই নতুন ছেলে, তাতে আবার বড়োলোক। বড়োলোকের ছেলেদের মাস্টার মশাই কিছু বলে না। আর আমি হলাম গরিব—হা-ঘরে। মাস্টার আমাকে দেখতে পারে না। কেননা, আমি অভদ্র, কোনোদিন তাঁর জন্যে কোনো উপহার আনতে পারি না। আমি যদি লেখা-পড়ায় খারাপ ছেলে হতাম, তাহলে কবে আমাকে দূর করে দিত তাড়িয়ে।

জানিস, এখানকার পড়া শেষ করে আমি বড়ো স্কুলে গিয়ে ভর্তি হবো তারপর দ্বিতীয় মান পাশ করে ছেড়ে দেবো। বড়ো স্কুলের একজন ছাত্র এরই মধ্যে আমাকে পড়াতে আরম্ভ করেছে পাশের পড়া। বড়ো স্কুলে গিয়ে আমি এমন পড়াশুনা করবো যে কেউ আমাকে আর ঠেকাতে পারবে না। হ্যাঁরে, তোদের ক'টা ঘোড়া আছে রে?

তিনটে। কিন্তু তোর এত পড়েশুনে কী হবে?—প্রশ্ন করল ফোমা।

আমি যে গরিব। গরিবের ছেলেদের খুব ভালো করে লেখাপড়া শিখতে হয়, তবেই না তারা একদিন বড়োলোক হয়ে উঠতে পারে! লেখাপড়া শিখে তারা ডাক্তার হয়, অফিসার হয়, কেরানি হয়। আমি অবশ্য হবো সৈনিক—পাশে ঝুলবে তালোয়ার, বুটের তলায় থাকবে নাল, চলতে গেলে বাজবে ক্লিং ক্লিং করে। আর তুই কী হবি?

আমি জানি না।—বলল ফোমা, তারপর গম্ভীর চিন্তিত মুখে বন্ধুর হাবভাব লক্ষ্য করতে লাগল।

তোর কিছু হবারও দরকার নেই। আচ্ছা পায়রা ভালোবাসিস তুই?

বাসি।

কি অপদার্থ ছেলে রে তুই, অ্যাঁ!—ফোমার ধীরে ধীরে কথা বলার ভঙ্গি অনুকরণ করে ভেংচে উঠল ইয়ঝভ;—কতগুলো পায়রা আছেরে তোর?

একটাও নেই।

বলিস কি? বড়োলোকের ছেলে তবুও পায়রা নেই একটাও! আরে, আমারও তো তিনটে আছে। আমার বাবা যদি বড়োলোক হত তবে আমি একশো পায়রা পুষতাম আর দিনভর কেবল পায়রাই ওড়াতাম। স্মলিনেরও পায়রা আছে, কী সুন্দর সুন্দর পায়রা! চোদ্দটা! আমাকে একটা উপহার দিয়েছে। ছেলেটা ভালো, তবে ওর দোষের মধ্যে একটু লোভী। তা অবশ্য বড়োলোক মাত্রেই লোভী হয়। হাঁরে তুই—তুইও কি লোভী নাকি?

জানি না।—নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল ফোমা।

স্মলিনের বাড়িতে আসিস, তারপর তিনজনে মিলে আমরা পায়রা ওড়াবো।

বেশ, আসবো, যদি আসতে দেয়।

কেন তোর বাবা তোকে ভালবাসেন না?

বাসেন।

তবে নিশ্চয়ই তিনি তোকে আসতে দেবেন। কিন্তু হাঁ, দেখিস কক্ষনো বলিস না যেন আমিও আসবো। হয়তো আমার সঙ্গে তোকে মিশতে দিতে চাইবেন না। বলবি, স্মলিনের বাড়ি যাচ্ছি। এ-ই স্মলিন!

মোটা নাদুস-নুদুস ছেলেটি এগিয়ে এসে দাঁড়াল ওদের কাছে। ইয়ঝভ তার সামনে এসে মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে শ্লেষভরা কণ্ঠে বলল : এ-ই, কটাচুল নিন্দুক! বন্ধুত্ব করার আদৌ যোগ্য নোস তুই, বুঝলিরে হাঁদারাম!

তুই গাল পাড়ছিস কেন রে?—শান্তকণ্ঠে বলেই ফোমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল স্মলিন।

গাল পাড়ছি না, যা সত্যি তা-ই বলছি।—সোজা হয়ে বুক টান করে বলল ইয়ঝভ; যদিও তুই একটা গবেট—কিন্তু থাকগে, যাক সে কথা! রবিবার উপাসনার পরে আমরা আসছি তোর বাড়িতে।

আসিস।—মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল স্মলিন।

আসবো আমরা। এক্ষুনি ঘণ্টা পড়বে, যাই, এক দৌড়ে গিয়ে পাখিটা বেচে আসি। বলতে বলতে ইয়ঝভ পকেট থেকে একটা কাগজের বাক্স টেনে বের করল। জ্যান্ত কি যেন একটা নড়ছে ভিতরে। পরক্ষণেই ইয়ঝভ হাতের চেটোয় ঢালা পারার মতো ছুটে বেরিয়ে গেল স্কুলের হাতা ছেড়ে।

কি অদ্ভুত ছেলে!—বলল ফোমা। তারপর অবাক বিস্ময়ে ইয়ঝভের চতুরতার কথা ভাবতে ভাবতে প্রশ্নভরা দৃষ্টি মেলে স্মলিনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ছেলেটা ঐ রকমেরই। ভীষণ চালাক!—বলল কটাচুল ছেলেটি।

খুব ফুর্তিবাজও বটে।—বলল ফোমা।

হাঁ, খুব ফুর্তিবাজ।—সায় দিল স্মলিন।

তারপর ওরা দুজনেই দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

তুই কি আসছিস নাকি ওর সঙ্গে আমাদের বাড়ি?—জিগ্গেস করল স্মলিন।

হাঁ, আসছি।

আসিস, খুব মজা হবে।

প্রত্যুত্তরে ফোমা কিছু বলল না।

তোর অনেক বন্ধু আছে বুঝি?—স্মলিন আবার জিগ্গেস করল।

না, আমার একটিও বন্ধু নেই।

ইস্কুলে আসার আগে আমারও কোনো বন্ধু ছিল না। কেবলমাত্র খুড়তুত ভাই বোন। এখন তো তুই একসঙ্গেই দুজন বন্ধু পাচ্ছিস।

হাঁ।—বলল ফোমা।

খুশি হয়েছিস?

হয়েছি।

যখন তোর অনেক বন্ধু হবে, দেখবি খুব মজা হবে তখন। পড়াশুনাটাও খুব সহজ হয়ে যাবে তখন—সবাই পিছন থেকে বলে বলে দেবে।

তুই কি লেখাপড়ায় খুব ভালো?

নিশ্চয়ই। সব বিষয়ে আমি ভালো।—ধীরকণ্ঠে জবাব দিল স্মলিন।

ঘণ্টা বাজতে শুরু করল—যেন দারুণ ভয় পেয়ে কোথাও দ্রুত চলেছে ছুটে।

ক্লাসে বসে ফোমা যেন আগের চাইতে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছে। মনে মনে ফোমা অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে তার বন্ধুদের তুলনা করে দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারল ওরা দুজনেই ক্লাসের ভিতরে সব চাইতে ভালো ছাত্র। ব্ল্যাক-বোর্ডের উপরে লেখা ঐ দুটি সংখ্যা পাঁচ আর সাত যা নাকি এখনো মুছে যায়নি, ঐ সংখ্যা দুটির মতোই ওরা তাই সবার আগে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দারুণ খুশি হয়ে উঠল ফোমা এই ভেবে যে ওর বন্ধুরা ইস্কুলে সবার চাইতে সেরা।

ছুটির পরে ওরা তিনজনে একসঙ্গেই চলেছে বাড়ি। কিছুদূর গিয়ে একটা সরু গলির ভিতরে মোড় নিল ইয়ঝভ। কিন্তু স্মলিন ফোমার সঙ্গে সঙ্গে ওর

বাড়ির কাছাকাছি পর্যন্ত এল, তারপর চলে যাবার সময়ে বলল :

দেখলি তো আমাদের দুজনার বাড়ির পথও এক।

* * *

বাড়ি ফিরে ফোমা দেখল বিরাট ব্যাপার। ওর বাবা ওকে উপহার দিলেন মনোগ্রামকরা একখানা ভারি রুপোর চামচ, আর পিসিমা দিলেন তাঁর নিজের হাতে বোনা একটা স্কার্ফ। সবাই ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল। তৈরি করেছে ওর সবচাইতে প্রিয় খাবার। ফোমা কোটটা খুলে রেখে খাবার টেবিলে এসে বসতেই ওরা প্রশ্ন করতে শুরু করল ফোমাকে:

কিরে কেমন? কেমন লাগল ইস্কুল?—স্নেহমাখা দৃষ্টিতে ফোমার হাসি হাসি গোলাপী মুখখানার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল ইগনাত।

ভালোই। খুব চমৎকার! —প্রত্যুত্তরে বলল ফোমা।

মানিক আমার!—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে গদগদকণ্ঠে বললেন পিসিমা,—দেখো, বন্ধুদের কাছ থেকে খুব সাবধানে থেকো। যদি কেউ কিছু বলে অমনি মাস্টারের কাছে বলে দিও।

বলে যাও! বলে যাও! এছাড়া আর কী উপদেশ দেবে তুমি?—ইগনাত একটু হাসল।

নারে ওসব করতে যাবি না। যদি কেউ কিছু বলে নিজেই তার সঙ্গে বোঝা পড়া করবি বুঝলি—নিজের হাতেই সাজা দিবি, অন্যের সাহায্যে নয়। হ্যাঁরে কোনো ভালো ছেলে দেখলি ইস্কুলে?

হাঁ, দু'জন আছে।—পরক্ষণেই ইয়ঝভের কথা মনে পড়তেই ফোমা একটু হাসল।—তার মধ্যে একজন ভীষণ সাহসী।

কে সে?

এক পেয়াদার ছেলে।

হুঁ! খুব সাহসী বলছিস?

দারুণ সাহসী।

আচ্ছা, থাকগে, অন্য জন?

অন্যজন, তার মাথার চুল সব কটা। স্মলিন।

ওঃ! নিশ্চয়ই মিত্রি ইভানোভিচ্-এর ছেলে। ওর সঙ্গে মিশবি, ভালো সঙ্গী। মিত্রি খুব চালাক চাষী। ছেলেটা যদি তার বাবার মতো হয় তবে তো ভালোই। কিন্তু ঐ আর যার কথা বললি—বুঝলি, ফোমা, রবিবার বরং ওদের তুই বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিস; কিছু উপহার কিনে এনে দেবো, ওদের দিস। আর আমরাও বুঝতে পারবো কেমন ছেলে ওরা।

রবিবার স্মলিন যে আমাকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছে!—জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে ফোমা তার বাবার মুখের দিকে তাকাল।

তাই নাকি? বেশ, তা যাস! ঠিক আছে। তবে ভালো করে লক্ষ্য করিস কেমন লোক ওরা। বন্ধুবান্ধব ছাড়া একা একা তো আর জীবন কাটাতে পারবি না। যেমন দেখ, তোর ধর্মবাবা আর আমি—আমাদের বন্ধুত্ব প্রায় বিশ বছরের। তাছাড়া ওর বুদ্ধির জন্যে আমার লাভও হয়েছে অনেক। তুইও এমন লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবি যে তোর চাইতেও ভালো, ঢের বেশি বুদ্ধিমান। ভালো লোকের সঙ্গে মেলামেশা করবি—তামার পয়সা রুপোর টাকার সঙ্গে ঘসবি যাতে নিজেও রুপোর টাকা হিসাবেই চলে যেতে পারিস।—বলেই নিজের উপমায় নিজেই হো হো

করে হেসে উঠল ইগনাত। তারপর হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল:

ঠাট্টা করছিলাম আমি। মেকি নয়, নিজেকে খাঁটি মানুষ হিসাবেই গড়ে তুলতে চেষ্টা করবি। আর বুদ্ধি রেখে চলবি, তা সে যতটুকুই হোক না কেন ক্ষতি নেই· কারণ সেটুকু তোর সম্পূর্ণ নিজস্ব। অনেক পড়াশুনা করতে হয়েছে নাকি আজ?

অনেক!—ফোমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক প্রতিধ্বনির মতোই ওর পিসিমার বুকের ভিতর থেকেও বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস।

বেশ মন দিয়ে পড়াশুনা করবি। ইস্কুলে কারুর চাইতেই যেন পিছিয়ে না থাকিস—খারাপ না হোস। অবশ্য একথাও মনে রাখিস যে, তোদের স্কুলে যদি পঁচিশটা ক্লাশও থাকত তবুও পড়তে লিখতে আর অঙ্ক কষতে শেখানো ছাড়া আর বেশি কিছু শিক্ষা দিতে পারত না। তাছাড়া কিছু—কুশিক্ষাও পেতে পারিস। ভগবান না করুন তাহলে কিন্তু কঠিন শাস্তি দেবো। খবর্দার, যদি তামাক খেতে শিখিস তবে ঠোঁট দুটো কেটে ফেলে দেবো, মনে থাকে যেন!

ভগবানকে ডাকিস ফামুশকা।—বললেন পিসিমা—ঈশ্বরের কথা যেন ভুলে যাসনে কখনো।

ঠিক কথা। ঈশ্বরকে আর বাবাকে ভক্তি করবি। কিন্তু আমি যা বলছিলাম, ইস্কুলের লেখাপড়া অতি সামান্য ব্যাপার। ছুতোরের কাজ করতে যেমন বাইশ আর পয়েন্টারের দরকার ওটাও ঠিক তেমনি। যন্ত্রপাতিরই মতো। কিন্তু যন্ত্রপাতি তো আর তোকে শেখাতে পারে না কেমন করে সেগুলোকে ব্যবহার করতে হয়। বুঝলি? যেমন ধর একজন ছুতোরের হাতে একটা বাইশ দেয়া গেল একটা কড়িকাঠকে চৌকো করতে। কিন্তু কেমন করে বাইশটা ব্যবহার করতে হয়, কাঠের উপরে কোপ দিলে সেটা এসে না তার নিজের পায়ের উপরেই পড়ে, সেটা তার জানা দরকার। তেমনি তোর হাতেও দেয়া হল লেখাপড়ার জ্ঞান, কিন্তু তোকেও শিখতে হবে তা দিয়ে জীবনকে কেমন করে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। তাহলেই এখন একথা আসে যে বই পুঁথি অতি সামান্য জিনিস। যেটা আসল দরকার সেটা হচ্ছে তার সুযোগ গ্রহণ করতে পারা। এ পারার ক্ষমতা বই পুঁথির চাইতে ঢের বড়ো। যদিও পুঁথিপত্তরের ভিতরে লেখা থাকে না এ কথা। বুঝলি ফোমা, এ বস্তু শিখতে হবে তোকে জীবন থেকে। বই, সে তো একটা প্রাণহীন শুকনো জিনিস। যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারো, ইচ্ছে হলে ছিঁড়ে ফেলতে পারো, কেটে ফেলতে পারো। কাঁদবে না, কথা বলবে না, উঠবে না চেঁচিয়ে চিৎকার করে। কিন্তু জীবনে একটিবারের জন্যেও যদি ভুল কদম ওঠাও—যদি ভুল স্থানে গিয়ে দাঁড়াও পা ফেলে, জীবন সহস্র কণ্ঠে উঠবে গর্জে, আঘাত করবে, লুটিয়ে ফেলবে মাটিতে।

টেবিলের উপরে দুহাতের কনুইয়ের ভর দিয়ে একান্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনতে লাগল ওর বাবার কথা। ইগনাতের দৃঢ়তাভরা কণ্ঠের সুরে ওর মানসপটে ভেসে উঠতে লাগল ছবি। কখনো দেখছে ছুতোর চৌকো করছে কড়িবর্গা, কখনো দেখছে নিজেকে,—দুহাত বাড়িয়ে অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলেছে একান্ত সতর্কতার সঙ্গে কী যেন এক বিরাট জীবন্ত কিছু একটার দিকে। প্রবল আগ্রহ জেগে উঠছে মনে সেই অজানা ভয়ঙ্করকে দুহাতে আঁকড়ে ধরতে।

মানুষকে নিজের শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে হয় কাজ করার জন্যে, আর পথ সম্পর্কেও থাকতে হয় সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। মানুষ—বুঝলি খোকা, ঠিক যেন জাহাজের পাইলট। যৌবনে জোয়ারের জলের মতো সোজা ছুটে চলে। সমস্ত পথই তখন তার কাছে উন্মুক্ত। কিন্তু জানতে হবে তোকে কখন হাল ফেরাতে

হবে। কোথাও রয়েছে ঘূর্ণি, কোথাও জেগেছে বালুচর, কোথাও পাহাড়। সবকিছু সম্পর্কেই ভালো করে জেনে নেওয়া দরকার যাতে সমস্ত বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে নিরাপদে গিয়ে পৌঁছনো যায় বন্দরে।

আমি ঠিক গিয়ে পৌঁছবো দেখো।—বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলল ফোমা।

অ্যাঁ? খুব সাহস আছে তো দেখছি।—ইগনাত হেসে উঠল। স্নেহের হাসিতে পিসিমাও বিগলিত হয়ে পড়লেন। বাবার সঙ্গে ভলগায় বেড়িয়ে আসার পর থেকে ফোমা যেন বাড়িতে আরো কিছুটা চঞ্চল আরো কিছুটা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। আগের চাইতে অনেক বেশি কথা বলে বাবা, পিসিমা আর মায়াকিনের সঙ্গে। কিন্তু রাস্তায়, কোনো নতুন জায়গায়, কিংবা কোনো অপরিচিত লোকের সামনে থাকে গম্ভীর হয়ে; সন্দেহভরা দৃষ্টি মেলে তাকায়, যেন সর্বত্রই অনুভব করে কেমন যেন একটা বিরোধীভাব—কি যেন লুকিয়ে থেকে গোপনে লক্ষ্য রাখছে ওর দিকে।

রাত্রে এক এক সময়ে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে ফোমা। বিস্ফারিত চোখের অচঞ্চল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে অন্ধকারের দিকে। চারপাশ ঘিরে নৈশ নিস্তব্ধতার ভিতরে কী যেন শুনতে-চেষ্টা করে কান পেতে। ধীরে ওর বাবার কথাগুলো যেন মূর্ত হয়ে ওর চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে উঠতে থাকে। নিজের অজ্ঞাতেই সেই কথার সঙ্গে মিশে যায় পিসিমার বলা রূপকথার কাহিনী। এমনি করে গড়ে ওঠে রোমাঞ্চক গল্প-কল্প, যার ভিতরে থাকে কল্পনার অত্যুজ্জ্বল বর্ণ-সমারোহ-ভরা ছবির সঙ্গে মিশে কঠিন বাস্তবতার ছায়া। কী যেন এক বিরাট, এক দুর্বোধ্য কী একটা গড়ে ওঠে। চোখ বুজে সেটাকে দূর করে দিতে প্রয়াস পায় ফোমা—প্রয়াস পায় রুদ্ধ করে দিতে তার নিজের কল্পনা, যা নাকি ওকে করে তুলেছে ভীত, সন্ত্রস্ত। কিন্তু ব্যর্থ হয় ওর সে প্রচেষ্টা—কিছুতেই পারে না ঘুমিয়ে পড়তে। চোখের সামনে আরো বেশি করে জমে ওঠে ভিড়—কালো কালো ছায়ামূর্তির ভিড়। তারপর অতি সন্তর্পণে পিসিমাকে জাগিয়ে তোলে।

পিসিমা! ও পিসিমা!

কি বাছা? যীশু তোমার সঙ্গে থাকুন!

আমি তোমার কাছে যাবো।—ফিস্ ফিস্ করে বলে ফোমা।

কেন? ঘুমিয়ে পড়ো লক্ষ্মীটি! ঘুমোও!

ভয় করছে পিসিমা!—বালক স্বীকার করে।

তাহলে মনে মনে বল : 'প্রভু আবার জেগে উঠবেন' দেখবে আর তোমার ভয় করবে না।

চোখ মেলেই শুয়ে পড়ে ফোমা আউড়ে চলে প্রার্থনার বাণী। নৈশ নিস্তব্ধতা ওর চোখের সামনে জাগিয়ে তোলে পরমপ্রশান্তিভরা নিস্তরঙ্গ কালো জলের এক সীমাহীন ব্যাপ্তি। যেন সবকিছু ডুবিয়ে দিয়ে গেছে জমাট বেঁধে। সেই অসীম জলরাশির বুকে নেই একটিও তরঙ্গ, নেই স্পন্দনের এতটুকুও কম্পিত ছায়া। ভিতরেও নেই কিছু—শূন্য অতল গভীর। অন্ধকারে ঐ মৃত জলরাশির দিকে তাকালে যে-কোনো মানুষের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কিন্তু তৎক্ষণে জেগে উঠেছে রাতপাহারাওয়ালার হাতের লাঠির খট্ খট্ শব্দ। ফোমা দেখল, সেই নিস্তরঙ্গ মৃত জলরাশির বুকে জেগে উঠেছে কম্পন—জেগে উঠেছে হালকা ঢেউ সমস্ত উপরিভাগ পরিব্যাপ্ত করে, আর তারই উপরে অসংখ্য ছোট ছোট হালকা বল চলেছে নেচে নেচে। গম্বুজের উপরের ঘণ্টার ধ্বনি যেন এক প্রবল দোলায়

সমগ্র জলরাশির ভিতরে জাগিয়ে তুলল নিদারুণ উত্তেজনা, আর তারই মৃদু কম্পনে কেঁপে উঠল বুক। জলের উপরে কিরণ ছড়িয়ে বড়ো একটা আলোর ফালি উঠল কেঁপে আর তারই কেন্দ্রস্থল থেকে বিচ্ছুরিত হল আলোর রেখা দূরের অন্ধকারের বুকে। সুদূরপ্রসারী অন্ধকারের বুকে সেই ক্ষীণ আলোর রেখা জেগে উঠে পরক্ষণেই যাচ্ছে মরে, বিলীন হয়ে। আবার সেই অন্ধকার মরুর বুকে নেমে এল মৃত্যুর নিস্তব্ধতা।

পিসিমা!—মিনতিভরা কণ্ঠে ডেকে উঠল ফোমা।

কেন মানিক?

আমি তোমার কাছে যাবো।

এস, উঠে এস মানিক আমার!

যাচ্ছি।—ফিস ফিস করে বলল ফোমা।

পিসিমার বিছানায় গিয়ে তাঁর বুকের ভিতরে ঢুকে জড়িয়ে ধরে আবদারের সুরে বলল :

একটা গল্প বলো পিসিমা।

এই এতো রাত্তিরে?—ঘুমজড়ানো চোখে আপত্তি জানালেন পিসিমা।

বলো না পিসিমা, লক্ষ্মীটি!

বেশিক্ষণ তাঁকে পীড়াপীড়ি করতে হল না। একটা হাই তুলে চোখ বুজেই ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন বৃদ্ধা :

এক দেশের এক রাজার রাজ্যে বাস করত একটা লোক আর তার বৌ। ওরা ছিল খুব গরিব। এমন অদৃষ্ট যে খাওয়া পর্যন্ত জুটত না। লোকের দোরে দোরে ভিক্ষা মেগে বেড়াত। কেউ হয়তো দিত এক মুঠো খুদকুঁড়ো। তাই খেয়েই কেটে যেত দু চার দিন। তারপর একদিন ওর স্ত্রীর সন্তানসম্ভাবনা হল। হল একটি ছেলে। কিন্তু ছেলেটির তো নামকরণ করতে হবে! ওরা এত গরিব যে কোথায় পাবে কী যা দিয়ে ছেলের ধর্ম-বাপ ধর্ম-মা কিংবা নিমন্ত্রিতদের ভোজ দেবে। তাই কেউ আর ছেলেটির নামকরণ করতে এলো না। কত চেষ্টা করল, কিন্তু কাউকেই পারল না রাজী করাতে। নাচার হয়ে ওরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল : হে প্রভু! হে ঈশ্বর......

ফোমা জানে ঈশ্বরের ধর্ম-পুত্রের সেই বেদনাদায়ক ইতিহাস। বহুবার শুনেছে এ কাহিনী। সঙ্গে সঙ্গে ওর মানসপটে ভেসে উঠতে লাগল ছবি : ঐ ধর্ম-পুত্র তার ধর্ম-বাপ-মায়ের কাছে চলেছে একটা শাদা ঘোড়ায় চড়ে। অন্ধকার মরুভূমি পাড়ি দিয়ে ছুটে চলেছে ঘোড়া। দেখতে পেল, কী অসহ্য যন্ত্রণায় কাটছে পাপীদের দিন। শুনতে পেল তাদের কাতর চিৎকারের সঙ্গে করুণ মিনতি :

হে মানুষ! জিজ্ঞেস করো গিয়ে প্রভুকে আর কতদিন আমরা এই নরক যন্ত্রণা ভোগ করবো ?

ফোমার মনে হল, সে নিজেই যেন নিশুতি রাতে অন্ধকার মরুভূমি পাড়ি দিয়ে চলেছে ছুটে ঘোড়ায় চড়ে। ঐ কাতর চিৎকার মিনতিভরা করুণ কণ্ঠে ঐ যে অনুনয় সে সব যেন ধ্বনিত হয়ে উঠছে ওকেই লক্ষ্য করে। কী এক দুর্বোধ্য আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠছে ওর মনে। বেদনায় ভরে উঠছে বুক। মুদ্রিত দুচোখ ভরে নেমে আসছে জলের ধারা, যেন ওর চোখ মেলতেও করছে ভয়। দারুণ অস্বস্তিতে ছটফট করতে শুরু করেছে বিছানার ভিতরে।

ঘুমো, খোকন ঘুমো! যীশু রয়েছেন তোমার সঙ্গে।—পাপীদের নরকযন্ত্রণার

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বলে উঠলেন বৃদ্ধা।

কিন্তু এমন নিদ্রাহীন রাত্রির পরেও সুস্থ খুশিভরা মনে জেগে ওঠে ফোমা। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে এসে চা খেয়েই ছুটে যায় স্কুলে। মিষ্টি কেক নিয়ে গিয়ে খেতে দেয় ইয়ঝভকে। ধনী বন্ধুর উদারতার দান লুব্ধ আগ্রহে গ্রহণ করে ইয়ঝভ।

কি রে, খাবার আছে কিছু?—তীক্ষ্ম ছুঁচলো নাকটা তুলে ফোমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে ইয়ঝভ। থাকে তো দে। কিছু না খেয়েই বেরিয়েছি বাড়ি থেকে। অনেক দেরিতে ঘুম ভেঙেছে আজ। কাল রাত দুটো পর্যন্ত পড়েছিলাম কিনা! আঁক কষেছিস?

না।

ধুত্তোর কুঁড়ের হাড্ডি কোথাকার! আচ্ছা দাঁড়া, এক্ষুনি কষে দিচ্ছি!

ছোট ছোট দাঁতগুলো কেকের ভিতরে ঢুকিয়ে জড়িত কণ্ঠে বেড়ালের মতো ঘড় ঘড় করতে করতে কি যেন বলে চলেছে আর বাঁ-পা ঠুকে ঠুকে তাল দিতে দিতে কসছে অঙ্ক। থেকে থেকে কাটা কাটা কথায় বলছে ফোমাকে ঃ

দেখেছিস, আট বালতি জল বেরিয়ে যায় এক ঘণ্টায়। তা হলে ছ' বালতি জল বেরিয়ে যাবে ক' ঘণ্টায়? আঃ! তোদের বাড়ির লোকেরা কী ভালো ভালো খাবার খায়! বুঝেছিস, তা হলে আমাদের আটকে ছয় দিয়ে গুণ করতে হবে। কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে কেক খেতে ভালোবাসিস? ওঃ! কী ভালোই না লাগে আমার। তাহলে ছ' ঘণ্টায় বেরিয়ে যায় আটচল্লিশ বালতি জল। আর সবশুদ্ধ বালতি আছে নব্বইটা। পরেরটা বুঝতে পেরেছিস?

স্মলিনের চাইতে বেশি পছন্দ করে ফোমা ইয়ঝভকে। তবুও স্মলিনের সংগেই ওর বন্ধুত্ব বেশি। এই খুদে ছেলেটির শক্তি ও সাহসে মুগ্ধ হয়ে যায় ফোমা। দেখে, ইয়ঝভ ওর চাইতে অনেক বেশি চতুর, অনেক বেশি বুদ্ধিমান। হিংসে করে ওকে ফোমা, আহত হয় মনে মনে। সংগে সংগে ঐ বুভুক্ষু ছেলেটির প্রতি এক অনুগ্রহ-পরায়ণতার অনুকম্পায় অন্তর পূর্ণ হয়ে ওঠে। সম্ভবত এই অনুকম্পাই কটাচুল স্মলিনের চাইতে ঐ চট্‌পটে বুদ্ধিমান ছেলেটির প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার দিকে সৃষ্টি করে বাধা। ইয়ঝভ তার বড়োলোক বন্ধু দুটিকে পরিহাস করে আনন্দ পায়। প্রায়ই বলে ঃ

ওঃ তোরা দেখছি এক-একটা কেকের বাক্‌স!

ওর এই পরিহাসে চটে যেত ফোমা। একদিন ওর ঐ বিদ্রূপে চটে গিয়ে বলল ফোমা ঃ

আর তুই? তুইতো একটা ভিক্ষুক—পথের ভিখারি!

ইয়ঝভের হলদে মুখটা লাল হয়ে উঠল, তারপর ধীরে ধীরে বলল ঃ

বেশ, তাই। আর আমি তোদের পড়া বলে দেবো না। তখন তো গাছের গুঁড়ির মতো বসে থাকবি।

তিন দিন ওরা কেউ কারুর সংগে কথা বলল না। ফলে, এ ক'দিন একান্ত দুঃখের সংগেই মাস্টারকে গণ্যমান্য ইগনাত মাতভিয়েইচ্‌-এর ছেলেকে দিতে হল সবচাইতে কম নম্বর।

সব খবরই রাখত ইয়ঝভ। স্কুলে এসে একদিন সে গল্প করল, কেমন করে মোক্তারের ঝির একটা ছেলে হয়েছে। আর তারই জন্যে মোক্তারের বৌ তার স্বামীর গায়ে ঢেলে দিয়েছে গরম কফি। জানে সে কখন কোথায় গেলে মাছ ধরা যায়।

কেমন করে ফাঁদ তৈরি করে পাখি ধরতে হয়। কেমন করে অস্ত্রাগারের ভিতরের সৈনিকটা দিয়েছে গলায় দড়ি। আর জানে, কোন্ ছেলের অভিভাবকের কাছ থেকে মাস্টার পেয়েছে কী উপহার।

স্মলিনের জ্ঞান ও উৎসাহ কেবলমাত্র ব্যবসায়ীদের জীবন-ধারার ভিতরেই সীমাবদ্ধ। বিশেষ করে ঐ কটাচুল ছেলেটা বাড়ি, আসবাবপত্র, ঘোড়া ইত্যাদির তুলনা করে কে কার চাইতে বেশি ধনী তারই হিসাব নিয়ে ব্যস্ত। এ সব জানেও সে খুব নিখুঁতভাবে, আর পরম উৎসাহের সঙ্গে করে আলোচনা।

ফোমার মতো সেও ইয়ঝভকে অনুকম্পা মেশানো কৃপার চোখেই দেখে; কিন্তু তবুও ফোমার চাইতে একটু বেশি বন্ধুভাবে, সমকক্ষ হিসাবেই মেলামেশা করে। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে একদিন স্মলিন বলল ফোমাকে ঃ

ইয়ঝভের সঙ্গে সব সময়ে ঝগড়া করিস কেন?

ও-ই বা অত অহঙ্কারী কেন?—রেগে উঠে বলল ফোমা।

তুই তোর পড়া তৈরি করিস না, ও সব সময়ে তোকে সাহায্য করে, তাই তো ওর এত অহঙ্কার। ইয়ঝভ বুদ্ধিমান। তাছাড়া আর একটা কারণ হচ্ছে যে ও গরিব। গরিব হওয়ার জন্যে কি ও নিজে দায়ী? ওর যা ইচ্ছে হয়, তাই ও শিখতে পারে। দেখে নিস, একদিন ও বড়োলোক হবে।

ওর স্বভাবটা মশার মতো।—ঘৃণাভরা কণ্ঠে বলল ফোমা,—সব সময়ে ভন্ ভন্ করে, তারপর হঠাৎ এক সময়ে কামড়ে দেয়।

কিন্তু এই শিশু'কটির জীবনে এমন একটা কিছু ছিল যা নাকি ওদের পরস্পরকে দিয়েছিল মিলিয়ে। এক এক সময়ে ওদের ভিতরের সমস্ত বিভেদ, সমস্ত তারতম্য যেত ঘুচে। প্রতি রবিবার ওরা মিলত গিয়ে স্মলিনদের বাড়ি। ওদের ছাদের উপরে ছিল বিরাট একটা পায়রার খোপ। তিনজনে মিলে ছাদে উঠে ওড়াত পায়রা।

হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর পায়রাগুলো বরফের মতো শাদা ডানার ঝাপটা মারতে মারতে খোপ থেকে বেরিয়ে এসে সার বেঁধে বসত গিয়ে কার্নিশের উপরে। তারপর, সূর্যের কিরণ গায়ে মেখে শিশুকটির সামনে বসে গলা ফুলিয়ে ফুলিয়ে জুড়ে দিত কল-কূজন।

তাড়া দাও!—ধৈর্যহীন উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে অনুরোধ জানায় স্মলিন।

দোয়ালবাঁধা একটা লাঠি ঘুরাতে ঘুরাতে শিস দিতে শুরু করে স্মলিন।

ভয় পেয়ে পায়রাগুলো ডানার ঝাপটায় বাতাস কাঁপিয়ে দ্রুত আকাশে উড়ে যায়। তারপর একটা বিরাট চক্র রচনা করে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমেই ঊর্ধ্বে নীল আকাশের গভীর নীলিমার ভিতরে উড়ে যায়। বরফের মতো শাদা চকচকে রুপোলি পাখা মেলে ওরা আরো, আরো উপরে ভেসে চলে। কতগুলো অবার বাজের মতো হালকা গতিতে নিস্পন্দপ্রায় ডানা মেলে দিয়ে উঠে যায় আরো উপরে—বুঝিবা ঢাকনার মতো আকাশের ছাদে গিয়ে চায় পৌঁছতে। কতগুলো আবার ডিগবাজি খেতে খেতে বরফের দলার মতো নেমে আসে নিচে, পরক্ষণেই আবার তীর-বেগে উঠে যায় উপরে। কখনো কখনো ঐ সমস্ত পায়রার ঝাঁকটাকে মনে হয় যেন আকাশের মরুপ্রান্তরের বুকে নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে ঝুলে। তারপর ক্রমেই ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে ঐ মরুময় আকাশেরই কোলে। মাথা পিছনের দিকে হেলিয়ে মুখ উঁচিয়ে নীরব প্রশংসাভরা দৃষ্টি মেলে ওরা তাকিয়ে থাকে ঐ উড়ন্ত পায়রাগুলোর দিকে। একটি মুহূর্তের জন্যেও পারে না ফিরিয়ে আনতে চোখ। নীরব আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ

ডানাওয়ালা জীবকটির উপরে হিংসে হয়, কত সহজেই না ওরা পৃথিবী ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে, বহু ঊর্ধ্বে রোদছড়ানো আকাশের নির্মল শান্ত পরিবেশের ভিতরে পারে উড়ে যেতে! নীল আকাশের গায়ে কলঙ্ক-রেখার মতো স্থানে স্থানে ঐ অদৃশ্যপ্রায় বিন্দুর সমষ্টিগুলি শিশুকটির মনে জাগিয়ে তোলে কল্পনার ইন্দ্রধনু। ইয়ক্ষভের মুখে ফুটে ওঠে ওদের অন্তরের জাগ্রত অনুভূতি যখন চিন্তিতমুখে মৃদুকণ্ঠে বলে ওঠে : অমনি করে আমাদেরও উড়তে হবে, বন্ধু!

কিন্তু ফোমা জানে, মানুষের মন প্রতিনিয়তই পায়রার রূপ ধরে ঊর্ধ্বপানে চলেছে ধেয়ে—অন্তরে অন্তরে অনুভব করে ফোমা এক প্রবল, শক্তিশালী দুরন্ত কামনার উন্মেষ।

অপার আনন্দে এক হয়ে গিয়ে ওরা নীরবে ঐ গভীর নীলিমার দেশ থেকে পায়রাগুলোর ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকে দাঁড়িয়ে। নিবিড় সান্নিধ্যে গায়ে গায়ে মিশে ওরা এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে যেন পৃথিবী-থেকে-বহু-দূরে-চলে-যাওয়া ঐ উড়ন্ত পায়রাগুলোর মতোই ওরা সংসার ছাড়িয়ে চলে গেছে দূরে—বহু দূরে। এইক্ষণে—এই মুহূর্তে ওরা কেবলমাত্র শিশু—জানে না হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ। সব কিছু আবিলতা থেকে মুক্ত। পরস্পর পরস্পরের একান্ত আপনার, একান্ত কাছের। দুচোখের দীপ্তি বিকিরণ করে নীরব মৌন মুখে পরস্পর পরস্পরকে অনুভব করছে অন্তর দিয়ে। মুক্ত আকাশের বুকে ঐ উড়ন্ত পায়রাগুলির মতোই ওদের অন্তর এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরপুর।

এতক্ষণে শ্রান্ত ক্লান্ত পায়রাগুলো নেমে এসে আবার বসল কার্নিশের উপরে। অতি সহজেই এখন ওদের তাড়িয়ে নিয়ে ঢুকিয়ে দিল খোপের ভিতরে।

চল্ না ভাই, আতা পাড়িগে!—প্রস্তাব করল ওদের সমস্ত রকমের খেলাধুলা ও দুঃসাহসিক কাজের পরামর্শদাতা ইয়ক্ষভ।

ইয়ক্ষভের আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকটির অন্তরে উড়ন্ত পায়রাগুলো এনে দিয়েছিল যে নির্মল প্রশান্তি তা যেন মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে গেল। দস্যুর মতো প্রতিটি শব্দে কান খাড়া করতে করতে একান্ত সতর্ক পায়ে চুপি চুপি পিছনের উঠোন পেরিয়ে পাশের বাগানের দিকে চলল এগিয়ে।

ধরাপড়ার ভয়ের ক্ষতিপূরণ হয় চুরির সাফল্যে। চুরি ব্যাপারটাই হচ্ছে ভয়ানক কাজ। কিন্তু নিজের পরিশ্রমে যা কিছু অর্জিত হয় তা-ই মিষ্টি লাগে। আর তার পেছনে যত বেশি প্রচেষ্টা থাকে আস্বাদও লাগে ততই বেশি।

অতি সন্তর্পণে শিশু তিনটি বাগানের বেড়া বেয়ে উঠে ঝুঁকে পড়ে বেড়া ডিঙিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আতা গাছের দিকে এগিয়ে চলল। দারুণ ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে—সতর্ক দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। দুরু দুরু করে কেঁপে উঠছে বুক। মৃদুতম পাতার মর্মর শব্দেও নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ধরাপড়ার ভয়ে সবাই ভীত—পাছে কেউ দেখে ফেলে, কেউ চিনে ফেলে। কিন্তু সেক্ষেত্রে, যদি কেউ দেখে ফেলে ওদের, চিনতে পেরে চিৎকার করে ওঠে, তবেই ওরা খুশি হয়ে উঠবে।

আলাদা আলাদা হয়ে ওরা এক-একজন এক এক দিকে যায়, তারপর আবার এসে মেলে এক জায়গায়। আনন্দে, উত্তেজনায়, সাহসে ওদের চোখগুলো জ্বলতে থাকে আর সবাই সবার কাছে বলে, কেমন করে একটা লোক ওদের তাড়া দিতেই ছুটে পালিয়ে এসেছে বাগানের ভিতর দিয়ে। এত জোরে ছুটেছে যে, মনে হচ্ছিল যেন পায়ের তলার মাটিতে আগুন জ্বলছে।

সমস্ত খেলা, সমস্ত দুঃসাহসিক কাজের ভিতরে এটাকেই সবচাইতে বেশি পছন্দ করে ফোমা। এই ধরনের অভিযানে ওর চালচলন এমন দুঃসাহসিক হয়ে ওঠে যে, ওর সঙ্গীরা ভয়ে বিস্ময়ে রুদ্ধশ্বাস হয়ে ওঠে। অন্যের বাগানে ঢুকে ইচ্ছে করেই ও যেন বেশি অসতর্ক হয়ে ওঠে। কথা বলে চেঁচিয়ে, শব্দ করে ভাঙে আপেল গাছের ডাল, আর পোকায় খাওয়া আতা ছিঁড়ে ছুঁড়ে মারে মালিকের বাড়ির দিকে। এতটুকু ভয় নেই ধরা পড়ার। বরং যেন আরো বেশি উত্তেজিত হয়ে ওঠে—দাঁতে দাঁত কড়-মড় করতে থাকে, দুচোখ ফেটে যেন রাগ ও গর্ব ঝরে পড়তে থাকে।

রাগে ঘৃণায় মুখ ভেংচে স্মলিন বলে : তুই বড্ডো বেশি বাড়াবাড়ি করছিস!

আমি তো আর ভীরু নই!—প্রত্যুত্তরে বলে ফোমা।

তুই ভীরু নোস তা জানি। তা বলে অত অহঙ্কার করারই বা কি আছে? অহঙ্কার না করেও লোকে একটা কাজ করতে পারে।

অন্যদিক থেকে ইয়েঝভও ওকে দোষারোপ করে :

ইচ্ছে করে যদি ধরা পড়তে চাস, তবে মরগে যা!. কিন্তু আমার সঙ্গে তাহলে তোর আর ভাব থাকবে না তা বলে দিচ্ছি। যদি আমাদের ধরে ফেলে, তোদের নিয়ে যাবে তোদের বাবার কাছে। তাঁরা তোদের বলবেন না কিছুই। কিন্তু আমাকে এমন মার খেতে হবে যে হাড় থেকে চামড়াটি খসিয়ে নিয়ে তবে ছাড়বে।

কাপুরুষ কোথাকার!—গোঁয়ার্তুমিভরা কণ্ঠে ঘাড় বাঁকিয়ে বলে ওঠে ফোমা।

অবশেষে একদিন ধরা পড়ল ফোমা ক্যাপটেন সুমাকভের হাতে। বেঁটে খাটো চেহারা বুড়োমানুষ সুমাকভ। বুকের ভিতরে লুকিয়ে চুরি-করা আতা নিয়ে যখন পালাচ্ছিল ফোমা চুপি চুপি পিছন থেকে এসে ওর ঘাড়টা ধরে ফেলল সুমাকভ। তারপর রুক্ষকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল :

এবার! ধরে ফেলেছি তোকে খুদে শয়তান! দাঁড়া!

ফোমার বয়েস তখন প্রায় বছর পনেরো। কৌশলে বুড়োর হাত ছাড়িয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিল ফোমা। কিন্তু পালিয়ে গেল না। ভ্রূ কুঁচকে ঘুষি বাগিয়ে সেও মারমুখী হয়ে দাঁড়াল।

আমার গায়ে হাত দাও এত বড়ো সাহস!

না তোর গায়ে হাত দেব কেন, শুধু পুলিসের হাতে ধরিয়ে দেবো। কার ছেলে রে তুই?

এতটা আশা করেনি ফোমা। মুহূর্তে ওর সমস্ত সাহস, সমস্ত বীরত্ব উবে গেল। থানায় নিয়ে গেলে কিছুতেই ওর বাবা ওকে ক্ষমা করবেন না। ফোমার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। একটু ইতস্তত করে বলল :

গর্‌দিয়েফের।

ইগনাত গর্‌দিয়েফ?

হাঁ।

এবার ক্যাপটেনের চমকে ওঠার পালা। মুহূর্তে সোজা হয়ে বুক টান করে দাঁড়াল। তারপর একটু জোরে জোরে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল। পরক্ষণেই আবার তার কাঁধটা ঝুলে পড়ল।

কি লজ্জার কথা! এত বড়ো একজন গণ্যমান্য ভদ্রলোকের ছেলে! এ কাজ তোমার পক্ষে সাজে না। আচ্ছা যাও। কিন্তু আবার যদি দেখি! হুঁ! তবে কিন্তু বাধ্য হয়েই তোমার বাবাকে বলে দিতে হবে!

ফোমা বৃদ্ধের হাবভাব লক্ষ্য করছিল। বুঝল, ওর বাবার নাম শুনে ভয় পেয়ে গেছে লোকটা। নেকড়ের ছানার মতো সুমাকভের দিকে প্রশ্নভরা দৃষ্টি মেলে কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে রইল। কৌতুকভরা গাম্ভীর্যে গোঁফে তা দিতে দিতে বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে রইল ফোমার সামনে। কিন্তু ছাড়া পেয়েও ফোমা চলে না গিয়ে দাঁড়িয়েই রইল।

তুমি যেতে পারো।—ইঙ্গিতে ফোমার বাড়ির পথের দিকে নির্দেশ করে আবার বলল সুমাকভ।

কিন্তু পুলিসে দেওয়ার কি হল?—রুক্ষ কণ্ঠে প্রশ্ন করল ফোমা। কিন্তু বলে ফেলেই সম্ভাব্য প্রত্যুত্তরের কথা ভেবে ভয়ও হল মনে।

ঠাট্টা করছিলাম আমি। একটু ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম তোমাকে।

আমার বাবার নাম শুনে নিজেই ভয় পেয়ে গেছে, আবার—প্রত্যুত্তরে বলেই ফোমা ঘুরে দাঁড়াল তারপর বাগানের ভিতরের পথ ধরে চলতে শুরু করল।

কী, আমি ভয় পেয়ে গেছি? অ্যাঁ? আচ্ছা!—বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল বৃদ্ধ। তার কণ্ঠস্বরে বুঝতে পারল ফোমা যে, দারুণ আঘাত করে ফেলেছে বুড়োকে। মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়ল। সমস্ত বিকেলটা একা একা ঘুরে ঘুরে বেড়াল। বাড়ি ফিরে এলে পরে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ওর বাবা ঃ

সুমাকভের বাগানে ঢুকেছিলি তুই?

হাঁ, ঢুকেছিলাম।—বাবার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে জবাব দিল ফোমা।

ইগনাত আশা করেনি এমন উত্তর পাবে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল ঃ

বোকা ছেলে! কেন গেলি? বাড়িতে কি আপেল নেই?

মাথা নিচু করে ফোমা মাটির দিকে তাকিয়ে নীরবে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

লজ্জা পেয়েছিস দেখছি! নিশ্চয়ই ইয়ঝিশ্‌কা তোকে পরামর্শ দিয়েছিল এ কাজ করতে। আসুক সে, দেখিয়ে দেবো মজাটা। তোদের বন্ধুত্বই ঘুচিয়ে দেবো।

না, আমি নিজেই করেছি।—দৃঢ়কণ্ঠে বলল ফোমা।

তা'হলে সেটা আরো খারাপ।—বিস্মিত কণ্ঠে বলল ইগনাত।—কিন্তু কেন করলি এ কাজ?

করেছি—

করেছি—বিদ্রুপভরা কণ্ঠে খে'কিয়ে উঠল ইগনাত।—যদি তুই নিজে নিজেই করে থাকিস, তবে উচিত তোর নিজেকেই তার জবাবদিহি করা নিজের কাছেও আর অন্যের কাছেও। এদিকে আয়!

ফোমা বাবার কাছে এগিয়ে গেল। একটা চেয়ারের উপরে বসে ছিল ওর বাবা। ফোমা এসে তার কোল ঘে'সে দাঁড়াল। বালকের কাঁধের উপরে একটা হাত রেখে ইগনাত একটু মুচকি হেসে ওর মুখের দিকে তাকাল।

লজ্জা পেয়েছিস?

হাঁ, আমি লজ্জিত।—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল ফোমা।

পরম স্নেহে ছেলের মুখখানা বুকের উপরে টেনে এনে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল ঃ

কেন এমন কাজ করিস? অন্যের বাগানের আতা কেন চুরি করিস বল?

আমি জানি না।—একটু ইতস্তত করে বলল ফোমা।—হয়তো বড্ডো একা একা লাগে, সেই জন্যে। সেই একই খেলা খেলছি দিনের পর দিন—একঘেয়ে, বিরক্তি ধরে গেছে আমার!

আর এটা হচ্ছে একটু বিপজ্জনক কাজ—উত্তেজনা আছে, তাই না?—মৃদু হেসে বলল ইগনাত।

হাঁ।

হুঁ, হয়তো তা-ই। কিন্তু তবুও, বুঝলি ফোমা, এদিকে তাকা,—এ অভ্যাসটা ছেড়ে দে। নইলে কিন্তু আমি ভীষণ শাস্তি দেবো।

আমি আর কখনো কারুর গাছে চড়ব না।—দৃঢ় কণ্ঠে বলল ফোমা।

আর ঐ যে তুই সমস্ত দোষ তোর নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিস, এটা খুবই ভালো। ভবিষ্যতে তুই কেমন হবি, তা অবশ্য ঈশ্বরই জানেন, কিন্তু যা দেখছি এটা খুব ভালো লক্ষণই বটে। কেউ যদি তার নিজের কৃতকর্মের জন্যে স্বেচ্ছায় শাস্তি নিতে তৈরি হয়, সেটা আদৌ তুচ্ছ জিনিস নয়। অন্য কেউ হলে বন্ধুবান্ধবের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিত, কিন্তু তুই বল্‌লি ঃ "আমি নিজেই করেছি"।—এটাই হচ্ছে ঠিক, বুঝলি ফোমা! তুই পাপ করেছিস, কিন্তু তার সাজাও নিয়েছিস। হ্যাঁরে, সুমাকভ মেরেছে নাকি তোকে?—বলতে বলতে একটু থেমে প্রশ্ন করল ইগনাত।

আমিই ওকে মারতাম—প্রত্যুত্তরে ধীরকণ্ঠে বলল ফোমা।

উঁ!—ইঙ্গিতভরা কণ্ঠে গর্জে উঠল ইগনাত।

আমি তাকে বলেছিলাম, তোমার নাম শুনে ভয় পেয়ে গেছে, তাই না এসে নালিশ করেছে তোমার কাছে। নইলে সে বলত না কিছুই।

তাই নাকি?

দোহাই ঈশ্বরের! তোমার বাবাকে আমার শ্রদ্ধা জানিও।—বলেছিল সুমাকভ।

বটে! তাই বললে সে?

হাঁ।

আঃ! কুকুর! দেখলি, দুনিয়ায় কী জাতের সব মানুষ আছে! তার ঘরে হল চুরি আর সে কিনা মাথা নিচু করে সম্মান জানাল। হা হা! অবশ্য একথা ঠিক যে ঐ আতার দাম এক পয়সার বেশি নয়। কিন্তু ওর কাছের একটা পয়সার দাম আমার কাছের একটা টাকারই সমান। কিন্তু তবুও ওটা যতক্ষণ আমার কাছে আছে, কারুর সাধ্য নেই যে ওটাকে স্পর্শ করে—যদি না আমি নিজেই ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দি। যাকগে, জাহান্নামে যাক সব! আচ্ছা বল দেখি, কোথায় ছিলি এতক্ষণ? কি কি দেখলি?

বাবার পাশে বসে পড়ল ফোমা, তারপর বলতে লাগল সে দিনের যত কিছু অভিজ্ঞতার কথা। ছেলের আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ইগনাত শুনতে লাগল ওর কথা। ক্রমে কী এক চিন্তায় ওর ভ্রূ কুঁচকে উঠল।

এখনো হাওয়ায় ভাসছিস! নেহাত বাচ্চা কিনা! হাঃ হাঃ!

পাহাড়ের খাদের ভিতরে একটা পেঁচাকে তাড়া করেছিলাম।—বলতে লাগল ফোমা। কি মজা! পেঁচাটা এদিক ওদিক উড়তে লাগল, তারপর একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেল। তারপর এমন করুণ সুরে ডাকতে আরম্ভ করল! আমরা আবার ওটাকে তাড়া করলাম, আবার ওটা উড়তে শুরু করল। শেষে কিসে যেন এমন জোরে ধাক্কা খেল যে ওর পালক ঝরে পড়ল। খাদের ভিতরে এদিক ওদিক উড়তে উড়তে অবশেষে অনেক কষ্টে কোথায় গিয়ে যেন লুকোল। আর আমরা

খ‍ুঁজে দেখিনি। মনে দুঃখও হল খুব—পেঁচাটার সমস্ত গা ছড়ে গেছে। আচ্ছা বাবা! পেঁচারা কি দিনের বেলায় একেবারেই দেখতে পায় না—অন্ধ হয়ে যায়?

অন্ধ?—প্রত্যুত্তরে বলল ইগনাত।—অনেক মানুষ আছে যারা পেঁচার মতোই জীবনভোর ধাক্কা খেয়ে খেয়েই মরে। সব সময়ে স্থান খ‍ুঁজে খ‍ুঁজে ফেরে—কিন্তু সে প্রচেষ্টায় কেবলমাত্র তাদের পালকই ঝরে পড়ে আর বিশেষ কোনো কিছু ফল হয় না। কেবল আঘাতই পায়—আঘাতই পায়, রুগ্ন হয়ে পড়ে; তারপর সবকিছু হারিয়ে, সবকিছু খুইয়ে কোথাও গিয়ে লুকিয়ে পড়ে নিজের অস্থিরতার হাত থেকে শান্তি পাওয়ার প্রয়াসে। এসব লোকদের কৃপার চক্ষে দেখবি, বুঝলি খোকা, এসব লোকদের কৃপার চক্ষে দেখবি!

কিসের কষ্ট ওদের?—অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করল ফোমা।

ঐ পেঁচাটার মতোই কষ্ট—ব্যথাভরা জীবন।

কিন্তু কেন অমন হয়?

কেন হয় সেটা অবশ্য বলা কঠিন। কেউ কেউ কষ্ট পায় অহংকারের কড়া মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ে বলে। ওরা চায় অনেক কিন্তু সামর্থ্য ওদের নেহাত কম। আবার কেউ কেউ কষ্ট পায় তাদের নির্বুদ্ধিতার জন্যে। কিন্তু এসব ছাড়াও আরো হাজারো কারণ আছে যা তুই এখন বুঝবি না।

চা খাবে এস!—আন্‌ফিসা ডাকলেন ওদের। বহুক্ষণ ধরে আন্‌ফিসা দাঁড়িয়ে-ছিলেন দোরের পাশে আর মুগ্ধ চোখের স্নেহভরা দৃষ্টি মেলে দেখছিলেন তাঁর ভাইয়ের বিশাল দেহটা একান্ত বন্ধুভাবে ঝুঁকে রয়েছে ফোমার দিকে আর বালক ফোমা বাবার গলা জড়িয়ে ধরে ভাবালু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে বসে।

এমনি করে দিনে দিনে ফোমার জীবন বিকশিত হয়ে উঠতে লাগল। শান্ত, ধীর, স্থির। উপচে-পড়া হৃদয়াবেগের ধৈর্যহীনতায় চঞ্চল হয়ে ওঠে না এতটুকুও। কখনো কখনো কী এক প্রবল ভাবধারায় ওর অন্তর প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। সে হয়তো ঘণ্টাখানেকের জন্যে। হয়তো বা একটা গোটা দিন তার প্রভাব ওর একঘেয়ে জীবনের পটভূমিকায় রেখাপাত করে, অচিরেই আবার তা যায় মিলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে। নিস্তরঙ্গ হ্রদের মতোই প্রশান্ত বালকের অন্তর—জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝা-আঘাতের বাইরে। সেই নিস্তরঙ্গ জলের বুকে যা-কিছুই এসে পড়ে হয় তা তক্ষুনি অতলে তলিয়ে যায়, ক্ষণেকের জন্যে সেই নিথর জলের বুকে আলোড়ন সৃষ্টি করে, নয়তো ভাসতে ভাসতে বহু দূরে চলে যায় বিলীন হয়ে।

স্কুলে পাঁচ বছর পড়ার পর মোটামুটি ভালোভাবেই পাশ করে বেরিয়ে এল ফোমা। ফোমা এখন এক সাহসী যুবক—কালো চুল, কালো ভুরু, ঠোঁটের উপরে তামাটে রঙের গোঁফের রেখা। দুটো বিশাল কালো চোখে সরল উদার দৃষ্টি, বুঝিবা একটু চিন্তাশীল। শিশুর মতো আধ-খোলা দুটো ঠোঁট। কিন্তু যখন ওর ইচ্ছার বিরোধিতার সম্মুখীন কিংবা কোনো কিছুতে বিরক্ত হয়ে ওঠে, ওর চোখের মণিদুটো বড়ো হয়ে ওঠে, ঠোঁটদুটো হয়ে ওঠে দৃঢ়সংলগ্ন আর চওড়া মুখ-খানা জুড়ে ফুটে ওঠে কঠিন দৃঢ়তার ছাপ। ফোমার ধর্ম-বাপ প্রায়ই একটু সন্দিগ্ধ হাসি হেসে পরিহাসছলে বলেন :

বুঝেছ ফোমা, মেয়েদের কাছে মধুর চাইতেও মিষ্টি হয়ে উঠতে হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত তোমার ভিতরে কই, তেমন বুদ্ধিশুদ্ধি তো দেখতে পাচ্ছি না!

তার কথা শুনে ইগনাত দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে।

এবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে কাজে লাগিয়ে দাও।

ঢের সময় আছে, সবুর করো।

কেন সবুর করার কি আছে? ভলগার বুকে বছর দু'তিন ঘুরে আসুক, তারপর বিয়ে দিয়ে দেবো। ঐ তো আমার লিউবভ রয়েছে।

লিউবভ মায়াকিন একটা বোর্ডিং স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। রাস্তায় প্রায়ই দেখা হয় ফোমার সঙ্গে। দেখা হলেই একটু কৃপামেশানো অনুকম্পার সঙ্গে মাথা হেলিয়ে নমস্কার করে। লিউবার মাথায় থাকে একটা ফ্যাশানানুরূপ টুপি। ফোমা ওকে পছন্দ করে। কিন্তু ওর গোলাপী আভাযুক্ত রক্তিম গাল, বাদামি চোখ, টুকটুকে ঠোঁট কিছুতেই ফোমার সেই অনুকম্পাভরা নমস্কারে আহত অন্তর প্রশমিত হয় না। স্কুলের কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে লিউবার বন্ধুত্ব। সেদলের ভিতরে ফোমার পুরানো বন্ধু ইয়ঝভও রয়েছে। কিন্তু তবুও সেদলের সঙ্গে মেলামেশা করতে আদৌ পছন্দ করে না ফোমা—এতটুকু তাগিদও অনুভব করে না। ফোমার মনে হয় ওর সামনে তারা তাদের পাণ্ডিত্য জাহির করতেই যেন ব্যস্ত হয়ে ওঠে, আর ওকে করে উপহাস। লিউবার ঘরে এসে হয়তো ওরা কোনো বই পড়ে কিংবা কোনো কিছু আলোচনা করে। কিন্তু ওকে দেখতে পেলেই তারা চুপ করে যায়। ফলে ওদের কাছ থেকে আরো দূরে সরিয়ে দেয় ওরা ফোমাকে।

একদিন ফোমা মায়াকিনের বাড়ি যেতেই লিউবা ওকে ডাকল বাগানে বেড়াতে যেতে। বাগানের ভিতরে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মুখ বাঁকিয়ে বলল লিউবা :

তুমি এমন অসামাজিক কেন বলো তো? কখনও কোনো বিষয়ে আলোচনা করো না, বলো না কোনো কথা।

কি নিয়ে আলোচনা করব? কিছুই জানি না আমি।—সরলভাবেই বলল ফোমা।

পড়ো—বই পড়ো।

ইচ্ছে করে না বই পড়তে।

দেখেছ, ইস্কুলের ছেলেরা কত কী জানে—সব কিছু। আর জানে কেমন করে সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হয়। যেমন ধরো না কেন ঐ ইয়ঝভ।

জানি, চিনি আমি ইয়ঝভকে—একটা বাচাল ছেলে।

তুমি ওকে হিংসে করো। কিন্তু ও খুব বুদ্ধিমান ছেলে। হাঁ, শিগ্‌গিরই পাশ দিয়ে মস্কো যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে।

কী হল তাতে?—নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল ফোমা।

আর তুমি—তুমি যেমন আছো তেমনি মূর্খ হয়েই থাকবে চিরদিন।

বেশ তাই।

তা খুব চমৎকারই হবে, না?—বিদ্রূপমেশানো কণ্ঠে বলল লিউবভ।

বিজ্ঞান না পড়েও আমি আমার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারব। যাদের পেটে ভাত নেই তারা পড়াশুনা করুক গে, আমার আর দরকার নেই।

ছিঃ! কী বোকা তুমি! বিশ্রী—বিরক্তিকর!—ঘৃণা-ভরা কণ্ঠে বলল তরুণী। তারপর ফোমাকে বাগানের ভিতরে একা ফেলে রেখেই চলে গেল।

ইতিমধ্যেই ফোমা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছে নির্জনতার সৌন্দর্য। চিন্তার সুমধুর বিষে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে ওর অন্তর। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যখন অস্তগামী সূর্যের আগুন-রাঙা দীপ্ত আভায় রাঙিন হয়ে ওঠে, কেমন যেন এক দুর্জ্ঞেয় দুর্বোধ্য অজানার আকুল প্রতীক্ষায় ওর অন্তর আচ্ছন্ন করে তোলে। বাগানের এক অন্ধকার কোণে বসে কিংবা বিছানায় গা এলিয়ে

দিয়ে ওর মানসপটে ফুটিয়ে তোলে রূপকথার রাজ্যের রাজ-কন্যাদের মুখ। তারা লিউবা কিংবা ওর পরিচিত তরুণীদের মূর্তি ধরে এসে দাঁড়ায়, ইস্যোকের আবা আলো-ছায়ায় ভেসে আর রহস্যময় গভীর দৃষ্টি মেলে ওর চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকে। কখনো কখনো ঐ স্বপ্ন-ছায়া ফোমার অন্তরে জাগিয়ে তোলে এক অদ্ভুত শক্তি—যেন ওকে মাতাল করে তোলে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুকভরে টেনে নেয় সুগন্ধি বাতাস। আবার কখনো বা ঐ স্বপ্নজাল ওর অন্তর মথিত করে জাগিয়ে তোলে এক বিষাদময় দুঃখানুভূতি। কান্না পায় ফোমার। কিন্তু লজ্জা পায় চোখের জল ফেলতে, তাই সামলে নেয় নিজেকে। নীরব কান্নায় ভাসায় না বুক। কিংবা হয়তো হঠাৎ ওর অন্তর কেঁপে ওঠে আর সংগে সংগে জেগে ওঠে করুণাময় ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা। স্মৃতিপথে ভেসে ওঠে প্রার্থনার বাণী। তারপর স্থির দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে বহুক্ষণ ধরে ফিসফিস্ করে আউড়ে যায় স্তোত্র। অন্তর প্লাবিত করে জেগে-ওঠা সেই দুর্বার শক্তি প্রার্থনায় ঢেলে দিয়ে বুকখানা হাল্কা হয়ে ওঠে।

ধীরে ধীরে একান্ত ধৈর্যের সংগে ফোমার বাবা ফোমাকে ব্যবসায়ী-মহলে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল। সংগে করে নিয়ে যায় বেচা-কেনার বাজারে। ওকে বলে তার চুক্তির কথা, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের কথা, সমব্যবসায়ীদের কথা। কেমন করে তারা জীবনে সাফল্য অর্জন করেছে। কে কতখানি ঐশ্বর্যের মালিক। কে কি চরিত্রের লোক। অতি অল্পদিনের ভিতরেই এ সবকিছু আয়ত্ত করে ফেলল ফোমা। সব কিছুই গুরুত্ব দিয়ে, বিচার বিবেচনা করে গ্রহণ করে।

আমাদের কুঁড়িটি যে বেশ বড়ো একটি সুগন্ধি গোলাপ হয়ে ফুটে উঠেছে।—ইংগিতভরা দৃষ্টিতে ইগনাতের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে বলল মায়াকিন।

কিন্তু তবুও, উনিশ বছর বয়সের ফোমার ভিতরে তখনো রয়েছে কেমন যেন ছেলেমানুষী ভাব—রয়েছে কেমন যেন এক অদ্ভুত সারল্য, যা ওর সমবয়সীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বোকা ভেবে ওকে তারা উপহাস করে। আর ফোমাও তাদের কাছ থেকে থাকে দূরে, ক্ষুণ্ণ হয় ওদের ব্যবহারে। কিন্তু ফোমার বাবা আর মায়াকিন—যারা তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে ওর চালচলন হাবভাব, ফোমার চরিত্রের এই অনিশ্চয়তায় কেমন যেন একটু সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে মনে মনে।

ওকে ঠিক বুঝে উঠতে পারি না—আক্ষেপ করে বলল ইগনাত। ও কোনো-রকম আমোদ-প্রমোদের ভিতরে যায় না, মেয়েদের পিছনেও ছোটে না। তোমাকে আর আমাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে খুব। যখন যা বলি শোনে। যেন পুরুষ নয়, একটি সুন্দরী তরুণী। কিন্তু তবুও মনে হয় না যে ওর বুদ্ধি কম, বোকা।

না, বুদ্ধিশুদ্ধি যে কম তা মোটেই নয়,—বলল মায়াকিন।

ওকে দেখলে মনে হয়, ও যেন কী একটা খুঁজে খুঁজে ফিরছে। কিসে যেন ওর দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ওর মাও এমনি করেই কি যেন হাতড়ে হাতড়ে ফিরত। আর দেখ, ঐ আফ্রিকান স্মলিন—আমার ছেলের চাইতে মাত্র দু বছরের বড়ো। কিন্তু কী চমৎকার হয়ে উঠেছে দেখো! ওর বাপের মতো বুদ্ধি পেয়েছে, না ওর বাপই ওর বুদ্ধিতে চলে তা বলা শক্ত। ও চায় একটা কারখানায় গিয়ে আরো কিছুদিন শিখতে। বলে,—"তুমি আমাকে কিছু শেখাওনি বাবা!" আর আমার ছেলে! একটি কথাও বলবে না মুখ ফুটে। হায় প্রভু!

দেখো,—প্রত্যুত্তরে বলল মায়াকিন—ওকে স্বাধীনভাবে হাতেকলমে ব্যবসার কাজে লাগিয়ে দাও। আমি নিশ্চয় করে বলছি, দেখে নিও—সোনার পরীক্ষা

আগুনে। স্বাধীনভাবে যখন কাজ করবে তখন বুঝতে পারব কোন্ দিকে ওর মনের গতি। ওকে একা ছেড়ে দাও, কামায় যাক একা।

পরীক্ষা করে দেখতে?

বেশতো, না হয় কিছু ক্ষতিই করবে—কিছু লোকসান যাবে তোমার। তবু তো জানতে পারা যাবে ছেলেটা কোন্ ধাতুতে গড়া?

ঠিক বলেছ—তাই পাঠাব।—মনস্থির করল ইগনাত।

* * * *

বসন্তকালে ইগনাত দু'-গাধাবোট-বোঝাই শস্য দিয়ে ছেলেকে পাঠাল কামায়। ইয়েফিমের পরিচালনায় গর্‌দিয়েফের স্টিমার "ফিলেঝ্‌নি" টেনে নিয়ে চলেছে শস্য-বোঝাই গাধাবোট। ফোমার পূর্বপরিচিত সেই লস্কর ইয়েফিম এখন ত্রিশবছরের শক্ত-সমর্থ জোয়ান মরদ। তীক্ষ্ণদৃষ্টি, ধীর, স্থির, বুদ্ধিমান অথচ খুব কড়া ক্যাপটেন।

পরম আনন্দে দ্রুত জাহাজ চালিয়ে ওরা চলেছে এগিয়ে। সবাই তৃপ্ত। এত বড়ো একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার পেয়ে মনে মনে বেশ একটু গর্ব অনুভব করছে ফোমা। ইয়েফিমও এই তরুণ মনিবটিকে পেয়ে খুশি। কথায় কথায় সে ওকে গালাগাল করবে না, খিট খিট্ করবে না দিনরাত। দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভারপ্রাপ্ত এই দুটি মানুষের অন্তরের খুশির আলোর ছোঁয়া সমস্ত নাবিকদের ভিতরে পড়েছে ছড়িয়ে। এপ্রিলে যেখান থেকে শস্য বোঝাই করেছিল সেখান ছেড়ে মে মাসের প্রথমে ওদের জাহাজ গিয়ে পৌঁছল গন্তব্য স্থানে। ফোমার কাজ হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাল খালাস করে দিয়ে পের্‌ম্ অভিমুখে রওনা হওয়া। সেখানে ওর জন্যে অপেক্ষা করে আছে এক জাহাজ লোহা। ইগনাত ঠিকে নিয়েছে সেগুলো বাজারে পৌঁছে দেবার।

তীর থেকে শ'দুই গজ দূরে একটা বড়ো গাঁয়ের সামনে জাহাজ নোঙর করল। জাহাজ ভিড়বার পরের দিন ভোর না হতেই কিসান স্ত্রীপুরুষের বিরাট একটা দল এসে হাজির। কেউ ঘোড়ায় কেউ পায়ে হেঁটে। হৈ হল্লা, গানে চিৎকারে সোরগোল তুলে ওরা উঠে এল জাহাজের ডেকে। সঙ্গে সঙ্গেই পরম উৎসাহে শুরু হয়ে গেল কাজ। জাহাজের খোলের ভিতরে নেমে মেয়েরা বোঝাই করছে রাই-এর থলে। আর চাষীরা সেই বোঝাই থলেগুলো কাঁধে বয়ে তক্তার উপর দিয়ে হেঁটে পৌঁছে দিচ্ছে পাড়ে। বোঝাই হচ্ছে গোরুর গাড়ি। বহুপ্রত্যাশিত শস্যে গাড়ি বোঝাই করে মন্থরগমনে ফিরে চলেছে গাঁয়ের দিকে। মেয়েরা গাইছে গান। চাষীরা হাসিতামাশা করছে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে। কেউবা পাড়ছে গাল। শান্তিরক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করছে নাবিকেরা। কখনো ধমকাচ্ছে কর্মরত ঐ মানুষ-গুলোকে। শস্য-বাহকদের পায়ের চাপে তক্তাগুলো দুলে উঠছে। জলের উপরে বাড়ি খেয়ে ছিট্‌কে উঠছে জল। তীরে ঘোড়া ডাকছে। গাড়ির চাকার তলায় ভাঙছে বালুর চাপ।

সবে মাত্র সূর্য উঠছে। নির্মল বাতাসে পাইনের গন্ধ। নদীর শান্তজলে আকাশের নিবিড় ছায়া। ছোট ছোট ঢেউ আছড়ে পড়ছে জাহাজের গায়ে আর নোঙরের শিকলে। জেগে উঠছে ছপ্ ছপ্ শব্দ। শ্রমের আনন্দমুখর কোলাহল আর প্রকৃতির যৌবনোচিত সৌন্দর্য মিলে কেমন যেন এক কোমল ধ্বনিময়তা—হয়তো বা একটু স্থূল—ফোমার অন্তর এক অপূর্ব আনন্দে দোলা দিতে থাকে। জাগিয়ে তোলে এক অভিনব অনুভূতি, এক অব্যক্ত কামনা।

স্টিমারে চাঁদোয়ার নিচে ইয়েফিম আর শস্য-গ্রাহক লোকটির সঙ্গে টেবিলে বসে ফোমা খাচ্ছিল চা। লোকটি গাঁয়ের কেরানি। লাল চুল, চোখে চশমা— ক্ষীণ দৃষ্টি। ভয়ে ভয়ে কাঁধে ঝাঁকুনি দিতে দিতে রুক্ষ মোটা গলায় বলে চলেছে কেমন করে গাঁয়ের চাষীরা মরছে অনাহারে। কিন্তু সেকথায় তেমন কান দিচ্ছিল না ফোমা। কখনো তাকিয়ে থাকছে নিচের কর্মরত লোকগুলির দিকে। কখনো বা নদীর পরপারের বালুকাময় কর্কশ তীরপ্রান্তের ঘনসন্নিবেশিত পাইন বনের দিকে। জনমানবহীন নির্জন তীর।

যেতে হবে ওখানে—ভাবল ফোমা মনে মনে। বহুদূর থেকে যেন ফোমার কানে ভেসে আসছে গ্রাহকটির রুক্ষ কণ্ঠের বিশ্রী ক্লান্তিকর সুর ঃ

হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবস্থা হয়ে দাঁড়াল সাংঘাতিক। এমন ঘটনাও ঘটেছিল! তস্‌সার এক ভদ্রলোকের কাছে একদিন একটা চাষী এসে হাজির।

সঙ্গে বছর ষোলো বয়সের একটা মেয়ে।

কী চাই তোর?

এজ্ঞে, মেয়েটাকে নিয়ে এলাম হুজুরের কাছে।

কেন?

এজ্ঞে এটাকে রেখে দ্যান্ আপনি—

বলল চাষী।—বিয়েথাওয়া করেন নি—

বটে? তোর মতলবটা কী, শুনি?

এজ্ঞে, লিয়ে গেছনু শহরে—ঝি-এর কাজে নাগিয়ে দেবো বলে। কিন্তু কেউ লিলেক নাই। আপনি এটাকে রাখেন হুজুর এজ্ঞে—রাখনি করে।

বুঝলেন তো ব্যাপারটা! নিজের মেয়ে, তাকে কিনা দিতে চাইছে! তাহলেই বিবেচনা করে দেখুন! নিজের মেয়েকে দিতে চাইছে কিনা রক্ষিতা করে! কী যে সব ঘটছে কালে কালে তা শয়তানই জানে! অ্যাঁ? ভদ্রলোক অবশ্য চটে গেলেন। তুড়ে গালাগাল দিতে লাগলেন চাষীটাকে। কিন্তু চাষীটাও যুক্তি দিয়েই বলল ঃ

বুঝে দেখুন হুজুর, যা দিনকাল পড়েছে, মেয়েটা আমার কী কাজে আসবে? বিলকুল বেফয়দা। আমার তিনটে ছেলে। ওগুলোকে রাখলে উপগার আছে। জন-মজুর খাটতে পারবে। আচ্ছা দ্যান্ দশটা ট্যাকাই দ্যান মেয়েটার বাবদ, তাতে আমার আর ছেলেগুলোর তবু কিছুটা সুরাহা হবে।

কেমন বোঝেন? অ্যাঁ? কী যে সাংঘাতিক অবস্থা সে আর কী বলবো!

খুবই খারাপ!—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল ইয়েফিম।—ঐ যে কথায় বলে, পেটের ক্ষিধে পাথরের দেয়ালও গুঁড়িয়ে ফেলে! পেট—বুঝলেন, ওর আইন-কানুনই আলাদা।

গল্পটা ফোমার মনে গভীর রেখাপাত করল। মেয়েটির ভাগ্য সম্পর্কে এক অবোধ ঔৎসুক্য জেগে উঠল ফোমার মনে। আগ্রহাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করল ঃ

লোকটা কিনল শেষ পর্যন্ত মেয়েটাকে?

নিশ্চয়ই না।—প্রত্যুত্তরে উৎসাহিত হয়ে উঠে বললেন ভদ্রলোক। কণ্ঠে বেজে উঠল ভর্ৎসনার সুর।

মেয়েটির কী হল তাহলে শেষ পর্যন্ত?

হয়তো অন্য কোনো লোক দয়া করল। রেখে দিল।

আঃ!—একটা অস্পষ্ট টানা সুর জেগে উঠল ফোমার কণ্ঠে।—আমি হলে আচ্ছা

[illegible] দিতাম চাষাটাকে। ওর মাথাটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতাম।—বলতে বলতে ফোমা তার মুষ্টিবদ্ধ হাতটা গ্রাহক ভদ্রলোকের মুখের সামনে তুলে ধরল।

অ্যাঁ! কেন?—রুগ্ন কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলেন ভদ্রলোক।—আপনি ওর উদ্দেশ্য ধরতে পারেননি।

পেরেছি।—মাথায় একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠল ফোমা।

কিন্তু এ ছাড়া তার আর কী-ই বা করার ছিল? তার মনে হয়েছিল—

তা বলে কেমন করে মানুষ একটা মানুষকে বিক্রি করতে পারে?

হাঁ কাজটা অবশ্য পশুর মতো কাজই বটে। সে-কথা স্বীকার করছি। এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত।

তাছাড়া কিনা একটা মেয়েকে! ঐ দামে! আমি হলে অমনি ওকে দশটা টাকা দিয়ে দিতাম।

হাত নেড়ে একটা হতাশার ভঙ্গি করে চুপ করে বসে রইলেন ভদ্রলোক। তাঁর ভাবভঙ্গিতে কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে পড়ল ফোমা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর রেলিং-এর কাছে গিয়ে নিচে গাধা-বোটের পাটাতনের উপরে কর্মরত লোক-গুলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জেগে-ওঠা কর্মকোলাহল ওব দেহ-মন কেমন যেন মাতাল করে তুলল। একটা অবোধ অস্বস্তি ওর অন্তর জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে সেই অস্বস্তি অদম্য কর্মস্পৃহায় রূপান্তরিত হয়ে উঠল। ইচ্ছে হল, এই মুহূর্তে দৈত্যের মতো অমিত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বিশাল দুটো কাঁধ। রাইবোঝাই একশ থলে একসঙ্গে তুলে নেবে সেই কাঁধে। অবাক বিস্ময়ে বোবা হয়ে সবাই তাকাবে ওর দিকে।

এই জলদি জলদি কাজ কর!—নিচের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল ফোমা। কণ্ঠে বেজে উঠল ঝঙ্কার। একসঙ্গে কতগুলো মাথা উঁচু হয়ে উঠল। কতকগুলো মুখ ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। তার ভিতরে একটি নারীমুখ। কালো চোখ তুলে মোহিনী হাসি হেসে তাকাল ওর মুখেব দিকে। ঐ হাসি মুহূর্তে ওর বুকের ভিতরে আগুন জ্বালিয়ে দিল। জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। তারপর প্রতিটি শিরা উপশিরা বেয়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়তে লাগল। রেলিং-এর কাছ থেকে সরে এল ফোমা। মনে হল ওর দুটো গাল যেন পুড়ে যাচ্ছে।

শুনুন!—গ্রাহক ভদ্রলোক বলে উঠলেন ফোমাকে লক্ষ্য করে।—কিছুটা শস্য নষ্ট হিসাবে ধরে নিতে আপনার বাবাকে একটা তার করে দিন। দেখুন কতটা শস্য নষ্ট হচ্ছে। আর এখানে কিনা প্রতিটি পাউণ্ড শস্য অনেক দামী। কথাটা আপনার বোঝা উচিত। খুব চমৎকার লোক আপনার বাবা।—বলেই লোকটি কামড়ানোর ভঙ্গিতে মুখ-ব্যাদন করল।

কতটা ছেড়ে দিতে হবে?—অবজ্ঞাভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করল ফোমা। কতটা চাই? একশ পুড? দু'শ পুড?

আমি—আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে!—আশাতীত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন গ্রাহক ভদ্রলোক। কেমন যেন একটু হকচকিয়েও গেলেন।—আপনার নিজের যদি সে একতিয়ার থেকে থাকে তবে তো কথাই নেই।

আমিই মালিক।—দৃঢ়কণ্ঠে বলল ফোমা। কিন্তু খবরদার আমার বাবার সম্পর্কে অমন মুখ করে কথা বলবেন না বলে দিচ্ছি।

মাপ করুন। আমি—আমি......আপনার যে সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমার। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে। আর

আপনার বাবাকেও। ওই ওদের তরফ থেকেও—ঐ লোকগুলোর হয়েও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাঁকানো ঠোঁটের উপরে আঙুল দিয়ে মৃদু মৃদু আঘাত করতে করতে তীক্ষ্ম সতর্ক দৃষ্টিতে ইয়েফিম তাকাচ্ছিল তার ঐ তরুণ মনিবটির দিকে। অহঙ্কারভরা গর্বিত দৃষ্টি মেলে ফোমা শুনে চলেছে ঐ চতুর গ্রাহকের বক্তৃতা। লোকটা দারুণ ধূর্ততার সংগে কড়া হাতে প্যাঁচ কষছিল।

দু'শ পুড! এটা ঠিক রুশিয়ানসুলভই বটে। বুঝলেন! এক্ষুনি আমি আপনার এ দানের কথা ঘোষণা করে দিচ্ছি চাষীদের ভিতরে। দেখবেন কী দারুণ কৃতজ্ঞই না ওরা হয়ে উঠবে! কী খুশিই না হবে সবাই!—তারপর চিৎকার করে কর্মরত চাষীদের উদ্দেশ্যে বলল :

ওরে শুনছিস তোরা! মালিক তোদের জন্য দু'শ পুড শস্য দান করলেন।

তিন 'শ।—বাধা দিয়ে বলে উঠল ফোমা।

তিন'শ পুড! বহুত বহুত ধন্যবাদ! তিন'শ পুড শস্য দান করছেন'

কিন্তু কর্মরত চাষীদের ভিতরে তেমন কোনো সাড়া জাগল না। ওরা মুখ তুলে একবার তাকাল পরক্ষণেই মাথা নিচু করে কাজ করতে লাগল। কেবলমাত্র কয়েকটি কণ্ঠ থেকে একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও জেগে উঠল ক্ষীণ উচ্ছ্বাস :

ধন্যবাদ! ভগবান অঢেল দেবেন আপনাকে! বহুত বহুত ধন্যবাদ!

কতগুলো কণ্ঠ থেকে জেগে উঠল বিদ্রূপভরা অবজ্ঞার সুর।

কী উব্‌গারটা হল? এর বদলে আমাদের সক্কলকে যদি একপাত্র করে ভদ্‌কা দিত তবে নাহয় বুঝতাম হাঁ! সেটা তবু একটা কাজের কাজ হত। ও শস্য তো আর আমাদের জন্যি নয়! উঠবে-গে সরকারী গুদামে!

অ্যাঁ! নাঃ ওরা বুঝতে পারেনি!—একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে বলে উঠল লোকটি।—যাই আমি নিচে গিয়ে ওদের বুঝিয়ে দেই ব্যাপারটা।—বলতে বলতে মুহূর্তে লোকটি অন্তর্হিত হয়ে গেল।

কিন্তু দান সম্পর্কে চাষীদের মনোভাবের প্রতি তেমন কোনো আগ্রহ বা উৎসাহ নেই ফোমার। ফোমা দেখল সেই গোলাপী-গাল কাজল-নয়না মেয়েটি এক অদ্ভুত স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মনে হল যেন তার সে দৃষ্টি আলিঙ্গনের মতো জড়িয়ে ধরে ফোমাকে জানাচ্ছে ধন্যবাদ, করছে সঙ্কেত। ঐ দুটি চোখ ছাড়া আর কিছুই পড়ছেনা ফোমার দৃষ্টিপথে।

মেয়েটির পরনে শহুরে মেয়েদের পোশাক। পায়ে জুতা। গায়ে কেলিকোর জামা আর মাথায় বাঁধা অদ্ভুত রঙ-এর এক রুমাল। দীর্ঘাঙ্গী, সুকোমল তনু। একটা কাঠের স্তূপের উপরে বসে দ্রুত হাত চালিয়ে মেরামত করছিল থলে। হাতের কনুই পর্যন্ত খোলা। কিন্তু ওর দৃষ্টি ফোমার মুখের দিকে। চাইছিল আর হাসছিল মৃদু মৃদু।

ফোমা ইগনাতিচ্‌!—ফোমা শুনল ইয়েফিমের ভর্ৎসনাভরা কণ্ঠস্বর।—বড্ডো বেশি দয়া দেখিয়ে ফেলেছেন। মাত্র পঞ্চাশ পুড দিলেই ঢের হত। কিন্তু এত কেন? দেখবেন, এর জন্যে না আমাদের গাল শুনতে হয়।

একটু একা থাকতে দাও আমাকে।—প্রত্যুত্তরে সংক্ষেপে বলল ফোমা।

অবশ্য আমার আর কী? আমি চুপ করেই থাকব। কিন্তু আপনি ছেলে-মানুষ—বয়েস কম। তাই বলে দিয়েছিলেন আমাকে আপনার উপরে দৃষ্টি রাখতে। শেষটায় আমাকেই তো গালমন্দ করবেন!

এ সম্পর্কে আমি নিজেই বলব বাবাকে। তুমি চুপ করে থাক।—বলল ফোমা।

আমার—তা বেশ, তাই হোক, আপনি যখন মালিক। বেশ তাই।

হাঁ, তাই।

আমি অবশ্য আপনার ভালোর জন্যেই বলছিলাম, ফোমা ইগনাতিচ্! কারণ আপনার বয়স কম তাছাড়া মনটাও সরল।

বেশ, এখন আমাকে একটু একা থাকতে দাও ইয়েফিম!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ইয়েফিম চুপ করে রইল। আর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল ফোমা ঃ

এমনি একটি মেয়ে যদি বিক্রি করতে আনত আমার কাছে!—ওর হৃৎপিণ্ডটা ধক্ ধক্ করে উঠল দ্রুততালে। যদিও দেহের দিক থেকে এখনো ফোমা পবিত্র, কিন্তু আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়ে নর ও নারীর একান্ত গোপন সম্পর্কের রহস্য আর অবিদিত নয় ফোমার কাছে। ও জানে সেই নিগূঢ় সম্পর্কের অমার্জিত লজ্জাকর নাম। আর সেই নামটাই ওর ভিতরে জ্বালিয়ে তুলল এক নিদারুণ অস্বস্তিকর লজ্জামিশ্রিত ঔৎসুক্য। দুর্দমনীয় হয়ে উঠল ওর কল্পনা। কারণ এ-ব্যাপারের বোধগম্য কোনো কল্পনার ছবি আঁকা অসাধ্য ওর পক্ষে। ওর সঙ্গী-সাথীরা যখন ওর অজ্ঞতার জন্য পরিহাস করত, বলত—ব্যাপারটা ঐ রকমেরই আর বাস্তবিকই ও ছাড়া আর অন্যরকমের হতেই পারে না—ফোমা হাসত—সংশয়-ভরা অবোধ হাসি। কিন্তু তবুও ভাবত, হয়তো বা নর-নারীর সম্পর্ক সবার জন্যেই অমন লজ্জাকর নয়। তাছাড়া হয়তো বা কিছুটা পবিত্রতা আছে।

কিন্তু ঐ কাজল-নয়না তরুণীর দিকে তাকিয়ে খুব স্পষ্টই সেই অমার্জিত আকর্ষণ অনুভব করছে ফোমা। সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন একটা ভয়—একটা সংকোচ অনুভব করছে।

দেখছি, তুমি ঐ মেয়েমানুষটার দিকে তাকিয়ে আছ। আর কিন্তু আমি মুখ বুজে থাকতে পারছি না। ওকে তুমি চেনো না, জানো না। তোমার এই কাঁচা বয়েস আর যা স্বভাব তাতে ও যদি তোমার দিকে ফিরে তাকায় তখন হয়তো তুমি এমন কাণ্ড করে বসবে যে শেষ পর্যন্ত হয়তো আমাদের নদীর পাড় ধরে পায়ে হেঁটেই ফিরে যেতে হবে। পরনের ট্রাউজারগুলো যদি শেষ পর্যন্ত বাঁচে তবেই রক্ষে—শত কোটি ধন্যবাদ দেবো ঈশ্বরকে!

কি চাও তুমি?—লজ্জায় সংকোচে লাল হয়ে উঠে প্রশ্ন করল ফোমা। ওর কণ্ঠ সংশয়াচ্ছন্ন।

চাইনা কিছুই। আমার কথাটা মনে রাখলেই হয়তো ভালো করবে। মেয়ে-মানুষের সঙ্গে নটঘটের ব্যাপারে আমি খুব ভালো মাস্টার হতে পারি। মেয়ে-মানুষের সঙ্গে কাজ কারবার করবে সোজাসুজি। এক বোতল ভদ্‌কা, কিছু খাবার। তারপর বোতল দুই বিয়ার। শেষে সবকিছু হয়ে গেলে পর নগদ গোটাকুড়ি পয়সা ছুঁড়ে দেবে, ব্যাস্! এতেই দেখবে সব কিছু দিয়ে সে তোমাকে ভালোবাসবে।

যাঃ! মিথ্যে কথা।—নরম সুরে বলল ফোমা।

কী আমি মিথ্যে কথা বলছি? কেন বলতে যাবো মিথ্যে কথা? কম করে একশবার দেখেছি এমনি ঘটতে। আচ্ছা বেশ, আমার উপর ছেড়ে দাও। আমি বন্দোবস্ত করি ওর সঙ্গে। কেমন? দেখবে, এক মিনিটে আমি তোমার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।

বেশ তবে তাই হোক।—প্রত্যুত্তরে বলল ফোমা। প্রবল উত্তেজনায় যেন বন্ধ হয়ে আসছে ওর শ্বাসপ্রশ্বাস। বুকের ভিতর থেকে কী যেন ঠেলে উঠে চেপে ধরেছে ওর কণ্ঠনালী।

ফোমার মুখের দিকে তাকিয়ে ইয়েফিম একটু হাসল। তারপর চলে গেল। সন্ধ্যে পর্যন্ত পায়চারি করে বেড়াল ফোমা। যেন এক অন্ধ কুয়াশার ভিতরে হারিয়ে ফেলেছে নিজের সত্তা। গ্রাহকের প্ররোচনায় সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে চাষীরা ওকে জানাচ্ছে অভিবাদন। কিন্তু সেদিকে আদৌ ভ্রুক্ষেপ নেই ফোমার। ওর অন্তর আচ্ছন্ন করে নেমে এসেছে এক নিদারুণ ভয়ের ছায়া। কেমন যেন অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে। ওদের অভিবাদনের প্রত্যুত্তরে একান্ত নম্র, বিনীতভাবে করছিল প্রতি-অভিবাদন। যেন কী একটা বিষয়ের জন্যে চাইছে মার্জনা।

সন্ধ্যে হতেই বাড়ি ফিরে গেছে কিছু মজুর। বিরাট আগুনের কুণ্ড জেবলে বাকি সবাই রান্নাবাড়া করছে রাতের জন্য। সান্ধ্য-নীরবতার ভিতর দিয়ে ভেসে আসছে তাদের কথার টুকরো টুকরো শব্দ। লাল আর হলদে রেখায় নদীর বুকে পড়েছে আগুনের ছায়া। নিস্তরঙ্গ জলের বুকে আর কেবিনের জানালার কাঁচের উপরে প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠছে কেঁপে কেঁপে। কেবিনের ভিতরে এক কোণে একটা অয়েল-ক্লথ মোড়া কৌচের উপরে নীরব প্রতীক্ষমানতায় বসে রয়েছে ফোমা। ওর সামনে টেবিলের উপরে কয়েকটা বিয়ার আর ভদকার বোতল। আর প্লেটে দুপুরের আহারের অবশিষ্ট কিছু রুটি ফল আর মিষ্টান্ন। জানালার পরদা টানা। আলো জবালেনি। পরদার ফাঁকে তীরের ঐ আগুনের ক্ষীণ কম্পিত আলোর রেখা পড়ছে এসে টেবিলের উপরে, বোতলের গায়ে আর দেয়ালে। কখনো উজ্জ্বল দীপ্তিতে উঠছে ঝলমল করে, কখনো ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে উঠছে। জন-মানবহীন স্টিমার, নির্জন গাধাবোট। কেবলমাত্র তীরের কথোপকথনের অস্পষ্ট শব্দের সঙ্গে জলের ঝাপটার শব্দ মিশে আসছে ভেসে। ফোমার মনে হল কে যেন আশপাশে অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে শুনছে ওর কথা। আর গোপনে ওর কার্যকলাপের প্রতি রাখছে সজাগ দৃষ্টি। কে যেন গাধাবোটের উপরে পাতা তক্তার উপর দিয়ে হেঁটে আসছে। জলের উপরে দুলে-ওঠা তক্তা লেগে জেগে উঠছে ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ। ফোমা শুনতে পেল ক্যাপটেনের কণ্ঠের জড়িত উচ্চ হাসি। আর তারই সঙ্গে অনুচ্চ কণ্ঠস্বর। কী যেন বলছে ইয়েফিম ফিস্‌-ফিস্‌ করে কেবিনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। মনে হচ্ছে যেন তিরস্কার করছে কিংবা দিচ্ছে উপদেশ। হঠাৎ ইচ্ছে হল ফোমার চিৎকার করে ওঠে : ওকে দরকার নেই।

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ফোমা। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কেবিনের দোর খুলে গেল। একটি দীর্ঘাঙ্গী নারীমূর্তি এসে ঢুকল খোলা দোরের পথে। নিঃশব্দে দোর বন্ধ করে মৃদু কণ্ঠে বলে উঠল :

উঃ! কী অন্ধকার! মানুষজন কেউ আছে কি এখানে?

হাঁ, আছি।—তেমনি মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল ফোমা।

বেশ, তাহলে নমস্কার।

একান্ত সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে এল স্ত্রীলোকটি।

এক্ষুনি আলো জবালছি—ভাঙা ভাঙা গলায় বলল ফোমা। তারপর কৌচের ভিতরে ডুবে গিয়ে বেঁকে ঝুঁকে উঠে বসল।

এমনিই বেশ; একটু সয়ে গেলেই সব দেখা যাবে। অন্ধকারের ভিতরেও।

বোসো।—বলল ফোমা।

বসছি।

স্ত্রীলোকটি সোফার উপরে এসে বসল। ফোমার কাছ থেকে একটু দূরে। ফোমা দেখল, ওর চোখদুটো চক্‌চক্‌ করছে। পরিপূর্ণ অধরে হাসির আভা। মনে হল, এ হাসি ঠিক আগের হাসির মতো নয়। কেমন যেন একটু ক্লিষ্ট—একটু বিষণ্ন। এ হাসি ওর অন্তরে এনে দিল সাহস। এতক্ষণে যেন ওর শ্বাস-প্রশ্বাস আসছে সহজ হয়ে। চোখদুটো ওর চোখে পড়েই পরক্ষণে মাটির দিকে নেমে গেল। কিন্তু ফোমা জানে না এই মুহূর্তে কি বলতে হবে ঐ স্ত্রীলোকটিকে। মিনিট দুই উভয়ে নীরব হয়ে রইল। তারপর সেই নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠল মেয়েটি ঃ

এখানে খুবই একা একা লাগছে বোধহয়, না?

হাঁ।—প্রত্যুত্তরে বলল ফোমা।

এ জায়গাটা ভালো লাগে?

চমৎকার! অনেক বন আছে এখানে।

আবার ওরা হারিয়ে ফেলে কথা। আবার রইল বসে নীরব হয়ে।

এ নদীটা ভল্‌গার চাইতে ঢের বেশি সুন্দর।—অনেক চেষ্টায় সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলল ফোমা।

আমিও ছিলাম ভল্‌গা অঞ্চলে।

কোথায়?

সিম্‌বির্‌স্ক্‌ শহরে।

সিম্‌বির্‌স্ক্‌?—সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রতিধ্বনির মতোই বলে উঠল ফোমা। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল আর কোনো কথা নেই বলবার মতো। যেন এতটুকু ক্ষমতাও নেই যে কিছু বলে।

এক আঁচড়েই চিনে ফেলল স্ত্রীলোকটি যে কী ধরনের মানুষের সঙ্গে ওকে কারবার করতে হবে। তাই হঠাৎ যেন মুখ ফুটেই ফিস ফিস করে বলে ফেলল ঃ

কই, আমায় যে কিছু খেতে দিচ্ছ না বড়ো!

এই যে, এক্ষুনি—এক্ষুনি—ফোমা বলতে শুরু করল,—সত্যি কী অদ্ভুত মানুষ আমি!

বেশ, এসো তবে টেবিলে গিয়ে বসি।

অন্ধকারেও ফোমার চোখ-মুখ ছেয়ে জেগে উঠেছে লজ্জার অরুণোচ্ছ্বাস। টেবিলটা একটু ঠেলে দিয়ে একটা বোতল হাতে তুলে নিল ফোমা। তারপর তুলে নিল আর একটা। পরক্ষণেই আবার সেই লজ্জিত সংশয়ভরা হাসি হাসতে হাসতে সেগুলোকে রেখে দিল যথাস্থানে। মেয়েটি সরে এল ওর কাছে। পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর একটু হেসে ওর মুখের দিকে তাকাল। তাকাল ওর কম্পিত হাতের দিকে।

কিগো লজ্জা লাগছে?—মেয়েটি ওর কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলে উঠল। ওর শ্বাস-প্রশ্বাস এসে লাগছে ফোমার গালে। তেমনি অনুচ্চ মৃদু কণ্ঠে বলে উঠল ফোমা ঃ হাঁ।

মেয়েটি তার হাতখানা ফোমার কাঁধের উপরে তুলে দিয়ে নীরবে ওকে বুকের উপরে টেনে আনল। তারপর অস্ফুট স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল ঃ

কিছু ভেবো না। লজ্জা কী? প্রিয়তম! তোমাকে দেখা পর্যন্ত কী মায়াই না পড়েছে আমার!

ওর সেই অস্ফুট কণ্ঠের সুরে ফোমার মনে হল বুঝিবা এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে। এক সুমধুর ক্লান্তিতে বিগলিত হয়ে এল অন্তর। ওর মাথাটা আরো নিবিড় করে বুকের ভিতরে চেপে ধরল মেয়েটি। ফোমাও দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে অস্ফুট কণ্ঠে কী যেন বলতে লাগল ওর কানে কানে। ক্ষণিক আগেও যে-কথা ওর নিজের কাছেও ছিল অজ্ঞাত।

চলে যাও এখান থেকে!—অকস্মাৎ বিস্ফারিত চোখে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল ফোমা। ফোমার গালে একটি চুম্বন দিয়ে কেবিন ছেড়ে চলে যেতে যেতে বলল মেয়েটি ঃ বেশ, বিদায়!

মেয়েটির উপস্থিতিতে কেমন যেন এক অসহায় লজ্জায় অভিভূত হয়ে পড়েছিল ফোমা। কিন্তু সে ঘর ছেড়ে চলে যেতেই পা টেনে টেনে ফোমা সোফার উপরে গিয়ে বসল। পরক্ষণেই মনে হল কী যেন এক মহামূল্য বস্তু এইমাত্র হারিয়ে ফেলেছে। হারিয়ে ফেলার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যে জিনিসটা ওর নজরে আসেনি। কিন্তু সংগে সংগেই পৌরুষের অহংকার জেগে উঠল ওর অন্তর আচ্ছন্ন করে। উবে গেল লজ্জা। পরিবর্তে অর্ধ-নগ্না ঐ নারীর প্রতি জেগে উঠল অসীম করুণা। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন দারুণ শীতের রাতে যে এইমাত্র চলে গেল ঘর ছেড়ে। দ্রুত পায়ে ফোমা কেবিনের বাইরে এসে দাঁড়াল। চাঁদ-হীন নিকষ রাত্রির আকাশে কেবল তারা জ্বল জ্বল করছে। বাইরে এসে দাঁড়াতেই কন্‌কনে হিমশীতল অন্ধকার ওকে জড়িয়ে ধরল। তীরে নিভন্তশিখা কয়লার আগুন সোনালী আলোর রক্তিম আভায় তখনো গন্‌গন করছে। কেমন যেন একটা বুকে-চেপে-বসা নিথর নিস্তব্ধতায় পূর্ণ করে তুলেছে বাতাস। কান পেতে শুনল ফোমা নোঙরের শিকলের উপরে আছড়ে-পড়া ঢেউ-এর ছলাত ছলাত শব্দ। কোথাও একটিও পায়ের শব্দ শোনা যায় না। মেয়েটিকে ডাকাব জন্যে আকুল হয়ে উঠল ফোমার অন্তর। কিন্তু জানে না ওর নাম। হঠাৎ গলুইয়ের কাছের গোল ঘরের পিছন থেকে কান যেন অস্ফুট কান্নার শব্দ ভেসে এল ওর কানে। প্রায় আর্তকণ্ঠে ককিয়ে ওঠার মতো একটা দীর্ঘ একটানা কান্নার শব্দ। ফোমার সর্বাংগ কেঁপে উঠল। একান্ত সন্তর্পণে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল। বুঝল মেয়েটি রয়েছে ওখানে। দেখতে পেল ওর ফর্শা কাঁধদুটো কাঁপছে। শুনল ওর কান্না। মনটা দমে গেল। মেয়েটির মুখের উপরে ঝুঁকে প্রশ্ন করল ঃ

ব্যাপার কী?

প্রত্যুত্তরে মেয়েটি কেবলমাত্র মাথা নাড়ল। কিন্তু একটি কথাও বলল না।

তোমার মনে আঘাত দিয়েছি আমি?

এখান থেকে চলে যান।—বলল মেয়েটি।

কেমন করে যাবো?—সংশয়কুণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করল ফোমা. মেয়েটির মাথার উপরে আলতো করে হাত রেখে।

রাগ করো না। নিজের ইচ্ছেতেই তো এসেছ তুমি!

রাগ করিনি আমি।—একটু জোরের সংগেই ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল মেয়েটি। আপনার উপরে রাগ করতে যাবো কেন? আপনি তো আর জোর করে আমাকে নষ্ট করেননি। আপনি নিষ্পাপ। আঃ! প্রিয়তম! বসো এখানে! বসো আমার পাশে!—বলতে বলতে মেয়েটি ফোমার একখানা হাত ধরে ওকে কাছে টেনে বসাল। কোলের কচি শিশুকে যেমন করে বুকে চেপে ধরে তেমনি করে ফোমার মাথাটা বুকের ভিতরে চেপে ধরল। তারপর মুখের উপরে ঝুঁকে পড়ে ঠোঁটদুটো

ফোমার ঠোঁটের উপরে চেপে ধরে দীর্ঘ চুম্বনে নীরব হয়ে রইল।

কেন কাঁদছিলে?—বাঁ হাতে ওর গালদুটো চেপে ধরে প্রশ্ন করল ফোমা। অন্য হাতে জড়িয়ে ধরল গলা।

কাঁদছিলাম নিজের দুঃখে।

কেন তুমি তাড়িয়ে দিলে আমাকে? অভিযোগভরা বিমর্ষ কণ্ঠে প্রশ্ন করল মেয়েটি।

নিজের কাছেই কেমন যেন লজ্জা লাগছিল।—প্রত্যুত্তরে মাথা নিচু করে বলল ফোমা।

প্রিয়তম! সত্যি করে বলো, নিশ্চয়ই খুশি হওনি তুমি আমাকে পেয়ে।—মৃদু হেসে বলল মেয়েটি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুফোটা জল ঝরে পড়ল ফোমার বুকের উপরে।

ও কথা কেন বলছ অমন করে?—উচ্ছ্বাসভরা কণ্ঠে বলে উঠল তরুণ ফোমা। বুঝিবা ভয় পেল মনে মনে। তারপর মেয়েটির রূপ, ওর অন্তরের কোমলতা, সহৃদয়তা সম্পর্কে প্রলাপের মতো অসংলগ্ন জড়িত সুরে বলে যেতে লাগল তপ্ত-কণ্ঠে। বলল, কেমন করে ওর উপস্থিতিতে দারুণ লজ্জিত হয়ে উঠেছিল ফোমা মনে মনে। কেমন করে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল অন্তর অনির্বচনীয় করুণায়।

শুনতে শুনতে মেয়েটি কখনো ওর গালে কখনো ওর খোলা বুকের উপরে চলেছে চুম্বন করে। ফোমা হারিয়ে ফেলল কথা। তারপর বলতে শুরু করল মেয়েটি। এত কোমল, এত করুণ সুরে, যেন সে কোনো মৃত প্রিয়জনের কথা বলছে।

আর আমি ভেবেছিলাম অন্য কথা। তুমি যখন বললে চলে যাও, তক্ষুনি উঠে চলে এলাম। এত আঘাত পেয়েছিলাম মনে যে,—দারুণ আঘাত। ভীষণ দুঃখ হয়েছিল আমার। একদিন ছিল যখন আমাকে আদর করে, আলিঙ্গন করে লোকের আশ মিটত না। একটুও ক্লান্তি আসত না। আমাকে খুশি করার জন্যে, আমার মুখের একটু হাসির জন্যে না করতে পারত এমন কোনো কাজ ছিল না। সেদিনের সে-সব কথা মনে পড়ে আমার কান্না পাচ্ছিল। দুঃখ হচ্ছিল আমার সেই হারানো যৌবনের জন্যে। কারণ বয়েস এখন আমার ত্রিশ। নারীজীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। হায় ফোমা ইগনাতিয়েভিচ্!—ঢেউয়ের সুরেলা শব্দতরঙ্গের তালে তালে প্রতিটি কথায় ঝঙ্কার তুলে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগল মেয়েটি।

শোনো! যৌবনকে রক্ষা করো। এর চাইতে ভালো জিনিস দুনিয়ায় আর কিছু নেই। এমন কিছু নেই যা নাকি যৌবনের চাইতে মূল্যবান। যদি যৌবন বজায় থাকে, সোনার মতো—সম্পদের মতো, দুনিয়ায় যা খুশি তাই-ই হাসিল করতে পারো। এমনভাবে বাঁচবে যাতে বুড়ো বয়সেও অম্লান থাকে তোমার যৌবন-স্মৃতি। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে আমার অতীতের কথা। যদিও আমি কাঁদছিলাম, কিন্তু অতীতের প্রত্যেকটি কথা মনে পড়ে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল আমার অন্তর। আর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল আমার তারুণ্য। যেন এক্ষুনি—এই মুহূর্তে পান করলাম সঞ্জীবনী। প্রিয় আমার! খুব আনন্দেই কাটবে আমার দিন তোমার সঙ্গে, যদি আমি পারি তোমাকে আনন্দ দিতে। হাঁ অন্তর আমার জ্বলে উঠেছে। পুড়ে ছাই হয়ে যাবো নিঃশেষ হয়ে।—বলতে বলতে ফোমাকে নিবিড় আলিঙ্গনে বুকে চেপে ধরে লোভীর মতো ওর দুটো ঠোঁট চুমোর চুমোয় ভরিয়ে দিতে লাগল।

তা-কি-য়ে-দে-খ—গাধাবোটের উপরের ঘড়িটা করুণ সুরে আর্তনাদ করে উঠল। পরক্ষণেই থেমে গিয়ে ছোট্ট হাতুড়িটা দিয়ে ধাতুর পাতের উপরে আঘাত করতে

লাগল। তীব্র কম্পিত শব্দে প্রশান্তিভরা নৈশ নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে যেতে লাগল।

কয়েকদিন পরে গাধাবোটগুলোর মাল খালাস হয়ে গেলে স্টিমারটা যখন পের্‌ম্‌-এর দিকে যাত্রা করবে, ইয়েফিম দেখল একটা গোরুর গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে পাড়ে। আর তার ভিতরে রয়েছে কৃষ্ণাক্ষী সেই মেয়েটি, পেলাগিয়া। সঙ্গে একটা বাক্‌স আর কিছু মালপত্র। দারুণ দুঃখ হল ইয়েফিমের মনে।

একটা খালাসী পাঠিয়ে ওর মালপত্র জাহাজে তুলে আনো।—ইঙ্গিতে তীরের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে হুকুম করল ফোমা।

নিদারুণ বিরক্তিতে মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ক্রুদ্ধ ইয়েফিম হুকুম তামিল করল। তারপর নিচু কণ্ঠে প্রশ্ন করল ঃ

ওটাও যাচ্ছে তাহলে আমাদের সঙ্গে?

ও যাচ্ছে আমার সঙ্গে—বলেই চুপ করে গেল ফোমা।

আমাদের সবার সঙ্গে যে নয় সে তো বোঝাই যাচ্ছে। হা ভগবান!

তুমি কেন অত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছ?

হাঁ, ফেলছি। ফোমা ইগনাতিচ্‌! আমরা যাচ্ছি একটা বড়ো শহরে। ওর মতো অঢেল মেয়েমানুষ মিলবে সেখানে। তাই নয় কি?

থাক, তুমি চুপ করো।—রুক্ষকণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠল ফোমা।

আমি চুপ করেই থাকব। তবে এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না।

কোন্‌টা?

আমাদের এ-ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা। আমাদের জাহাজ পবিত্র। আর হঠাৎ সেই জাহাজে কিনা একটা মেয়েমানুষ! তাছাড়া যদি একটা মেয়েমানুষের মতো মেয়ে-মানুষও হত তবু না হয় কথা ছিল। ওটা তো নামে মাত্র মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়!

তীব্র ভ্রূকুটিকুটিল চোখে তাকাল ফোমা ইয়েফিমের দিকে, তারপর আদেশভরা কণ্ঠে প্রতিটি কথায় জোর দিয়ে বলল ঃ

ইয়েফিম! একটা কথা মনে রেখো আর সবাইকে জানিয়ে দিও যে, কেউ যদি ওর সম্পর্কে কোনো কুৎসিত মন্তব্য করে তবে তার মাথা আমি গুঁড়িয়ে দেবো।

কী সাংঘাতিক!—উৎসুক দৃষ্টিতে মনিবের মুখের দিকে তাকাল ইয়েফিম। কেমন যেন প্রত্যয় হচ্ছে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুপা পেছিয়ে এল। ইগনাতের ছেলে। নেকড়ের মতো দাঁত বের করেছে। বড়ো হয়ে উঠেছে চোখের মণি-দুটো। পরক্ষণেই আবার গর্জে উঠল ঃ

হাসছ? শিখিয়ে দেবো কেমন করে হাসতে হয়।

যদিও ততক্ষণে উবে গেছে ইয়েফিমের সাহস, তবুও তার পদমর্যাদা বজায় রেখে বলল ঃ

ফোমা ইগনাতিচ! যদিও তুমি মনিব কিন্তু আমার উপরেও আদেশ দিয়ে বলেছেন ঃ দৃষ্টি রেখো ইয়েফিম! তাছাড়া আমি ক্যাপটেন।

ক্যাপটেন!—চিৎকার করে উঠল ফোমা। ওর প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাগে থরথর করে কেঁপে উঠে মুহূর্তে ছাইয়ের মতো শাদা হয়ে গেল।—আর আমি? আমি কে?

যাকগে, তুচ্ছ একটা মেয়েমানুষের জন্যে অত চেঁচামেচি করো না।

ফোমার পাণ্ডুর গালের উপরে জেগে উঠল রক্তের দাগ। এক পা থেকে অন্য পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। বিকারগ্রস্তের মতো হাতদুটো ঢুকিয়ে দিল পকেটের

ভিতরে। তারপর দৃঢ় রুক্ষকণ্ঠে বলল :

শোন্! ক্যাপটেন! আর একটা কথা বলবি কখনো আমার বিরুদ্ধে তক্ষুনি তোকে জাহান্নামে পাঠাবো। পাড়ে ছেড়ে দেবো। বাকি লস্কর দিয়েই আমার কাজ চলবে। বুঝেছিস? আমার উপরে কর্তৃত্ব ফলাবার কেউ নোস তুই। বুঝলি?

বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেল ইয়েফিম। প্রত্যুত্তরে একটি কথাও খুঁজে না পেয়ে ভাঁড়ের মতো জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে মনিবের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

বুঝেছিস যা বললাম?

হাঁ। বুঝেছি।—টেনে টেনে বলল ইয়েফিম।

কিন্তু তার জন্যে এতো সোরগোল বাঁচাচ্ছ কেন? একটা—

চুপ!

ফোমার চোখদুটো বড়ো বড়ো হয়ে উঠল। ক্রোধে বিকৃত হয়ে উঠল মুখ। পরক্ষণে এই মুহূর্তে ক্যাপটেনকে স্থান ত্যাগের নির্দেশ দিয়ে নিজেই ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত চলে গেল।

উঃ! কী সাংঘাতিক! বাঁশের কোঁড়ে বাঁশই জন্মায়।—ডেকের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে ঘৃণাভরা কণ্ঠে বলল ইয়েফিম। দারুণ রাগ হয়েছে ওর ফোমার উপরে। নেহাত তুচ্ছ কারণে আহত মনে হচ্ছে নিজেকে। কিন্তু সংগে সংগেই মনে হল যেন অনুভব করছে মনিবের দৃঢ় হাতের চাপ। যে চাপ অনুভব করেছে বছরের পর বছর নিম্নপদস্থ থেকে। ওর নিজের উপরে মনিবোচিত এই ক্ষমতার প্রকাশে কেমন যেন খুশিও হয়ে উঠছে মনে মনে। তারপর বুড়ো নাবিকের ঘরে গিয়ে আদ্যোপান্ত বলল তার কাছে। ওর কণ্ঠে বেজে উঠল কেমন যেন সন্তুষ্টি-ভরা তৃপ্ত সুর।

বুঝলে?—এই বলে তার গল্প শেষ করল,—ভালো জাতের কুকুরছানা। প্রথম শিকার ধরল ভালো কুকুরেরই মতো। বাইরে থেকে যেমন তেমন মনে হলেও একটা মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠবে কালে কালে। যাকগে, করুক একটু ফুর্তি। এখন মনে হচ্ছে, ওতে তেমন বেশি কিছু ক্ষতি হবে না। ওর মতো স্বভাবের মানুষ—না। কেমন করে ধমকে উঠল আমাকে! যেন একটা খাঁটি জয়ঢাক! নিজেকে সংগে সংগেই যেন মনিব বানিয়ে তুলল। যেন এইমাত্র ক্ষমতা আর দৃঢ়তার কড়া মদ খেয়ে নিল।

ঠিকই বলেছে ইয়েফিম। এই ক'দিনের ভিতরেই দারুণ পরিবর্তন এসেছে ফোমার ভিতরে। উদগ্র কামনার আগুনে জ্বলে উঠেছে ওর অন্তর। একটি নারীর দেহ ও মনের স্বামী—তার মালিক। এই নবলব্ধ শক্তির অগ্নিশিখায় ওর অন্তর প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে যা-কিছু কুশ্রীতা যা-কিছু ওকে রেখেছিল নির্বোধ বিষাদময় করে। আর এরই ধ্বংসের ভিতর দিয়ে ওর অন্তর পূর্ণ হয়ে জেগে উঠেছে যৌবনের আত্ম-প্রত্যয়-ভরা অহংকার। ব্যক্তিত্বের চেতনা। নারীর প্রতি ভালোবাসা পুরুষকে তোলে সার্থক করে। তা সে যেমনই হোক না সে ভালোবাসা। এমন-কি সে ভালোবাসা যদি আনে নিদারুণ বেদনার অসহনীয়তা তবুও তার ভিতরে থাকে অনেক সম্পদ। যাদের অন্তরে জ্বলে ওঠে এই প্রেম তাদের অন্তরে শুরু হয় এক শক্তিশালী বিষক্রিয়া। সবল সুস্থ মানুষের কাছে এ প্রেম আগুনের ভিতরে লোহার মতো। পুড়িয়ে তাকে ইস্পাতে পরিণত করে তোলে। ত্রিশ বছর বয়সের ঐ নারী—ফোমার বুকে পড়ে যে এইমাত্র শোক

করছিল তার বিগত যৌবনের জন্যে—ওর প্রতি ফোমার ভালোবাসা পারেনি তাকে কর্মক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত করতে। ভালো মদেরই মতো ঐ নারী জাগিয়ে তুলেছে ওর অন্তরে কর্মোন্মাদনা। জাগিয়ে তুলেছে প্রেম। আর তার নিজের ভিতরেও ফিরে এসেছে যৌবন, ফিরে এসেছে তারুণ্য ঐ চুম্বনের সোনালী ছোঁয়ায়।

পের্‌ম্‌-এ এসে ফোমা দেখল, ওর নামে একখানা চিঠি এসে রয়েছে। লিখেছে ওর ধর্মবাপ। লিখেছে, ওর জন্যে ভাবনায় চিন্তায় দারুণভাবে মদ খেতে শুরু করেছে ইগনাত। তার মতো বয়সের লোকের পক্ষে সেটা খুবই অনিষ্টকর। চিঠির শেষে তাগিদ দিয়েছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শেষ করে ওর ফিরে আসা দরকার। নিদারুণ দুশ্চিন্তার কালো মেঘ ঘনিয়ে এল ফোমার মনে। ঘনিয়ে এল ওর মনের নির্মল নীল আকাশ পরিব্যাপ্ত করে। কিন্তু কাজের চিন্তায় আর পেলাগিয়ার আলিঙ্গনে অচিরেই কেটে গেল সেই মেঘ।

নদীর তরঙ্গের মতো দ্রুত গতিতে বয়ে চলেছে ওর জীবন। নিয়ে আসছে প্রতিদিন নতুন নতুন উন্মাদনা। জাগিয়ে তুলছে নতুন চিন্তা, নতুন ভাবনা। পেলাগিয়ার সম্পর্কের ভিতরে রয়েছে রক্ষিতার যাবতীয় উদগ্র কামনার আকর্ষণভরা উত্তাপ। রয়েছে সবটুকু অনুভূতি, সবটুকু অন্তরাবেগের সেই অমোঘ শক্তি কামনার বহ্নিশিখায় যা নাকি নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে ওর বয়সের নারীরা জীবনের পানপাত্রের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত পান করে।

থেকে থেকে এক ভিন্ন ভাবধারা জেগে ওঠে ঐ নারীর অন্তরে। সে ভাব-ধারার শক্তিও কম নয়। ফোমাকে আরও বেশি করে আকৃষ্ট করে ওর প্রতি। সন্তানের প্রতি মায়ের যে ভাব। যে ব্যাকুলতা দিয়ে পরম স্নেহের ধনটিকে ঘিরে রাখেন মা—আগলে রাখেন জীবনের চলার পথে সমস্ত ভুল-ত্রুটির হাত থেকে, শিক্ষা দেন, দেন জীবন-পথে জ্ঞানের আলোক।

প্রায়ই রাত্রে যখন ওরা ঘন সান্নিধ্যে নিবিড় হয়ে ডেকের উপরে বসে থাকে পরম স্নেহে ব্যথাভরা কোমল কণ্ঠে বলে পেলাগিয়া ঃ

আমাকে মনে করো তোমার বড়ো বোন। অনেক দেখেছি আমি। চিনি আমি পুরুষদের। বহু পুরুষ দেখেছি আমি জীবনে। খুব সাবধানে বেছে নেবে নিজের সঙ্গী। কেননা এমন সমস্ত মানুষ আছে রোগের বীজাণুর মতোই যারা সংক্রামক। কিন্তু প্রথম প্রথম বুঝতে পারবে না। মনে হবে অন্য পাঁচ জনার মতোই সাধারণ লোক। তারপর নিজের অজ্ঞাতেই এক সময়ে দেখবে নিজের জীবনে তুমি তার অনুকরণ করতে শুরু করেছ। তাকিয়ে দেখবে নিজের চারদিকে—দেখবে তার পচনশীল ঘা সংক্রামিত হতে শুরু করেছে তোমার দেহে। এমনি এক বন্ধুর পাল্লায় পড়েই আমি হারিয়ে ফেলেছি জীবনের সবকিছু। রিক্ত—সর্বস্বান্ত হয়েছি জীবনে। ছিল স্বামী। ছিল দুটি সন্তান। বেশ সুখেই কাটত আমার দিন। স্বামী ছিল কেরানি—বলতে বলতে পেলাগিয়ার গলা বুজে এল। তারপর চলন্ত নৌকার গতিবেগে আন্দোলিত জলের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল। বহুক্ষণ পরে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলতে শুরু করল ঃ পবিত্র কুমারী মাতা আমার মতো মেয়েদের হাত থেকে চিরদিন তোমাকে রক্ষা করুন। তোমার বয়েস কম। হৃদয় এখনো কঠিন হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া মেয়েরাও তোমার মতো পুরুষকেই চায়। সবল, সুন্দর, ধনবান। হাঁ, শান্ত নিরীহ মেয়েদের কাছ থেকে দূরে থাকবে. —সতর্ক থাকবে ওদের সম্পর্কে। ওরা রক্তচোষার মতো গায়ে লেপ্‌টে থাকে। তারপর চুষে চুষে ঝাঁঝরা করে দেয়। অবশ্য বাইরে দেখায় যেন কত স্নেহশীলা,

কষ্ট তন্ত্র। ওরা তোমার রস নিংড়ে নিংড়ে খাবে আর নিজেরা মোটা হবে। আর অকারণেই তোমার মন ভেঙে দেবে। বরং যারা আমার মতো সাহসী, ডানপিটে মিশবে তাদের সঙ্গে। তারা কখনো লোভের জন্যে আসবে না।

সত্যিই মেয়েটি নির্লোভ—উদাসীন। পের্‌ম্‌-এ পৌঁছে ফোমা অনেক নতুন জিনিসপত্র কিনে নিয়ে এল ওর জন্যে। প্রথমে ও দারুণ খুশি হয়ে উঠল। কিন্তু পরে জিনিসগুলো ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে ব্যথাভরা কণ্ঠে বলল :

দেখো, এমন করে পয়সা নষ্ট করো না। আমি ভালোবাসি তোমাকে। এসব ছাড়াও ভালোবাসবো।

পেলাগিয়া ইতিমধ্যেই ফোমাকে জানিয়ে দিয়েছে যে, সে কেবল কাজান পর্যন্তই যাবে ওর সঙ্গে। সেখানে ওর একটি বোন আছে—বিবাহিতা। কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না ফোমা যে সত্যি সত্যিই সে ওকে ছেড়ে যাবে। কিন্তু কাজান পৌঁছবার আগে সে আবার স্মরণ করিয়ে দিল সেকথা। অমনই ফোমা গম্ভীর হয়ে গেল। মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল তার অন্তর। বারবার করে একান্তভাবে অনুরোধ করতে লাগল যাতে ওকে ছেড়ে না চলে যায়।

আগে থেকেই মন খারাপ করো না। এখনো গোটা একটা রাত রয়েছে সামনে। যখন চলে যাবো তখন অনেক সময় পাবে দুঃখ করার। অবশ্য যদি দুঃখ পাও মনে।

কিন্তু তবুও ফোমা একান্তভাবে মিনতি করতে লাগল যাতে পেলাগিয়া ওকে ছেড়ে চলে না যায়। শেষ পর্যন্ত যা ভাবছিল ঘটল তাই-ই। ফোমা প্রস্তাব করে বসল, ওকে বিয়ে করবে।

বটে! বটে!—হাসতে আরম্ভ করল পেলাগিয়া। আমার স্বামী এখনো বেঁচে। আর আমি তোমাকে করবো বিয়ে! প্রিয় আমার! সত্যি কী অদ্ভুত মানুষ তুমি! বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়েছে, অ্যাঁ? কিন্তু আমার মতো মেয়েকে কেউ আবার বিয়ে করে নাকি! ঢের ঢের মেয়ে পাবে আমার মতো যারা রক্ষিতা হয়ে থাকবে তোমার কাছে। যখন জীবনের পানপাত্র পূর্ণ হয়ে যাবে—নিঃশেষ হয়ে যাবে সমস্ত রসের আস্বাদন তখন করো বিয়ে। একজন সুস্থ লোক—নিজের সুখ শান্তির জন্যেই তার উচিত নয় অল্প বয়সে বিয়ে করা। একটি নারী কিছুতেই পাবে না তাকে তৃপ্ত করতে। তখন সে বাধ্য হয় অন্য নারীর কাছে যেতে। তোমার নিজের সুখ শান্তির জন্যেই বলছি—যখন বুঝবে একটি স্ত্রীতেই তোমার মন ভরবে, কেবলমাত্র তখনই বিয়ে করো।

কিন্তু যতই বলতে লাগল পেলাগিয়া, ফোমার জিদও ততই বেড়ে যেতে লাগল। অনুরোধ করতে লাগল যাতে সে ওকে ছেড়ে না যায়।

আমি যা বলছি, শোনো।—ধীর শান্তকণ্ঠে বলল মেয়েটি। তোমার হাতের ভিতরে জ্বলছে একটা কাঠের টুকরো। ওর আলো ছাড়াও তুমি দেখতে পাবে। তোমার উচিত ওটাকে জলে ডুবিয়ে ধরা। যাতে ধোঁয়ার গন্ধ এসে না লাগে তোমার নাকে। আর হাত না পুড়ে যায়।

তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

পারছ না? শোনো, তুমি তো আমার কোনো ক্ষতি করোনি। তাই আমিও চাই না তোমার কোনো ক্ষতি করতে। আর তারই জন্যে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে দূরে।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত এই বাদানুবাদের পরিণতি কোথায় কত দূর গিয়ে গড়াত

তা বলা কঠিন ছিল যদি না হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটে সমস্ত ব্যাপারটার মোড় দিত ঘুরিয়ে।

কাজানে পোঁছে ফোমা মায়াকিনের তার পেল। সংক্ষেপে লিখেছে ওর ধর্ম-বাপ ঃ যাত্রীবাহী স্টিমার ধরে এক্ষুনি চলে এসো।

ফোমার অন্তর কেঁপে উঠল। কয়েক ঘণ্টা পরে গমনোদ্যত একটা যাত্রীবাহী জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে ফোমা। রেলিং ধরে ঝুঁকে স্থির অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে প্রিয়তমার মুখের দিকে। ধীরে তীর ও পোতাশ্রয়ের সঙ্গে দূরে সরে যাচ্ছে প্রিয়ার মুখ।

রুমাল নাড়তে নাড়তে পেলাগিয়া হাসছে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু ফোমা জানে ও কাঁদছে। নিবিড় বেদনার অজস্র অঝোর কান্নায় ভেসে যাচ্ছে ওর বুক। পেলাগিয়ার চোখের জলে ভিজে গেছে ফোমার জামার সামনের দিকটা। এক বেদনাভরা ভয়ে অন্তর এসেছে জমে ঠাণ্ডা হয়ে। ক্রমে ক্ষুদ্র হয়ে আসছে ঐ নারীর দেহ। যেন ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে। স্থির অপলক দৃষ্টিতে ওর অপসৃয়মান দেহের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনুভব করল ফোমা যে ওর বাবার জন্যে ভয় দুশ্চিন্তা আর ঐ নারীর সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনা ছাড়াও কী যেন একটা অভিনব শক্তিশালী লবণাক্ত অনুভূতি জেগে উঠেছে ওর অন্তর আচ্ছন্ন করে। জানে না কী সে বস্তু। জানে না নাম। কিন্তু তবুও মনে হচ্ছে কার উপরে যেন ওর অন্তর জুড়ে ঘনিয়ে আসছে অভিমান—ঘনিয়ে আসছে ক্ষোভ। জানে না কী সে। জানে না তার নাম। তবুও ওর সমস্ত অন্তরাত্মা জুড়ে এক সুগভীর বিক্ষোভ আসছে ঘনিয়ে।

পোতাশ্রয়ে জনতার ভিড় যেন একাকার হয়ে গিয়ে তাল-গোল পাকিয়ে পরিণত হয়েছে একটা অচঞ্চল ঘন কালো বিন্দুতে। নেই মুখ। নেই কোনো আকৃতি। নেই স্পন্দন। রেলিং-এর কাছ থেকে সরে এসে ফোমা বিষাদক্লিষ্ট মুখে ডেকের উপরে পায়চারি করতে শুরু করল।

যাত্রীরা জটলা করতে করতে চা খাচ্ছে। পরিচারকেরা সোরগোল তুলে টেবিল সাজাচ্ছে রেলিং-এর পাশে। গলুইয়ের কাছে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ভিতর থেকে জেগে উঠেছে একটি শিশুর কান্না। জেগে উঠেছে চিৎকার আর কোলাহলের ঐক্যতান। পাচক ছুরি দিয়ে কী যেন কাটছে টুকরো টুকরো করে। ডিশগুলো বেজে উঠছে ঝন্ ঝন্ করে। জেগে উঠছে একটা করুণ কর্কশ শব্দ। ঢেউ কেটে কেটে ফেনা তুলে নিদারুণ শ্রান্তিতে কাঁপতে কাঁপতে আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে অতিকায় স্টিমারটা দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে স্রোতের উল্টো দিকে। পিছনের সেই বিস্তীর্ণ ক্রুদ্ধ ভাঙা ঢেউয়ের দিকে তাকাল ফোমা। সঙ্গে সঙ্গে ওর অন্তর জুড়ে জেগে উঠল কিছু একটা ভেঙে চূর্ণ চূর্ণ করে গুঁড়িয়ে ফেলার উত্তেজনাভরা আবেগ। ইচ্ছে হল ঐ স্রোতের বিরুদ্ধে বুক পেতে দিয়ে অনুভব করে ঐ বিরাট জলরাশির বিপুল চাপ।

অদৃষ্ট!—ক্লান্ত কর্কশ কণ্ঠে কে যেন বলে উঠল ওর পাশ থেকে। কথাটা ওর জানা। ওর প্রশ্নের উত্তরে বহুবার বলেছেন ওর পিসিমা। কল্পনায় ফোমা ঐ ছোট্ট কথাটির ভিতরে আরোপ করেছে ঈশ্বরের সমতুল্য শক্তি। বক্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল ফোমা। দেখল পক্ক-কেশ একটি বৃদ্ধ। মুখখানা করুণামাখা। সঙ্গী অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী। চোখদুটো বড়ো আর ক্লান্তির ছায়া ঘেরা। গোঁজের মতো ছুঁচলো একটু দাড়ি। তাঁর বিরাট উঁচু নাক আর ভাঙা তোবড়ানো

গাল মনে করিয়ে দিল ফোমাকে তার ধর্মবাপের কথা।

অদৃষ্ট!—বৃদ্ধ তার সঙ্গীর দৃঢ়তাভরা কণ্ঠের কথাটি পুনরাবৃত্তি করে হাসতে শুরু করল।

জীবনে অদৃষ্ট হচ্ছে নদীর বুকে জলের মতো। বঁড়শিতে টোপ গেঁথে ছুঁড়ে দেয় আমাদের ভিতরে—জীবনের কলকোলাহলের ভিতরে আর আমরা প্রলুব্ধ হয়ে কামড়ে ধরি। অদৃষ্ট তখন ছিপে টান দেয়। মানুষ আছাড়ি-পিছাড়ি করতে শুরু করে। মাটিতে পড়ে ঝাপ্‌টা মারে। ধড়ফড় করতে থাকে। তারপর তার হৃদয়-মন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এই হচ্ছে অদৃষ্টের খেলা। বুঝলে ভাই!

ফোমা চোখ বুজল। যেন এক ফালি রোদ এসে পড়েছে ওর চোখের উপরে। তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে একটু জোর গলায়ই বলে উঠল :

ঠিক। খাঁটি কথা।

আলোচনারত লোক দু'জন একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। বৃদ্ধের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে বুদ্ধিদীপ্ত সুন্দর মৃদু আভা। কিন্তু সঙ্গী—বড়ো চোখওয়ালা ভদ্রলোকটির দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে সৌহার্দ্যহীন জিজ্ঞাসা। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে ফোমা কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। লজ্জারুণ রক্তিম মুখে সরে গেল ওদের কাছ থেকে অদৃষ্টের কথা ভাবতে ভাবতে। কেনই-বা ঐ মেয়েটিকে ওর কাছে এনে দিয়ে, পরিচয় করিয়ে দিয়ে প্রথমে করল সদয় ব্যবহার কেনই-বা আবার অবলীলাক্রমে অমন রূঢ়ভাবে কেড়ে নিল তাকে ওর কাছ থেকে? এতক্ষণে বুঝতে পারল, যে অস্পষ্ট তিক্ততায় ওর অন্তর আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে সেটা হচ্ছে ওকে নিয়ে এমনি করে খেলা করবার জন্যে অদৃষ্টের বিরুদ্ধে জেগে-ওঠা অন্তরজোড়া আক্রোশ। জীবনের কাছ থেকে বড্ডো বেশি প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে। প্রথমে যে আনন্দের পরিপূর্ণ পানপাত্রটি জীবন এগিয়ে ধরেছিল ওর মুখে তার ভিতরে এক বিন্দু বিষও যে ছিল সেটাকে সহজভাবে মেনে নিতে শেখেনি।

কিন্তু ঐ আক্রোশ যদিও ওর ভিতরে জাগিয়ে তুলল না হতাশা, জাগিয়ে তুলল না দুঃখ কিন্তু তীব্র ক্রোধ আর প্রতিশোধ স্পৃহায় ওর অন্তর পূর্ণ করে তুলল।

ফোমা দেখল মায়াকিন। ওর উৎকণ্ঠাভরা উত্তেজিত প্রশ্নের জবাবে মায়াকিনের সবুজে চোখদুটো চক্‌চক্‌ করে উঠল। তারপর গাড়ির ভিতরে উঠে গিয়ে ধর্ম-পুত্রের পাশে বসে বলল :

তোমার বাবা একদম ছেলেমানুষ হয়ে উঠেছে।

খুব মদ খেতে শুরু করেছেন বুঝি?

তার চাইতেও খারাপ। পাগল হয়ে গেছে।

সত্যি? হা ঈশ্বর! বলুন, সবকিছু খুলে বলুন।

বুঝতে পারছ না? একটি ভদ্রমহিলা সারাক্ষণ ওকে ঘিরে রেখেছে।

ব্যাপার কী?—উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করল ফোমা। ওর মনে পড়ে গেল পেলাগিয়ার কথা। সঙ্গে সঙ্গেই মনটা কেমন যেন আনন্দে ভরে উঠল।

জোঁকের মতো গায়ে কামড়ে ধরেছে আর রক্ত শুষে খাচ্ছে।

মহিলা কি খুব শান্ত নিরীহ প্রকৃতির?

সে? ঠান্ডা—আগুনের মতো। পঁচাত্তর হাজার টাকা ইতিমধ্যে পাখির পালকের মতো উড়ে গেছে ওর পকেট থেকে।

ওঃ! তাই বলুন! কে সে?

সোন্‌কা মেদিনস্কায়া। স্থপতির স্ত্রী।

হা ঈশ্বর! এ কী সম্ভব! তিনি...আমার বাবা কী...এ কী সম্ভব যে তিনি তাকে গ্রহণ করেছেন প্রণয়িনী হিসাবে?—বিস্ময়ভরা জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করল ফোমা।

চকিতে ওর ধর্মবাপ ওর কাছ থেকে একটু সরে বসল। চোখদুটো বড়ো বড়ো করে বলল ঃ

তুইও দেখছি ওরই মতো পাগল হয়ে গেছিস। হাঁ ঠিক বলছি, তুইও পাগল হয়ে গেছিস। একটু বুদ্ধিশুদ্ধি ধর। তেষট্টি বছর বয়সে প্রণয়িনী! আর এই দামে! কী বলছিস তুই? আচ্ছা দাঁড়া, বলছি গিয়ে আমি ইগনাতকে!—মায়াকিন খন্‌ খন্‌ করে হেসে উঠল। ওর ছাগলের মতো ছুঁচলো দাড়ি অদ্ভুতভাবে নড়তে লাগল। পরিষ্কার জবাব পেতে অনেকটা সময় লাগল ফোমার। বৃদ্ধ কেমন যেন একটু অস্থির, একটু উদ্‌বিগ্ন—যেটা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। স্বভাবত কথা বলে বেশি—বলে অনর্গল। কিন্তু আজ কেমন যেন বেধে যাচ্ছে। কাশছে থেকে থেকে। গলা ঝাড়ছে। আর অতি কষ্টে বুঝতে পারল ফোমা কী ঘটেছে।

সোফিয়া পাভ্‌লোভনা মেদিনস্কায়া—ধনী স্থপতির স্ত্রী। শহরের বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্যে সুপরিচিত। একটা সাধারণ বাসগৃহ ও একটা লাইব্রেরি আর পাঠাগার স্থাপনের জন্য ইগনাতকে রাজী করিয়েছে প'চাত্তর হাজার টাকা দান করতে। টাকাটা দিয়ে দিয়েছে ইগনাত। আর ইতিমধ্যেই কাগজে কাগজে প্রচারিত হয়েছে ওর এই বিরাট দানের খ্যাতি। ফোমা চেনে মহিলাটিকে। দেখেছে অনেকবার রাস্তায়। ছোটখাট চেহারা। ফোমা জানে মহিলাটির খ্যাতি আছে শহরের সেরা সুন্দরী হিসেবে। আর আছে অনেক জনশ্রুতি।

তাহলে মোটকথা এই তো?—বলল ফোমা ওর ধর্মবাপের কাহিনী শেষ হতে। —আর আমি ভেবেছিলাম—কী জানি, কি, ভগবান জানেন!

তুই? তুই ভেবেছিলি? হঠাৎ চটে ওঠে মায়াকিন।—কিছুই ভাবিসনি তুই। এক ফোঁটা পুঁচকে ছেলে!

তা'বলে গাল পাড়ছেন কেন?—বলল ফোমা।

বল দেখি, নিজেই বল তুই, প'চাত্তর হাজার টাকা কি এক কাঁড়ি টাকা নয়?

হাঁ, অনেক টাকাই তো বটে।—একটু ভেবে বলল ফোমা।

ওঃ!

কিন্তু আমার বাবার তো অনেক টাকা আছে। এর জন্যে এত সোরগোল করছেন কেন?

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল ইয়াকভ তারাশভিচ।

তুই—তুই বলছিস একথা?

আমিই তো বলছি। আর কে বলবে?

মিথ্যা কথা। তুই বলছিস না, বলছে তোর তারুণ্যের অবিমৃষ্যকারিতা। আর বলছে আমার বার্ধক্যের মূর্খতা,—জীবনে লক্ষ বার যার পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখনো নেহাতই একটা বাচ্চা কুকুর—অমন করে চিৎকার করার এখনো সময় হয়নি।

আগে আগে ফোমা তার ধর্মবাবার অলঙ্কারবহুল ভাষার ব্যবহারে থাকত চুপ করে। মায়াকিন ওর বাবার চাইতে ঢের বেশি রুক্ষকণ্ঠে কথা বলত ওর সঙ্গে। গাল পাড়ত। কিন্তু এবার তরুণ ফোমা দারুণ ক্রুদ্ধ হল মনে মনে। সংযত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলল ঃ অযথা গালাগাল করবেন না। বাচ্চা ছেলে নই আর আমি এখনো।

বটে! বটে!—ব্যঙ্গের ছলে চোখ কপালে তুলে ফোমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল মায়াকিন। আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল ফোমার অন্তর। পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রত্যেকটি কথায় জোর দিয়ে বলল ঃ

আমিও স্পষ্ট কথা জানিয়ে দিচ্ছি আপনাকে, এই ধরনের অসংযত গালাগাল শুনতে আমি আর রাজী নই। ঢের সহ্য করেছি।

হুঁ! আচ্ছা! বেশ, মাপ করো।

ইয়াকভ তারাশভিচ চোখ বুজল। ঠোঁট কামড়াল কিছুক্ষণ। তারপর ধর্ম-ছেলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চুপ করে বসে রইল। গাড়িটা একটা ছোট গলির ভিতর মোড় নিল। দূরে থেকে নিজেদের বাড়ির ছাদ নজরে পড়তেই নিজের অজ্ঞাতেই ফোমা সামনের দিকে একটু সরে এল। ঠিক সেই মুহূর্তে শয়তানীভরা নিরীহ ভালোমানুষের হাসি হেসে বলল মায়াকিন ঃ

হ্যাঁরে ফোমা, বল দেখি, দাঁতে ধার দিয়েছিস কার উপর? অ্যাঁ?

কেন বড্ডো ধারাল নাকি?—মায়াকিনের বর্তমান আচরণে মনে মনে খুশি হয়ে প্রত্যুত্তরে বলল ফোমা।

তা বেশ। ভালোই। খুব ভালো। তোর বাবার আর আমার ভয় ছিল পাছে তুই না মুখচোরা হোস। বেশ, বেশ, ভালো। ভদ্‌কা খেতে শুরু করেছিস নাকি?

করেছি।

বড্ডো তাড়াতাড়ি ধরেছিস। খুব বেশি খাস নাকি?

বেশি কেন খাবো?

খেতে ভালো লাগে?

খুব ভালো লাগে না।

তাই। যাকগে, ওটা তেমন কিছু খারাপ নয়। তবে দোষের মধ্যে এই যে, তুই বড্ডো খোলাখুলি বলে ফেলিস সব। যে-কোনো লোকের কাছে যা-কিছু খারাপ কাজ করিস তা বলে ফেলতে পারিস। কিন্তু তোর বুঝে দেখা উচিত যে এটা সব সময় ঠিক নয়। প্রয়োজনও নেই কিছু। সময়ে চুপ করে থেকে অন্যকে খুশি করতে পারিস আর তাতে পাপও হয় না। সত্যিকথা বলতে কি, মানুষের মুখে সব সময়ে আগল থাকে না। এই যে এসে গেছি আমরা। দেখ, তোর বাবা জানে না যে তুই এসেছিস। এখন বাড়ি আছে কী? কী জানি!

বাড়িতেই ছিল ইগনাত। খোলা জানলার পথে শোনা যাচ্ছিল তার হেঁড়ে গলার উচ্চহাসির শব্দ। গাড়ির শব্দ দোরের কাছে এসে থেমে যেতেই ইগনাত জানলার পথে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলের চোখে চোখ পড়তেই আনন্দে চিৎকার করে উঠল ঃ

অ্যাঁ। এসেছিস তুই! এসেছিস!

ক্ষণেক পরে এক হাতে ফোমাকে বুকে চেপে ধরে বাকি হাতখানা তার কপালের উপরে রেখে মাথাটা একটু পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর খুশিভরা গদগদ কণ্ঠে বলল ঃ

রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছিস। বেশ চমৎকার জোয়ান পুরুষ। ভদ্রে! কেমন দেখছেন আমার ছেলেকে? খুব সুন্দর নয়?

না, দেখতে খারাপ নয়।—বেজে উঠল শান্ত রুপোলী কণ্ঠের সুর।

বাবার কাঁধের পিছন থেকে উঁকি মেরে তাকাল ফোমা। দেখল, ক্ষীণাঙ্গী একটি নারী। চমৎকার সুন্দর চুল। সামনের দিকের কোণে টেবিলের উপরে

কনুইয়ের ভর রেখে বসে রয়েছে। গভীর দুটি চোখ, সরু ভ্রু-রেখা, রক্তিম রসাল দুটি ঠোঁট পাণ্ডুর মুখের উপরে অপরূপভাবে বিকশিত হয়ে রয়েছে। ওর চেয়ারের পিছনে একটা ফিলোডেনড্রন গাছ। বড়ো বড়ো চিত্রিত পাতাগুলো হাওয়ার ভারে ঝুলে পড়েছে তার সোনালী চুলেভরা ছোট্ট মাথাটির উপরে।

কেমন আছেন সোফিয়া পাভলোভনা?—কোমল সুরে বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল মায়াকিন।—কি ব্যাপার! এখনো কি আপনি আমাদের মতো গরিব-গুড়োর কাছে চাঁদা আদায় করে বেড়াচ্ছেন নাকি?

নীরবে ফোমা মহিলাটিকে অভিবাদন জানাল। মায়াকিনের কথার জবাবে সোফিয়া কী বলল, বা ওর বাবাই-বা কী বললেন ওকে, কিছুই ফোমার কানে ঢুকল না। অপলক দৃষ্টিতে মহিলা ফোমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নীরবে একটু হাসল—প্রশান্ত, স্নিগ্ধ, কোমল হাসি। শিশুর মতো কোমল তনুদেহ, পরনের কালো পোশাক যেন একাকার হয়ে মিশে গেছে চেয়ারের লাল রঙের সঙ্গে। অন্যদিকে কুঞ্চিত সোনালী চুল আর পাণ্ডুর মুখখানি যেন ফুটে রয়েছে কালো পটভূমিকার বুকে। কোণের ঐ গাঢ় সবুজ পাতার নিচে ওকে যুগপৎ মনে হচ্ছে যেন একটি প্রস্ফুটিত ফুল আর আইকন।

দেখছেন সোফিয়া পাভলোভনা, ও কেমন করে তাকাচ্ছে আপনার দিকে, যেন একটা বাজপাখি, কি বলেন? —বলল ইগনাত।

সোফিয়ার চোখদুটি কুঁচকে ছোট হয়ে এল। মৃদু সলজ্জ অরুণ আভা ফুটে উঠল ওর গালে। পরক্ষণেই হেসে উঠল—রুপোলী ঘণ্টার রিনরিনে সুর তুলে।

আমি আর আপনাদের সময় নষ্ট করব না, নমস্কার!

নীরব লঘু পায়ে ফোমার পাশ দিয়ে হেঁটে যেতেই ওর নাকে এসে লাগল মৃদু সুগন্ধ। দেখল ওর চোখদুটি ঘন নীল। ভ্রুদুটি কালো কুচ্‌কুচে।

পাজীটা সরে পড়ল—ওর গমন পথের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল মায়াকিন।

আচ্ছা, এখন বল দেখি কেমন হল? মেলাই টাকা নষ্ট করে এসেছিস নাকি? —মুহূর্তপূর্বে মেদিনস্কায়া যে চেয়ারটায় বসেছিল ছেলেকে সেই চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে হেঁড়ে গলায় প্রশ্ন করল ইগনাত। প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে ইগনাতের মুখের দিকে তাকিয়ে ফোমা অন্য একটা চেয়ারে উঠে এসে বসল।

খুব সুন্দরী তাই না? কী বলিস?—ধূর্ত চোখে ফোমার দিকে ইঙ্গিত করে মৃদু হেসে বলে উঠল মায়াকিন।—ওর দিকে যদি হা করে তাকিয়ে থাকিস তবে ও তোর ভিতরের সবকিছু গিলে খেয়ে নেবে।

কেন যেন ফোমার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। কিন্তু প্রত্যুত্তরে কিছু না বলে সাধারণভাবে বলতে আরম্ভ করল ওর ভ্রমণকাহিনী।

দাঁড়াও, আগে একটু কঞাক্‌ আনতে বলি।—ওকে বাধা দিয়ে বলে উঠল ইগনাত।

লোকে বলে, তুমি নাকি সবসময়েই মদ খেতে?—অসম্মতি প্রকাশের সুরে বলল ফোমা।

বিস্ময়মাখা উৎসুক দৃষ্টি মেলে ইগনাত ছেলের মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল ঃ

বাবার সঙ্গে বুঝি অমনি করে কথা বলতে হয়?

কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়ল ফোমা। মাথা নিচু করল।

তাই!—সদয় কণ্ঠে বলল ইগনাত। তারপর কঞাক্ আনতে হুকুম করল। চোখ মট্‌কে মায়াকিন পিতাপুত্রের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল, পরে ওদের সন্ধ্যের চায়ের নিমন্ত্রণ করে বিদায় নিল।

আনফিসা পিসি কোথায়?—প্রশ্ন করল ফোমা। বাবার সামনে একা একা কেমন যেন একটু অস্বস্তি লাগছে।

মঠে গেছে। আচ্ছা বলো এবার! কঞাক্ খেতে খেতে শুনি।

কয়েক মিনিটের ভিতরেই ফোমা কাজকর্ম সম্পর্কে সব কিছু কথা বলল। তারপর অকপট স্বীকৃতির ভিতর দিয়ে কাহিনী শেষ করল।

নিজের জন্যে কিন্তু অনেকগুলো টাকা খরচ করে ফেলেছি।

কত?

শ ছয়েক।

এই ছ' হপ্তার মধ্যে! না, কর্মচারী হিসাবে দেখছি তুমি আমার পক্ষে একটু বেশি খরচের! কোথায় ওড়ালে এতগুলো টাকা?

তিনশ' পুড্ গম দান করেছি।

কাকে? কোথায়?

সব কিছু খুলে বলল ফোমা।

হুঁ! তা বেশ। ওটা ঠিকই করেছ।—অনুমোদন করল ইগনাত।—এর ভিতর দিয়ে দেখানো হল কী ধাতের মানুষ আমরা। ওটা বেশ পরিষ্কার। বাবার সম্মানের জন্যে—প্রতিষ্ঠানের সম্মানের জন্যে। তাছাড়া, ওতে লোকসানও কিছু হয়নি। বরং সুনামই হয়। আর সেটাই হচ্ছে,—বুঝলে ব্যবসার পক্ষে ভালো সাইনবোর্ড। বেশ, তারপর?

তারপর আমি আরো কিছু খরচ করেছি।

বল! কিচ্ছু লুকোসনে—বল দেখি সব কিছু?

এই খেয়েছি-দেয়েছি।—স্বীকার করল না ফোমা। বিরস বদনে মাথা নিচু করে বসে রইল।

ভদ্‌কা খেয়েছিস?

ভদ্‌কাও।

হুঁ, তাই! কিন্তু, বড্ডো শিগ্‌গির শিগ্‌গির শুরু করলি না কী?

ইয়েফিমকে জিগ্‌গেস করো। মাতাল হয়ে পড়ার মতো করে কোনোদিন খেয়েছি কিনা?

কেন? ইয়েফিমকে জিগ্‌গেস করতে যাবো কেন? তোর মুখেই শুনতে চাই সবকিছু। তাহলে মদ খেতে শুরু করেছিস? এটা কিন্তু আমি পছন্দ করি না।

কিন্তু মদ না খেয়েও তো বেশ থাকতে পারি আমি।

আচ্ছা থাক, থাক। একটু কঞাক্ খাবি?

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে এক গাল হেসে ফেলল ফোমা। প্রত্যুত্তরে স্নেহ-মাখা হাসি হেসে ইগনাত ছেলের মুখের দিকে তাকাল।

হুঁ! শয়তান! আচ্ছা খা, খা! কিন্তু দেখিস ব্যবসাটা ভালো করে বুঝে নিস! কী আর করা যায়! যে মাতাল হয়, ঘুমিয়ে উঠলেই আবার তার মাথা ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু মূর্খের কোনোদিনই না। তোমার সান্ত্বনার জন্যেও কথাটা অন্তত আমাদের বোঝা দরকার। মেয়েদের সঙ্গেও খুব ফুর্তি-টুর্তি করে বেড়িয়েছিস বোধ হয়? সত্যি করে বল! মারধোর করব বলে ভয় পাচ্ছিস বুঝি?

হাঁ। ছিল একটি। তাকে আমি পের্‌ম্‌ থেকে কাজান পর্যন্ত নিয়ে যাই।

বটে!—দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল ইগনাত। তারপরে ভ্রূ কুঁচকে বলল : বড্ডো অল্প বয়সেই চরিত্র নষ্ট করলি।

আমার বয়েস এখন কুড়ি। তাছাড়া তুমি নিজেই তো বলেছ, তোমাদের কালে লোকে পনেরো বছরে বিয়ে করত।—সংকোচজড়িত কণ্ঠে প্রত্যুত্তরে বলল ফোমা।

তখন তারা করত বিয়ে। আচ্ছা থাক এ বিষয়ের আলোচনা। তাহলে একটা মেয়ের সঙ্গেও কারবার করেছ। কী আর হয়েছে তাতে? মেয়েমানুষ হল টিকে দেয়ার মতো। ওদের না হলে জীবন কাটানো যায় না। আমি লুকানো ছাপানোর ধার ধারি না। তোর চাইতে আরো কম বয়সেই আমি মেয়েদের পিছনে ঘুরেছি। কিন্তু ওদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবি।

ইগনাত চুপ করে গিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে বসে। মাথাটা ঝুলে পড়েছে বুকের উপর।

শোন ফোমা!—আবার দৃঢ়কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করল।—আমি আর বাঁচবো না বেশি দিন। বুড়ো হয়ে গেছি। তখন আমার সব কিছুই বর্তাবে তোকে। প্রথম প্রথম কিছুদিন তোর ধর্মবাপ তোকে সাহায্য করবে। ওর কথা শুনে চলিস। কী যেন একটা চেপে বসেছে আমার বুকের ভিতরে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। হাঁ, তোর আরম্ভটা বেশ ভালোই হয়েছে। খুব ভালো। ঠিক ঠিক ভাবেই করে এসেছিস সব কিছু। যদিও অনেকগুলো টাকা খরচ করে এসেছিস, তবুও বুদ্ধি হারাসনি। ভবিষ্যত যাত্রাপথে ঈশ্বর যেন এইটুকুই দান করেন তোকে। মনে রাখিস—ব্যবসা হচ্ছে একটা জ্যান্ত জানোয়ার। সবল হাতে ওকে বশে রাখতে হয়। শক্ত লাগামে আটকে রাখবি, নইলে তোকেই উলটে ফেলে দেবে। চেষ্টা করবি ব্যবসার উপরে পা রেখে দাঁড়াতে। এমনভাবে দাঁড়াবি যেন ব্যবসা-বাণিজ্য সব কিছু থাকে তোর পায়ের তলায়। যাতে প্রত্যেকটি কাঁটা থাকে তোর নখদর্পণে।

বাবার বিস্তৃত বিশাল বুকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ফোমা। শুনছে তাঁর গম্ভীর কণ্ঠের স্বর। আর ভাবছে.—না, কিছুতেই এত তাড়াতাড়ি তুমি পারবে না মরে যেতে! ভাবতে ভাবতে ওর অন্তর আনন্দে ভরে উঠল। সমস্ত অন্তর জুড়ে বাবার উপরে জেগে উঠল সুগভীর ভালোবাসা।

তোর ধর্মবাবার উপরে বিশ্বাস রাখিস। ওর এত বুদ্ধি আছে যে শহরের সমস্ত মানুষকে সুপরামর্শ দিতে পারে। কেবল ওর যা নেই তা হচ্ছে সাহস। নইলে দারুণ উন্নতি করতে পারত জীবনে। হাঁ সত্যি বলছি তোকে, দিন আমার ঘনিয়ে এসেছে। এখন পরপারের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। সব কিছুই সরিয়ে দিতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমার মৃত্যুর পরে লোকে যেন আমার সুনাম করে। সুখ্যাতি গায়।

নিশ্চয় করবে।—দৃঢ়কণ্ঠে বলল ফোমা।

যদি কোনো কারণ না থাকে তবে করবে কেন?

কেন ঐ বাড়িটা?

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ইগনাত হেসে উঠল।

ইয়াকভ ইতিমধ্যেই সে খবর দিয়েছে দেখছি! কিপ্‌টে বুড়ো! নিশ্চয়ই খুব গালমন্দ করেছে আমাকে?

তা একটু করেছে।—মৃদু হেসে বলল ফোমা।

নিশ্চয়ই করেছে। ওকে আমি চিনি না?

এমনভাবে বলছিল, যেন টাকাটা তার নিজেরই।

চেয়ারে পা এলিয়ে দিয়ে বসল ইগনাভ। তারপর জোরে জোরে হেসে উঠল :

বুড়ো দাঁড়কাক! কথাটা ঠিকই। টাকাটা ওরই হোক কি আমারই হোক, ওর কাছে দুই-ই সমান। ও তো কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে। একটা উদ্দেশ্য আছে ওর—ঐ টেকো বুড়োর। কী বল দেখি?

একটু ভাবল ফোমা, তারপর বলল : আমি জানি না।

দূর বোকা! ও চায় আমাদের ভাগ্য গুনতে।

কেমন করে?

এখন নিজেই আন্দাজ কর।

বাবার মুখের দিকে তাকাল ফোমা। বুঝতে পারল। মুহূর্তে ওর মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠল। তারপর চেয়ারের ভিতরে একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে দৃঢ়কণ্ঠে বলল :

না, আমি চাই না। আমি ওকে বিয়ে করব না।

বটে! কেন? বেশ স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। তাছাড়া বোকাও নয় মেয়েটি। এক-মাত্র সন্তান।

কেন তারাস? যে বকে গেছে? কিন্তু আমি আদৌ ওকে বিয়ে করতে চাই না।

যে চলে গেছে, সে গেছেই। তার কথা বলে এখন আর লাভ নেই। ও উইল করেছে, তাতে লিখেছে ওর যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর—সব কিছু সম্পত্তি বর্তাবে লিউবভের কাছে। তাছাড়া ও যখন তোর ধর্মবাবার মেয়ে—আমরা সম্বন্ধটা পাকা করে ফেলব।

সে একই কথা!—দৃঢ়কণ্ঠে বলল ফোমা,—কিছুতেই আমি ওকে বিয়ে করছি না।

আচ্ছা আচ্ছা থাক, এখনো ও কথা আলোচনা করবার সময় আসেনি। সে দেখা যাবে পরে। কিন্তু ওকে এত অপছন্দ করিস কেন তুই?

ওর মতো মেয়ে আমার ভালো লাগে না।

বটে! বোঝো একবার! কিন্তু কোন্ ধরনের মেয়ে আপনার পছন্দ মশাই, শুনতে পারি।

যারা আরো সাদাসিধে। ও সবসময়েই ওর স্কুলের বন্ধুবান্ধব আর বই কেতাব নিয়ে ব্যস্ত। আমাকে উপহাস করে—বিদ্রূপ করে।—আবেগভরা কণ্ঠে বলল ফোমা।

কথাটা অবশ্য ঠিক। মেয়েটা বড্ডো বেশি সাহসী। কিন্তু সেটা তেমন কিছু নয়। চেষ্টা করলে যে-কোনো মরচেই ঘসে তুলে ফেলা যায়। সে হল ভবিষ্যতের কথা। তাছাড়া তোর ধর্মবাপ বুদ্ধিমান লোক। ধীর, স্থির, শান্তিপ্রিয়। এক জায়গায় বসেই সে চিন্তা করতে পারে সব কিছু। ওর কথা শুনে চললে উপকার আছে। কারণ সংসারের সব কিছু বিষয়ের খারাপ দিকটা ওর নজরে পড়ে। ও হচ্ছে আমাদের বনেদী লোক—মা একাতেরিনার বংশধর,—হাঃ হাঃ হাঃ। নিজের ব্যাপারটা বেশ ভালোই বোঝে। তাছাড়া তারাসের দ্বারা যখন ওর বংশের মূলোচ্ছেদ হয়েই গেছে, ঠিক করেছে তোকে বসাবে তার জায়গায়। বুঝেছিস?

না। আমি আমার নিজের জায়গা নিজেই ঠিক করে নিতে পারব।—বলল ফোমা। ওর কণ্ঠে অনমনীয় সুর বেজে উঠল।

এখনো তোর কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি হয়নি।—ছেলের কথার জবাবে হেসে উঠল ইগনাত।

আনফিসা পিসি আসতেই ওদের আলোচনা বন্ধ হল।

ফোমা! এসেছিস তুই!—দোরের ওপাশ থেকেই চিৎকার করে বলে উঠলেন আনফিসা। স্নিগ্ধ হেসে উঠে দাঁড়াল ফোমা, তারপর এগিয়ে গেল পিসিমার কাছে।

আবার ফোমার জীবন বয়ে চলে একঘেয়ে শান্ত মন্থর গতিতে। আবার সেই ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্র—বাবার নির্দেশ উপদেশ। স্নেহভরা পরিহাস, একটু উৎসাহ-ব্যঞ্জক সুরে ইগনাত আর-একটু কড়া ব্যবহার শুরু করল ফোমার উপরে। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ের জন্যে গাল পাড়ে। প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সে ওকে মানুষ করে তুলেছে স্বাধীনভাবে। ওর কোনো কিছুতেই বাধা দেয়নি কোনোদিন। কিংবা মারধোরও করেনি কখনো।

অন্য বাপ হলে চ্যালা কাঠ দিয়ে পিটে তোর মতো ছেলেকে ঢিট করে দিত। আমি বলে আঙুলটি পর্যন্ত ছোঁয়াইনি তোর গায়ে কোনোদিন।

আমিও নিশ্চয়ই এমন কিছু করিনি কোনোদিন যাতে তুমি মারতে পারো?

ছেলের কথা বলার ভঙ্গিতে খেপে ওঠে ইগনাত।

দেখ, অত মুখ নাড়িসনে! কিছু বলি না তাই সাহস বেড়ে গেছে! সব কথায় মুখে মুখে জবাব দেয়া চাই, না? সাবধান! যদিও আমার হাতদুটো খুবই নরম তবুও এমন মুচড়ে দিতে পারি যাতে নাকের জলে চোখের জলে এক হয়ে যাবে। পায়ের তলায় গড়িয়ে নেমে আসবে চোখের জল। অল্প বয়সেই হেঁপাচির মতো লায়েক হয়ে উঠেছিস, না! গোল্লায় গেছিস এরই মধ্যে।

অত করে চটে যাও কেন আমার উপরে?—আহত ভারাক্রান্ত মনে প্রশ্ন করে ফোমা যখন ওর বাবা থাকে খুশি মনে।

কেন? তোর বাবা যখন বকে, তুই সেটা সহ্য করতে পারিস না বলে।

তুমি যে বড্ডো মনে আঘাত দিয়ে কথা বল। আগের চেয়ে আমি তো আর খারাপ হয়ে যাইনি! আমার বয়সী ছেলেদের চালচলন কেমন সে কি আর আমি দেখি না!

আচ্ছা বাবা যদি একটু বকেই তাতে তো আর তোর মুণ্ডুটা খসে পড়বে না। তাছাড়া তোকে বকি কেন জানিস, আমি দেখেছি তোর ভিতরে এমন একটা কিছু আছে যা আমার ভিতরে নেই। কিন্তু সেটা যে কী, তা আমি জানি না। অথচ দেখতে পাই। আর সেটা খুবই ক্ষতিকর তোর পক্ষে।

ইগনাতের কথা ফোমাকে কেমন যেন চিন্তিত করে তুলল। ফোমা নিজেও কী যেন একটা অদ্ভুত বস্তু অনুভব করে তার নিজের ভিতরে, যা নাকি ওর বয়সী ছেলেদের চাইতে ওকে রাখে তফাত করে। কিন্তু কী সেটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। কেমন যেন সন্দেহভরা দৃষ্টিতে ফোমা নিজের দিকে তাকায়।

বিনিময় কেন্দ্রে গম্ভীর প্রকৃতির লোকেদের কল-কোলাহলের ভিতরে গিয়ে খুবই আনন্দ পায় ফোমা। হাজার হাজার টাকার কেনা-বেচা করে। অপেক্ষাকৃত কম ধনী ব্যবসায়ীরা লক্ষপতির ছেলে ফোমাকে যেভাবে নমস্কার করে, সমীহ করে কথা বলে তাতে মনে মনে দারুণ খুশি হয়ে ওঠে ফোমা। বাবার কোনো একটা কারবারের সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে যখন সাফল্যের সঙ্গে সেটা সম্পন্ন করে আসে আর বিনিময়ে

বাবার কাছ থেকে পায় পরিপূর্ণ অনুমোদন, গর্বে আনন্দে বুক ভরে ওঠে ফোমার। দারুণ একটা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা রয়েছে ওর অন্তরে। কিন্তু আগের বারের পের্‌ম্‌-এ যাবার সময়ের মতোই ও থাকে চুপচাপ—নিজের একাকিত্বের গণ্ডীর ভিতরে আত্মসমাহিত হয়ে। আজও ওর অন্তরে জেগে ওঠেনি কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করার স্পৃহা। যদিও ইদানিং আসতে হচ্ছে ওকে ওরই বয়সী ব্যবসায়ীর ছেলেদের সংস্পর্শে। তারা বহুবার ওকে নিমন্ত্রণ করেছে তাদের পানোৎসব ও আমোদ-প্রমোদের সঙ্গী হতে। কিন্তু ঘৃণাভরা কঠিন সুরেই ফোমা করেছে প্রত্যাখ্যান। এমন-কি বিদ্রূপ করেছে তাদের।

আমার বাপু ভয় করে। তোমাদের বাবারা হয়তো জেনে ফেলবেন তোমাদের ঐ পানোৎসবের খবর। তারপর গাল পাড়বেন। আর আমাকেও তার ভাগী হতে হবে।

ওদের ভিতরে সব চাইতে যে জিনিসটা অপছন্দ করে সেটা হচ্ছে বাবাদের চোখের আড়ালে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করা। আর তার জন্যে যে টাকা ওড়ায় তা আসে হয় বাপের পকেট থেকে চুরি করে, নয় তো চড়া সুদে দীর্ঘমেয়াদী দেনা করে।

ফোমার এই গাম্ভীর্য, এই স্ফূর্তিবিমুখতাকে ওরা মনে করে অহংকার। আর সেটাই ওদের বেশি করে আহত করে। তাই ওরা কেউ ওকে পছন্দ করে না। বয়স্ক লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেও ভয় করে ফোমা, পাছে কেউ মনে করে বোকা, নিরেট।

ওর প্রায়ই মনে পড়ে পেলাগিয়ার কথা। প্রথম প্রথম তার প্রতিচ্ছবি কল্পনায় ভেসে উঠতেই ওর অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। কিন্তু যতই সময় বয়ে যেতে লাগল, ধীরে ঐ নারীর ঔজ্জ্বল্য—তার বর্ণ-সমারোহ যেন মুছে যেতে লাগল। কিন্তু এ-সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন হওয়ার আগেই মেদিনস্কায়ার অপ্সরীর মতো ক্ষীণ তনু-শ্রী ওর মনকে ভরিয়ে তুলল। কোনো-না-কোনো অনুরোধ উপরোধ নিয়ে প্রায় প্রত্যেক রবিবারেই সে আসত ইগনাতের কাছে। আর সে সবের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকত ধর্মশালা তৈরির কাজটা যাতে তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলা যায়। তার সামনে ফোমার নিজেকে মনে হত কেমন যেন উজবুক—অসাড় ভারি মনে হত দেহ মন। সোফিয়া মেদিনস্কায়ার আয়ত দুটি চোখের অসঙ্কোচ দৃষ্টির সামনে তাই সে ঘেমে উঠত। দারুণ সংকুচিত হয়ে পড়ত। লক্ষ্য করেছে ফোমা যখনই সে তাকায় ওর দিকে তার চোখের মণিদুটো যেন আরো কালো আরো গভীর হয়ে ওঠে। ঠোঁটটা কাঁপতে কাঁপতে উপরের দিকে উঠে যায়। ফলে তার ছোট ছোট ধবধবে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ে। ওকে অমন করে পলকহীন স্থিরদৃষ্টিতে মেদিনস্কায়ার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে একদিন ওর বাবা বলল :

ওর মুখের দিকে অমন করে তাকিয়ে থাকিস না। ও হচ্ছে বার্চের আঠার মতো। বাইরে থেকে দেখবে নম্র, মসৃণ, বিষাদময়। সব মিলে মনে হবে ঠাণ্ডা শান্ত চেহারার নিরীহ মানুষ। কিন্তু হাতে তুলে নাও, তোমাকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে।

মেদিনস্কায়া ফোমার অন্তরে জাগিয়ে তোলে না কামনার বহ্নিশিখা। কারণ এমন কিছু নেই তার ভিতরে যার কোনো সাদৃশ্য মেলে পেলাগিয়ার সঙ্গে। তাছাড়া সব কিছু মিলে অন্য নারীর সঙ্গে ওর রয়েছে অনেক প্রভেদ। ফোমা জানে, বহু জনশ্রুতি রয়েছে মেদিনস্কায়ার সম্পর্কে—বহু কুৎসিত গুজব, কানাঘুসা। কিন্তু

তার সম্পর্কে ওর অন্তরের গোপন মনোভাবের হল পরিবর্তন। যেদিন দেখল খয়েরি রঙের টুপির ভিতর থেকে কাঁধ পর্যন্ত নেমে-আসা লম্বা-চুল মোটা এক ভদ্রলোকের পাশে বসে রয়েছে মেদিনস্কায়া গাড়ির ভিতরে। ভদ্রলোকের মুখটা লাল—বেলুনের মতো। লেপা-পোছা। দাড়ি-গোঁফ নেই মুখে। সব মিলে মনে হচ্ছে যেন পুরুষের ছদ্মবেশে একটি স্ত্রীলোক। ফোমা শুনল ঐ লোকটিই হচ্ছে মেদিনস্কায়ার স্বামী। কেমন যেন বিক্ষোভভরা একটা বিদ্বেষের ভাব জেগে উঠল ওর মনে। ইচ্ছে হল ঐ লোকটাকে অপমান করে। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি এক নিদারুণ ঈর্ষাভরা সম্ভ্রমে পূর্ণ হয়ে উঠল অন্তর। মেদিনস্কায়াকে মনে হল তেমন সুন্দরী নয়। তেমন সঙ্কোচ নেই আর ওর কাছে যেতে। ওর দুঃখ হল মেদিনস্কায়ার জন্য। আর নিদারুণ বিদ্বেষের সঙ্গে ভাবতে লাগল—ঐ লোকটা যখন ওকে চুমু খায়, নিশ্চয়ই বিরক্তি অনুভব করে মেদিনস্কায়া। কিন্তু এর পরেও এক অতল চাপা শূন্যতায় ফাঁকা হয়ে ওঠে ফোমার মন। কিছু দিয়েই পারে না সে ফাঁক ভরাট করতে। না সমস্ত দিনের কাজকর্মের চিন্তায়, না অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে। বিনিময় কেন্দ্র, কাজকর্ম, মেদিনস্কায়ার চিন্তা সব কিছুই যেন ঐ বিরাট শূন্যতা গ্রাস করে ফেলে। কেঁদে ওঠে ওর অন্তর ঐ সীমাহীন অতল শূন্যতার নিকষ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে। কী যেন এক বিরুদ্ধ শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করে। যদিও এখনো সেটা নিরাকার, কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই যেন মূর্ত হয়ে ওঠার চেষ্টায় একান্ত সতর্কতার সঙ্গে করে চলেছে সংগ্রাম।

ইতিমধ্যে বাইরে থেকে তেমন পরিবর্তন খুব সামান্য হলেও আরো যেন অস্থির আরো যেন খিটখিটে হয়ে উঠেছে ইগনাত। প্রায়ই নিজের অসুস্থতার কথা বলে অভিযোগ করে :

ঘুম উবে গেছে। . আমার ঘুম ছিল এমন গভীর যে গায়ের চামড়া ছিঁড়ে নিলেও আমি টের পেতাম না। আর এখন সারা রাত বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট্ করি। হয়তো ভোরের দিকে একটু চোখ বুজে আসে। তাও একটুতেই ভেঙে যায়। হৃদ্‌পিণ্ডের গতি অসমান—যেন দারুণ ক্লান্ত। প্রায়ই এমনি হয়—টাক্, টাক্, টাক্! তারপর কখনো কখনো থেমে যায়। তখন মনে হয় যেন এক্ষুনি ছিঁড়ে পড়বে আপনা থেকে। তারপর কোন্ অতলে যাবে তলিয়ে। বুকের ভিতরে। হা ঈশ্বর! কৃপা করো—অপার করুণায়!

তারপর কঠিন রোগীর মতো একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে মুখটা উপরের দিকে তুলে আকাশপানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখদুটো আপনা থেকেই নিষ্প্রভ হয়ে আসে। উজ্জ্বল দীপ্তিভরা চোখের আলো যায় নিভে।

মৃত্যু কোথায় যেন খুব কাছেই দাঁড়িয়ে ওঁত পেতে আছে।—বিষাদভরা কণ্ঠে বলল ইগনাত। তারপর সত্যসত্যই একদিন তার ঐ বিশাল দেহটা আছড়ে ফেলে দিল মাটির উপরে।

শরতের এক সকাল। ফোমা তখনো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ ওর মনে হল কে যেন কাঁধ ধরে জোরে নাড়া দিচ্ছে। আর একটা শুকনো কর্কশ কণ্ঠস্বর বাজছে ওর কানে :

ওঠ! ওঠ!

ফোমা চোখ মেলে তাকাল। দেখল ওর বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসে ওর বাবা একঘেয়ে শুকনো গলায় ওর কানের কাছে বলে চলেছেন : ওঠ! ওঠ!

সবেমাত্র সূর্য উঠেছে। ইগনাতের শাদা জামার উপরে পড়েছে তরুণ আলোর

রেখা। এখনো বিলীন হয়ে যায়নি সে আলোর গোলাপী আমেজ।
এখনো ভোর হয়নি।—হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে পাশ ফিরে শুল ফোমা।
পরে অনেক সময় পাবি ঘুমোবার—এখন ওঠ।
কম্বলের ভিতরে নড়েচড়ে আলস্যজড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করল ফোমা ঃ
এত ভোরে আবার কী দরকার পড়ল আমাকে?
ওরে ওঠ, ওঠ লক্ষ্মীটি ওঠ!—বলল ইগনাত। কণ্ঠে কেমন যেন একটু আহত অভিমানের সুর।—যখন আমি ডাকছি তোকে তখন নিশ্চয়ই কোনো জরুরী দরকার আছে।
চোখ খুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে বাবার মুখের দিকে তাকাতেই ফোমা দেখল নিদারুণ ক্লান্তির ছায়া নেমে এসেছে তার মুখখানা ছেয়ে।
অসুখ করেছে তোমার?
একটু।
ডাক্তারকে ডেকে পাঠাবো?
জাহান্নামে যাক ডাক্তার!—হাত নাড়ল ইগনাত। আমি আর তরুণ নই, ডাক্তার ছাড়াও বুঝতে পারছি।
কী?
আঃ! জানি আমি। কে যেন বলে দিচ্ছে আমাকে। এখন যদি একটা জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ি, আমার হৃদপিণ্ডটা ফেটে যাবে। আজ রবিবার। সকালের প্রার্থনার পরে একজন পুরুত ডেকে পাঠাস।
কী বলছ তুমি বাবা?—মৃদু হাসল ফোমা।
কিছু না। তুই উঠে হাতমুখ ধুয়ে বাগানে আয়। ওখানে সামোভার দিতে বলে দিয়েছি। ভোরের ঠাণ্ডায় বসে আজ আমরা চা খাবো। এক কাপ কড়া গরম চা খেতে ইচ্ছে করছে। জলদি কর!
অতি কষ্টে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বৃদ্ধ। খালি পা। কুঁজো হয়ে পা টানতে টানতে চলে গেল ঘর ছেড়ে। বাবার দিকে তাকিয়ে দেখল ফোমা। কেমন যেন এক জেগে-ওঠা শৈত্যময়তায় কেঁপে উঠল অন্তর। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে দ্রুতপায়ে বাগানে চলে এল।
বাগানে বড়ো একটা আতা গাছের তলায় বিরাট একটা চেয়ারে বসে রয়েছে ইগনাত। পাতার ফাঁকে ফাঁকে নৈশ-বাস-পরা বৃদ্ধের শাদা পোশাকের উপরে পড়েছে সূর্যের কিরণরেখা। বাগানে এমন একটা নিঃশব্দ নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে যে হঠাৎ গাছের ডালে ফোমার পোশাক লেগে একটু শব্দ হতেই মনে হল যেন বিরাট একটা শব্দ। সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠল ইগনাত। ওর বাবার সামনে টেবিলের উপরে সামোভার—সযত্নলালিত মোটা বেড়ালের মতো ঘড় ঘড় করছে। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে ফুটন্ত জলের বাষ্প-রেণু। বিগত দিনের বর্ষা-ধোয়া বাগানের মৌন প্রশান্তির ভিতরে পিতলের ঐ শব্দমান চাকচিক্য ফোমার মনে হল যেন একান্ত অনাবশ্যক। স্থান ও কালের অনুপযোগী। কিংবা এই মুহূর্তে শাদা পোশাক-পরা ঐ রুগ্ন কুব্জ বৃদ্ধ লাল-আতা-উঁকিমারা মৌন অচঞ্চল ঐ গাঢ় সবুজ পত্র-শাখার নিচে রয়েছে বসে—তার দিকে তাকিয়ে ওর অন্তরে জেগে উঠেছে যে-ভাব তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।
বোস্।—বলল ইগনাত।
একজন ডাক্তার ডাকা দরকার।—ইগনাতের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে একটু

ইতস্তত করে বলল ফোমা।

দরকার নেই। খোলা হাওয়ায় একটু ভালোই মনে হচ্ছে। এখন এক কাপ চা খেলেই বোধ হয় উপকার হবে।—গ্লাসে চা ঢালতে ঢালতে বলল ইগনাত। ফোমা দেখল চায়ের পাত্রটা ওর বাবার হাতের ভিতরে কাঁপছে।

চা খা!

নীরবে একটা গ্লাস টেনে নিয়ে ফোমা উপরের ফেনায় ফুঁ দিতে দিতে শুনতে লাগল বাবার ভারি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। ওর অন্তর ব্যথায় মুচড়ে উঠল। হঠাৎ কী যেন একটা খুব জোরে এসে পড়ল টেবিলের উপরে। থালা-প্লেটগুলো বেজে উঠল ঝন্ ঝন্ করে। চমকে উঠে মুখ তুলে বাবার মুখের দিকে তাকাতেই ফোমা দেখল, বাবার চোখের দৃষ্টি ভীত সন্ত্রস্ত—প্রায় জ্ঞানশূন্য। ছেলের দিকে তাকিয়ে ইগনাত শুকনো অস্ফুট কণ্ঠে বলল :

একটা আতা পড়েছে—জাহান্নামে যাক! কামান দাগার মতো আওয়াজ হল।

চায়ের সঙ্গে একটু কঞাক্ খাবে?

না, এমনিই ভালো।

দুজনেই নীরব হয়ে রইল। কিচিরমিচির শব্দে আকাশ বাতাস মুখরিত করে বাগানের উপর দিয়ে এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল।

আবার বাগানের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ডুবে গেল স্তব্ধ মৌনতায়। ইগনাতের চোখে তখনো ভয়ের ছায়া।

হে প্রভু! যীশুখৃষ্ট!—ক্রুশচিহ্ন এঁকে অস্ফুট নিচু কণ্ঠে বলল ইগনাত। হ্যাঁ, ঠিক। আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত উপস্থিত।

চুপ করো বাবা।—ফিস্ ফিস্ করে বলল ফোমা।

কেন চুপ করব? আমরা চা খাবো। চা খেয়ে পুরুত আর মায়াকিনকে ডাকতে পাঠা।

এক্ষুনি পাঠাচ্ছি।

এক্ষুনি প্রার্থনার ঘণ্টা বেজে উঠবে। পুরুত এখন বাড়িতে নেই। তাছাড়া অত তাড়াতাড়ি নেই। এটা এখনি কেটে যাবে।

তারপর ইগনাত সসারে ঢালা চায়ের দিকে হাত বাড়াল।

হয়তো আর দু'এক বছর বাঁচব। তোর বয়েস অল্প। তাই তোকে আমার ভয়। সৎভাবে দৃঢ়চিত্তে থাকবি। কখনো অন্যের জিনিসে লোভ করিসনে। আর নিজের জিনিসও সযত্নে রক্ষা করিস।

কথা বলতে দারুণ কষ্ট হচ্ছিল ইগনাতের। একটু থেমে হাত দিয়ে বুকটা ডলতে লাগল।

অন্যের উপরে কখনো ভরসা করিস না। লোকের কাছে আশা করিস খুবই সামান্য। আমরা মানুষ—মানুষ নিতেই চায়, দিতে কেউ চায় না। হে ঈশ্বর! পাপীর উপরে করুণা করো!

দূরে বেজে উঠল ঘণ্টাধ্বনি প্রত্যুষের নির্মল নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে। ইগনাত আর ফোমা তিনবার করে ক্রুশ করল।

প্রথম বেজে-ওঠা ঘণ্টার ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই বেজে উঠল দ্বিতীয় ঘণ্টার ধ্বনি। তারপর তৃতীয়। অনতিবিলম্বেই আকাশবাতাস মুখরিত করে চতুর্দিক থেকে প্রবহমান তালে তালে বেজে উঠল গির্জার আহ্বান।

প্রার্থনার জন্যে ডাকছে সবাইকে।—কান পেতে বিলীয়মান ঘণ্টার প্রতিধ্বনি

শুনতে শুনতে বলল ইগনাত।—শব্দ শুনে বলতে পারিস কোন্‌টা কোন্‌ গির্জার?

না।—প্রত্যুত্তরে বলল ফোমা।

শোন, ঐযে, এখন যেটা বাজছে—শুনতে পাচ্ছিস, ওটা নিকোলা গির্জার। ঐ ঘণ্টাটা উপহার দিয়েছিল পিতর মিত্রিচ ভিয়াগিন। আর এই যেটার সুর কর্কশ ওটা দিয়েছে প্রাস্‌কোভিয়া পিয়াৎনিৎসা।

ঘণ্টার সঙ্গীতমুখর ধ্বনি-তরঙ্গ বাতাস বিক্ষুব্ধ করে তুলল। তারপর নীল আকাশের বুকে বিলীন হয়ে গেল।

চিন্তিত মুখে ফোমা বাবার মুখের দিকে তাকাল। দেখল, ইতিপূর্বে জেগে-ওঠা ভয়ের ছায়া বিলীন হয়ে গেছে। মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু হঠাৎ বৃদ্ধের মুখখানা রক্তিম হয়ে উঠল। চোখদুটো দূরের পানে নিবদ্ধ। ঘুরছে। যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে গর্তের ভিতর থেকে। আতঙ্কে মুখখানা হা হয়ে গেছে। ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে একটা হিস্‌ হিস শব্দ।

ফ্যা-এ-এ-চ্‌......

মুহূর্তে ইগনাতের মাথাটা পিছনের দিকে ঝুলে পড়ল। ভারি দেহটা ধীরে গড়িয়ে পড়ল মাটির উপরে। যেন পৃথিবী রাজোচিত অভ্যর্থনায় টেনে নিল তার কোলে।

ক্ষণেকের জন্যে ফোমা কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে গেল। পরক্ষণেই লাফিয়ে এসে ইগনাতের পাশে দাঁড়িয়ে দুহাতে তার মাথাটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে মুখের দিকে তাকাল। গাঢ় অন্ধকারে মলিন হয়ে গেছে মুখ—স্থির নিশ্চল। বিস্ফারিত চোখে নেই কোনো ব্যঞ্জনা। ব্যথা, ভয়, আনন্দ কোনো কিছুরই নেই কোনো অভিব্যক্তি।

অসহায় দৃষ্টি মেলে চারদিকে তাকাল ফোমা। জনমানবের চিহ্ন মাত্র নেই কোথাও। কেবল গির্জার ঘণ্টাধ্বনি তেমনি প্রতিধ্বনি তুলে ফিরছে গুমরে গুমরে। ফোমার হাতদুটো কেঁপে উঠল। বাবার মাথাটা হাত থেকে সজোরে পড়ে গেল মাটির উপর। খোলা মুখের নীল-হয়ে-ওঠা গালের উপর সূক্ষ্ম রেখায় গড়িয়ে নেমে এল কাল্‌চে রক্তের ধারা। মৃতদেহের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ফোমা দুহাতে বুক চাপড়ে উচ্চৈস্বরে কেঁদে উঠল। ভয়ে ওর সর্বাঙ্গ কাঁপছে। পাগলের মতো রক্তাক্ত চোখ মেলে খুঁজছে কাউকে।

৪

বাবার মৃত্যু ফোমাকে কেমন যেন অসাড় করে ফেলল। ওর অন্তর জুড়ে জেগে উঠল এক অদ্ভুত অনুভূতি। জীবনের সমস্ত মুখরতা আচ্ছন্ন করে নেমে এল নিস্তব্ধতা—অনড়, বেদনাময়।

পরিচিত বন্ধুবান্ধবেরা ওকে ঘিরে জমিয়ে তুলেছে ভিড়। তারা আসে, চলে যায়। কী যেন বলে। প্রত্যুত্তরে ফোমাও বলে দু'চার কথা—অর্থহীন, খাপছাড়া। ওদের কথা, ওদের সান্ত্বনা কোনো প্রতিচ্ছবিই জাগিয়ে তোলে না ওর মনে। অন্তর আচ্ছন্ন করে নেমে-আসা মৃত্যুর মতো সেই শান্ত নিস্তব্ধতার অতল আবর্তে তলিয়ে যায় সব। ফোমা কাঁদে না। করে না শোকার্ত বিলাপ। ভাবেও না কোনো কিছু। বিষাদময় শীর্ণ মুখে ভ্রূ কুঁচকে ঐ নিথর নিস্তব্ধতায় কান পেতে থাকে। যা নাকি ওর সমস্ত অনুভূতি নিয়েছে নিঙড়ে, নিঃশেষ করে। অসাড় করে দিয়েছে ওর অন্তর। কঠিন শক্ত মুঠোয় চেপে ধরেছে মস্তিষ্ক। কিন্তু অবলুপ্ত হয়ে যায়নি ওর চেতনা কেমন যেন নিছকই একটা দৈহিক অনুভূতি—বোঝার মতো ভারি অনুভূতি—ওর বুকখানা জুড়ে চেপে বসে আছে। ফোমার মনে হচ্ছে তখনো রয়েছে কাক-ডাকা ভোরের সেই আধো-অন্ধকার। যদিও বেলা তখন অনেক। সমস্ত পৃথিবীর সব কিছুর গায়েই যেন জড়িয়ে রয়েছে অন্ধকার, জড়িয়ে রয়েছে এক বিষণ্ণ বিষাদময়তা।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যা-কিছু ব্যবস্থা, করছে মায়াকিন। দারুণ ব্যস্ততায় ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর জুতার গোড়ালির শব্দে বিক্ষুব্ধ হচ্ছে নিস্তব্ধতা। কখনো গাল পাড়ছে চাকরবাকরদের। কখনো ফোমার কাঁধে হাত রেখে দিচ্ছে সান্ত্বনা।

এমন পাথরের মতো হয়ে রয়েছিস কেন? কাঁদ—একটু কাঁদ, তাহলেই হালকা লাগবে'খন। বাবা বুড়ো হয়েছিল—হাঁ অনেক বয়েস হয়েছিল। সবাই একদিন মরবে। তাকে কেউ-ই এড়াতে পারবে না। তা বলে আগে থেকেই এমন ভেঙে পড়লে তো চলবে না! যতই দুঃখ হোক, ওকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবি না। তোর দুঃখ, তোর শোক এখন ওর কাছে মূল্যহীন—নিরর্থক। ঐ যে বলেঃ ভীষণদর্শন দেবদূতেরা যখন দেহের ভিতর থেকে আত্মাটাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, আত্মা ভুলে যায় পার্থিব সমস্ত আত্মজনের কথা। তার মানে তুই আর এখন ওর কেউ নোস। যতই কাঁদো আর হাসো। কিন্তু যারা জীবিত তারা ভাববে তাদেরই কথা যারা বেঁচে আছে। একটু বরং কাঁদ—সেটাই এখন স্বাভাবিক। তাতে শোকের উপশম হয়—বুকটা হালকা হয়ে যায়।

কিন্তু কোনো কথাই ফোমার মস্তিষ্কে বা অন্তরে কোনো রেখাপাত করে না। অবশেষে ওর ধর্মবাপের ক্রমাগত চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন বিষাদ-ক্লিষ্ট ফোমা কিছুটা আত্মস্থ হল।

অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ার দিন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বিষাদময়। ধুলোর ঘন মেঘের ভিতর দিয়ে কালো ফিতের বুনুনির মতো জনতার এক বিরাট মিছিল চলেছে ইগনাত গরুদিয়েফের কফিনের পিছনে। সোনার কাজ-করা পুরুতের পোশাক ঝলমল করছে। মিছিলের পায়ের অস্পষ্ট মৃদু শব্দ, বিশপের গায়ক-সম্প্রদায়ের উপাসনা-গানের গম্ভীর সুরের সঙ্গে মিশে সৃষ্টি করেছে এক অদ্ভুত ঝংকার। পাশ থেকে পিছন থেকে ধাক্কা লাগছে ফোমার গায়ে। হেঁটে চলেছে ফোমা। কেবলমাত্র ওর বাবার ধূসর মাথাটা ছাড়া আর কিছুই ওর চোখে পড়ছে না। শোক-সংগীতের সুর ওর অন্তরে জাগিয়ে তুলছে বেদনাময় প্রতিধ্বনি। পাশে পাশে চলতে চলতে মায়াকিন ক্রমাগত ফিস্‌ফিস্‌ করে ওর কানে কানে বলে চলেছে :

দেখছিস কী বিরাট জনতা! হাজারখানেক লোক হবে। গভর্নর নিজে এসেছেন তোর বাবার দেহ গির্জেয় পৌঁছে দিতে। এসেছেন মেয়র আর শহরের সব গণ্যমান্য মন্ত্রী-উপমন্ত্রীরা। আর ঐ তোর পিছনে তাকিয়ে দেখ, চলেছে সোফিয়া মেদিনস্কায়া পাভলোভ্‌না। গোটা শহর ভেঙে পড়েছে ইগনাতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে।

প্রথমটায় ফোমা ওর ধর্মবাবার কথায় তেমন কান দেয়নি। কিন্তু যেইমাত্র মেদিনস্কায়ার নাম করল সঙ্গে সঙ্গেই ফোমা মুখ ফিরিয়ে পিছনের দিকে তাকাল। তাকাতেই গভর্নরের সঙ্গে ওর চোখাচোখি হয়ে গেল। কাঁধে চক্‌চকে ফিতা আঁটা, বুকে ঝোলানো সম্মানের পদক—এই বিশিষ্ট লোকটির দিকে দৃষ্টি পড়তেই কেমন যেন একবিন্দু শান্তিবারি ঝরে পড়ল ফোমার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে। মৃত-দেহের পিছে পিছে চলেছেন তিনি পায়ে হেঁটে। কঠিন মুখাবয়ব ঘিরে নেমে এসেছে বিষাদের ছায়া।

যে পথের উপর দিয়ে আজ ঐ পুণ্যাত্মা চলে যাচ্ছেন সে পথ ধন্য।—নাক নেড়ে গুন্‌গুন্‌ করে বলে উঠল ইয়াকভ তারাশভিচ। পরক্ষণেই আবার ফোমার কানের কাছে মুখ এনে বলতে লাগল :

পঁচাত্তর হাজার টাকা এমন একটা বিরাট অঙ্ক যাতে শবানুগামী হিসাবে এমন একটা বিরাট জনতা আশা করা যায়। শুনেছিস, পনেরো তারিখ ভিত্তি স্থাপনের ব্যবস্থা সব ঠিক করে ফেলেছে সোন্‌কা? তোর বাবার মৃত্যুর ঠিক চল্লিশ দিন পরে।

আবার ফোমা মুখ ফিরিয়ে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গেই মেদিনস্কায়ার সঙ্গে ওর চোখাচোখি হয়ে গেল। মেদিনস্কায়ার স্নিগ্ধ দৃষ্টির আলিঙ্গনে ফোমার বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস। আর সঙ্গে সঙ্গেই যেন ওর বুকখানা হালকা হয়ে গেল। যেন এক উত্তপ্ত আলোর কিরণরেখা ওর অন্তরের অন্তস্তলে অনুপ্রবেশ করে কী যেন একটা জমাট-বাঁধা বস্তুকে গলিয়ে দিতে লাগল। পরক্ষণেই ওর খেয়াল হল অমন করে এদিক-ওদিক মুখ ফিরিয়ে তাকানোটা আদৌ সমীচীন নয়।

গির্জায় পৌঁছে ফোমার মাথা ব্যথা করতে লাগল। মনে হল ওর চারদিকের আর পায়ের তলার সব কিছুই যেন ঘুরছে। ধুলোর, ভিড়ের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে আর ধূপ-ধুনোর ধোঁয়ায় ভারি-হয়ে-ওঠা বাতাসে মোমবাতির ক্ষীণ শিখা ভীরুতায় কাঁপছে। বিরাট আইকনের উপরে যীশুর শান্ত নম্র প্রতিমূর্তি যেন চোখ নিচু করে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। ত্রাণকর্তার মাথার সোনার মুকুটে মোমবাতির আলোর শিখা প্রতিফলিত হয়ে রক্তের ফোঁটার কথা জাগিয়ে তুলছে ওর মনে।

ফোমার জাগ্রত আত্মা পরম লুব্ধতায় গিলে চলেছে উপাসনার গম্ভীর বিষাদময় কাব্যগাথা। তারপর যখন এল সেই মর্মস্পর্শী আহ্বান :

"এসো সবাই আমরা শেষবারের মতো ওকে চুম্বন করি।"—ফোমার বুকের ভিতর থেকে একটা শোকার্ত কান্নার বেগ সশব্দে ফেটে বেরিয়ে এল। গির্জার প্রাঙ্গনের সমবেত জনতা ওর এই শোকার্ত কান্নায় দারুণ বিচলিত হয়ে পড়ল।

কেঁদে উঠে ফোমা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই মায়াকিন ওর হাতখানা ধরে ফেলল। তারপর উচ্চকণ্ঠে গান করতে করতে ওকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে সামনে কফিনের কাছে এগিয়ে নিয়ে চলল। একটু বিরক্তির সুরেই বলে উঠল :

এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে যে ছিল তাকে চুম্বন করো। পাথর-ঢাকা কবরের ভিতরে এক্ষুনি তাকে করা হবে সমাধিস্থ। সমাধিস্থ হয়ে মৃত আত্মাদের সঙ্গে বাস করতে চলেছে সে অন্ধকারের রাজ্যে।

বাবার কপালের উপরে একটা চুম্বন করল ফোমা। পরক্ষণেই নিদারুণ ভয়ে কফিনের কাছ থেকে ছিট্‌কে দূরে সরে এল।

স্থির হও! আর একটু হলেই আমাকে ফেলে দিয়েছিলে আর কি!—ধীর অনুচ্চ কণ্ঠে বলল মায়াকিন। ঐ সহজ সরল কথা ক'টি যেন ফোমাকে তার ধর্ম-বাপের হাতের চাইতে বেশি অবলম্বন দিল।

"বন্ধুগণ, তোমরা যারা আমাকে দেখছ তোমাদের সামনে নীরব নিষ্প্রাণ—আমার জন্যে দু'ফোঁটা অশ্রুপাত করো!"—গির্জার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল ইগনাতের করুণ মিনতি। কিন্তু তার ছেলে আর কাঁদছে না। কালো হয়ে ফুলে-ওঠা বাবার মুখের দিকে চেয়ে তাকিয়ে ফোমার অন্তরে জেগে উঠল ভয়। আর সেই ভয় ওর অন্তরে এনে দিল স্থৈর্য।

ওকে ঘিরে রয়েছে পরিচিত বন্ধুবান্ধবের দল। সদয় সহৃদয়তায় দিচ্ছে সান্ত্বনা। ফোমা শুনছে ওদের কথা। বুঝতে পারছে, সবাই ওর দুঃখে দুঃখিত। সবার কাছেই ও হয়ে উঠেছে প্রিয়। হয়ে উঠেছে আপনার জন। তাই ওর ধর্মবাপ যখন এসে ওর কানে কানে বলল,—"দেখেছিস সবাই কেমন তোর উপরে মায়া দেখাচ্ছে! ধেড়ে বেড়াল যেন মাছের গন্ধ পেয়েছে!"

কথাগুলো খুবই বিশ্রী মনে হল ফোমার। বিরক্তি জাগিয়ে তুলল। কিন্তু তবুও মনে হল প্রয়োজনীয়, প্রাসঙ্গিক। যেন ঐ কথাগুলোর ভিতর দিয়েই সমস্ত কিছু ঘটনার তাৎপর্য পরিস্ফুট হয়ে উঠল ওর কাছে।

সমাধিস্থলে যখন ওরা ইগনাতের অবিনশ্বর স্মৃতি-গাথা গাইছিল, আবার ফোমা গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই মায়াকিন ওর হাতখানা ধরে ফেলল। তারপর সমাধির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে এনে অধীর কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করল :

কী দুর্বল-চিত্ত মানুষ তুই? আমার কি কষ্ট হচ্ছে না? ওর প্রকৃত মূল্য যদি কেউ বুঝত সে আমি। তুইতো কেবল ওর ছেলে মাত্র। তবুও দেখ আমি কাঁদছি না। ত্রিশ বছরের বেশি ছিলাম আমরা এক সঙ্গে। মিলে-মিশে। পরম শান্তি ও সৌহার্দে। কত কথা, কত ভাবনা চিন্তা—কত না দুঃখ ভোগ করেছি দুজনে একসঙ্গে। তোর বয়েস কম। শোক করা তো তোকে সাজে না! তোর সামনে পড়ে রয়েছে বিস্তীর্ণ জীবন। ঢের ঢের বন্ধু-বান্ধব পাবি তোর জীবনে। আর আমি—আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আমার পুরোনো দীর্ঘদিনের বন্ধুকে সমাধিস্থ করে আজ আমি দেউলে হয়ে গেলাম। আর আমি এমন একটি অন্তরঙ্গ সুহৃদ পাবো না।

অদ্ভুতভাবে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর। মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠল। ঠোঁটদুটো বেঁকে কুঁচকে উঠে কাঁপতে শুরু করল। আর ছোট ছোট চোখদুটো ছাপিয়ে অবিরল ধারায় জল নেমে এসে বলিকুঞ্চিত মুখের রেখায় রেখায় ঝরে পড়তে লাগল।

মায়াকিনকে এমন করুণ, এমন অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল যে স্তম্ভিত হয়ে গেল ফোমা। সবল পুরুষের মমতাভরা কোমলতায় বৃদ্ধের গায়ের কাছে আরো ঘন-হয়ে এগিয়ে এসে ভীত শঙ্কিতকণ্ঠে বলতে লাগল :

কাঁদবেন না বাবা! কাঁদবেন না!

তাইতো!—একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে শীর্ণকণ্ঠে বলল মায়াকিন। মুহূর্তে আবার যেন সে স্বাভাবিক চতুর সেই বৃদ্ধ মায়াকিনে রূপান্তরিত হয়ে উঠল।

কাঁদিব না তুই।—গাড়িতে ধর্ম-ছেলের পাশে বসে ঈষৎ রহস্যভরা কণ্ঠে বলল মায়াকিন।—তুই এখন যুদ্ধের সেনাপতি। বীরের মতো সাহসের সঙ্গে তোকে তোর বাহিনী পরিচালিত করতে হবে। টাকাই হল তোর সে বাহিনী। আর সে বাহিনীও বিরাট, বিপুল। চলতে হবে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করে।

বৃদ্ধের এই অদ্ভুত দ্রুত পরিবর্তনে অবাক হয়ে গেল ফোমা। শুনতে লাগল ফোমা ওর কথা। কিন্তু কেন যেন ক্রমাগতই ওর মনে পড়তে লাগল সবাই মিলে কেমন করে ইগনাতের সমাধির ভিতরে কফিনের উপরে ফেলছিল মাটির চাপ।

কার সঙ্গে যুদ্ধ করব আমি?—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে প্রশ্ন করল ফোমা।

তা আমি শিখিয়ে দেবো তোকে। তোর বাবা কি একথা বলে যায়নি তোকে যে আমি বুদ্ধিমান, দূরদর্শী,—আমার কথা শুনে চলবি?

হাঁ, বলে গেছেন।

তাহলে আমার কথামতো চলিস। তোর যৌবনের শক্তির সঙ্গে যদি আমার বুদ্ধি মেশে তবে জয় সুনিশ্চিত। তোর বাবা ছিল একটা মহাপুরুষ, কিন্তু তার দূরদৃষ্টি ছিল না। জীবনে সে যে সাফল্য অর্জন করেছে অন্তরের চাইতে তা মস্তিষ্ক দিয়েই বেশি। ওঃ! কি হবে এখন তোর! বরং আমার বাড়ি এসেই থাক। তোর বাড়িটা এখন বড্ডো ফাঁকা ফাঁকা লাগবে।

পিসিমা রয়েছেন।

পিসিমা। সেওতো ভুগছে। বেশিদিন সেও আর নেই।

বলবেন না ওকথা!—মিনতিভরা অনুচ্চকণ্ঠে বলে উঠল ফোমা।

বলবোই আমি। মৃত্যুকে ভয় পাসনে। হেঁসেলের কোণের বুড়ি মেয়েমানুষ নোস তুই। বাঁচবি নির্ভীকভাবে। আর যে কাজ করতে এসেছিস তা করে যাবি। মানুষ আসে পৃথিবীতে জীবনকে সংগঠিত করতে। মানুষ হল মূলধন। টাকা-কড়ির মতো। আধলা পয়সা এসব দিয়ে তৈরি। কথায় বলে, ধরণীর ধুলোমাটি দিয়ে তৈরি। আর যেহেতু তাকে সংসারের সবকিছুর সংস্পর্শে আসতে হয়, গ্রহণ করতে হয় গ্রিস্‌ তেল, ঘাম, আর চোখের জল—ওদের ভিতর থেকে আত্মা অনুপ্রবেশ করতে থাকে। আর তারপর থেকেই মানুষ আগায় মাথায় সব দিক থেকেই বাড়তে শুরু করে। তাই দেখ, যার মূল্য এখন একটা আধলার সমান পরক্ষণেই তার মূল্য হয়ে ওঠে পনেরো টাকা। তারপর একশ টাকা। হয়তো ক্রমে ক্রমে সে হয়ে ওঠে অমূল্য। তাকে খাটাও—জীবনে সুদে-আসলে ফিরে আসবে। জীবন আমাদের প্রত্যেকের মূল্যই উপলব্ধি করতে পারে। কখনো অসময়ে আমাদের গতিরুদ্ধ

করে না। যে কেউ—যদি সে বুদ্ধিমান হয় তবে নিজের অনিষ্টের জন্যে সে কাজ করে না। তা ছাড়া অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করে রাখে জীবন। শুনছিস আমার কথা?

শুনেছি।

কী বুঝলি তা হ'লে?

বুঝেছি সব।

মিথ্যে কথা বলছিস না তো?—কেমন যেন সন্দেহ জাগে মায়াকিনের।

কিন্তু কেন আমাদের মৃত্যু হয়?—অনুচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করে ফোমা।

দুঃখিত মনে মায়াকিন ওর মুখের দিকে তাকায়। তারপর ঠোঁট দিয়ে একটা শব্দ করে বলে ঃ

বুদ্ধিমান মানুষ কখনো এমন প্রশ্ন করে না। যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা জানে যে, যদি নদী হয় তবে সেটা নিশ্চয়ই প্রবহমান। আর যদি একই স্থানে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তবে সেটা বিল।

আপনি ক্রমাগতই আমাকে উপহাস করে চলেছেন।—তিক্তকণ্ঠে বলল ফোমা।—সমুদ্রও আদৌ প্রবহমান নয়।

সমস্ত নদীকে নিজের বুকে টেনে নেয় সমুদ্র। তারপর সময়ে অমিত শক্তিশালী ঝঞ্ঝা জেগে ওঠে তার বুকে। জীবনসমুদ্রও কখনো কখনো ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মানুষের দ্বারা আন্দোলিত হয়ে ওঠে প্রবলভাবে। তারপর মৃত্যু এসে সেই জীবন-সমুদ্রের সবটুকু জল শুষে নেয়। পাছে খারাপ হয়ে যায় সে জল। যতই মানুষ মরুক না কেন ক্ষতি নেই। তবুও চিরকাল বহুসংখ্যায় তারা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

তাতে কি? আমার বাবা তো মরে গেলেন।

তুমিও মরবে একদিন।

তবে যত লোকই জন্মাক না কেন সে তত্ত্বে আমার কী এল গেল?—একটু বিষাদক্লিষ্ট হাসি হাসল ফোমা।

কি...তা...তা...!—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল মায়াকিন।

তা অবশ্য কথাটা ঠিক। আমাদের কারুরই তাতে কিছু যায় আসে না। তাহলেই দেখ তোর ঐ ট্রাউজারটা সম্পর্কেও ঠিক ঐ একই কথা খাটে। দুনিয়ায় কতরকমের কত কি জিনিস আছে তা সে সব তত্ত্ব জেনেই বা আমাদের লাভ কি? পরলে ছিঁড়ে গেলে ফেলে দিলে।

অভিযোগভরা দৃষ্টি মেলে ফোমা তার ধর্মবাবার মুখের দিকে তাকাল। অবাক-বিস্ময়ে দেখল মায়াকিন মৃদু মৃদু হাসছে। পরক্ষণেই সম্ভ্রমভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করল ঃ

আপনি মৃত্যুকে ভয় করেন না, এ কথা কি কখনো সত্যি হতে পারে?

সবচাইতে বেশি ভয় করি আমি মূর্খতাকে। বৎস!—বিনীত তিক্তকণ্ঠে বলল মায়াকিন। আমার মত হচ্ছে এই ঃ যদি কোনো মূর্খলোক মধুভাণ্ডও মুখে তুলে দেয় তবে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করবে। কিন্তু যদি কোনো বুদ্ধিমান জ্ঞানীলোক বিষের পাত্রও দেয়, বিনা দ্বিধায় তা পান করবে। তাছাড়া পার্চ মাছ ক্ষীণপ্রাণ, কারণ ওর লেজের দিকের ডানা দাঁড়ায় না।

বৃদ্ধের বিদ্রূপভরা কথাবার্তায় অন্তরে অন্তরে ক্রুদ্ধ ও আহত হয়ে উঠল ফোমা।

এই ধরনের হেঁয়ালি ছাড়া আপনি কখনো সোজা কথা বলতে পারেন না?

না, পারি না।—প্রত্যুত্তরে বলল মায়াকিন।—প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব ধরন আছে কথা বলবার। আমার কথাগুলো খুব রূঢ় মনে হয় নাকি? কি বলো?

ফোমা চুপ করে রইল।

দেখ, একটা কথা মনে রাখিস, যে ভালোবাসে সে-ই শিক্ষা দেয়। কথাটা খুব ভালো করে মনে রাখিস। আর মরণের কথা আদৌ চিন্তা করিস না। জীবন্ত মানুষের মৃত্যুর কথা চিন্তা করা নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। মৃত্যুর উপরেই ধর্মযাজকদের প্রভাব প্রতিফলিত হয় সব চাইতে বেশি। ঐ যে কথায় বলে, যে একটা জ্যান্ত কুকুরও মরা সিংহের চাইতে ভালো।

বাড়িতে এসে পোঁছল দুজনে। বাড়ির সামনের রাস্তায় জমে উঠেছে ভিড়। জানলার পথে ভেসে আসছে উচ্চকণ্ঠে কথাবার্তা বলার শব্দ। ঘরে এসে ঢুকতেই ফোমার হাত ধরে টেনে নিয়ে এল টেবিলের সামনে। কিছু পানাহার করার জন্যে সবাই মিলে বার বার অনুরোধ করতে লাগল ওকে। একটা বাজারে গণ্ডগোলে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে বাতাস। ভারি হয়ে উঠেছে। হলঘর লোকের ভিড়ে গিস্‌ গিস্‌ করছে। দম আটকে আসছে। নীরবে ফোমা একগ্লাস ভদকা খেল। তারপর আর একগ্লাস। আর একগ্লাস। ওর চারপাশে জেগে উঠছে চর্বণ ও লেহনের শব্দ। বোতল থেকে ঢালা ভদকার গ্লাসে উঠছে বুদ্‌বুদ্‌। পেয়ালার ঠুন্‌ ঠুন্‌ শব্দ। কেউ তারিফ করছে শুঁট্‌কি মাছের। কেউ আলোচনা করছে বিশপের ঐকতান বাদকদের কথা। আবার শুরু হয়েছে শুঁট্‌কি মাছের আলোচনা। কে যেন বলছে,—মেয়রেরও ইচ্ছে ছিল একটা বক্তৃতা দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস করল না বিশপের বক্তৃতার পরে বক্তৃতা দিতে, পাছে অমন সুন্দর না হয়। দরদভরা কণ্ঠে কে যেন বলে উঠল ঃ মৃত ভদ্রলোক এমনি করতেন। একটুকরো ভাঙন মাছ কেটে নিয়ে তাতে পুরু করে মরিচ মাখিয়ে আর এক টুকরো মাছ উপরে রেখে প্রতিবার পান করার পরেই মুখে পুরে দিতেন।

আসুন আমরাও তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করি।—জেগে উঠল বহু কণ্ঠের কোলাহল।

মুহূর্তে ফোমার অন্তর বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ভ্রুকুটি-কুটিল দৃষ্টি মেলে মোটা মোটা ঠোঁটে সুখাদ্যচর্বণরত লোকগুলোর দিকে তাকাল। ওর ইচ্ছে হল এক্ষুনি চিৎকার করে ওঠে। ক্ষণিক আগেই যাদের গাম্ভীর্য ওর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল, দূর করে তাড়িয়ে দেয় তাদের ওর বাড়ি থেকে।

তোর আর একটু ভদ্র আর একটু সামাজিক হয়ে ওঠা উচিত—ফোমার কাছে এগিয়ে এসে অনুচ্চকণ্ঠে বলল মায়াকিন।

কেন ওরা অমন রাক্ষসের মতো গিলছে এখানে বসে? এটা কি সরাইখানা নাকি?—ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল ফোমা।

চুপ! চুপ!—ভীত সন্ত্রস্ত মায়াকিন বলে উঠেই বিনয়ের হাসি হেসে সবার দিকে তাকাল। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। কোনো কাজেই এল না ওর হাসি। সবাই শুনে ফেলেছে ফোমার কথা। মুহূর্তে সমস্ত কথাবার্তা, সমস্ত গোলমাল স্তব্ধ হয়ে গেছে। অতিথিরা কেউবা উত্তেজিত কণ্ঠে দ্রুত ফিস্‌-ফিস্‌ করছে। বিক্ষুব্ধ অন্তরে ভ্রুকুটি-কুটিল চক্ষে কেউ বা রয়েছে তাকিয়ে। কেউবা হাতের কাঁটা-চামচ রেখে উঠে পড়ছে টেবিল থেকে। ক্রুদ্ধ ফোমা নীরবে তাকিয়ে রয়েছে।

আমি অনুরোধ করছি আপনারা ফিরে আসুন টেবিলে!—চিৎকার করে বলে উঠল মায়াকিন। একগাদা ছাইয়ের ভিতরে এক টুকরো অংগারের মতো তার সর্বাংগ জ্বলজ্বল করছে।

মিনতি করছি আপনারা বসে পড়ুন! এক্ষুনি পিঠে পরিবেশন করা হবে।

নিদারুণ বিরক্তিতে কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ফোমা দোরের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল ঃ

আমি খাবো না।

পিছনে বহুকণ্ঠের বিরুদ্ধে মন্তব্য ভেসে এল ফোমার কানে। ওর ধর্মবাপ কার সংগে যেন কথা বলছে ঃ

বুঝলেন শোকে-দুঃখে...একাধারে ওর মা-বাপ দুই ছিল কিনা ইগনাত!

বেরিয়ে এসে বাগানে যেখানটায় ওর বাবার মৃত্যু হয়েছিল সেখানে গিয়ে বসল ফোমা। শোক আর একাকিত্বের অসহনীয় অনুভূতি বোঝার মতো চেপে বসেছে ওর বুকখানা জুড়ে। জামার বোতাম খুলে দিল ফোমা যাতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সহজ হয়ে ওঠে। তারপর টেবিলের উপরে কনুইয়ের ভর রেখে দুহাতে শক্ত করে মাথাটা চেপে ধরে স্থির নিশ্চল হয়ে বসে রইল।

গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। আতাগাছের পাতায় পাতায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে জেগে উঠছে করুণ মর্মরধ্বনি। বহুক্ষণ তেমনিভাবে একা একা বসে রইল ফোমা। দেখছিল কেমন করে ছোট ছোট জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছে আতাগাছের পাতায় পাতায়। মাথাটা ভারি হয়ে উঠেছে ভদ্‌কায়। অন্তর জুড়ে জেগে উঠেছে মানুষের প্রতি বিদ্বেষ। কেমন যেন একটা অবোধ অশরীরী চিন্তা জেগে উঠ্‌ছে ওর মনে। পরক্ষণেই আবার যাচ্ছে বিলীন হয়ে। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল ধর্মবাপের টাক-মাথা, একগোছা রুপোলি চুল আর কালো মুখ। পুরাকালের আইকনের মতো। ঐ ফোকলা মুখের উপরে শয়তানি হাসি ফোমার অন্তরের সেই একাকিত্বের চেতনা আশ্রয় করে জাগিয়ে তুলল ভীতির কম্পন। পরক্ষণেই ওর মানস-পটে ভেসে উঠল মেদিনস্কায়ার স্নেহ-কোমল দুটি চোখ, তার ছোটখাট দেহের অপরূপ তনু-শ্রী। আবার তারই পাশে ভেসে উঠল রক্তিম গাল লিউবভ মায়াকিনের বিরাট বলিষ্ঠ দেহ। হাসিমাখা দুটি চোখ আর সোনালি চুলের লম্বা বেণী।

'মানুষের উপরে ভরসা করো না। খুব কমই প্রত্যাশা করো তাদের কাছে।'—বাবার কথাকটি যেন ওর স্মৃতিপথে গুঞ্জন তুলে বেজে চলেছে। একটা বিষাদ-ভরা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফোমা চারদিকে তাকাল। বৃষ্টির ফোঁটায় গাছের পাতাগুলো দুলছে। বাতাসে মর্মরিত হয়ে উঠছে ব্যথার মূর্ছনা। ধূসর আকাশ বুঝিবা করুণ কান্নায় পড়ছে ভেঙে। গাছের পাতায় পাতায় টলমল করছে অশ্রুজল।

ফোমার অন্তর শুষ্ক। অন্ধকারময়। পিতৃহীনতার বেদনাভরা নিঃসংগ একাকিত্বের অনুভূতি ওর অন্তর ভারি করে তুলেছে। কিন্তু সেই অনুভূতি প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে ওর মনে ঃ

এমন একা একা কেমন করে থাকবো আমি?

ওর কাপড়জামা ভিজে উঠেছে বৃষ্টিতে। যখন অনুভব করল শীতে ওর সর্বাংগ কাঁপছে তখন উঠে ঘরের ভিতরে চলে গেল।

জীবন চতুর্দিক থেকে ওকে টানতে শুরু করেছে। এতটুকু অবকাশও নেই যে বসে বসে একটু ভাবে কিংবা বাবার জন্যে শোক করে। ইগনাতের মৃত্যুর

চল্লিশ দিনের দিন ছুটির দিনের পোশাক-পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হয়ে হালকা মনে চলল ফোমা ধর্মশালার ভিত্তি স্থাপনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। আগের দিন মেদিনস্কায়া চিঠি লিখে জানিয়েছে যে ওকে তারা বিল্ডিং কমিটির সভ্য নির্বাচন করেছে। আর নির্বাচন করেছে সেই সোসাইটির অবৈতনিক সভ্য যার সভানেত্রী মেদিনস্কায়া নিজে। ফোমার অন্তর আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল। আজকের এই ভিত্তি স্থাপনের অনুষ্ঠানে যে ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে ওকে তারই কথা ভেবে এক উত্তেজনাময় অনুভূতি জেগে উঠল ওর অন্তরে। যাবার পথে ভাবতে লাগল কেমন করে অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হবে। আর ও নিজে কেমন করে চলবে যাতে করে দশজনের সামনে ওকে অপ্রস্তুত হতে না হয়।

ওহে দাঁড়াও দাঁড়াও!

ফোমা মুখ ফিরিয়ে তাকাল। পাশের গলি পথের ভিতর থেকে মায়াকিন দ্রুত এগিয়ে আসছে ওর দিকে। তার পরনে ফ্রককোট পায়ের গোড়ালি অবধি এসে পৌঁছেছে। মাথায় উঁচু টুপি। হাতে একটা বিরাট ছাতা।

দাঁড়াও! আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল।—বাঁদরের মতো লাফিয়ে গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল মায়াকিন।—সত্যি বলতে কি তোমার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছিলাম। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম তোমার যাবার সময় হল।

আপনিও ওখানে যাচ্ছেন?—জিগ্গেস করল ফোমা।

নিশ্চয়। দেখতে হবে না আমাকে কেমন করে ওরা আমার বন্ধুর টাকাগুলো মাটিতে কবর দেয়!

প্রশ্নভরা দৃষ্টি মেলে বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল ফোমা।

অমন চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন? ভয় নেই শিগ্গিরই তুমিও পরোপকারী হিসাবে লোকসমাজে পরিচিত হয়ে উঠবে।

তার মানে?—গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল ফোমা।

আজ সকালেই খবরের কাগজে দেখলাম তুমি বিল্ডিং কমিটির সভ্য নির্বাচিত হয়েছ। আর নির্বাচিত হয়েছ সোফিয়ার সঙ্ঘের অবৈতনিক সভ্য।

হ্যাঁ।

এই সভ্যপদই তোমার পকেট ফাঁক করে দেবে।—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল মায়াকিন।

তাতে আমি মরে যাবো না।

আমি ওসব কিছু জানি না।—বিদ্বেষভরা কণ্ঠে বলল মায়াকিন।—বলছি এ জন্যেই যে দান-খয়রাতের ব্যাপারে আমার তেমন বুদ্ধিমত্তা নেই। তাছাড়া আমার মতে ওটা ব্যবসা তো নয়ই বরং ক্ষতিকর—বাজে জিনিস।

লোককে সাহায্য করাটা কি বাজে জিনিস?

কি হে'ড়ে মাথা! তুমি বরং আমাদের বাড়ি এসো। এসব ব্যাপারে আমি তোমার চোখ খুলে দেবো। আসবে তো?

বেশ, আসব।—প্রত্যুত্তরে বলল ফোমা।

ভালো। ইতিমধ্যে একটা কাজ করবে, ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠানে সগর্বে সবার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। এ কথাটা না বলে দিলে তুমি হয়তো কারুর পেছনে আত্ম-গোপন করে থাকতে।

কেন নিজেকে লুকিয়ে রাখব?—অসন্তুষ্ট ফোমা বলল প্রত্যুত্তরে।

বলেছি ঠিক কথাই। এর মধ্যে আর কেন, কিন্তু নেই। টাকাটা যখন দান

করেছে তোমার বাবা তখন তার সবটুকু সম্মান উত্তরাধিকারসূত্রে তোমারই প্রাপ্য। সম্মান আর অর্থ একই বস্তু। সম্মান বজায় থাকলে যে-কোনো জায়গায় ধার পাওয়া যায়। আর সর্বত্রই তার কাছে অবারিতদ্বার। সুতরাং সব সময়েই সামনে গিয়ে দাঁড়াবে যাতে সবাই তোমাকে দেখতে পায়। তারপর যদি পাঁচ পয়সার কাজও করো, তবে দেখবে তার বদলে গোটা টাকাই লাভ হবে। আর যদি মুখ লুকিয়ে বেড়াও তার ফল মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই হবে না।

ওরা এসে পৌঁছল নির্দিষ্ট স্থানে। ইতিমধ্যেই শহরের গণ্যমান্য ভদ্রলোকেরা সবাই উপস্থিত হয়েছেন। ইট, কাঠ আর মাটির স্তূপের চার পাশ ঘিরে জমে উঠেছে লোকের ভিড়। বিশপ, নগরপাল, নগরীর অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি-নিধিরা, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা, সঙ্গে উজ্জ্বল বেশভূষায় সুসজ্জিত মহিলাবৃন্দ। সবাই ওরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে দেখছিল কেমন করে দুজন রাজমিস্ত্রি মেশাচ্ছিল চুন আর শুরকি। মায়াকিন আর তার ধর্মছেলে পথ করে এগিয়ে গেল ঐ দলের দিকে। ফিসফিস্ করে ফোমার কানে কানে বলল ঃ

সাহস হারিয়ে ফেল না। ওরা পেট মেরে গায়ে চড়িয়েছে সিল্কের পোশাক।

খুশিভরা সশ্রদ্ধ কণ্ঠে মায়াকিন বিশপের সামনে দাঁড়ানো প্রদেশপালকে জানাল অভিবাদন ঃ

নমস্কার! মহামান্য প্রদেশপাল! কেমন আছেন? আশীর্বাদ করুন পবিত্র ধর্মাত্মা!

এই যে ইয়াকভ তারাশভিচ!—সৌহার্দ্যপূর্ণ হাসি হেসে প্রত্যুত্তরে বলল নগর-পাল মায়াকিনের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ বিশপেরও হাতে চুম্বন করল ঃ

কেমন আছেন মৃত্যুঞ্জয়ী অমরবৃন্দ?

আপনাকে ধন্যবাদ! সোফিয়া পাভলোভনাকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার!—ভিড়ের ভিতরে লাট্টুর মতো ঘুরছে মায়াকিন আর দ্রুত বলে চলেছে অনর্গল। মিনিট-খানেকের ভিতরেই সে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে করমর্দন করল। করমর্দন করল সরকারী উকিলের সঙ্গে, মেয়রের সঙ্গে। এক কথায় যাদের সঙ্গে আগে করমর্দন করা দরকার মনে করল, করল তাদের সবারই সঙ্গে। অবশ্য তাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। হাসি ঠাট্টা তামাশার ভিতর দিয়ে মুহূর্তে ঐ ছোটখাট মানুষটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। নীরব নত মস্তকে ফোমা দাঁড়িয়ে রয়েছে তার পিছনে। সোনালী কাজ-করা মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদে সুসজ্জিত লোকগুলোর দিকে তাকাচ্ছে প্রশ্নভরা দৃষ্টি মেলে। বৃদ্ধ মায়াকিনের চট্পটে ভাব চালচলন ওকে ঈর্ষান্বিত করে তুলল মনে মনে। ক্রমেই ওর সাহস আসছে দমে। সাহস হারিয়ে ফেলেছে বুঝতে পেরে আরো যেন ভীত হয়ে পড়ল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে মায়াকিন ওর হাত ধরে কাছে টেনে এনে বলল ঃ

মাননীয় প্রদেশপাল মহোদয়! এই দেখুন, এই আমার ধর্মছেলে—মৃত ইগনাতের পুত্র।

ওঃ!—প্রত্যুত্তরে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন প্রদেশপাল।—খুব খুশি হয়েছি। তোমার দুর্ভাগ্যের জন্যে সমবেদনা জানাচ্ছি!—ফোমার সঙ্গে করমর্দন করতে করতে বললেন তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরক্ষণেই আবার প্রত্যয়ভরা দৃঢ়কণ্ঠে বললেন ঃ পিতৃহারা হওয়া নিদারুণ দুর্ভাগ্য।—ফোমার জবাবের আশায় কয়েক মুহূর্ত চুপ করে অপেক্ষা করে থেকে মুখ ঘুরিয়ে মায়াকিনকে লক্ষ্য করে বললেনঃ

জিটি হলে আপনার বক্তৃতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। চমৎকার! ইয়াকভ তারাশভিচ! সাধারণের ক্লাবের জন্য টাকা ব্যয় করার প্রস্তাবটা—ওরা জনসাধারণের সত্যিকারের প্রয়োজন বোঝে না মোটেই।

হ্যাঁ, তারপর বুঝলেন মহামান্য প্রদেশপাল, ছোট্ট একটি মূলধন মানে হচ্ছে শহরের নিজের টাকাও তাতে মেলাতে হবে।

ঠিক বলেছেন, সম্পূর্ণ সত্যকথা।

আমার কথা হচ্ছে সংযম ভালো, কিন্তু ভগবান সবাইকে যদি বুদ্ধিমান বিবেচক করে সৃষ্টি করতেন! আমি মদ ছুঁই না পর্যন্ত। কিন্তু লোকে যেখানে পড়তে পর্যন্ত জানে না সেখানে এইসব অনুষ্ঠান—এই লাইব্রেরি এসবের মূল্য কি বলুন?

প্রত্যুত্তরে সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়লেন প্রদেশপাল।

আমি বলব, এই টাকাটা বরং একটা শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে ব্যয় করা উচিত ছিল। যদি ছোট পরিকল্পনা নিয়ে শুরু করা হত তবে এই টাকাই যথেষ্ট। আর যদি তাতে না কুলোত তবে আমরা সেন্ট পিটার্সবার্গে লিখতাম। তারা টাকাটা দিত আমাদের। তাহলে আর আমাদের শহরের টাকা জোগান না দিয়েও চলতে পারত। সমস্ত ব্যাপারটারই তখন একটা মানে হত।

ঠিক কথা। আমি সম্পূর্ণ একমত আপনার সঙ্গে। কিন্তু দেখছেন তো উদারনৈতিক দল কেমন আপনার পিছনে লেগেছে? হাঃ হাঃ হাঃ!

সব কিছু ব্যাপারে সোরগোল তোলা ওটা হচ্ছে ওদের কাজ।

গির্জার ঘণ্টায় ঘোষিত হল প্রার্থনার সময়।

সোফিয়া পাভলোভনা ফোমার কাছে এগিয়ে এসে নমস্কার করে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল :

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল। ভাবলাম, হা ভগবান্! কী নিদারুণ কষ্টই না পাচ্ছে!

ওর কথা শুনতে শুনতে ফোমার মনে হল যেন সে মধু পান করছে।

তোমার কান্নায় আমার অন্তরাত্মা আকুল হয়ে উঠেছিল। আমি কিন্তু এমনি-ভাবেই কথা বলবো তোমার সঙ্গে। কারণ আমি বুড়ী হয়ে গেছি।

আপনি?—প্রত্যুত্তরে বিস্ময়মাখা কোমল কণ্ঠে বলল ফোমা।

তাই নয় কি?—ফোমার মুখের দিকে তাকিয়ে সহজ সরলভাবে বলল সোফিয়া। নতমুখে চুপ করে রইল ফোমা।

বিশ্বাস হয় না তোমার যে আমি বুড়ী হয়ে গেছি?

আপনাকে বিশ্বাস করি আমি। মানে, আপনার সব কথা আমি বিশ্বাস করি। কেবল এই কথাটি নয়।—আবেগভরা মৃদু কণ্ঠে বলল ফোমা।

কি সত্যি নয়? কি বিশ্বাস করো না?

না, এ কথাটি নয়—অন্য সব। আমি—মাপ করুন আমি কথা বলতে জানি না। —সংশয়জড়িত কণ্ঠে বলল ফোমা। ওর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল।—আমি শিক্ষিত নই।

সেজন্যে তোমার চিন্তিত হবার কারণ নেই।—প্রত্যুত্তরে বলল সোফিয়া পাভলোভনা।—তোমার বয়েস অল্প, আর শিক্ষা সবারই পক্ষে গ্রহণীয়। কিন্তু এমন লোকও আছে যাদের কাছে শিক্ষাটা অনাবশ্যক তো বটেই এমন কী ক্ষতিকরও। যাদের অন্তর পবিত্র, শিশুর মতো সরল। তুমি হচ্ছ সেই জাতের মানুষ। তাই নও কি?

কি বলবে ফোমা প্রত্যুত্তরে? কেবলমাত্র একান্ত অন্তরিক আবেগের সঙ্গে বলল : আপনাকে ধন্যবাদ।

কিন্তু ওর কথায় মেদিনস্কায়ার দুচোখে আনন্দের আভা জেগে উঠতেই কেমন যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল ফোমা। নিজের কাছে নিজেকে কেমন যেন বোকা বোকা মনে হতে লাগল। মুহূর্তে দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল নিজের উপর। তারপর কম্পিত কণ্ঠে বলল :

হ্যাঁ, আমি ঐ রকমেরই। যা বলি অন্তর থেকেই বলি। হাসির কিছু দেখলে প্রকাশ্যেই হেসে উঠি।

ওকথা কেন বলছ?—মৃদু ভর্ৎসনাভরা কণ্ঠে বলল মেদিনস্কায়া। তারপর পোশাক-পরিচ্ছদ একটু ঠিক করে নিয়ে ফোমার টুপি-ধরা হাতখানার উপরে নিজের অজ্ঞাতেই হঠাৎ একটু মৃদু আঘাত করল। নিজের কব্জির দিকে তাকাল ফোমা। পরক্ষণেই আনন্দে হাসির আভায় ওর মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

নিশ্চয়ই তুমি ডিনারে উপস্থিত থাকবে, থাকবে না?—প্রশ্ন করল মেদিনস্কায়া।

থাকব।

আর কাল আমার বাড়ির বৈঠকেও উপস্থিত থাকবে, কেমন?

নিশ্চয়ই থাকব।

তাছাড়া মাঝে মাঝে আমার বাড়ি আসবে। দেখা করতে, কেমন?

ধন্যবাদ! আসব।

তোমার এই স্বীকৃতির জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।

দুজনে চুপ করে গেল। বাতাসে ভেসে আসছে বিশপের শ্রদ্ধাভরা কোমল কণ্ঠের সুর। দুহাত মেলে আবেগভরা কণ্ঠে আবৃত্তি করে চলেছেন তিনি প্রার্থনার বাণী যেখানে হয়েছে ভিত্তি স্থাপনা :

"বাতাস, জল, কিংবা কোনো কিছুতেই যেন এর কোনো ক্ষতিসাধন কবতে না পারে। তোমার পরম করুণায় যেন সুসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে এর প্রস্তুতি। আর যারা এর ভিতরে বাস করবে সমস্ত আপদ-বিপদের হাত থেকে তারা যেন মুক্ত থাকে।"

আমাদের প্রার্থনা কী সুন্দর আর কী সারগর্ভ!—তাই না?—বলল মেদিনস্কায়া।

হ্যাঁ।—ওর কথার তাৎপর্য বুঝতে না পেরেই সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল ফোমা। পরক্ষণেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

ওরা সব সময়েই আমাদের ব্যবসায়ী-স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবে।—ফোমার অনতিদূরে মেয়রের পাশে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলে চলেছে মায়াকিন।—তাতে ওদের আর কি? ওরা চায় একমাত্র সংবাদপত্রের সমর্থন। আসল ব্যাপারে পৌঁছতে পারে না। বেঁচে আছে কেবল নিজেদের জাহির করার জন্যে। জীবনকে সংগঠিত করার জন্যে নয়। এটাই হল ওদের একমাত্র কাজ। খবরের কাগজ আর সুইডেন! ডাক্তার কাল সমস্ত দিন ধরে সুইডেন সম্পর্কে বলে বলে আমার কান দুটো ঝালাপালা করে দিয়েছে। সুইডেনের জল-শিক্ষা, তাছাড়া সেখানকার সব কিছুই নাকি প্রথম শ্রেণীর—বললেন তিনি। সুইডেনটা কী? হয়তো সুইডেনটাই একটা অলীক, গল্পকথা। কেবল উদাহরণ হিসেবেই লোকে বলে থাকে সুইডেনের কথা। আর সেখানকার শিক্ষাই বলুন আর যা-কিছুই বলুন, কিছুই নেই। তাছাড়া আমরা তো আর সুইডেনের জন্যে বেঁচে থাকব তা নয়! সুইডেনও যে আমাদের বাজিয়ে নেবে তা পারে না। আমাদের যা-কিছু সব আমাদের নিজস্ব ধরনেরই

করতে হবে। তাই নয় কি?

ধ্বনিত হয়ে উঠল প্রধান ধর্মযাজকের কণ্ঠ। মাথাটা একটু পিছনের দিকে হেলিয়ে বলে উঠলেন :

অনিবশ্বর হয়ে থাক এই গৃহের স্থাপয়িতার স্মৃতি।

ফোমার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। কিন্তু ইতিমধ্যেই মায়াকিন এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে। তারপর জামার হাতায় টান দিতে দিতে জিগ্গেস করল ফোমাকে :

ডিনারে যাচ্ছ তো?

পরক্ষণেই মায়াকিনের ভেলভেটের মতো মসৃণ উষ্ণ ছোট্ট হাতখানা ফোমার হাতের ভিতরে এসে ঢুকল।

ডিনারে বসা ফোমার কাছে যেন একটা শাস্তি বিশেষ। জীবনে এই প্রথম বসেছে সে গণ্যমান্য পদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে। দেখল তারা খেতে খেতে গল্প করছে। আর গল্প করতে করতে খাচ্ছে। সব কিছুই করছে সহজভাবে। কিন্তু ফোমার মনে হল, ওর আর মেদিনস্কায়ার মাঝখানে যেন টেবিল নয়, একটা পাহাড় দাঁড়িয়ে মাথা তুলে। পাশে বসেছে সমিতির সম্পাদক। যে সমিতির অবৈতনিক সভ্য করে নেয়া হয়েছে ফোমাকে। আদালতের একজন ছোকরা কর্মচারী। বিশ্রী উচ্চারণের নাম উখ্তিশ্চেভ। যেন নামটাকে আরো যাতে অদ্ভুত শোনায় তারই জন্যে কথা বলে উচ্চ রিনরিনে কণ্ঠে। বেঁটেখাটো, গোলগাল চেহারা, ফুলো ফুলো মুখ। কথা বলে চোখে-মুখে। ওকে দেখাচ্ছিল যেন নতুন-কেনা একটি ঘন্টা।

—"সমিতির ভিতরে সবচাইতে যেটি ভালো তা হচ্ছে সমিতির শুভানুধ্যায়িনী নেত্রী নিজে। আমাদের সবচাইতে বেশি বুদ্ধি-বিবেচনার কাজ হল ওর মনোরঞ্জন করা। অবশ্য সামনে ওর প্রশংসা করে ওকে খুশি করাটাই হচ্ছে কঠিন কাজ। তাই সবচাইতে বুদ্ধির কাজ হচ্ছে নীরব নিস্পৃহ হয়ে ওকে তারিফ করা। যেন তুমি বাস্তবিকই সমিতির সভ্য নও। বরং টেণ্টালাসদের সমিতির সভ্য—সোফিয়া মেদিন-স্কায়ার ভক্তদের দ্বারা গঠিত।"

ওর বক্বকানি শুনতে শুনতে ফোমা থেকে থেকে তাকাচ্ছিল পুলিসের বড়ো কর্তার সঙ্গে আলোচনারত মেদিনস্কায়ার দিকে। প্রত্যুত্তরে ও একটা অস্পষ্ট শব্দ করল; ভান করল যেন খাওয়া নিয়ে কতই ব্যস্ত। ওর মনে হল ডিনার-পর্ব যত শীঘ্র শেষ হয়ে যায়, যেন বাঁচে। ফোমার মনে হল সবাই যেন তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কেমন যেন নির্বোধ বিরক্তিকর মনে হচ্ছে ওকে। ওর নিশ্চিত ধারণা হল, ভর্ৎসনাভরা তীব্র দৃষ্টিতে সবাই তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। কেমন যেন একটা অদৃশ্য শৃঙ্খলে ওকে বেঁধে ফেলেছে। হরণ করে নিয়েছে ওর চিন্তা করবার, কথা বলবার ক্ষমতা। শেষ পর্যন্ত ওর চিন্তা এতদূর গিয়ে পৌঁছল যে জমকালো পোশাক পরা ঐ যে সব লোক সারি সারি বসে রয়েছে একটা শাদা ফিতের মতো—ওরা যেন বিদ্রূপভরা দৃষ্টি দিয়ে ওকে খুঁচিয়ে চলেছে।

মেয়রের পাশে বসেছে মায়াকিন। দ্রুত কাঁটা-চামচ নাড়াচাড়া করতে করতে অনর্গল কথা বলে চলেছে। ওর মুখের বলিরেখা কখনো কুঞ্চিত কখনো প্রসারিত হয়ে উঠছে। মেয়রের ধূসর মাথা, লাল মুখ, খাটো ঘাড়। ষাঁড়ের মতো তাকিয়ে রয়েছে মায়াকিনের মুখের দিকে। থেকে থেকে অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে টেবিলের কিনারায় মোটা মোটা আঙুল দিয়ে আঘাত করে জানাচ্ছে সমর্থন। চার-দিকের উদ্দীপনাভরা আলাপ-আলোচনা ও হাসির শব্দের ভিতরে ডুবে যাচ্ছে মায়াকিনের বক্তৃতা। একটি কথাও এসে পৌঁছচ্ছে না ফোমার কানে। তাছাড়া

সেক্রেটারির উচ্চকণ্ঠের স্বর তখনো বেজে চলেছে ওর কানে।

ঐ দেখুন, প্রধান ধর্মযাজক উঠে দাঁড়ালেন। এক্ষুনি ঘোষণা করবেন ইগনাত মাত্‌ভিইচ-এর অক্ষয় স্মৃতির কথা।

আমি কি এখন চলে যেতে পারি?

কেন পারবেন না? সবাই বুঝবে আপনি কেন চলে যাচ্ছেন।

হলঘরের কলকোলাহল ছাপিয়ে বেজে উঠল ধর্মযাজকের কণ্ঠের ঝংকারময় স্বর। বিশিষ্ট ব্যবসায়ীরা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তার বিরাট ব্যাদিত মুখের দিকে—যেখান থেকে নিঃসৃত হচ্ছিল ঐ গুরুগম্ভীর শব্দময় ধ্বনির স্রোত। এই ফাঁকে উঠে দাঁড়াল ফোমা তারপর হলঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল।

ক্ষণেক পরে ওর মনে হল যেন বেঁচেছে মুক্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে। গাড়ির ভিতরে বসে একান্ত বিষাদভরা অন্তরে ভাবতে লাগল, এই সব মানুষের ভিতরে আদৌ কোনো স্থান নেই ওর। মনে মনে ওদের অভিহিত করল মার্জিত রুচি ভদ্রলোক বলে। ওদের চালচলনের স্বাভাবিক সাবলীলতা, বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য, তাদের মুখ, হাসি, কথাবার্তা কিছুই ওর ভালো লাগল না। কেবলমাত্র ওদের যে কোনো বিষয়ে কথা বলার ক্ষমতা, সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ সব মিলে একটা ঈর্ষা-মেশানো শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠল ওর মনে। অন্তর ভারি হয়ে উঠল। কেমন যেন একটা বিষাদময় অনুভূতি বোঝার মতো চেপে বসল ওর মনে। ঐ সব লোকের মতো অনর্গল কথা বলতে পারে না ও নিজে—এই অক্ষমতার চেতনার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল এরই জন্যে বহুদিন অনুযোগ বহু ভর্ৎসনা করেছে ওকে মায়াকিন।

মায়াকিনের মেয়েকে পছন্দ করে না ফোমা। যেদিন বাবার মুখে শুনল যে, মায়াকিনের উদ্দেশ্য হচ্ছে লিউবার সঙ্গে ওর বিয়ে দেওয়া, সেদিন থেকে একেবারেই তার কছে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল ফোমা। কিন্তু ওর বাবার মৃত্যুর পর প্রায় প্রত্যেক দিনই যায় সে মায়াকিনের বাড়ি। একদিন লিউবা বলল :

তোমার দিকে কেন আমি তাকিয়ে থাকি জানো? তোমাকে আদৌ ব্যবসায়ীর মতো দেখায় না।

তোমাকেও ব্যবসায়ীর মেয়ের মতো দেখায় না।—প্রত্যুত্তরে বলেই ফোমা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল। যেন লিউবার কথার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হয়নি ওর। ও কি আঘাত করতে চায়, না কিছু না ভেবে-চিন্তেই বলেছে।

তার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।—বলেই লিউবা সৌহার্দভরা স্নিগ্ধ হাসি হেসে ফোমার মুখের দিকে তাকাল।

তাতে অত আনন্দ হচ্ছে কেন তোমার?—প্রশ্ন করল ফোমা।

আসলে, আমরা কেউই আমাদের বাবাদের মতো হইনি।

অবাক বিস্ময়ে ফোমা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

আচ্ছা, সত্যি করে বলো দেখি,—কণ্ঠস্বর নিচু করে বলল লিউবা।—আমার বাবাকে কেমন লাগে তোমার? ভালো লাগে না, না? তুমি ওঁকে পছন্দ করো না, তাই না?

তেমন নয়।—প্রত্যুত্তরে ধীর কণ্ঠে জবাব দিল ফোমা।

আর আমি, আদৌ পছন্দ করিনা ওঁকে।

কেন? কিসের জন্যে?

সব কিছুর জন্যে। তোমার জ্ঞান হলে বুঝতে পারবে পরে। তোমার বাবা কিন্তু লোক ভালো ছিলেন।

নিশ্চয়ই।—গর্বের সঙ্গে বলে উঠল ফোমা।

এই দিনের এই আলোচনার পর থেকে কেমন যেন একটা আকর্ষণ গড়ে উঠল দুজনার ভিতরে। দিনে দিনে সে আকর্ষণ যেন বেড়েই উঠতে লাগল। অনতি বিলম্বেই সেটা পরিণত হয়ে উঠল বন্ধুত্বে। যদিও এক ধরনের বন্ধুত্ব আগে থেকে ছিলই।

যদিও লিউবা বয়সে বড়ো নয় তার ধর্মভাইয়ের চাইতে, তবুও কোনোদিন ফোমাকে বড়ো বলে মানেনি। বরং ছোট শিশুর মতোই ব্যবহার করে এসেছে ওর সঙ্গে। কথা বলত ভারিক্কি চালে। কখনো বা ওকে নিয়ে করত হাসিঠাট্টা। কথাবার্তায় এমন সব ভাষার ব্যবহার করত যা ছিল ফোমার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বিশেষ ভঙ্গিতে ঐ সব কথা উচ্চারণ করে আনন্দ পেত লিউবা। বিশেষ করে লিউবা তার দাদা তারাসের কথা আলোচনা করতে আনন্দ পেত সবচাইতে বেশি। যদিও জীবনে সে কখনো চোখেও দেখেনি তাকে। কিন্তু তার সম্পর্কে এমন সব কথা গল্প করত ফোমার কাছে যা নাকি আনফিসা পিসির বলা রূপকথার মহৎ-হৃদয় বীর দস্যুদের কথাই মনে হত ফোমার। আর প্রায়ই তার বাবার সম্পর্কে অনুযোগ করে বলত :

তুমিও ঠিক কঞ্জুস হবে বাবারই মতো।

এ ধরনের কথাবার্তা আদৌ ভালো লাগত না ফোমার। বরং আঘাত পেত। আহত হত ওর আত্মাভিমান।

কিন্তু এক এক সময়ে লিউবা সহজ সরল হয়ে উঠত ওর কাছে। বিশেষ করে স্নেহ-প্রীতিভরা বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে উঠত। ফোমাও তখন ওর অন্তর উন্মোচিত করে তুলে ধরত ওর কাছে। দুজনে বলত অনেক কথা। আর বলত সরল মনে। কিন্তু তবুও ওরা কেউ কাউকেই বুঝতে পারত না। ফোমার মনে লিউবার যা-কিছু কথা সবই যেন দুর্বোধ্য। তাছাড়া লিউবার নিজের কাছেও অনাবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে এটাও অনুভব করত যে ওর অসংলগ্ন কথাবার্তায় মোটেই কোনো আকর্ষণ অনুভব করছে না লিউবা। আদৌ চেষ্টা করছে না ওর কথা বুঝতে। যত দীর্ঘ সময় ধরেই হোক না কেন ওদের ভিতরে আলোচনা, সে আলোচনা উভয়ের মনে কেমন অস্বস্তি, অসন্তুষ্টি যেন এনে দিত। যেন এক অপরিসীম বিরক্তির দেয়াল গড়ে উঠত দুজনার মাঝখানে।

কেউ-ই ওরা সে দেয়ালের গায়ে হাত দিতে প্রচেষ্টা পেত না। কিম্বা কেউ-ই বলত না যে সে অনুভব করছে ঐ দেয়ালের উপস্থিতি। তারপর আবার ওরা আলাপ-আলোচনা শুরু করত অস্পষ্ট অনির্দিষ্টভাবে। দুজনেই অনুভব করত ওদের ভিতরে এমন একটা কিছু আছে যা নাকি দুজনার ভিতরে এনে দিতে পারে বন্ধন।

মায়াকিনের বাড়ি যখন এসে পৌছল ফোমা, দেখল, বাড়িতে লিউবা একা। ও যেতেই লিউবা বেরিয়ে এল। ওকে দেখে মনে হল অসুস্থ। কিংবা কোনো কারণে বুঝিবা কেমন একটু হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। জ্বরো রোগীর মতো লাল হয়ে উঠেছে চোখ। চার পাশে গভীর কালো দাগ। শীত করছে। একটা গরম চাদরে গা ঢেকে একটু হেসে বলল :

খুব ভালো হল, তুমি এলে। বড্ডো একা একা লাগছিল। কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। চা খাবে একটু?

খাবো। কিন্তু কী হয়েছে তোমার বলো তো? অসুখ-বিসুখ করেছে নাকি?

খাবার ঘরে চলো। বলে দিয়েছি সামোভার ও ঘরে দিতে।—ওর প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে বলল লিউবা।

একটা ছোট কামরায় গিয়ে ঢুকল ফোমা। কামরাটার দুটো জানলাই বাগান-মুখো। ঘরের মাঝখানে ডিমের মতো আকৃতি একটা টেবিল, চারপাশে সেকেলে ধরনের চামড়ায় মোড়া চেয়ার। দেয়ালের গায়ে কাঁচের দরজা-দেয়া লম্বা কেসের ভিতরে একটা ঘড়ি। কোণের দিকে কাবার্ডে ডিশ। জানলার উলটো দিকে মাঝারি গোছের একটা ঘরের মতো সাইডবোর্ড।

ভোজসভা থেকে ফিরলে বুঝি?

ফোমা নীরবে মাথা ঝুঁকাল।

কেমন হল? খুব চমৎকার, না?

ভীষণ।—মৃদু হাসল ফোমা।—যেন জ্বলন্ত কয়লার আগুনের উপরে বসে-ছিলাম এতক্ষণ। ওদের দেখাচ্ছিল যেন এক একটি ময়ূর। আর তাদের ভিতরে আমি একটি হুতুম পেঁচা।

কাবার্ড থেকে কাপ-ডিশ বের করতে লাগল লিউবা, কিন্তু প্রত্যুত্তরে কোনো কথা বলল না।

সত্যি, কেন তোমাকে এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে বলত?—লিউবার গম্ভীর বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল ফোমা।

লিউবা ওর মুখের দিকে তাকাল।

উঃ জানো ফোমা, কী চমৎকার একটা বই পড়লাম! আঃ তুমি যদি বুঝতে পারতে!

নিশ্চয়ই খুব ভালো বই। নইলে এমন করে ফেলেছে তোমাকে!—একটু হেসে বলল ফোমা।

রাতভোর ঘুমোইনি। পড়েছি সমস্ত রাত ধরে। বুঝে দেখ একবার! পড়ে দেখ, দেখবে আর একটা স্বর্গের দোর খুলে গেছে তোমার সামনে। সেখানকার লোকজন অন্য ধরনের, আলাদা তাদের ভাষা। সব কিছুই আলাদা। জীবনই সেখানে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের—একেবারে স্বতন্ত্র।

আমার ওসব ভালো লাগে না।—একটু বিরক্ত হয়েই বলল ফোমা।—ওসব উপন্যাস—জোচ্চুরি। যেমন থিয়েটার। ব্যবসায়ীদের লাঞ্ছিত করা হয়। সত্যিই কি ব্যবসায়ীরা অত নির্বোধ? সত্যি? এই ধরো যেমন তোমার বাবা—

থিয়েটার আর স্কুল একই বস্তু ফোমা।—বলল লিউবা উপদেশ দেয়ার ভঙ্গিতে। —ব্যবসায়ীরা অমনি-ই ছিল। তাছাড়া বইয়ের ভিতরে জোচ্চুরি থাকবে কেমন করে?

রূপকথার গপ্পেরই মতো। কিছুই সত্যি নয়।

ওটা তোমার ভুল। তুমি কোনো বই পড়নি। কেমন করে বিচার করবে? বইয়ের ভিতরে বেশির ভাগই থাকে সত্য। বাস্তব। তোমাকে শিক্ষা দেয় কেমন করে বাঁচতে হয়।

থাক, থাক,—হাত নাড়ল ফোমা।—যেতে দাও ওসব কথা। কোনো উপকারই পাওয়া যায় না বই থেকে। যেমন ধরো, তোমার বাবা। তিনি কি বই পড়েন কখনো? কিন্তু তবুও দেখ, কী রকম বুদ্ধিমান তিনি। তাঁর দিকে তাকিয়ে আজ আমার হিংসে হচ্ছিল। সবার সঙ্গে তাঁর আচার-ব্যবহার এত সহজ সাবলীল আর চাতুর্যপূর্ণ! কেমন আলাপ-আলোচনা করছিলেন সবার সঙ্গে! দেখলে

সংগে সংগে তোমার মনে হবে যে দুনিয়ার যা কিছু তিনি চাইবেন, নিশ্চয়ই তা পাবেন।

কী তিনি চান?—প্রত্যুত্তরে বলল লিউবা—কিছুই না। শুধু টাকা। কিন্তু সংসারে এমন লোকও আছে যারা চায় সবার জন্যে সুখ, সবার জন্যে শান্তি। আর তা লাভ করার জন্যে প্রাণপাত করে পর্যন্ত কাজ করেন। দুঃখ পান তাঁরা, বরণ করেন মৃত্যু। আমার বাবার সংগে কেমন করে তুলনা হবে তাঁদের?

তাঁদের সংগে তুলনা করে কাজ নেই। তাঁরা পছন্দ করেন এক জিনিস, তোমার বাবা পছন্দ করেন অন্য জিনিস।

কিছুই চান না তাঁরা।

তা কেমন করে হবে?

তাঁরা চান সব কিছুর পরিবর্তন ঘটাতে।

সুতরাং কোনো একটা কিছু তো চান-ই তাঁরা!—মাথা নেড়ে বলল ফোমা।—সেখানে কে আমার সুখের কথা ভাবে? তাছাড়া কী শান্তি দিতে পারেন তাঁরা আমাকে যখন আমি নিজেই জানি না কী আমি চাই? না, তার চাইতে যাঁরা ঐ ভোজসভায় এসেছিল তাঁদের দিকেই তাকানো উচিত।

ওরা মানুষ নয়।—সোজাসুজি মন্তব্য করল লিউবা।

আমি জানি না তোমার চোখে কী তাঁরা। কিন্তু তবুও একটু তাকালে পরেই দেখতে পাবে, তাঁরা জানেন কোথায় তাঁদের স্থান। তাঁরা বুদ্ধিমান, সচ্ছল।

হায় ফোমা—নিদারুণ বিরক্তির সুরে বলে উঠল লিউবা—কিছুই বোঝ না তুমি। কোনো কিছুতেই আলোড়ন জাগে না তোমার মনে। তুমি একটি জড়।

এবার কিন্তু বড্ডো বাড়াবাড়ি হচ্ছে! একটুও সময় নেই আমার যে দেখি কোথায় আমি দাঁড়িয়ে।

তুমি একটি অন্তঃসারশূন্য মানুষ।—তীব্রকণ্ঠে বলল লিউবা।

তুমি তো আর আমার অন্তরের অন্তস্থলে ঢুকে বসোনি!—প্রত্যুত্তরে শান্তকণ্ঠে বলল ফোমা।—আমি কী ভাবি তুমি তা জানো না।

কী এমন আছে, যার জন্যে তুমি ভাববে?—কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠল লিউবা।

বটে? প্রথমত আমার কেউ নেই—আমি একা। দ্বিতীয়ত বাঁচতে হবে আমাকে। আমি কি বুঝি না ভাবো, যে আজ যেমন আছি এমনি করে বেঁচে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব? অন্যের উপহাসের পাত্র হয়ে? এমনকি লোকজনের সংগে কথা পর্যন্ত বলতে পারি না আমি। পারি না চিন্তা করতে।—কথার শেষে ফোমা একটু হাসল—বিব্রত হাসি।

পড়াশুনো করা দরকার।—ঘরের ভিতরে পায়চারি করতে করতে দৃঢ় প্রত্যয়ভরা কণ্ঠে বলল লিউবা।

কী যেন আমার অন্তরের অন্তস্থল আলোড়িত করে তুলেছে।—লিউবার দিকে না তাকিয়েই বলে চলেছে ফোমা। যেন সে বলছে নিজের কাছেই।—কিন্তু জানি না আমি কী সে বস্তু। যেমন আমি বুঝতে পারি যে আমার ধর্মবাবা যা কিছু বলেন তা যুক্তিপূর্ণ, সুবুদ্ধির কথা। কিন্তু তাতে আমার অন্তর সাড়া দেয় না। তাঁর চাইতে অন্যলোক আমার কাছে ঢের বেশি আকর্ষণীয়।

অভিজাতদের কথা বলছ তুমি?—প্রশ্ন করল লিউবা।

হ্যাঁ।

তোমার উপযুক্ত স্থান তাদেরই ভিতরে।—ঘৃণাভরা মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল লিউবার ঠোঁটের কোণে।—কী আর বলব তোমাকে। ওরা কি মানুষ? আত্মা বলে কিছু কি আছে নাকি ওদের?

কেমন করে জানলে তুমি? ওদের সংগে তো তোমার পরিচয় নেই!

কেন বই? অনেক বই পড়িনি বুঝি আমি ওদের সম্পর্কে?

পরিচারিকা সামোভার নিয়ে এল। বাধা পড়ল ওদের আলোচনায়। লিউবা নীরবে চা তৈরি করতে লাগল। ফোমা ওর মুখের দিকে তাকাল। সংগে সংগেই ওর মনে পড়ে গেল মেদিনস্কায়ার কথা। ইচ্ছে হল মেদিনস্কায়ার সংগে কথা বলে।

হাঁ—চিন্তিত মুখে বলল লিউবা—দিনে দিনে এ ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে আমার যে বেঁচে থাকাটা বড্ডো কঠিন। কী করব আমি তবে? বিয়ে করব? কাকে বিয়ে করব? একটা ব্যবসায়ীকে বিয়ে করব? লোকের রক্ত চুষে খাওয়া ছাড়া যার আর কোনো কর্ম নেই! কেবল মদ গেলে আর তাস পেটে—আর করে না কিছুই? বর্বর। চাই না আমি তা। আমি চাই স্বাতন্ত্র্য। আমি চাই তাই—কারণ আমি জানি জীবনের গড়ন কত ভুলে ভরা! পড়াশুনা করব? কিন্তু আমার বাবা তো তা দেবেন না। হা ঈশ্বর! কোথাও পালিয়ে যাবো? না, তেমন সাহসও আমার নেই। কী করব তাহলে?—শক্ত মুঠোয় দু'হাতে দু'হাত জড়িয়ে ধরে টেবিলের উপরে মাথা রাখল লিউবা।

যদি বুঝতে কেমন বিশ্রী বিরক্তিকর। একটিও জন-প্রাণী নেই এখানে। মায়ের মৃত্যুর পরে সবাইকে তাড়িয়ে দিয়েছেন বাবা। কেউ চলে গেছে লেখাপড়া করতে। লিপা পর্যন্ত ছেড়ে চলে গেছে আমাদের। সে আমাকে চিঠি লেখে,—পড়ো। হায়, পড়ছি আমি! পড়ছি!—হতাশাভরা কণ্ঠে বলে উঠল লিউবা। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিষাদমাখা কণ্ঠে আবার বলতে আরম্ভ করল :

অন্তর একান্তভাবে যা চায়, বইতে তা মেলে না। তাছাড়া সব সময়ে একা একা—পড়তেও ক্লান্তি আসে। চাই আমি একটি মানুষের সংগে কথা বলতে। কিন্তু, কেউ নেই কোথাও কথা বলবার মতো। তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠেছি আমি: মানুষ একবারই বাঁচে। মানুষের মতো বেঁচে থাকবার সময় এসেছে আমার জীবনে। কিন্তু একটি মানুষও নেই কাছে। কিসের জন্যে বেঁচে থাকব তবে? লিপা বলে : "পড়ো, তবেই বুঝতে পারবে।" আমি চাই রুটি, ও ছুঁড়ে দেয় পাথর। বুঝি আমি কী করা উচিত—যা লোকে বিশ্বাস করে, ভালোবাসে, তারই জন্যে তাকে দাঁড়াতে হয়—সংগ্রাম করতে হয়।...

তারপর কান্নাজড়ানো বিলাপের সুরে শেষ করল লিউবা তার কথা :

কিন্তু আমি একা। কার সংগে সংগ্রাম করব? কোনো শত্রু নেই এখানে। নেই কোনো মানুষ। একা আমি বাস করছি বন্দীশালায়।

হাতের আঙুলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফোমা শুনতে লাগল ওর কথা। অনুভব করল, ওর কথার ভিতর থেকে কী যেন এক গভীর বেদনার সুর ঝরে পড়ছে। কিন্তু কী সে কিছুতেই পারছে না বুঝে উঠতে। হতাশায় ভাঙা ব্যথিত মনে লিউবা যখন চুপ করে গেল, ওকে বলার মতো একটি কথাও খুঁজে পেল না ফোমা। পরিবর্তে যা বলল, তা যেন ভর্ৎসনার মতোই শোনাল :

তবেই দেখো, নিজেই বলছ তুমি বই পড়াটা বাজে, তবুও আমাকে উপদেশ দিচ্ছ বই পড়তে।

লিউবা ওর মুখের দিকে তাকাল। তার দুটো চোখের ভিতর দিয়ে যেন ক্রোধের অত্যুগ্র বহ্নিশিখা বেরিয়ে আসতে লাগল।

আঃ! এই বিক্ষোভ যদি জেগে উঠত তোমার ভিতরে! যে-ঝড় প্রতিনিয়তই বয়ে চলেছে আমার অন্তর মথিত করে। পিষে দিয়ে চলেছে আমার অন্তর। তবে আমারই মতো সে-চিন্তা কেড়ে নিত তোমার চোখের ঘুম। তুমিও তিক্তবিরক্ত উঠতে সব কিছুর উপরে। এমনকি নিজের উপরে পর্যন্ত। আমি ঘৃণা করি তোমাদের সবাইকে। ঘৃণা করি তোমাকে।

লিউবার সমস্ত চোখ মুখ, সমগ্র দেহ যেন জ্বলে উঠল আগুনের মতো রক্তিম আভা বিকিরণ করে। এমন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল লিউবা ওর মুখের দিকে, এমন ঘৃণাভরা কণ্ঠে বলতে লাগল কথা যে অবাক বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইল ফোমা। ওর কথায় আহত হওয়ার অনুভূতিবোধটুকুও যেন আর নেই। ইতিপূর্বে কোনোদিনই লিউবা এমনভাবে ওর সংগে বলেনি কথা।

কী হল তোমার?—বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল ফোমা।

আমি ঘৃণা করি—তোমাকেও! কী তুমি? মৃত। শূন্যগর্ভ। কেমন করে বাঁচবে তুমি? কী দেবে তুমি দুনিয়ার মানুষকে?—তীব্র বিদ্বেষভরা অনুচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগল লিউবা।

কিছুই দেবো না তাদের। নিজেরাই তারা নিজেদের পথ বেছে নিক।—প্রত্যুত্তরে বলল ফোমা। ও জানে যে একথায় ওর ক্রোধ আরো উঠবে ধূমায়িত হয়ে।

হতভাগ্য জীব!—ঘৃণামেশানো কণ্ঠে বলল লিউবা। ওর প্রত্যয়ভরা কণ্ঠের সুর—ওর ভর্ৎসনা, এসবকিছুর ভিতরের অন্তর্নিহিত শক্তি বাধ্য করল ফোমাকে একান্ত মনোযোগের সংগে শুনতে ওর অবজ্ঞাভরা কথা। ফোমা অনুভব করল ওর কথার ভিতর রয়েছে যুক্তি। আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এল লিউবার কাছে। কিন্তু ক্রুদ্ধ লিউবা ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে বসে রইল।

বাইরে তখনো রয়েছে দিনের আলো। অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভা পড়েছে জানলার সামনের লিন্ডেন গাছের মাথায়। কিন্তু ঘরের ভিতর নেমে এসেছে সন্ধ্যার ম্লান ছায়া। কাবার্ড, সাইডবোর্ড, ক্লক-ঘড়ি সবকিছু মনে হচ্ছে যেন আরো বড়ো হয়ে উঠেছে। ক্লক-ঘড়ির পেন্ডুলামটা প্রতিমুহূর্তেই জানলার পথে উঁকি মেরে পরক্ষণেই শ্রান্তিভরা শব্দ তুলে একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে লুকিয়ে পড়ছে। পেন্ডুলামটার দিকে তাকাল ফোমা। কেমন যেন বিশ্রী নিঃসংগ মনে হতে লাগল। লিউবা উঠে দাঁড়াল। জেবলে দিল টেবিলের উপরে ঝোলানো আলোটা। ওর মুখখানা পাংশু, কঠিন।

আমাকে খুঁজতে গিয়েছিলে তুমি?—গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল ফোমা।—কেন বলো তো? বুঝতে পারলাম না আমি।

তোমার সংগে কথা বলতে চাই না আমি।—ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দিল লিউবা।

সেটা অবশ্য তোমার খুশি। কিন্তু তবুও তোমার কাছে কী অপরাধ করেছি আমি বলো দেখি?

তুমি?

হ্যাঁ, আমি।

বুঝতে চেষ্টা করো আমাকে। আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। চতুর্দিক বন্ধ। এই কি জীবন? এমনি করেই কি মানুষ বেঁচে থাকে? বলতে পারো, কী আমি? বাবার সংসারের একটা গলগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নই। দাসী-বাঁদীর মতোই আশ্রয়

দিচ্ছে আমাকে। আমাকে বিয়ে দেবে। সেটাও গৃহরক্ষকের কাজ। এ ভীষণ জলা-ভূমি। ডুবে যাচ্ছি আমি। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

কিন্তু আমার কী করবার আছে?—প্রশ্ন করল ফোমা।

অন্য কারুর চাইতে তুমিও ভালো নও।

সেজন্যেই আমি তোমার কাছে অপরাধী?

হাঁ, অপরাধী। ভালো হওয়ার ইচ্ছে থাকা উচিত তোমার।

কিন্তু তা কি চাই না আমি?—উৎসাহভরা কণ্ঠে বলল ফোমা।

প্রত্যুত্তরে তরুণী কী যেন বলতে যাচ্ছে, ঠিক এমনি সময়ে কোথায় যেন বেজে উঠল ঘণ্টার শব্দ। চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলতে আরম্ভ করল লিউবা : বাবা আসছেন।

আরো কিছুক্ষণ যদি তিনি অন্যত্র থাকেন তাহলেও আমি দুঃখিত হবো না। ইচ্ছে হচ্ছে আরো খানিকক্ষণ বসে তোমার কথা শুনি। বড়ো অদ্ভুত কথা বলো তুমি।

আঃ! ঘুঘুপাখিরা আমার!—দোরের কাছে এসে উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠল তারাশভিচ।—চা খাচ্ছ তোমরা? খানিকটা আমার জন্যেও ঢালো লিউবভ।

মধুর হেসে হাতে হাত ঘসতে ঘসতে মায়াকিন এগিয়ে এসে বসল ফোমার কাছে। তারপর ফোমার কোঁকে একটা খোঁচা দিয়ে বলল :

কী সম্পর্কে কুজন গুঞ্জন হচ্ছিল তোমাদের?

এই নানান ধরনের আজে-বাজে বিষয় নিয়ে।—জবাব দিল লিউবা।

তোকে তো জিগ্‌গেস করিনি, করেছি?—মুখ বাঁকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল মেয়েকে বাপ।—তুই মুখ বুজে চুপ করে বসে থাক ওখানে। আর মেয়েদের যে কাজ তাই কর বসে।

ভোজসভার গল্প বলছিলাম আমি ওকে।—মায়াকিনের কথায় বাধা দিয়ে বলল ফোমা।

আঃ! তাই নাকি? আমিও বলি তবে ভোজসভার গল্প। শেষ পর্যন্ত তোমাকে আমি লক্ষ্য করেছি। ঠিক বুদ্ধিমানের মতো ব্যবহার করোনি তুমি।

তার মানে?—অসন্তুষ্ট ফোমা ভ্রূ-কুঁচকে প্রশ্ন করল।

মানে তোমার ব্যবহার হয়েছে নিতান্ত অসংগত, ব্যস্! ধরো যেমন গভর্নর যখন কথা বলছিলেন তোমার সংগে তুমি কিনা রইলে মুখ বুজে।

কী বলতাম আমি তাঁকে? তিনি বললেন কারুর বাবা মারা যাওয়া দুর্ভাগ্য। সে তো আমিও জানি। কী বলার ছিল আমার তাঁকে?

বলা উচিত ছিল, ঈশ্বরের যখন অভিপ্রায় তখন আমি অভিযোগ করি না ইওর এক্‌সেলেন্সি! কিংবা অমনি ধরনের কিছু একটা। লোকের বিনীত ভাবটা খুবই পছন্দ করেন গভর্নরবাহাদুর, বুঝলে?

ভেড়ার মতো চোখ করে কি তাকানো উচিত ছিল তাঁর দিকে?

ভেড়ার মতোই দেখাচ্ছিল তোমাকে। আর তারই কোনো প্রয়োজন ছিল না। ভেড়ার মতোও নয় কিংবা নেকড়ের মতোও নয়। কিন্তু এমন ভাব করা উচিত ছিল, ঐযে কথায় বলে—'তুমি আমাদের বাপ-মা, আমরা তোমার সন্তান'। সংগে সংগেই তিনি নরম হয়ে পড়বেন।

কিন্তু কিসের জন্যে এ সব?

যে-কোনো ব্যাপারের জন্যেই। একজন গভর্নর, বুঝলে কোনো না কোনো

ব্যাপারে সব সময়েই কাজে আসে।

কী শেখাচ্ছ ওকে বাবা?—বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলে উঠল লিউবা।

কী বললি?

নাচের মহড়া।

মিথ্যে কথা। শিক্ষিতা মূর্খ মেয়ে! আমি শেখাচ্ছি ওকে রাজনীতি। নাচের মহড়া নয়। জীবনের রাজনীতি শেখাচ্ছি আমি ওকে। তুই চলে যা এখান থেকে। কুসংসর্গ থেকে চলে গিয়ে খাবার করগে আমাদের জন্যে। যা, চলে যা!

লিউবা দ্রুত উঠে দাঁড়াল। তারপর তোয়ালেটা চেয়ারের উপরে রেখে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

চোখ মটকে মায়াকিন ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে টেবিলের উপরে আঙুল দিয়ে টোকা দিতে দিতে বলল :

আমি তোমাকে উপদেশ দেব ফোমা। শেখাব যা নাকি সবচাইতে সাচ্চা—সত্য জ্ঞান আর দর্শন। যদি বুঝতে পারো—উপলব্ধি করতে পারো জীবন নির্দোষ হয়ে গড়ে উঠবে।

ফোমা দেখল, বৃদ্ধের কপালের বলিরেখাগুলো কেমন করে কুঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগল। ওর মনে হল যেন কতগুলো স্লাভ অক্ষরের আঁকা-বাঁকা রেখা।

প্রথমত, বুঝলে ফোমা, দুনিয়ায় যখন বাস করতেই হবে তখন আশপাশে যা কিছুই ঘটছে সে সব সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে। কেন? না, নির্বুদ্ধিতার জন্যে না নিজেকে কষ্ট পেতে হয়। আর তোমার বোকামোর জন্যে না অন্যে দুর্ভোগ ভোগে। প্রত্যেক মানুষের কাজ-হচ্ছে দ্বিমুখী, বুঝলে ফোমা! একটা হচ্ছে যা লোকের চোখে পড়ে—অর্থাৎ তার ভুলের দিক। অন্যটা থাকে লুকানো, সবার দৃষ্টির অন্তরালে। সেটাই হচ্ছে তার প্রকৃত দিক। এ-দিকটাই দেখতে হবে তোমাকে, শিখতে হবে যাতে করে সব কিছুর সঠিক তাৎপর্য বুঝতে পারো। উদাহরণ স্বরূপ, ধরো যেমন ঐ অনাথ আশ্রম, শ্রমিকাবাস, দরিদ্রাবাস কিংবা ঐ ধরনের অন্যান্য সব প্রতিষ্ঠান। কিসের জন্যে এসব ভেবে দেখ দেখি একবার?

এতে আবার ভাববার কী আছে?—ক্লান্ত কণ্ঠে বলল ফোমা। সবাই জানে ওগুলো কিসের জন্যে। অসমর্থ গরিব লোকদের জন্যে, আবার কি?

তাই নাকি? কোনো একটা লোক সম্পর্কে হয়তো সবাই জানে যে লোকটা পাজী, বদমাইশ। কিন্তু তবুও লোকে তাকে ডাকে ইভান বা পিতর বলে। আর গাল দেয়ার বদলে সসম্মানে তার পিতৃ-পদবী জুড়ে দেয় তার নামের সঙ্গে।

তার সঙ্গে এর সম্পর্কটা কী?

সম্পর্ক আছে বৈকি? যেমন, তোমরা বলবে, ঐ বাড়িগুলো তৈরি হল গরিবদের জন্যে, ভিক্ষুকদের জন্যে। সুতরাং পুরোপুরি সামঞ্জস্য রয়েছে খ্রীষ্টের নির্দেশের সঙ্গে। কিন্তু ভিক্ষুক কারা? ভিক্ষুক হচ্ছে তারাই অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় যারা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় খ্রীষ্টের নাম। ওরা খ্রীষ্টের ভাই। গানের ভিতর দিয়ে ওরা আমাদের মনে করিয়ে দেয় খ্রীষ্টের কথা—প্রতিবেশীকে সাহায্য করবার পবিত্র নির্দেশ। কিন্তু মানুষ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে তাদের জীবন যে অসম্ভব হয়ে উঠেছে খ্রীষ্টের নির্দেশ অনুসারে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা। মাত্র একবার নয় শত-সহস্রবার ক্রুশবিদ্ধ করছি আমরা তাঁকে। কিন্তু তবুও তাঁকে জীবন থেকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারি না। কারণ তাঁর দরিদ্র ভাইয়েরা প্রতিদিন পথে-ঘাটে তাঁর নাম গেয়ে বেড়ায় আর আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর

কথা। কিন্তু আমরা তাদের বন্দী করার ব্যবস্থা করেছি বাড়ির ভিতরে, যাতে না পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে আমাদের চেতনা, আমাদের বিবেক-বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

চালাক!—ধর্মবাপের মুখের দিকে অপলক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অনুচ্চ কণ্ঠে বলে উঠল ফোমা।

আঃ!—হৃষ্ট উৎফুল্ল মায়াকিন বলে উঠে। তাঁর দুটো চোখ যেন জয়ের আনন্দে চক্‌চক্‌ করছে।

কিন্তু আমার বাবা একথা ভাবতে পারেননি কেন?—নিদারুণ অস্বস্তিভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করল ফোমা।

দাঁড়াও! শোনো আরো একটু। ব্যাপারটা আরো বেশি খারাপ। সুতরাং দেখতে পাচ্ছ যে ওদের আমরা ঐ সমস্ত বাড়িতে বন্দী করে রাখার ব্যবস্থা করেছি। ব্যবস্থা করেছি যাতে খুব কম খরচে ওদের রাখা যায়। ঐ সব অসমর্থ বুড়ো-বুড়ী ভিখিরিদের কাজ করবার ব্যবস্থা করেছি। তাই এখন আর আমাদের ভিক্ষে দিতে হবে না। তাছাড়া, যে হেতু আমরা ঐ সব ছিন্নকন্থা জীর্ণ বেশ ভিক্ষুকদের সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করেছি তাদের নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশা আর দারিদ্র্য আমাদের চোখে দেখতে হবে না। সুতরাং ভাবতে পারব যে দুনিয়ার সমস্ত মানুষই ভালো খেয়ে ভালো পরে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। এই জন্যেই ঐ সব বাড়ি তৈরি হচ্ছে—সত্যকে ঢেকে রাখার জন্যে। জীবন থেকে খ্রীষ্টকে নির্বাসিত করবার জন্যে। বুঝতে পারলে পরিষ্কার?

হাঁ।—বলল ফোমা। বৃদ্ধের চাতুর্যপূর্ণ কথায় কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল।

কেবলমাত্র এইটুকু নয়। এখনো তো সব কথা বলিনি।—পরমোৎসাহে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল বৃদ্ধ। ওর মুখের উপরের বলিরেখাগুলো যেন নাচতে আরম্ভ করেছে। দীঘল নাকটা উঠেছে কুঁচকে। প্রবল উত্তেজনা ও উদ্দীপনায় বেজে উঠল কণ্ঠ:

এবার বিষয়টাকে অন্যদিক থেকে দেখা যাক। কারা বেশি চাঁদা দিয়েছে ঐ গরিব লোকদের জন্যে? কারা গড়ে দিচ্ছে ঐসব প্রতিষ্ঠান? নিঃস্ব গরিবদের জন্যে বাড়ি করে দিচ্ছে? ধনীরা। ব্যবসায়ীরা—আমাদের ব্যবসায়ী সংঘ। ভালো কথা। কিন্তু কারা আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করেন? অভিজাতেরা—সরকারী লোকেরা। তাছাড়া অন্যান্য লোক যারা আমাদের শ্রেণীর নয়। আইন, সংবাদপত্র, বিজ্ঞান—সব কিছুই ওদের মুঠোয়। আসে ওদের কাছ থেকেই। আগে ওরা ছিল ভূ-স্বামী। এখন জমি ওদের হাত থেকে চলে গেছে তাই ওরা চাকরি করছে। বেশ কথা। কিন্তু আজকের দিনে কারা সবচাইতে প্রতিপত্তিশালী? সমস্ত সাম্রাজ্যের ভিতরে ব্যবসায়ীরাই হচ্ছে সবচাইতে প্রতিপত্তিশালী। কারণ তাদের আছে লক্ষ লক্ষ টাকা। তাই নয় কি?

হাঁ।—ফোমা সমর্থন জানাল। তারপর উৎকর্ণ হয়ে উঠল পরবর্তী কথা শোনবার জন্যে। যে-কথা ইতিমধ্যেই চক্‌চক্‌ করে উঠেছে ওর ধর্মবাপের চোখের ভিতরে।

একটু লক্ষ্য করে দেখো,—প্রত্যেকটি কথায় জোর দিয়ে পরিষ্কার কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করল বৃদ্ধ,—কিন্তু আজকের দিনে জীবন নিয়ন্ত্রণ করার দিক থেকে কোনো হাত নেই আমাদের ব্যবসায়ীদের। কোনো কথাই চলে না আমাদের। জীবন সংগঠিত করে অন্য লোকে। আর ওরাই ক্ষত সৃষ্টি করে চলেছে জীবনে—ঐ অলস

নিঃস্ব হতভাগ্যেরা। ঐ ক্ষত সৃষ্টি করে ওরা প্রতিবন্ধকতা করছে জীবনের অগ্রগতির। সর্বনাশ করছে। সঠিকভাবে বিচার করতে গেলে ওদেরই কর্তব্য ঐ সব ক্ষত সারিয়ে জীবনকে সুন্দর, পবিত্র করে তোলা। কিন্তু সে কাজ করছি আমরা। আমরা দান করছি গরিবদের জন্যে। ওদের দেখাশোনা করছি আমরা। এখন নিজেই বিচার করে দেখো,—কেন আমরা অন্যের ছেঁড়া কাঁথা সেলাই করে দেবো? যে কাঁথা আমরা ছিঁড়িনি? কেন আমরা সে বাড়ি মেরামত করে দেবো যে বাড়িতে বাস করবে অন্য লোক? আর বাড়িটাও অন্যের? তাই আমাদের উচিত নয় কি কেবল এক পাশে দাঁড়িয়ে থেকে দেখে যাওয়া? যতদিন পর্যন্ত না পচন বেড়ে বেড়ে গলায় নিঃশ্বাস আটকে আসে? ঐ ওদের—যারা আমাদের কাছে অপরিচিত। ওরা কিছুতেই এ অবস্থার সমাধান করতে পারবে না। পারবে না অবস্থাকে আয়ত্বে আনতে। সে সামর্থ তাদের নেই। তখন দেখবে, ওরা এসে বলবে আমাদের কাছেঃ দয়া করে সাহায্য করুন আমাদের মশাইরা। আর আমরা তখন বলব : আমাদের কাজ করবার সুবিধা দাও। অধিকার দাও আমাদের জীবন গড়ে তোলার কাজে। অংশ দাও। আর যে মুহূর্তে তা দেবে, ওদের সমস্ত নোংরা জঞ্জাল এক নিমেষে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দেবো। তখন সম্রাট দেখতে পাবেন পরিষ্কার কারা তাঁর অনুগত বিশ্বস্ত ভৃত্য। বুঝলে?

নিশ্চয়ই।—দারুণ উৎসাহে বলে উঠল ফোমা।

মায়াকিন যখন বলছিল সরকারী কর্মচারীদের কথা, ফোমার কেবলই মনে পড়ছিল ভোজসভায় উপস্থিত লোকগুলোর মুখ। মনে পড়ছিল সেই সুচতুর বাচাল সেক্রেটারিকে। পরক্ষণেই ওর মনে হল ঐ মোটা মোটা ভদ্রলোকদের আয় হয়তো বা বছরে এক হাজার টাকাও নয়। আর ফোমার নিজের আয় দশ লাখ। কিন্তু তবুও ঐ লোকটা কেমন সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন ধারণ করে চলেছে। কিন্তু ফোমা জানে না কী করে বাঁচতে হয়। বাঁচাটাই যেন ওর পক্ষে লজ্জার হয়ে উঠেছে। এই তুলনা ও মায়াকিনের কথা মিলে ওর ভিতরে জেগে উঠল নানান রকমের চিন্তা। কিন্তু শুধু একটি জিনিসই ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারল—বলতে পারল মুখ ফুটে একটি মাত্র কথা—

আমরা কি সত্যিই কেবল টাকা রোজগার করতেই আছি? লাভ কী সে টাকায় যদি তা আমাদের ক্ষমতায়ই না সমাসীন করতে পারে?

অ্যাঁ? হাঁ!—চোখ মটকে বলল মায়াকিন।

অ্যাঁ!—কেমন যেন একটু আহত হয়েই বলল ফোমা : তাহলে আমার বাবার সম্পর্কে কী হল? বলেছিলেন বাবাকে একথা?

গত বিশ বছর ধরেই বলে আসছি।

কী বলতেন তিনি?

আমার কথা তার কানে ঢুকত না। তোমার বাবার মাথাটা ছিল একটু মোটা। যদিও আত্মাটা ছিল দরাজ। কিন্তু মনটা ছিল তার নিজের ভিতরে ঢাকা। হ্যাঁ, একটা দারুণ ভুল করে গেছে সে। ঐ টাকাটার জন্যে আমি দারুণ দুঃখিত।

আপনি নিজে তাঁর দশ ভাগের এক ভাগও উপার্জন করে তারপর একথা বলবেন।

আসতে পারি?—দরজার ওপাশ থেকে ভেসে এল লিউবার কণ্ঠস্বর।

হাঁ, সোজা ঢুকে চলে আয়।—বলল মায়াকিন।

এখন খাবে তোমরা?—ভিতরে এসে জিগ্‌গেস করল লিউবা।

বেশ, খেয়ে নেয়া যাক।

পাশের গা-আলমারির কাছে এগিয়ে গেল লিউবা। পরক্ষণেই জেগে উঠল থালা-প্লেটের শব্দ। ইয়াকভ তারাশভিচ তাকাল লিউবার দিকে। তার ঠোঁটদুটো নড়ে উঠল। হঠাৎ ফোমার হাঁটুর উপরে একটা চাপড় মেরে বলে উঠল মায়াকিনঃ

এ-ই হচ্ছে পথ, বুঝলে ফোমা, ভেবে দেখো।

প্রত্যুত্তরে একটু হাসল ফোমা। মনে মনে বলল ঃ

বাবার চাইতে ঢের বেশি চালাক।

কিন্তু সংগে সংগেই ওর ভিতর থেকে আর-একটা কণ্ঠ বলে উঠল ঃ

চালাক, কিন্তু নীচ।

৫

যতই দিন যেতে লাগল, মায়াকিনের প্রতি ফোমার বৈধ মনোভাব ততই বেড়ে যেতে লাগল। দারুণ ঔৎসুক্য নিয়ে একান্ত মনোযোগের সঙ্গে শোনে মায়াকিনের কথা। সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করে মায়াকিনের সঙ্গে প্রত্যেকটি সাক্ষাৎ ওর অন্তরে বৃদ্ধের প্রতি জাগিয়ে তোলে বিরুদ্ধ মনোভাব; বিজাতীয় বিতৃষ্ণা। কখনো বা তার কথাবার্তা ফোমার অন্তরে জাগিয়ে তোলে ভয়, কখনো বা দৈহিক বিতৃষ্ণা। বৃদ্ধ যখন কোনো কিছুতে খুশি হয়ে ওঠে তখনই ওর অন্তরে জেগে ওঠে বীতরাগ। হাসতে গেলে বৃদ্ধের মুখের বলিরেখাগুলো কাঁপতে থাকে। ফলে প্রতিমুহূর্তেই পরিবর্তিত হতে থাকে মুখের ভাব। শুকনো পাতলা ঠোঁট আকর্ণ বিস্তৃত হয়ে উঠে কাঁপতে শুরু করে। বেরিয়ে পড়ে কালো কালো ভাঙা দাঁত। লাল দাড়ির গোছা মনে হয় যেন আগুনের শিখার মতো জ্বলছে। মরচে-ধরা কবজার মতো হাসির শব্দ। সব মিলে বৃদ্ধকে মনে হয় যেন একটা গিরগিটি।

বৃদ্ধের প্রতি এই বিরূপ মনোভাব চেপে রাখতে পারে না ফোমা। কথায়, ভাব-ভঙ্গিতে অনেক সময়েই তা প্রকাশ করে ফেলে। কিন্তু সেসব লক্ষ্য না করার ভান করে মায়াকিন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর চালচলন, ওর প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। নিজের ছোট দোকানটিকে পর্যন্ত অবহেলা করে মায়াকিন নিজেকে নিয়োজিত রাখে তরুণ গর্দিয়েফের জাহাজ সংক্রান্ত কাজে। ফলে ফোমার প্রচুর অবসর। শহরে মায়াকিনের প্রতিষ্ঠা আর ভলগার তীরে তার বিভিন্ন লোকের সঙ্গে ব্যাপক পরিচিতি থাকার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য চলছে সুন্দরভাবে। কিন্তু এ ব্যাপারে মায়াকিনের প্রবল উৎসাহ দেখে ফোমার মনে সেই সন্দেহই দৃঢ় হয়ে উঠল যে ওর ধর্মবাপ লিউবার সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে কৃতসংকল্প। ফলে বৃদ্ধের সম্পর্কে ফোমার মনোভাব আরো প্রতিকূল হয়ে উঠল।

লিউবাকে পছন্দ করে ফোমা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর সম্পর্কে কেমন যেন একটা সন্দেহ, একটা আশঙ্কা জাগে ফোমার মনে। বিয়ে করেনি লিউবা, আর সে সম্পর্কে একটি কথাও বলে না মায়াকিন। কখনো পার্টি দেয় না। আমন্ত্রণ করে না কোনো যুবককে বাড়িতে। কিংবা লিউবাকেও বাড়ির বার হতে দেয় না কখনো। লিউবার সমস্ত মেয়ে বন্ধুদের বিয়ে হয়ে গেছে। আগ্রহভরা ঔৎসুক্য নিয়ে ফোমা শোনে লিউবার কথা। যেমন শোনে ওর বাবার কথা। তারিফ করে। কিন্তু যখনই পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তারাসের কথা বলতে আরম্ভ করে লিউবা, ফোমার মনে হয় যেন তারাসের আড়ালে লুকিয়ে রাখছে লিউবা অন্য একটি মানুষকে। হয়তো সে লোকটি হচ্ছে ইয়ঝভ। ওরই মুখে শুনেছে ফোমা যে সেও কোনো কারণে বিশ্ব-বিদ্যালয় ছেড়ে চলে গেছে মস্কো। লিউবার ভিতরে সরলতা সহৃদয়তা রয়েছে অনেকখানি, যা নাকি তৃপ্তি দেয় ফোমাকে। ওর কথায় প্রায়ই ওর প্রতি ফোমার

অন্তরে জাগিয়ে তোলে করুণা। তখন ওর মনে হয় বুঝিবা লিউবা ইহসংসারে নেই। ও যেন জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছে।

বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিনে ভোজসভায় ফোমার আচরণ জানাজানি হয়ে গেছে। তাতে দারুণ বদনাম হয়েছে ওর ব্যবসায়ী মহলে। লক্ষ্য করেছে ফোমা বাজারে সবাই অবজ্ঞার দৃষ্টি নিয়ে তাকায় ওর দিকে। কেমন যেন অদ্ভুত ভঙ্গিতে কথা বলে ওর সঙ্গে। একদিন শুনতে পেল ফোমা অনুচ্চ ঘৃণাভরা কণ্ঠে কে যেন বলছেঃ গরুদিয়েফটা একটা মেয়েলী পুরুষ!

ফোমা বুঝল কথাটা বলেছে ওকে লক্ষ্য করেই। কিন্তু কে বলল, দেখার জন্যে মুখ ফেরাল না। যে-সব ধনীলোকদের দেখে ওর মনে ভয় হত, তাদের ঐশ্বর্য ও জ্ঞানের ভোজবাজী ধরা পড়ে গেছে ওর চোখে। অনেকবার তারা ওর হাত থেকে অনেক লাভজনক ব্যবসা ছিনিয়ে নিয়েছে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ফোমা যে ওরা আবারও করবে তা। ফোমা দেখল, ওরা অর্থলোলুপ—একে অন্যকে ঠকাবার জন্যে তৈরি হয়েই আছে সুযোগের অপেক্ষায়।

একদিন ফোমা যখন এ সম্পর্কে বলল তার ধর্মবাপকে, প্রত্যুত্তরে বলল মায়াকিন ঃ

তাছাড়া আর কী? ব্যবসাটা যুদ্ধেরই মতো কঠিন ব্যাপার। এখানে যুদ্ধ হয় টাকার জন্যে। আর ঐ টাকার মধ্যেই থাকে প্রাণ।

এ আমার ভালো লাগে না।—বলল ফোমা।

সবকিছু যে আমারও ভালো লাগে তা নয়। দারুণ জোচ্চুরি রয়েছে এর ভিতরে। কিন্তু কথা হচ্ছে ব্যবসাক্ষেত্রে সাধুতা একেবারেই অসম্ভব। খুবই ধূর্ত হতে হবে তোমাকে। ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে যখন কারুর কাছে যাবে তখন এক হাতে নেবে মধুর পাত্র, অন্য হাতে ছুরি। সবাই চাইবে পাঁচ পয়সার জিনিস আধ পয়সায় কিনতে।

কিন্তু এটা তো ভালো কথা নয়।—চিন্তিত মুখে বলল ফোমা।

শেষে দেখবে ভালোই হবে। যখন জিতবে তখন সবই ভালো মনে হবে। বুঝলে ফোমা জীবনটা বড্ডো সরল ঃ হয় তুমি সবাইকে কামড়াবে নয়তো তোমাকে নর্দমায় গড়াগড়ি দিতে হবে।—বৃদ্ধ একটু হাসল। তার মুখের ভিতরের ভাঙা দাঁত একটা গভীর চিন্তা জাগিয়ে তুলল ফোমার মনে।

বোধ হয় অনেককেই কামড়েছেন আপনি?

একটিমাত্র কথাই আছে, সংগ্রাম।—আবার বলল মায়াকিন।

এটাই কি সত্যি?—অনুসন্ধিৎসু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মায়াকিনের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল ফোমা।

তার মানে? কী বলছ, সত্যি?

এর চাইতে ভালো কি কিছুই নেই? সবকিছুর ভিতরে এই?

এছাড়া আর কী হতে পারে বল? সবাই বাঁচে তার নিজের জন্যে। আমরা সবাই চাই, নিজের ভালো হোক। আর ভালোটা কী? না, অন্যের সামনে গিয়ে তার উপরে দাঁড়ানো। অর্থাৎ প্রত্যেকেই চায় জীবনে প্রথম স্থানটি অধিকার করতে। কেউ বা চায় এভাবে, কেউ বা ওভাবে। কিন্তু সবাই-ই চায় যে বহুদূর থেকেও লোকে তাকে দেখুক—উঁচু গম্বুজের চূড়ার মতো। তাছাড়া, সম্ভবত মানুষের গতিই উর্ধ্বমুখী। এমন কি জব-এর বইতেও লেখা আছে ঃ "মানুষ দুঃখ কষ্টের ভিতরে জন্মে স্ফুলিঙ্গেরই মতো উর্ধ্বগতি হওয়ার জন্যে।" তবেই দেখো ঃ এমন

কি শিশুরাও খেলতে গিয়ে চেষ্টা করে অন্যকে হারিয়ে দিতে। আর প্রত্যেক খেলায়ই একটা চরম অবস্থা আসে যখন খেলাটা উপভোগ্য হয় সবচাইতে বেশি। বুঝলে?

বুঝলাম।—ফোমার কণ্ঠে জেগে উঠল আত্মপ্রত্যয়ের সুর।

কিন্তু সেটা তোমাকে অনুভব করতে হবে অন্তর দিয়ে। কেবল বুঝলেই বেশি দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। আন্তরিক ইচ্ছে থাকা চাই। এমন ইচ্ছে যে বিরাট পর্বতকেও মনে হবে একটা ছোট্ট টিলা। আর সমুদ্রকে মনে হবে ডোবা। আমার যখন তোমার মতো তরুণ বয়েস ছিল তখন জীবন ছিল সহজ। কিন্তু তুমি সবে-মাত্র লক্ষ্য স্থির করেছ—তোমার সামনে রয়েছে লক্ষ্য। কিন্তু তবুও খুব তাড়াতাড়ি ভালো ফল পাবে না।

বৃদ্ধের একঘেয়ে বক্তৃতার উদ্দেশ্য অচিরেই সফল হয়ে উঠল। শুনতে শুনতে জীবন সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা জন্মাল ওর মনে। অন্যের চাইতে ভালো হতে হবে ওকে—মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করল ফোমা। যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ বপন করল বৃদ্ধ ওর মনে, ধীরে তা অঙ্কুরিত হতে লাগল। মূল বিস্তার করল ওর অন্তরে। কিন্তু তবুও অন্তর যেন ভরপুর হয়ে উঠল না। কারণ মেদিনস্কায়ার সম্পর্কে ওর অন্তরে জেগে উঠেছে এক স্বাভাবিক আকর্ষণ। এক ব্যাকুল প্রতীক্ষা-মানতা জেগে থাকে ওর অন্তরে। তাঁকে একটু দেখার জন্যে জেগে ওঠে অদম্য আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু তার সামনে কেমন যেন ভীত হয়ে পড়ে। হারিয়ে ফেলে নিজের বুদ্ধি। ফোমা বুঝতে পারে আর তাতে ওর অন্তর বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

প্রায়ই ফোমা তার ওখানে যায় দেখা করতে। কিন্তু বাড়িতে তাকে একা পাওয়া খুবই দুষ্কর। গুড়ের উপরে মাছির মতো আতরমাখা ফুলবাবুরা সব সময়েই ওকে ঘিরে থেকে গুঞ্জন তোলে। তারা কথা বলে ফরাসি ভাষায়, হাসে গায়। কিন্তু ফোমা ঈর্ষাকাতর দৃষ্টি মেলে নীরবে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে আর অন্তরে অন্তরে জ্বলে পুড়ে মরে। দামী আসবাবপত্রে ঠাসা মেদিনস্কায়ার ড্রইং রুমের এক কোণে পায়ের উপরে পা তুলে তীব্র কঠিন দৃষ্টি মেলে বসে থাকে ফোমা, আর লক্ষ্য করে।

নরম কার্পেটের উপর দিয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারণ করে ফিরতে থাকে মেদিনস্কায়া। কখনো বা ওর দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে হাসে একটু যখন তার স্তাবকেরা ওকে ঘিরে শুরু করে কূজন গুঞ্জন। সবাই কেমন চাতুর্যে বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট টেবিল-চেয়ার, ফুলদানি, ইতস্তত ছড়ানো নানা রকমের সুন্দর সুন্দর হাল্‌কা শৌখিন আসবাবপত্রে বোঝাই ঘরের ভিতর দিয়ে সাবলীলভাবে চলাফেরা করে! ফোমা যখন ঘরের ভিতরে হাঁটে তখন কার্পেটে ওর পা ডোবেনা। আর সবকিছুই যেন ওর জামায় আটকে যায়, নড়ে ওঠে, পড়ে যায়। একটা ব্রোঞ্জের নাবিক-মূর্তি রয়েছে পিয়ানোর পাশে। হাতদুটো উপরে তোলা। একটা হাত যেন প্রাণ বাঁচানোর জন্যে রিঙ্‌ ছুড়ে মারতে উদ্যত। রিঙটার সঙ্গেই রয়েছে একটা তারের দড়ি। ঐ দড়িটায় প্রায়ই ফোমার চুল আটকে যায়। ফলে সোফিয়া পাভলোভ্‌না আর তার স্তাবকদল ওঠে হেসে। অন্তরে অন্তরে দারুণ আহত হয় ফোমা।

কিন্তু যখন একা থাকে সোফিয়ার কাছে, তখনো কম অস্বস্তি অনুভব করে না। মধুর হেসে ওকে অভ্যর্থনা জানায় সোফিয়া তারপর এসে বসে ওর পাশে ড্রইং রুমের এক কোণের নরম আসনে। শুরু করে কথাবার্তা। প্রায়ই সে কথায় থাকে অভিযোগ—সবার বিরুদ্ধে।

হয়তো বিশ্বাস করবে না, কতখানি যে খুশি হই আমি তোমাকে দেখে!

তারপর বেড়ালের মতো নিচু হয়ে কালো চোখের দৃষ্টি মেলে ফোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কেমন যেন একটা লোলুপ আগ্রহাকুলতা জ্বলে ওঠে ওর সেই দৃষ্টি বেয়ে।

খুব ভালোবাসি আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে।—গানের সুরের মতো কম্পিত সুরেলা কণ্ঠে বলে সোফিয়া।—দারুণ তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছি আমি ঐ লোকগুলোর উপরে। এমন উত্যক্ত করে ওরা—বিরক্তিকর! নেহাত সাধারণ, শূন্যগর্ভ। আর তুমি সজীব, সরল, প্রাণবন্ত। তুমিও ওদের পছন্দ করো না—তাই না?

আদৌ সহ্য করতে পারি না আমি ওদের।—দৃঢ়কণ্ঠে বলে ফোমা।

আর আমাকে?—কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করে সোফিয়া। ওর চোখের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল ফোমা।

একথা কতবার জিগ্‌গেস করবেন বলুন তো?

মুখ ফুটে বলতে বাধে বুঝি আমার কাছে?

বাধে না অবশ্য, কিন্তু কেন বলব বলুন?

জানতে চাই আমি।

আপনি আমাকে নিয়ে খেলা করছেন।—তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল ফোমা।

ফোমা!—অবাক বিস্ময়ে চোখদুটো বড়ো করে প্রশ্ন করল সোফিয়া : কেমন করে খেলছি আমি তোমাকে নিয়ে? খেলা করা মানে?

এমন সুন্দর, এমন পবিত্র, স্বর্গীয় দেবদূতের মতো দেখাল সোফিয়ার মুখ-খানা যে ফোমা তাকে আর অবিশ্বাস করতে পারল না।

আমি ভালোবাসি আপনাকে। আপনাকে ভালো না বেসে থাকা অসম্ভব।—উত্তাপভরা গাঢ় কণ্ঠে বলল ফোমা। কিন্তু পরক্ষণেই ব্যথাতুর কণ্ঠে বলল : কিন্তু আপনি তো তা চান না। এতটুকুও প্রয়োজন নেই আপনার!

কী কথা!—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল মেদিনস্কায়া। তোমার মুখে যৌবনোচ্ছল এই মৌলিক কথাগুলো শুনতে সব সময়েই আনন্দ পাই আমি। তুমি কি আমার হাতে একটা চুমু খাবে?

আর একটি কথাও না বলে নিচু হয়ে ফোমা সোফিয়ার শীর্ণ কোমল হাতখানি সযত্নে একান্ত সন্তর্পণে ধরে ঝুঁকে পড়ে বহুক্ষণ ধরে উষ্ণ চুম্বনে ভরিয়ে দিতে লাগল। ওর সেই উষ্ণ উত্তেজনায় এতটুকুও বিচলিত হল না সোফিয়া। কোমল হাসিভরা মুখে দৃপ্ত ভঙ্গিতে হাতখানা ছাড়িয়ে নিল। তারপর চিন্তিত মুখে ফোমার মুখের দিকে তাকাল। তার চোখের ভিতর থেকে কেমন যেন একটা অদ্ভুত আভা ঝলসে উঠতে লাগল। সে দৃষ্টির সামনে হকচকিয়ে গেল ফোমা। যেন একটা দুষ্প্রাপ্য অদ্ভুত কিছু একটা দেখছে এমনি সন্ধানী দৃষ্টি মেলে সোফিয়া ফোমার দিকে তাকিয়ে বলল :

তোমার অন্তর কতখানি শক্তি, তেজ ও সজীবতায় ভরপুর সে কথা কি জানো তুমি? তোমরা ব্যবসায়ীরা একটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের, অভিনব জাত। একটা সমগ্র জাতি। যাদের ভিতরে রয়েছে মৌলিক ঐতিহ্য, রয়েছে দেহ ও মনে বিরাট উদ্দীপনা। এই ধরো যেমন তুমি। তুমি হচ্ছ একটি মহামূল্যবান মণি। কিন্তু তোমাকে মার্জিত হতে হবে।

ওহ্‌!

সোফিয়া যখনই বলে 'তোমরা' বা 'তোমাদের ব্যবসায়ীদের ফ্যাশানে'—ফোমার মনে হয় যেন ঐ কথাগুলোর ভিতর দিয়ে সে ওকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। ওর অন্তর ব্যথায় ভরে ওঠে—রক্তাক্ত হয়ে যায়। হারিয়ে ফেলে কথা। নীরব দৃষ্টি মেলে সোফিয়ার সুসজ্জিত, ফুলের মতো কোমল সুগন্ধময় কুমারীসুলভ দেহের দিকে তাকিয়ে থাকে। কখনো বা ওর অন্তরে জেগে ওঠে আকুলতা। ইচ্ছে হয় সোফিয়াকে বুকে টেনে এনে মুখখানা চুমোর চুমোয় ভরিয়ে দেয়। কিন্তু ভয় হয়, সোফিয়ার সৌন্দর্য—তার ক্ষীণ কোমল তনুর পেলব কমনীয়তা পাছে নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া সোফিয়ার শান্ত কোমল কণ্ঠ, স্বচ্ছ সজাগ দৃষ্টি ওর অন্তরে জেগে-ওঠা উচ্ছল উদ্দীপনা মুহূর্তে প্রশমিত করে জাগিয়ে তোলে এক শৈত্যময় অনুভূতি। মনে হয় সোফিয়ার দৃষ্টি যেন বক্ষপঞ্জর ভেদ করে অন্তরের অন্তস্তলে গিয়ে পৌঁছে ওর সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ভাব মুহূর্তে পড়ে ফেলছে। কিন্তু এ ধরনের উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ হয় খুবই কম। সাধারণত তরুণ ফোমা মেদিনস্কায়াকে করে শ্রদ্ধা। তার সৌন্দর্য, তার কথা, তার সুন্দর পরিচ্ছদ, তার সব কিছুকেই তারিফ করে। কিন্তু এই সশ্রদ্ধ ভালোবাসা ছাড়াও ফোমার অন্তর দূরত্বের এক ব্যথাভরা চেতনায় ভারি হয়ে উঠেছে।

খুব অল্প সময়ের ভিতরেই দুজনার ভিতরে গড়ে উঠল ঐ সম্পর্ক। মাত্র দু'তিনবার দেখা সাক্ষাতের পরেই তরুণ ফোমার উপরে পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করল মেদিনস্কায়া। তারপর ধীরে ধীরে শুরু করল পীড়ন করতে। একটি স্বাস্থ্যবান তরুণকে কাছে পেতে চায় মেদিনস্কায়া করুণাপ্রার্থী হিসাবে। শুধু কণ্ঠস্বর আর দৃষ্টির খোঁচায় তার ভিতরের জন্তুটাকে খেপিয়ে তুলে পোষ মানাতে ভালোবাসে। নিজের শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বের সম্পর্কে দৃঢ়নিশ্চিত মেদিনস্কায়া ফোমাকে খেলিয়ে আনন্দ পায়।

মেদিনস্কায়ার কাছ থেকে চলে আসার পর নিদারুণ উত্তেজনায় প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়ে ফোমা। অন্তর-জুড়ে ফেনিয়ে ওঠে সোফিয়ার প্রতি প্রবল অভিযোগভরা বিদ্বেষ। আর রাগ হয় নিজের উপর। এক ব্যথাভরা মদির মোহাচ্ছন্নতায় ভরে ওঠে বুক। কিন্তু দুদিন পরেই আবার ছুটে যায় সেই পীড়ন, সেই জ্বালা বুক পেতে গ্রহণ করতে।

একদিন ভয়ে ভয়ে জিগ্‌গেস করল ফোমা মেদিনস্কায়াকে :

সোফিয়া পাভ্‌লোভনা! আপনার ছেলেপুলে হয়েছিল কি কোনোদিন?

না।

আমিও ভেবেছিলাম তাই।—খুশিভরা কণ্ঠে বলল ফোমা।

কেন মনে হল তোমার একথা?—ছোট্ট মেয়ের সরলতা মাখা দৃষ্টি মেলে প্রশ্ন করল মেদিনস্কায়া।

বলো না, কেন মনে হল তোমার এ কথা? আর কেনই বা জানতে চাইলে আমার ছেলেপুলে হয়েছে কিনা?

দেখুন যে মেয়েদের ছেলেপুলে হয় তাদের চোখের দৃষ্টিই অন্য রকমের।

তাই নাকি? কী রকমের হয় বলো তো?

নির্লজ্জ।—বলল ফোমা।

রুপোলি হাসির ঝঙ্কারে ফেটে পড়ল মেদিনস্কায়া। তার মুখের দিকে তাকিয়ে ফোমাও হেসে উঠল।

মাপ করুন।—অবশেষে হাসি থামিয়ে বলল ফোমা,—হয়তো আমি অন্যায় কথা

বললাম।

আরে না না। কোনো অন্যায় কথা বলতেই পারো না তুমি। তুমি সরল, নিষ্পাপ। তাহলে আমার চোখের চাউনি নির্লজ্জ নয়তো?

আপনি স্বর্গের দেবী।—উচ্ছল কণ্ঠে বলে উঠল ফোমা। তারপর উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে তাকাল সোফিয়ার মুখের দিকে। সোফিয়াও এমন চোখে তাকাল ওর দিকে যেন সে এই প্রথম দেখছে ওকে; তার দৃষ্টি, মায়ের চোখের স্নেহ-ক্ষরা দৃষ্টি, যুগপৎ স্নেহ ও ভয় মাখা।

লক্ষ্মীটি আজ এখন এসো। বড্ডো ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি। একটু বিশ্রাম নেয়া দরকার।—ফোমার মুখের দিকে না তাকিয়েই বলল মেদিনস্কায়া।

একান্ত অনুগত বাধ্য ছেলেটির মতো চলে গেল ফোমা।

সেইদিনের ঘটনার পর থেকে ফোমার সম্পর্কে সোফিয়ার আচরণ আরো কড়া আরো যেন আন্তরিক হয়ে উঠল। যেন সে ওকে দেখছে করুণার পাত্র হিসাবে। কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার ওদের ওদের সম্পর্ক সেই পুরানো পর্যায় ফিরে এল—সেই পুরানো ইঁদুর-বেড়ালের খেলা।

মেদিনস্কায়ার সঙ্গে ফোমার সম্পর্ক মায়াকিনের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না। বিদ্বেষ-ভরা বিকৃত মুখে একদিন বলল মায়াকিন ঃ

দেখ ফোমা, একটু ঘন ঘন খতিয়ে দেখিস মাথাটা ঠিক আছে কিনা! নইলে হয়তো কোনো দৈব দুর্বিপাকে হারিয়েও ফেলতে পারিস মাথাটা।

এ কথার মানে?—প্রশ্ন করল ফোমা।

হ্যাঁ সোন্‌কার কথাই বলছি আমি। বড্ডো ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করেছিস ওর ওখানে।

তাতে আপনার কী ক্ষতিটা হল?—রুঢ়কণ্ঠে বলে উঠল ফোমা।—আর কেনই-বা আপনি সোনকা বলেন ওকে?

আমার কি! আমার কিছুই নয়। ও যদি তোর যথাসর্বস্বও দুয়ে নিয়ে যায় তাতে আমার কি? আর ওকে সোনকা বলি কেন? সবাই জানে ওর নাম সোনকা। আর ঠিক তেমনিই একথাও সবাই জানে যে, অন্যের হাত দিয়ে আগুন জড়ো করতে খুবই পছন্দ করে সোনকা।

খুব চতুর।—ভ্রূ কুঁচকে হাতদুটো পকেটের ভিতরে ডুবিয়ে বলল ফোমা।

চতুর একথা খুবই সত্যি। কী চাতুর্যের সঙ্গে সেদিনের সেই ভোজের ব্যাপারটা সম্পন্ন করল। উঠল দুহাজার চারশ টাকা। খরচ হল এক হাজার ন'শ। অবশ্য সত্যি খরচ বোধ হয় এক হাজারও হয়নি। অর্থাৎ লোকে যা কিছুই করুক ওর জন্যে তা ভস্মে ঘি ঢালা। বুদ্ধিমতী। সে তালিম দেবে তোমাকে আর ঐ যেসব নিষ্কর্মার দল ওর পেছন পেছন ঘুরে বেড়ায় তাদেরকেও।

নিষ্কর্মা নয় ওরা, বুদ্ধিমান লোক।—ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল ফোমা। প্রতিবাদ করল নিজেরই।—ওদের কাছেই আমি শিখছি। কী আমি? দুনিয়ার কিছুই জানি না। কী শিক্ষা আমি পেয়েছি? আর ওরা, সবকিছু সম্পর্কেই আলোচনা করতে পারে। প্রত্যেকেরই বলবার থাকে কিছু-না-কিছু। আমাকে মানুষ হয়ে ওঠার পথে আপনি বাধা দেবেন না।

ছ্যা! কী চমৎকার কথা বলতেই শিখেছিস! কী ভীষণ রাগ! যেন শিল পড়ছে ছাদের উপর! বেশ তুই মানুষ হয়ে ওঠ! কিন্তু মানুষ হয়ে ওঠার পক্ষে এর চাইতে বুঝি শুঁড়িখানাও কম ক্ষতিকর হত। সেখানকার লোকজন সোফিয়ার

মানুষদের চাইতে ঢের ভালো। আর তুই—তোর অন্তত মানুষে মানুষে পার্থক্য বুঝতে শেখা উচিত ছিল। ঐ সোফিয়াকেই ধরো না। কী সে? প্রকৃতির একটি আদুরে পোকা ছাড়া আর কী?

দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল ফোমা। দাঁতে দাত চেপে আরো বেশি করে পকেটের ভিতরে হাত ডুবিয়ে দিয়ে মায়াকিনের কাছ থেকে অন্য দিকে চলে গেল। কিন্তু বৃদ্ধ আবার বলতে আরম্ভ করল মেদিনস্কায়ার সম্পর্কে।

জাহাজগুলো দেখাশুনা করে ওরা ফিরছিল একটা বড়ো স্লেজে করে। বন্ধুত্ব-পূর্ণভাবেই আলাপ-আলোচনা করছিল ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে। জল ছিট্‌কে উঠছে স্লেজের তলা থেকে। বরফের উপরে ইতিমধ্যেই ময়লা জমে উঠেছে। মেঘমুক্ত স্বচ্ছ আকাশে সূর্যের তপ্ত আলোর সমারোহ। হঠাৎ ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা বন্ধ করে একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই বলে উঠল মায়াকিন :

বাড়ি গিয়ে এক্ষুনি কি আবার তোর মহিলাটির কাছে যাবি?

যাবো।—সংক্ষেপে জবাব দিল ফোমা।

হুঁ। উপহার-টার কেমন দিচ্ছিস বল দেখি?—সহজকণ্ঠে একটু অন্তরঙ্গতার সুরে প্রশ্ন করল মায়াকিন।

উপহার? কী উপহার? কিসের জন্যে?—অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করল ফোমা।

আদৌ উপহার দিস না বলতে চাস? মিথ্যে বলিস না। সে কি তবে তোর সঙ্গে বসবাস করে এমনি-এমনি? নিছক প্রেমের খাতিরে?

রাগে দুঃখে লজ্জায় গড় গড় করে উঠল ফোমা। হঠাৎ বৃদ্ধের দিকে মুখ ফিরিয়ে তীব্র ভর্ৎসনাভরা কণ্ঠে বলল :

আপনি বুড়ো মানুষ, কিন্তু এমন সব কথা বলছেন যা শুনে লজ্জায় ঘৃণায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে। অমন কথা মুখেও আনবেন না। আপনি কি মনে করেন এতটা নিচে নেমে আসতে পারে সে?

ঠোঁটে ঠোঁটে একটা শব্দ করল মায়াকিন, তারপর করুণ সুরে বলল : কী মাথা-মোটা তুই! কী বোকা!—বলতে বলতেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল মায়াকিন। ঘৃণা-ভরা কণ্ঠে বলল :

ধিক্‌ তোকে! হরেক রকমের জানোয়ার পান করছে ঐ একই পাত্র থেকে। পড়ে আছে কেবল মাত্র তলানিটুকু! আর একটা বেকুফ কিনা সেই নোংরা পাত্রটাকে পুজো করছে দেবতা বলে! শয়তান্‌! যা সোজা তার কাছে গিয়ে বল, আমি তোমার প্রেমাস্পদ হতে চাই। আমি তরুণ, বেশি হে'কো না আমার কাছে।

ধর্মবাবা!—তীব্র ধমকের সুরে বলে উঠল ফোমা,—মোটেই সহ্য করব না আমি এ ধরনের কথা। যদি অন্য কেউ একথা বলত—

কিন্তু আমি ছাড়া কে আছে তোকে সাবধান করে দেবে? ভগবান্‌! ভগবান্‌!—ফোমার হাতখানা আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে বলে উঠল মায়াকিন।—তবে কি গোটা শীতকালটা ধরে সে তোর নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে? কী জানোয়ার মাগীটা!

দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল বৃদ্ধ। ওর কণ্ঠে একই সঙ্গে বেজে উঠল নিদারুণ ক্রোধ, বিরক্তি ও কান্নার মিলিত সুর। কোনোদিন ফোমা বৃদ্ধকে এতখানি বিচলিত হয়ে উঠতে দেখেনি। বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে আপনা থেকেই কেমন যেন নির্বাক হয়ে গেল ফোমা।

ও মাগী তোর সর্বনাশ করে ছাড়বে। হে প্রভু! বাবিলনের ঐ খানকি মাগীটা!—মায়াকিনের চোখদুটো জ্বল জ্বল করে উঠল। ঠোঁটদুটো কাঁপছে থর

ধর করে। তারপর ক্রুদ্ধকণ্ঠে তীব্র বিদ্বেষের সুরে বলতে লাগল মেদিনস্কায়ার সম্পর্কে।

ফোমা অনুভব করল, ঠিক কথাই বলছে বৃদ্ধ। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস টানতেও যেন কষ্ট হচ্ছে ফোমার। মুখ শুকিয়ে তেতো হয়ে উঠেছে।

থাক থাক, ঢের হয়েছে বাবা, থামুন—মায়াকিনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ব্যথাভরা কণ্ঠে বলল ফোমা।

বুঝেছিস, শিগ্‌গিরই তোকে বিয়ে করতে হবে।—শঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠল বৃদ্ধ।

দোহাই ঈশ্বরের! ওকথা মুখেও আনবেন না।—নির্জীব কণ্ঠে প্রত্যুত্তরে বলল ফোমা।

ফোমার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল মায়াকিন। ওর মুখখানা ম্লান, কাগজের মতো শাদা হয়ে উঠেছে। আধ-খোলা ঠোঁট ও চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে জেগে উঠেছে বেদনার কালো ছায়া। অসাড়, নিস্পন্দ। পথের দুধারে ডাইনে বামে বিস্তীর্ণ প্রান্তর—এখনো শীতের পোশাক অঙ্গে ধারণ করে রয়েছে। মাঝে মাঝে বরফ গলে জেগে উঠেছে কালো দাগ। দাঁড়কাকগুলো ঐ কালো দাগের উপরে লাফালাফি করছে। স্লেজের নিচে চলকে উঠছে জল। ছিটকে উঠছে কর্দমাক্ত বরফ ঘোড়ার খুরে খুরে।

যৌবনে কী দারুণ বোকাই না থাকে মানুষ!—নিচু কণ্ঠে আপন মনেই বলে উঠল মায়াকিন।

ফোমা ফিরেও তাকাল না তার দিকে।

ওর সামনে দাঁড়িয়ে একটা গাছের গুঁড়ি। আর তাকে দেখছে কিনা একটা হাতির শুঁড়!—এমনি করেই বুঝিবা ভয় পায় মানুষ। হায়! হায়!

কী বলতে চান সোজা কথায় বলুন।—আবার তীব্রকণ্ঠে বলে উঠল ফোমা।

কী আছে আর বলবার? সবই তো পরিস্কার। যুবতী মেয়েরা হলগে ক্ষীর আর স্ত্রীলোক দুধ। স্ত্রীলোক কাছের আর তরুণীরা দূরের। সুতরাং যাও সোন্‌কার কাছে, যদি তাকে না হলে একান্তই তোমার না চলে! গিয়ে সোজা বলো গে তাকে। এমনিই হয়ে থাকে। মূর্খ! যদি সে ভ্রষ্টা হয়ে থাকে, সহজেই পাবে তাকে। অত চটাচটির তো কিছু নেই? এতে শিউরে ওঠারই বা কি আছে?

তা আপনি বুঝবেন না।—অনুচ্চ কণ্ঠে বলল ফোমা।

কী আছে এমন যে আমি বুঝব না? বুঝি আমি সব কিছুই।

হৃদয়। হৃদয় বলে একটা বস্তু আছে মানুষের।—ফোমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল।

মায়াকিন চোখ কোঁচকাল তারপর বলল : থাকতে পারে। তবে মন বলে বস্তু নেই।

৬

যখন শহরে এসে পৌঁছল ফোমা, রাগে দুঃখে ওর অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠেছে। মেদিনস্কায়াকে গাল পাড়ার, তাকে অপমান করার এক প্রবল ইচ্ছে জেগে উঠেছে ওর মনে। দাঁতে দাঁত চেপে পকেটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে তার নির্জন ঘরের ভিতরে পায়চারি করে ফিরতে লাগল। ভ্রূদুটো উঠেছে কুঁচকে। বুকখানা ক্রমাগতই উঠছে ফুলে ফুলে। যেন ওর হৃদপিণ্ডটাকে ধরে রাখার পক্ষে বুকখানা খুবই সংকীর্ণ! ভারি পদক্ষেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরময়। বুঝিবা ধূমায়িত করে তুলছে ক্রোধ।

নোংরা হতচ্ছাড়ি! দেবীর ছদ্মবেশ ধরেছেন!—হঠাৎ ওর স্মৃতিপথে পেলাগিয়ার মূর্তি ভেসে উঠতেই বিদ্বেষভরা তিক্তকণ্ঠে বলে উঠল ফোমা।—পতিতা। তবুও ঢের ভালো পেলাগিয়া। সে করেনি ছলনা—করেনি খেলা। দেহ মন উন্মুক্ত করে তুলে ধরেছে সামনে। ওর বুকখানার মতোই শুভ্র, সতেজ, গভীর ওর হৃদয়।

থেকে থেকে আশা ভীরু কণ্ঠে ওর কানে অস্ফুট গুঞ্জন তুলে বলেছে : হয়তো ওর সম্পর্কে যা শুনেছে, সব মিথ্যে। কিন্তু পরক্ষণেই মায়াকিনের প্রত্যয়ভরা দৃঢ় কণ্ঠের সুর বেজে উঠছে ওর কানে। তার সতেজ কণ্ঠের শক্তিময় সুর মুহূর্তে সেই ভীরু আশার বাণীকে দিচ্ছে নির্মূল করে। আরো দৃঢ়ভাবে চেপে ধরেছে দাঁত। ফুল উঠছে বুক। দুষ্ট চিন্তা কাঠের টুকরোর মতো ওর অন্তরে বিন্ধ হয়ে অন্তরখানিকে তীব্র ব্যথায় বিষিয়ে তুলছে।

মেদিনস্কায়াকে অমন ঘৃণ্যভাবে অপমান করে ওর ধর্মবাপ ফোমাকে তার আরো কাছে ঠেলে দিয়েছে। অনতিবিলম্বেই একথা অনুভব করল ফোমা।

কেটে গেছে কয়েকদিন। প্রশমিত হয়ে এসেছে ফোমার উত্তেজনা। বসন্তকালীন ব্যবসায়ের ভাবনায়-চিন্তায় ডুবে গেছে সেই হারানোর ব্যথা। ঐ নারীর প্রতি জেগে-ওঠা ঘৃণা এসেছে স্তিমিত হয়ে। ওকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে পাবার সম্ভাবনা জেগে উঠেছে মনে। আরো তীব্র হয়ে উঠেছে ফোমার আকর্ষণ ঐ নারীর প্রতি।

নিজের অজ্ঞাতেই কেমন যেন ওর হঠাৎ মনে হল আর সংগে সংগেই স্থির করে বসল যে সোফিয়া পাভ্‌লোভনার কাছে যাওয়া ওর একান্ত দরকার। সোজা গিয়ে খোলাখুলি বলবে তাকে, কী চায় ফোমা তার কাছে। ব্যস! এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবার সংগে সংগেই কেমন যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠল মনে মনে। আর রওনা হল মেদিনস্কায়ার উদ্দেশ্যে। পথে যেতে যেতে ভাবতে লাগল কেমন করে সুন্দরভাবে বলবে সে তার কথা।

ওর আসা-যাওয়া সম্পর্কে মেদিনস্কায়ার বাড়ির ঝি-চাকরেরা অভ্যস্ত। মেদিনস্কায়া ঘরে আছে কিনা—এ প্রশ্নের জবাবে ঝি বলল : ড্রইংরুমে যান। উনি একাই

আছেন সেখানে।

কেমন যেন একটু ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল ফোমা। কিন্তু পরক্ষণেই আয়নার ভিতরে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছদে সুসজ্জিত নিজের ঋজু দেহ, কালো কোমল দাড়িগোঁফে সমাচ্ছন্ন বলিষ্ঠ গম্ভীর মুখ, আর আয়ত দুটো কালো চোখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় জেগে উঠল ওর মনে। বলিষ্ঠ পদক্ষেপে বারান্দা পেরিয়ে এগিয়ে চলল ড্রইংরুমের দিকে।

ভেসে-আসা তারের যন্ত্রের সঙ্গীতময় সুরের ঝঙ্কার ওকে জানাল অভিনন্দন। ফোমার মনে হল বুঝিবা সে সুর নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে উঠছে জেগে। এক নিরানন্দ হাসির শব্দ কিসের বিরুদ্ধে যেন জানাচ্ছে অভিযোগ। পরম কোমলতায় অন্তর মথিত করে বুঝিবা আকর্ষণ করছে মনোযোগ। কিন্তু নেই তা পাবার আশা। সঙ্গীত শুনতে ভালো লাগে না ফোমার। ওর অন্তর বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এমনকি যখন কোনো পানশালার 'যন্ত্রে' বেজে ওঠে করুণ সুর তখন ফোমা হয় অনুরোধ করে সে যন্ত্র বন্ধ করে দিতে, নয়তো দূরে সরে গিয়ে বসে, যাতে করুণ বিলাপ আর চোখের জলভরা ঐ না-কথা-কওয়া সুরের ঝঙ্কার এসে ওর কানে না লাগে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে ড্রইংরুমের দোরে এসে নিজের অজ্ঞাতেই থমকে দাঁড়াল।

রঙ-বেরঙের লম্বা লম্বা কাঁচের মালার পরদা ঝুলছে দরজায়। কাঁচের টুকরো-গুলো এমনভাবে সাজানো মনে হয় যেন একটা চারাগাছ বাতাসে দুলছে। মালা-গুলো নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে যেন ফুলের অস্পষ্ট ছায়া ভেসে বেড়াচ্ছে। স্বচ্ছ পরদার ঘরের ভিতরের কোনো কিছুই অবরুদ্ধ হয়নি ফোমার দৃষ্টি থেকে।

পছন্দমতো কোণটিতে একটা কোচের উপরে বসে মেদিনস্কায়া বাজিয়ে চলেছে ম্যান্‌ডোলিন্‌। কালো পোশাকে সুসজ্জিত ক্ষীণাঙ্গী নারীর দেহে পড়েছে দেয়ালের গায়ে ঝোলানো একটি জাপানী ছাতার বহু বর্ণের মিলিত ছায়া। একটা বিরাট ব্রোঞ্জের বাতির গোল আচ্ছাদনের ভিতর থেকে সূর্যের অস্তকালীন দীপ্তির মতো আলোর আভা ছড়িয়ে পড়েছে তার দেহে। পরদার ঝোলানো দড়ির মৃদু-মর্মর ধ্বনি প্রদোষের গন্ধময় কোমল আলোয়ভরা অপরিসর ঘরের ভিতরে বেদনা-ভরা মূর্ছনায় ঘুরে মরছে। এতক্ষণে মহিলা ম্যান্‌ডোলিন্‌টা কোলের উপরে শুইয়ে নিয়ে তারের উপরে দ্রুত অঙ্গুলি সঞ্চালন করে চলেছেন। দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত, যেন স্থির অচঞ্চল চোখে কী যেন দেখছে। ফোমার বুকের ভিতর জেগে উঠল একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস।

মেদিনস্কায়ার সর্বাঙ্গ ঘিরে সঙ্গীতের কোমল মূর্ছনা। ছায়াপাতের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে মুখের ভাব। ছায়া পড়ছে আর সঙ্গে সঙ্গেই যাচ্ছে মিলিয়ে ওর দুটি উজ্জ্বল চোখের দীপ্তির ঘায়ে।

পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে ফোমা ওর মুখের দিকে তাকাল। দেখল, যখন একা থাকে তখন তেমন সুন্দরী নয় মেদিনস্কায়া যেমন মনে হয় লোকজনের ভিতরে যখন থাকে। এখন ওর মুখখানা মনে হচ্ছে অনেক বেশি বয়সের। ঢের বেশি গম্ভীর। চোখে নেই সেই স্নেহমাখা কোমল দীপ্তি। বরং কেমন যেন একটা ম্লান ক্লান্তির ছায়া সে দুটি চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ঘিরে রয়েছে। এই মুহূর্তে ওর ভঙ্গিটিও ক্লান্ত। যেন চাইছে প্রদীপ্ত হয়ে উঠতে, কিন্তু পারছে না। ফোমা অনুভব করল যে অনুভূতি তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল ওর কাছে ছুটে আসতে তা যেন বিলীন হয়ে গিয়ে অন্তরে জাগিয়ে তুলেছে এক অন্য ধরনের অনুভূতি। পা দিয়ে

মেঝের উপর শব্দ করে একটু কাশল ফোমা।

কে?—চমকে উঠল মেদিনস্কায়া। সঙ্গে সঙ্গে তারগুলোও ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। কাঁচের মালাগুলোও ঐ চমকানো সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঝন্ ঝন্ শব্দে কেঁপে উঠল।

আমি—প্রত্যুত্তরে বলল ফোমা মালার দড়িগুলো একপাশে সরিয়ে দিয়ে।

আঃ! কত চুপি চুপি এসে ঢুকেছ! খুবই খুশি হলাম তোমাকে দেখে। বসো। এতদিন আসোনি কেন?—ফোমার হাত ধরে নিজের পাশেরই একটা চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করল। আনন্দের আভায় চক্ চক্ করে উঠল সোফিয়ার দুটো চোখ।

গিয়েছিলাম বাইরে উপকূলে জাহাজগুলো দেখাশুনা করতে।—চেয়ারটা আর একটু ওর পাশে সরিয়ে এনে সহজ সুরে বলল ফোমা।

মাঠে এখনো কি খুব বরফ জমে আছে?

প্রচুর। যত চান। কিন্তু এরই ভিতরে গলতে শুরু করেছে। পথের সর্বত্র জল।—সোফিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল ফোমা।

ওর স্বাচ্ছন্দ্য-ভরা সহজ ব্যবহারের ভিতরে দেখল মেদিনস্কায়া যেন এক নতুন পরিবর্ত এসেছে ওর হাসির ভিতরে। পোশাক-পরিচ্ছদ একটু সামলে নিয়ে ফোমার কাছ থেকে একটু দূরে সরে বসল। চোখে চোখে মিলতেই মাথা নিচু করল মেদিনস্কায়া।

গলতে শুরু করেছে?—তেমনি মুখ নিচু করে ছোট আঙুলে পরা আংটিটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল মেদিনস্কায়া।

হাঁ। সর্বত্রই স্রোত বইছে। নিজের পায়ের জুতার দিকে দৃষ্টিনিবন্ধ করে প্রত্যুত্তরে বলল ফোমা।

ভালো। বসন্ত আসছে।

আর বেশি দেরি নেই আসতে।

বসন্ত আসছে।—কোমল মৃদুকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করল মেদিনস্কায়া। যেন শুনছে সে তার নিজেরই কথার ধ্বনি।

মানুষ এখন প্রেমে পড়বে।—মৃদু হেসে বলল ফোমা। তারপর কেন যেন হাতদুটো জোরে জোরে ঘসতে শুরু করল।

তাই বুঝি তুমি নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছ?—শুক্‌নো কণ্ঠে প্রশ্ন করল মেদিনস্কায়া।

আমার দরকার নেই। ঢের আগেই তৈরি হয়ে নিয়েছি আমি। প্রেমে পড়েছি। সারা জীবনের মতো।

সোফিয়া ফোমার মুখের দিকে তাকাল। পরক্ষণেই তারের দিকে তাকিয়ে বাজাতে শুরু করল।

বসন্তকাল। কী চমৎকার! তুমি বাঁচতে আরম্ভ করেছ। অন্তর অফুরন্ত শক্তির উৎস। নেই সেখানে এতটুকুও অন্ধকার—নেই কোনো মলিন ছায়া।

সোফিয়া পাভলোভনা!—আবেগভরা মৃদুকণ্ঠে বলে উঠল ফোমা।

সস্নেহ মৃদু ভঙ্গিতে ওকে বাধা দিয়ে বলে উঠল মেদিনস্কায়া :

একটু দাঁড়াও ভাই! আজ আমি তোমাকে কয়েকটি কথা বলব। ভালো কথা! জানো, মানুষের জীবনে এমন একটা মুহূর্ত আসে, দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার পরে হঠাৎ একসময়ে নিজের অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায়, দূর বিস্মৃতির অন্ধ অতল কোণে যা নাকি এতদিন পড়েছিল অনাদরে অবজ্ঞায় অন্তরের অন্তস্তলে,

হারিয়ে ফেলেনি সে যৌবনের গন্ধাকুল সতেজ সমারোহ। স্মৃতির ছোঁয়ায় মুহূর্তে জেগে ওঠে বসন্ত তার সমস্ত দেহমন পূর্ণ করে—জীবনের প্রথম প্রভাতের টাট্‌কা তাজা নিঃশ্বাস তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিয়ে।

সোফিয়ার আঙুলের ছোঁয়ায় যন্ত্রের তারগুলো বুঝিবা গুমরে গুমরে কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। ফোমার মনে হল ঐ সুরের ঝঙ্কার ঐ নারীর কণ্ঠের কোমল মূর্ছনার সঙ্গে মিশে ওর অন্তরে জাগিয়ে তুলেছে এক অভূতপূর্ব আলিঙ্গন-ভরা সুকোমল স্পর্শানুভূতি। কিন্তু তবুও সংকল্পে অটল ফোমা। শুনছে ওর কথা। বোধগম্য হচ্ছে না। ভাবছে ঃ—যা-ই কিছু বলো না তুমি, তোমার কোনো কথাই আমি বিশ্বাস করছি না।

এ চিন্তা উত্তেজিত করে তুলল ফোমাকে। দুঃখ হল ওর কথা আগের মতো মনোযোগ দিয়ে, আগের মতো বিশ্বাসভরা নিষ্ঠা নিয়ে শুনতে পারছে না বলে।

ভাবছ কি, কেমন করে বাঁচতে হয়?—প্রশ্ন করল মেদিনস্কায়া।

ভাবি সময় সময়। তারপরেই আবার ভুলে যাই। অত ভাববার সময় নেই আমার।—একটু হাসল ফোমা।—তাছাড়া কী-ই-বা অত ভাববার আছে? সোজা কথা। দেখতে হবে অন্যেরা কেমন করে বাঁচে। বেশ, তাদের অনুকরণ করলেই হল।

না তা করো না। নিজেকে আলাদা রেখো। তুমি এত ভালো! একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে তোমার ভিতরে। কী সেটা, তা অবশ্য আমি জানি না। কিন্তু বুঝতে পারি—অনুভব করতে পারি। আমার মনে হয়, খুবই কঠিন হবে তোমার পক্ষে বাঁচা—জীবনযাপন করা। নিশ্চয় করে বলতে পারি, তোমার দলের অন্যলোকের মতো তুমি পারবে না চলতে বাঁধা রাস্তায়। না। কেবলমাত্র মুনাফা শিকার করার যে জীবন—কেবল টাকার পিছনে, ব্যবসার পিছনে ছুটে পারবে না তুমি সন্তুষ্ট থাকতে। না। না। কিছুতেই পারবে না তুমি তা। আমি জানি তোমার কামনা আছে অন্য কিছুর পরে। তাই নয় কি?

দ্রুতকণ্ঠে বলে চলেছে সোফিয়া। চোখের দৃষ্টি ছেয়ে কেমন যেন ফুটে উঠেছে একটা ভীতসন্ত্রস্ত ভাব। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল ফোমা ঃ

কী বলতে চাইছে?

পরক্ষণেই ধীর মৃদু কণ্ঠে বলল ঃ

হয়তো আমি চাই অন্য কিছু-ই। হয়তো বা পেয়েও গেছি তা'।

ফোমার গা ঘেঁসে আর একটু সরে এসে ওর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলল সোফিয়া ঃ

শোনো! অন্যের মতো জীবন কাটাতে যেও না। ভিন্নভাবে সংগঠিত করো তোমার জীবন। তুমি শক্তিমান। তুমি তরুণ। তুমি ভালো।

যদি আমি ভালো-ই হয়ে থাকি তবে আমার জন্যে ভালো জিনিসই থাকা দরকার!—উৎসাহভরা কণ্ঠে বলে উঠল ফোমা। অনুভব করল, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ভিতরে ভিতরে। দ্রুত হয়ে উঠেছে হৃদপিণ্ডের গতি।

তা নয়। এ দুনিয়াটা খারাপ লোকের চাইতে ভালো লোকের পক্ষেই বেশি কঠিন।—বিষাদক্লিষ্ট কণ্ঠে বলল মেদিনস্কায়া।

আবার জেগে উঠল সঙ্গীতের কম্পিত মূর্ছনা সোফিয়ার আঙুলের ছোঁয়া লেগে। ফোমা অনুভব করল এখনি যদি সে তার কথা না বলে ফেলে, শেষে আর কিছুই বলা হবে না।

ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন! মনে মনে বলল ফোমা। তারপর বুকে বল করে নিচু কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করলঃ

সোফিয়া পাভলোভনা! ঢের হয়েছে! আমার কয়েকটি কথা আছে তাই এসেছি আপনাকে সেকথা বলতে। অনেক তো হল, এখন আসুন আমরা সহজ সরল খোলাখুলিভাবে কথাবার্তা বলি। প্রথমে আপনি নিজেই আমাকে আকৃষ্ট করেছেন আপনার দিকে। এখন চাইছেন দূরে সরে যেতে। আমি বুঝতে পারি না আপনার কথা। আমার মস্তিষ্ক নিরেট। তবুও অনুভব করতে পারি যে আপনি আপনাকে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তা। বুঝতে পারছেন আপনি কী সে যা নাকি আমাকে ঠেলে নিয়ে এসেছে এখানে?

প্রতিটি কথার সঙ্গে ওর চোখদুটো চক্‌চক্‌ করে উঠতে লাগল। কণ্ঠ ক্রমেই উত্তপ্ত, ক্রমেই উচ্চতর হয়ে উঠতে লাগল। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে এল মেদিনস্কায়া তারপর শঙ্কিত সচকিত কণ্ঠে বলল ঃ

আঃ! থামো ফোমা!

না। থামব না। বলব আমি আমার কথা।

আমি জানি কী তুমি বলতে চাও।

না। জানেন না আপনি, সব কথা।—ধমকের সুরে বলে উঠল ফোমা। তারপর উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু আমি সবকিছুই জানি আপনার।

বটে? তবেতো ভালোই হল।—শান্ত, অবিচলকণ্ঠে বলল মেদিনস্কায়া।—বলতে বলতে সেও সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। যেন কোথাও চলে যাবে। কিন্তু একটু পরেই আবার বসে পড়ল। গম্ভীর মুখ। দুটি ঠোঁট দৃঢ়সংলগ্ন। নমিত চোখ। সে চোখের দৃষ্টি দেখতে পেল না ফোমা। ভেবেছিল, "আমি আপনার সবকিছুই জানি" কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ভীত হয়ে পড়বে মেদিনস্কায়া। হকচকিয়ে যাবে। লজ্জিত হয়ে পড়বে। ওর কাছে চাইবে মার্জনা ভিক্ষা এতদিন ওর সঙ্গে ছলনা করেছে বলে। তখন ফোমা ওকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বুকে টেনে নেবে। করবে ক্ষমা। কিন্তু কৈ তেমন কিছুতো হল না! বরং তার অচঞ্চল প্রশান্তি ওকেই যেন কেমন বিমূঢ় করে ফেলল। মেদিনস্কায়ার মুখের দিকে তাকাল ফোমা। তারপর আবার বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু একটি কথাও খুঁজে পেল না।

ভালোই হল।—শুষ্ক দৃঢ়কণ্ঠে বলল মেদিনস্কায়া।—তাহলে সবকিছুই জেনে ফেলেছ, কি বলো? আর নিশ্চয়ই আমাকে গাল পেড়েছ। ওটা অবশ্য আমার প্রাপ্য। বুঝলাম। আমি তোমার কাছে অপরাধী। কিন্তু—না। আমি আমার দোষ ঢাকতে চাই না।—বলতে বলতে চুপ করে গেল মেদিনস্কায়া। তারপর হঠাৎ কম্পিত হাতদুটো তুলে চুল ঠিক করতে আরম্ভ করল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল ফোমা। মেদিনস্কায়ার কথায় ওর অন্তরের সবটুকু আশা বিলীন হয়ে গেল। যে আশা প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল ওর অন্তরে,—অনুভব করল ফোমা, তা সম্পূর্ণ নির্বাপিত। মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তিক্ত ভর্ৎসনার সুরে বলতে আরম্ভ করল ঃ

একদিন ছিল, যখন আপনার দিকে তাকিয়ে ভাবতাম : কী সুন্দর! কী চমৎকার! আর আজ নিজেই বলছেন কিনা—আমি অপরাধী। ওঃ!—বলতে

বলতে ফোমার কণ্ঠ ভেঙে পড়ল। কিন্তু কোমল সুরে হেসে উঠল মেদিনস্কায়া।

কী সুন্দর, কী হাস্যোদ্দীপক তুমি! কিন্তু আশ্চর্য যে এসব কিছুই বোঝ না!

ফোমা ওর মুখের দিকে তাকাল। অনুভব করল, সোফিয়ার ঐ স্নেহমাখা কথা আর মুখের ঐ ম্লান হাসির আঘাতে ওর সমস্ত অস্ত্র ভোঁতা হয়ে গেছে। ওর বিরুদ্ধে জমে উঠেছিল যা কিছু অভিযোগ রূঢ়, রুক্ষ, শৈত্যময়, ওর ঐ দৃষ্টির উত্তপ্ত উষ্ণ স্পর্শে তা যেন গলে যেতে আরম্ভ করেছে। ওকে যেন একটি অসহায় শিশুর মতো মনে হচ্ছে ফোমার। কোমল মসৃণ কণ্ঠে কী যেন বলে চলেছে আর হাসছে মৃদু হাসি। কিন্তু সে কথা ফোমার কানে প্রবেশ করছে না।

সোফিয়ার কথায় বাধা দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে বলে উঠল ফোমা ঃ

আমি এসেছি আপনার কাছে, কিন্তু তবুও কিছুই বলে উঠতে পারিনি। চেয়েছিলাম সবকিছু বলতে—উজাড় করে ঢেলে দিতে। কিন্তু এখন আর এতটুকুও ইচ্ছে নেই সে কথা বলবার। আমার অন্তর দমে গেছে। এমনই অদ্ভুত ব্যবহার করলেন আমার সঙ্গে। মনে হচ্ছে যেন আদৌ উচিত হয়নি আমার আপনার কাছে আসা। আপনি যে কী আমার কাছে! মনে হচ্ছে চলে গেলেই আমার পক্ষে হত ভালো।

থামো! দাঁড়াও ভাই। চলে যেও না।—চকিতে ফোমার হাতখানা ধরে ফেলে দ্রুত নিঃশ্বাসে বলে উঠল সোফিয়া। কেন অমন নিষ্ঠুর হলে? রাগ করো না আমার উপরে। আমি কি তোমার উপযুক্ত? তোমার প্রয়োজন অন্য ধরনের একটি বন্ধুর। একটি নারী—যে তোমরই মতো সরল, তোমারই মতো স্বাস্থ্যে যৌবনে ভরপুর। স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী, আনন্দময়ী। কিন্তু আমি? আমি বুড়ো হয়ে গেছি। চিরটাকাল দুঃখেই কেটেছে আমার দিন। এমন শূন্য, এমন ব্যথাভরা ক্লান্ত আমার জীবন! এমন রিক্ত! জানো, যখন কেউ আনন্দে থাকতে অভ্যস্ত হয়েই বেড়ে ওঠে, কিন্তু তবুও পারে না সুখী হতে, কতখানি খারাপ লাগে তখন তার? সে চায় আনন্দে থাকতে—চায় হাসতে, তবুও পারে না। জীবন তাকে লক্ষ্য করে হাসে বিদ্রুপের হাসি। তাছাড়া মানুষের সম্পর্কে......। শোনো! মায়ের মতো আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি—অনুরোধ করছি আমি তোমার কাছে—নিজের অন্তরের নির্দেশ ছাড়া আর কারুর কোনো কথায়ই কান দিও না। অন্তরের নির্দেশেই জীবনের চলার পথে চলবে। মানুষ জানে না কিছুই। তারা তোমাকে এমন কিছুই বলতে পারে না, যা সত্য। আদৌ কান দিও না তাদের কথায়।

যতদূর সম্ভব সহজকণ্ঠে পরিষ্কার করে বলতে চেষ্টা করছে মেদিনস্কায়া কিন্তু ভিতরে ভিতরে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠছে। কথাগুলো দ্রুত অসংলগ্নভাবে বেরিয়ে আসছে একটার পর একটা। ঠোঁটের কোণে ফুটে রয়েছে একটু করুণ ম্লান হাসি। কেমন যেন অসুন্দর করে তুলেছে মুখখানাকে।

জীবন বড়ো কঠিন। চায়, সবাই ওর বশ্যতা স্বীকার করুক। কিন্তু যারা শক্তিমান কেবলমাত্র তারাই পারে ওর দণ্ডের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে—আত্মরক্ষা করতে। মানুষ এমন হয়ে ওঠে যে নিজেকেই শুরু করে সে ভয় করতে। বিচারক আর অপরাধী—এ দুইয়ে ভাগ করে ফেলে নিজেকে। আর নিজের কাছেই খুঁজে ফেরে নিজের কাজের যৌক্তিকতা। যাদের ঘৃণা করে, তাদের সঙ্গেই কাটাতে চায় দিনরাত। নিতান্ত বিরক্তিকর। তবুও পাছে নিজের সঙ্গে একা থাকতে হয় তারই ভয়ে।

ফোমা মুখ তুলল। বিস্ময়ভরা অবিশ্বাসের দৃষ্টি মেলে তাকাল সোফিয়ার

মুখের দিকে।

এসব কথা বুঝতে পারি না আমি। লিউবভও বলে এমনি।

কে লিউবভ? কী বলে সে?

আমার ধর্ম-বোন। একই কথা বলে সে-ও। দারুণ অভিযোগ রয়েছে তার জীবন সম্পর্কে। সে বলে,—বেঁচে থাকা অসম্ভব ব্যাপার।

এখনো ওর বয়েস কম। কিন্তু খুবই সুখের কথা যে ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করেছে এ ধরনের কথা।

সুখের!—বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বলে উঠল ফোমা।—আজব সুখ-ই বটে! যাতে কিনা লোকের দীর্ঘশ্বাস পড়ে, অন্তর জুড়ে জেগে ওঠে অভিযোগ!

তুমি বরং অভিযোগই শুনো। মানুষের অভিযোগের ভিতরে অনেকখানি তাৎপর্য আছে। অন্য সবকিছুর চাইতে ঢের বেশি বুদ্ধিমত্তা রয়েছে ঐ সব অনুযোগ অভিযোগের ভিতরে। ওদের কথা শুনো। ওরা শেখাবে তোমাকে পথ বেছে নিতে।

সোফিয়ার কণ্ঠের প্রত্যয়ভরা সুর। কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে পড়ল ফোমা। বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। সব কিছুই চেনা—সব কিছুই পরিচিত। কিন্তু আজ যেন সবকিছুই ওর মনে হচ্ছে নতুন। নানান ধরনের টুকিটাকি জিনিসে ভরা ঘর। দেয়ালময় ছবি, তাক। কোণে কোণে উজ্জ্বল সুন্দর সব জিনিসপত্র। লাল আলোর আভায় বিষণ্ণভাব জাগিয়ে তুলছে মনে। ঘরের সব কিছু ঘিরে নেমে এসেছে সন্ধ্যার ম্লান ছায়া। কেবলমাত্র এখানে সেখানে ফ্রেমের গায়ের সোনালি আলোর ছিটে আর মৃদু আভায় প্রতিফলিত মর্মরের শ্বেত ছায়া। দোরে ঝুলছে মোটা কাপড়ের পরদা। সবকিছু মিলে ফোমার মনে জাগিয়ে তুলছে এক নিদারুণ অস্বস্তি। বুঝিবা ওর গলা টিপে ধরেছে। ওর মনে হল যেন হারিয়ে ফেলেছে পথ। ঐ নারীর জন্যে ওর অন্তরে জেগে উঠেছে তীব্র বেদনা। কিন্তু তবুও কেমন যেন এক নিদারুণ বিরক্তিতে ভারি হয়ে উঠেছে অন্তর।

শুনছ, কেমন করে আমি কথা বলছি তোমার সঙ্গে? মনে হয়, আমি যদি তোমার মা কিংবা দিদি হতাম! এর আগে কেউ কোনোদিন আমার মনে এতখানি উত্তাপ, এতখানি স্নেহ জাগিয়ে তুলতে পারেনি। আর তুমি কিনা আমার দিকে তাকাচ্ছ বিরূপ দৃষ্টি মেলে। আমাকে বিশ্বাস করো তুমি? কি বলো, করো, না করো না?

ফোমা ওর মুখের দিকে তাকাল। তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল।

জানি না আমি। বিশ্বাসই তো করতাম আপনাকে।

আর এখন? সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করল সোফিয়া।

এখন? এখন বোধহয় আমার চলে যাওয়াই ভালো। কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না আমি। তবুও বোঝবার জন্যে অন্তর আমার আকুল হয়ে উঠেছে। এমনকি বুঝিবা নিজেকেও বুঝে উঠতে পারছি না। পথে আসতে জানতাম, কী বলতে এসেছিলাম আমি। কিন্তু এখানে এসে সবই ঘুলিয়ে গেল। আমাকে গাছে তুলে দিয়ে এখন মই কেড়ে নিচ্ছেন আপনি। বলছেন কিনা আমি তোমার মায়ের মতো। তার মানে,—দূর হয়ে যাও তুমি!

আমাকে বুঝতে চেষ্টা করো। সত্যি আমি তোমার জন্যে খুবই দুঃখিত। —কোমল কণ্ঠে বলল সোফিয়া।

কিন্তু সোফিয়ার প্রতি ফোমার বিক্ষোভ ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠতে লাগল। আর

যতই কথা বলছে ততই যেন অসংলগ্ন, অসম্ভব যুক্তিহীন হয়ে পড়ছে সেসব কথা। বলতে বলতে এমনভাবে বার বার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠছে যেন সে চাইছে কোনো একটা বাঁধন ছিঁড়ে ফেলতে।

দুঃখিত? কেন? কিসের জন্যে? আমি চাই না। ভালো করে গুছিয়ে কথা বলতে পারি না আমি। বোবা হওয়া সত্যিই অভিশাপ। কিন্তু হয়তো বলতাম আমি আপনাকে! ভালো ব্যবহার করেননি আপনি আমার সঙ্গে। সত্যি কথা। কেন আপনি একটা লোককে অমন করে প্রলোভন দেখালেন? আমি কি আপনার খেলার বস্তু?

আমি শুধু চেয়েছিলাম তোমাকে আমার পাশে দেখতে।—অপরাধ-সঙ্কুচিত কণ্ঠে বলল সোফিয়া। কিন্তু সেকথা ফোমার কানে গেল না।

কিন্তু যখন সময় এল, ভয় পেয়ে গেলেন আপনি। নিজেকে লুকিয়ে রাখলেন আমার কাছ থেকে। অনুশোচনা করছিলেন আপনি! হাঃ হাঃ! জীবন খুব মন্দ? কিন্তু জীবন সম্পর্কে কেন আপনার এত অভিযোগ? জীবন কী? মানুষ-ই হচ্ছে জীবন। যেখানে মানুষ নেই সেখানে জীবনও নেই। কিন্তু আপনি আবিষ্কার করেছেন অন্য এক দানব। লোকচক্ষুকে প্রতারণা করার জন্যে আপনার ঐ আবিষ্কার। আর করেছেন তা নিজেকে সঠিক প্রমাণ করতে। অনেক ক্ষতিকর —অনিষ্টকর কাজ করে থাকেন আপনি। নানান ধরনের নির্বুদ্ধিতা আর আবিষ্কারের ভিতরে হারিয়ে ফেলেন নিজেকে। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন—হায় জীবন! হায় জীবন! বলুন, করেননি কি আপনি তাই? অবশেষে অভিযোগের আবরণে নিজেকে ঢেকে রেখে অন্যকে বিমূঢ় করে তোলেন। পথভ্রষ্ট আপনি! বেশ ভালো কথা। তবে কেন চান আপনি আমাকে ধ্বংসের পথে—উচ্ছন্নের পথে পরিচালিত করতে? একটা শয়তানিবুদ্ধি—দুষ্টবুদ্ধি আপনার ভিতর থেকে বলছে : খুব খারাপ লাগছে আমার। প্রত্যুত্তরে আপনি বলেন : লাগুক খারাপ। ওর হৃদয়ের উপরে আমি আমার বিষাক্ত চোখের জলের কয়েক ফোঁটা ছিটিয়ে দেবোখন। তাই না? কেমন? ঈশ্বর আপনাকে দিয়েছে পরীর মতো রূপ, দিয়েছেন অপরূপ সৌন্দর্য। কিন্তু আপনার হৃদয়? কোথায় সেটা?

মেদিনস্কায়ার সামনে দাঁড়িয়ে ফোমা। ওর সর্বাঙ্গ কাঁপছে। ভর্ৎসনাভরা তীব্রদৃষ্টি মেলে দেখছে ওর আপাদমস্তক। এতক্ষণে বেরিয়ে আসছে ওর কথা সহজ সাবলীলভাবে। বেরিয়ে আসছে ওর অন্তর থেকে। কণ্ঠ মৃদু—অনুচ্চ। কিন্তু বলছে প্রতিটি কথায় জোর দিয়ে। ফোমা মুখ তুলল। বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে সোফিয়া ওর মুখের দিকে তাকাল। ঠোঁটদুটো কাঁপছে। ঠোঁটের দু'কোণে ফুটে উঠেছে গভীর বলি-রেখা।

যে সুন্দর তার জীবনও সুন্দরভাবেই পরিচালিত হওয়া উচিত। কিন্তু লোকে কত কী কথা বলে আপনার সম্পর্কে।—বলতে বলতে ফোমার কণ্ঠ ভেঙে পড়ল। তারপর হাত তুলে বিষণ্ণ ম্লান কণ্ঠে বলল শেষ কথা :

বিদায়!

বিদায়!—অস্ফুট কণ্ঠে প্রত্যুত্তরে বলল মেদিনস্কায়া। করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল না ফোমা। পরক্ষণেই ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর কাছ থেকে চলে গেল। কিন্তু দোরের সামনে এসেই মনে হল সোফিয়ার জন্যে ওর অন্তর ব্যথায় মুচড়ে উঠেছে। মুখ ফিরিয়ে কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল মেদিনস্কায়ার দিকে। ঘরের সেই কোণে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে মেদিনস্কায়া। মাথাটা নিচু। নিষ্কম্প দুটো হাত পড়েছে ঝুলে।

ফোমা অনুভব করল এমন করে ওকে ফেলে রেখে চলে যাওয়া সম্ভব নয় ওর পক্ষে। কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে পড়ল। তারপর অনুতাপহীন কোমল কণ্ঠে বলল:

হয়তো অনেক অন্যায় কথা বলেছি। আঘাত করেছি আপনার মনে। ক্ষমা করবেন। যা-ই কিছু হোক না কেন, আমি ভালোবাসি আপনাকে।—ফোমার বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস।

কোমল হাসিতে ফেটে পড়ল সোফিয়া।

না, তুমি আঘাত করোনি আমাকে। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন!

বেশ, চললাম তবে, নমস্কার!—আরো মৃদু, আরো কোমল কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করল ফোমা।

হাঁ, এসো!—তেমনি মৃদুকণ্ঠেই জবাব দিল সোফিয়া।

ঝোলানো কাঁচের মালাগুলি একপাশে সরিয়ে দিল ফোমা। কিন্তু নিঃশব্দে দুলতে দুলতে ফিরে এসে ফোমার গাল স্পর্শ করল। ঠাণ্ডা স্পর্শে ফোমার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই চলে গেল বোঝার মতো ভারি এক বিক্ষুব্ধ বিমূঢ় অনুভূতি বুকে বয়ে। হৃদপিণ্ডটা এমনভাবে চলছে যেন একটা নরম অথচ শক্ত জাল তার উপরে এঁটে বসে গেছে।

নেমে এসেছে রাত্রির কালো ছায়া। জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আকাশের বুকে জেগে উঠেছে চাঁদ। ছোট ছোট খানায় বরফ জমে রুপোলি দীপ্তিতে ঝলমল করছে। পথের একপাশ ধরে হেঁটে চলেছে ফোমা। হাতের লাঠিগাছা দিয়ে জমে-ওঠা তুষার-স্তূপগুলি ভাঙতে ভাঙতে চলেছে এগিয়ে। করুণ মর্মরধ্বনি তুলে ওগুলো ভেঙে চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। পথের পাশের বাড়িগুলোর চৌকো ছায়া পড়েছে এসে পথের উপরে। অপূর্ব সৌন্দর্য বিস্তার করে পড়েছে গাছের ছায়া। মনে হচ্ছে যেন শীর্ণ হাতে মাটি আঁকড়ে ধরেছে।

কী করছে এখন সে?—ভাবল ফোমা মনে মনে। ম্লান রক্তিম আলোর ছোট্ট ঘরের কোণে একাকী ঐ নারীর মূর্তি ভেসে উঠল ফোমার মানস-পটে।

ওকে ভুলে যাওয়াই ভালো আমার পক্ষে।—মনে মনে স্থির করল ফোমা। কিন্তু কিছুতেই পারছে না তাকে ভুলতে। সে দাঁড়িয়েছিল ওর সামনে। ওর অন্তর জুড়ে কখনো জাগিয়ে তুলছিল করুণা—কখনো নিদারুণ বিরক্তি, বিতৃষ্ণা—এমনকি রাগ। ওর ছবি এত স্পষ্ট, এত তীব্র বেদনাদায়ক ওর চিন্তা যেন ওকে বুকে বয়ে নিয়ে চলেছে ফোমা। উলটো দিক থেকে এগিয়ে আসছে একটা গাড়ি। পাথর ও বরফের সঙ্গে লেগে চাকার ঘর্ঘর শব্দ উঠেছে জেগে নৈশ নিস্তব্ধতা বিক্ষুব্ধ করে। যখন চন্দ্রালোকিত অংশ ধরে এগিয়ে চলে দ্রুত ও উচ্চ হয়ে ওঠে শব্দ। আর যখন চলে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তখন শব্দ হয়ে ওঠে গম্ভীর, মন্থর। গাড়ির চালক আর আরোহী দুজনেই দুলছে। কেন যেন দুজনেই ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে আর ঘোড়ার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গিয়ে একটা কালো বস্তুতে রুপান্তরিত হয়ে উঠল। আলোছায়ায় পথের বুকখানা চকমক করছে। কিন্তু দূরে মনে হচ্ছে যেন জমাটবাঁধা ঘন অন্ধকার। রাস্তাটা যেন মাটি ফুঁড়ে আকাশপানে ঠেলে-ওঠা বিরাট একটা দেয়াল কেটে তৈরি। কেন যেন ফোমার মনে হল, ঐ লোকগুলো জানে না কোথায় তারা চলেছে। কোথায় চলেছে নিজেও জানে না। কল্পনায় ওর চোখের উপরে ভেসে উঠল নিজের বাড়িখানা। ছ'টা বড়ো বড়ো ঘর—যার ভিতরে ও বাস করে একা। আনফিসা পিসি চলে গেছেন মঠে। হয়তো আর ফিরে আসবেন না। মরেও যেতে পারেন সেখানে। বাড়িতে আছে বুড়ো চাকর

কালা ইভান। বুড়ী ঝি সেক্লেতেইয়া আর পাচক ও চাকর। আর আছে একটা লোমশ কুকুর—কালো, শাপলাপাতা মাছের মতো থ্যাবড়া নাক। কুকুরটাও বুড়ো।

বোধহয় বিয়ে করাই আমার উচিত।—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ভাবল ফোমা মনে মনে।

ওর পক্ষে বিয়ে করা কতই না সহজ! ভাবতেই ওর মনটা দমে গেল। এমনকি নিজের কাছে নিজেকেই কেমন যেন বিশ্রী লাগতে লাগল। কালই বলা দরকার ওর ধর্ম-বাবাকে একটি কনের জন্যে। এক মাসের ভিতরেই আসবে একটি নারী। বসবাস করবে এসে ওর সঙ্গে—ওর ঘরে। দিনরাত থাকবে ওর পাশে। তাকে বলবে,—"চলো একটু বেড়িয়ে আসি গে"। সে যাবে ওর সঙ্গে। বলবে,—"চলো এখন শুতে যাই", তক্ষুনি সে আসবে শুতে। ফোমা তাকে আর সেও চুম্বন করবে ওকে। এমনকি তার ইচ্ছে না থাকলেও। আর যদি সে তাকে বলে,—"চাই না, চলে যাও এখান থেকে!" মনে ব্যথা পাবে। তখন কী বলবে ফোমা তাকে?—ভাবতে লাগল ফোমা। ওর মনে ভেসে উঠতে লাগল পরিচিত মেয়েদের ছবি। ব্যবসায়ীদের মেয়েদের ছবি। কেউ কেউ খুবই সুন্দরী। ফোমা জানে ওরা যে কেউ-ই স্বেচ্ছায় রাজী হবে ওকে বিয়ে করতে। কিন্তু তাদের কাউকেই স্ত্রী হিসাবে পেতে আদৌ লালায়িত নয় ফোমা। যখন একটি মেয়ে বৌ হয়ে আসবে ওর ঘরে—কী বিশ্রী, কী লজ্জার কথা। আচ্ছা নবপরিণীত স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে কী কথা বলে বিয়ের পরে যখন ওরা শোবার ঘরে থাকে একা একা? ভাবতে চেষ্টা করল ফোমা। এমনক্ষেত্রে কী বলবে সে? কিন্তু কিছুই পারল না ভেবে উঠতে। উপযুক্ত কথা খুঁজে না পেয়ে হেসে উঠল আপন মনে। পরক্ষণেই মনে পড়ল লিউবা মায়াকিনের কথা। নিশ্চয়ই সে কথা বলবে আগে। প্রয়োগ করবে কতগুলো অবোধ্য শব্দ—যা নাকি তার নিজের কাছেও একান্ত অজানা। কেন যেন ওর মনে হচ্ছে, লিউবার সব কথাই দুর্বোধ্য। ও যা-কিছু বলে তা ওর মতো বয়সের—ওর মতো চেহারার বা বংশের মেয়ের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

সঙ্গে সঙ্গেই ওর মনে পড়ল লিউবার অভিযোগের কথা। শ্লথ হয়ে এল ওর চলার গতি। অবাক হয়ে গেল ফোমা এই ভেবে যে, যারাই ওর কাছের লোক—যাদের সঙ্গেই ও কথা বলেছে বেশি, তারা সবাই জীবন সম্পর্কে বলেছে কথা। ওর বাবা, পিসিমা, ওর ধর্মবাপ, লিউবা, সোফিয়া পাভলোভ্না, সবাই। কেউ হয়তো উপদেশ দিয়েছে ওকে জীবনকে বুঝতে আর কেউ-বা জীবন সম্পর্কে করেছে অভিযোগ। ফোমার মনে পড়ল স্টিমারের সেই বুড়োর কথা। সেও বলেছিল ওকে অদৃষ্টের কথা। তাছাড়া আরো অনেকেরই মুখে শুনেছে জীবন সম্পর্কে তিক্ত অভিযোগ, অনেক মন্তব্য, তীব্র ভর্ৎসনা।

অর্থ কী এর?—মনে মনে ভাবল ফোমা। যদি মানুষই না হয় তবে জীবন কী? অথচ সেই মানুষই আবার জীবন সম্পর্কে এমনভাবে বলে, যেন ওটা আলাদা একটা বস্তু—মানুষকে বাদ দিয়ে, বাইরের একটা কী। আর সেটা মানুষের বেঁচে থাকার পক্ষে জন্মায় বাধা। তবে কি সেটা শয়তান?

কেমন যেন একটা ভয় ওর সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। কেঁপে উঠল ফোমা। দ্রুত চারদিকে তাকাল। শান্ত পথ, জনমানবহীন। বাড়ির জানালাগুলো ম্লান চোখে তাকিয়ে রয়েছে রাত্রির অন্ধকারের দিকে। দেয়ালের গায়ে আর বেড়ার উপরে পড়েছে ফোমার ছায়া।

কোচোয়ান!—দ্রুত পায়ে চলতে চলতে চিৎকার করে ডেকে উঠল ফোমা। চমকে

উঠল ছায়া। হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগল ওর পিছু পিছু। ভীত, কালো, নীরব। ফোমার মনে হল, কে যেন ওর পিছন পিছন ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ধেয়ে চলেছে। বিরাট, অদৃশ্য, ভয়ঙ্কর। বুঝিবা এক্ষুনি ধরে ফেলল ওকে। ভীত ফোমা প্রায় ছুটতে শুরু করল গাড়িটাকে ধরবার জন্যে। অন্ধকারের ভিতর থেকে নিঃশব্দে এগিয়ে এল গাড়িটা। যখন গাড়িটার ভিতরে উঠে বসল ফোমা তখনও পিছনের দিকে ফিরে তাকাতে ভয় করছে ওর। যদিও চায় একটিবার ফিরে দেখতে।

৭

মেদিনস্কায়ার সঙ্গে সেদিনের সেই কথাবার্তার পর এক সপ্তাহ কেটে গেছে। রাত-দিন তার মূর্তি ভেসে ওঠে ফোমার মনে। জাগিয়ে তোলে অন্তর কুরে-খাওয়া এক দুশ্চিন্তাভরা বেদনার অনুভূতি। মনপ্রাণ আকুলি-বিকুলি করে ওঠে। ইচ্ছে হয় ছুটে যায় তার কাছে। তারই সঙ্গলাভের এক সুতীব্র আকর্ষণ অনুভব করে। সেই ব্যাকুল কামনার সংঘাতে দেহের প্রতিটি হাড় পর্যন্ত বুঝিবা ব্যথায় মরমর করে ওঠে। কিন্তু এক রূক্ষ কঠিন নীরবতায় মৌন হয়ে থাকে ফোমা। ভ্রূ কুঁচকে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে, তবুও সেই ইচ্ছের কাছে করে না আত্মসমর্পণ। প্রাণপণ চেষ্টায় ডুবে থাকে কাজকর্মের ভিতরে, আর ঐ নারীর প্রতি এক নিদারুণ ক্রোধে ধূমায়িত করে তোলে অন্তর।

মনে মনে অনুভব করে ফোমা যে, যদি সে তার কাছে যায়, আর পারবে না তাকে দেখতে ঠিক আগের মতো করে। সেদিনের সেই আলোচনার পরে নিশ্চয়ই তার মনে এসেছে কিছু পরিবর্তন। তাই আগের মতো আন্তরিকতার সঙ্গে পারবে না আর ওকে গ্রহণ করতে। হাসবে না আর সেই স্বচ্ছ সুন্দর হাসি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। যে হাসি ওর অন্তর আলোড়িত করে জাগিয়ে তুলত এক অদ্ভুত চিন্তাধারা—জাগিয়ে তুলত আশা। সে সবকিছুই বুঝিবা গেছে নষ্ট হয়ে—গেছে হারিয়ে। পরিবর্তে অন্য কিছু এসে বাসা বেঁধেছে তার মনে। নিজেকে সংযত করল ফোমা। আর নিদারুণ ব্যথায় বিকল হয়ে উঠতে লাগল ওর দেহমন।

কাজকর্ম কিংবা সোফিয়ার জন্যে ওর ব্যাকুলতা পারল না ফোমার জীবন সম্পর্কে চিন্তায় বাধা সৃষ্টি করতে। ঐ রহস্য—যা নাকি ওর অন্তর আলোড়িত করে জাগিয়ে তুলেছে এক ভয়ের অনুভূতি—তা নিয়ে অবশ্য দার্শনিকতা করে না ফোমা। ও পারে না তর্ক করতে—পারে না আলোচনা করতে। কিন্তু লোকে জীবন সম্পর্কে যা কিছু মন্তব্য করে, একান্ত মনোযোগের সঙ্গে শোনে সেসব কথা। আর চেষ্টা করে মনে রাখতে। কিন্তু সেসব কথা কিছুই পরিষ্কার নয়, কিছুই বোধগম্য হয় না ওর কাছে। বরং ওর মনে জাগিয়ে তোলে দুশ্চিন্তা। তাদের সন্দেহের চোখে দেখার মনোভাবই জাগিয়ে তোলে ওর মনে। এটা লক্ষ্য করেছে ফোমা যে তারা চতুর—বুদ্ধিমান। বেশ হুঁশিয়ার হয়েই কাজকারবার করতে হয় তাদের সঙ্গে। ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছে ফোমা, যে-কোনো প্রয়োজনীয় ব্যাপারে ওরা যেমনটি ভাবে তেমনটি বলে না। বিশেষ করে লক্ষ্য করে দেখেছে ফোমা যে, জীবন সম্পর্কে ওদের দীর্ঘশ্বাস, ওদের অভিযোগ ওর অন্তরে জাগিয়ে তোলে অবিশ্বাস। নীরব সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে ঐ সব লোকদের দিকে তাকায়। কপাল কুঁচকে থাকতে থাকতে ওর কপালে পড়েছে ক্ষীণ একটা বলি-রেখা।

একদিন সকালে বাজারে বসে ওর ধর্মবাপ ওকে বলল: আনানি এসেছে।

অনেক পাপী-ই কি নেই দুনিয়ায়?

মাত্র একটি লোক আছে যে নাকি মৃত ইগনাতের চাইতে আরো বেশি পাপী। সে হলগে ঐ অভিশপ্ত নোংরা জীবটা—তোমার ধর্মবাপ ইয়াশকা।

ঠিক জানেন আপনি?—মৃদু হেসে প্রশ্ন করল ফোমা।

আমি? নিশ্চয়ই জানি।—মাথা নাড়তে নাড়তে দৃঢ় কণ্ঠে বলল শুরভ। ওর চোখদুটো কেমন যেন ঘোর হয়ে এসেছে।

অবশ্য আমিও যখন গিয়ে প্রভুর কাছে হাজির হবো, নেহাত নিষ্পাপ হয়ে যাবো না। ভারি বোঝা নিয়ে গিয়েই হাজির হবো তাঁর পবিত্র মূর্তির সামনে। শয়তানের সেবা করেছি আমিও। কিন্তু তবুও বিশ্বাস রাখি, তাঁর করুণা পাবো। কিন্তু কোনো কিছুর উপরেই বিশ্বাস নেই ইয়াশ্‌কার। না স্বপ্নের উপরে, না পাখির গানের উপরে। আমি জানি ইয়াশ্‌কার ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই। ঐ নাস্তিকতার জন্যেই এ দুনিয়ায় থাকতে থাকতেই তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আপনি কি এ-সম্পর্কে স্থিরনিশ্চিত?

হাঁ, জানি আমি। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না আমার কথাগুলো শুনতে তোমার যে খুবই খারাপ লাগছে তাও আমি জানি? তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক বটে তুমি। কিন্তু যে জীবনে অনেক বেশি পাপ করেছে সে আরো বেশি বুদ্ধিমান। পাপ হচ্ছে শিক্ষক। আর সেই জন্যেই ইয়াশ্‌কা মায়াকিন অমন অদ্ভুত রকমের চতুর লোক।

বৃদ্ধের প্রত্যয়ভরা কর্কশ কণ্ঠের কথা শুনে মনে মনে ভাবল ফোমা: বোধহয় ইনিও মৃত্যুর গন্ধ পেতে আরম্ভ করেছেন।

হোটেলের পরিচারক সামোভার নিয়ে এল। বেঁটেখাটো চেহারা। ভাবলেশ-হীন বিবর্ণ পাংশু মুখ। সামোভারটা রেখে দিয়েই দ্রুত লঘু পদক্ষেপে ঘর ছেড়ে চলে গেল। জানালার উপরে রেখে কি যেন একটা মোড়ক খুলছিল বৃদ্ধ। ফোমার দিকে না তাকিয়েই বলে উঠল:

তুমি খুব সাহসী। বেশ গভীর তোমার চোখের চাউনি। আগে মানুষের চোখের দৃষ্টি হত হালকা। কারণ তাদের অন্তর ছিল উজ্জ্বল। সেকালে সব কিছুই ছিল সহজ, সরল। মানুষও আর তাদের পাপও। আর আজকাল সব কিছুই জটিল হয়ে উঠেছে। হেঃ হেঃ!

ফোমার মুখোমুখি বসে চা তৈরি করতে করতে বলে চলেছে বৃদ্ধ:

তোমার বয়সে তোমার বাবা করত জল সেঁচার কাজ। আর থাকত আমাদের গাঁয়েরই কাছে একটা নৌবহরের সঙ্গে। তোমার বয়সে ইগনাতও ছিল আমার কাছে কাঁচের মতোই পরিষ্কার—স্বচ্ছ। এক নজরেই বলে দিতে পারতাম কী ধরনের লোক সে। কিন্তু তুমি—এইতো আমি তাকিয়ে দেখছি তোমার মুখের দিকে—কেমন, কী ধরনের লোক কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। তুমি কে—তা বাপু নিজেও জানো না। তাই জীবনে দুঃখ পাবে। সব মানুষকেই আজকাল দুঃখ পেতে হয়। কারণ তারা জানে না কী তারা। জানে না নিজেকে। জীবন হচ্ছে ঝড়ে উপড়ে-পড়া একগাদা গাছের মতো। জানতে হবে তোমাকে কেমন করে তার ভিতর দিয়ে পথ করে নিতে হয়। কিন্তু কোথায় তা? উজিয়ে যাচ্ছে সবাই। আর তাতে শয়তানই কেবল খুশি হয়ে উঠছে। বিয়ে করেছ?

না করিনি এখনও।—বলল ফোমা।

আবার দেখো,—তুমি বিয়ে করোনি। তবুও ঠিক জানি, পবিত্রও নও আর

তুমি। ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে খুব পরিশ্রম করছ বুঝি?

করি কখনো কখনো। এখন তো ধর্মবাবার সঙ্গেই আছি।

কী ধরনের কাজকর্ম আছে এখন?—মাথা নাড়তে নাড়তে প্রশ্ন করল বুড়ো। ওর চোখদুটো ক্রমেই জ্বলে উঠছে মিট্ মিট্ করে।

আজকাল তোমাদের কোনো পরিশ্রমই করতে হয় না। আগের কালের ব্যবসায়ী-দের ব্যবসার কাজে চলাফেরা করতে হত ঘোড়ায়। এমনকি, তাদের চলতে হত রাত্রে—ঝড়-তুষারের মধ্য দিয়ে। শুনে ডাকাতেরা পথের পাশে থাকত ওঁত পেতে। তারা হত্যা করত। আর তারা বরণ করত শহীদের মৃত্যু। নিজের দেহের রক্তে পাপ যেত ধুয়ে। আর আজকাল তারা চলাফেরা করে রেলে। মাল পাঠায়। এমন এক যন্ত্র আবিষ্কার করে বসেছে যে লোকে পাঁচ মাইল দূরে থেকেও কথা-বার্তা বলতে পারে। আফিসে বসে পাঁচ মাইল দূরের সেকথা স্পষ্ট শুনতে পারে। এর ভিতরে নিশ্চয়ই রয়েছে শয়তানের কারসাজি। মানুষ নিশ্চল হয়ে বসে থাকে আর পাপ করে চলে। কারণ, তার একা একা লাগে—নিঃসঙ্গ। করবার কিছুই নেই। যন্ত্রই করে দিচ্ছে তার সব কাজ। তাই করবার মতো আর কোনো কাজই নেই। আর কাজ নেই বলেই চলেছে ধ্বংসের পথে। মানুষ নিজের জন্যে সৃষ্টি করছে যন্ত্র। ভাবছে খুবই ভালো। কিন্তু যন্ত্র হচ্ছে শয়তানের পাতা ফাঁদ। সে এই ফাঁদে আঁটকে ফেলে মানুষকে। মানুষ যত বেশি কাজ করবে, পাপ করবার সময় পাবে ততই কম। কিন্তু যন্ত্র পেয়ে মানুষ পেয়েছে স্বাধীনতা। স্বাধীনতা হত্যা করে মানুষকে। যেমন করে সূর্যের কিরণ-রেখা মাটির গভীর অভ্যন্তরের অধিবাসী কীট-পতঙ্গদের মেরে ফেলে। স্বাধীনতা পিষে মারে মানুষের আত্মাকে।

পরিষ্কার সুস্পষ্ট কণ্ঠে প্রতিটি কথা উচ্চারণ করতে করতে আনানি আঙুল দিয়ে চারবার আঘাত করল টেবিলের উপরে। বিজয়-গর্বে ওর মুখখানা উঠেছে উজ্জ্বল হয়ে। ফুলে উঠেছে বুক। আর তারই উপরে রুপোলি দাড়িগুলো নড়ছে নিঃশব্দে।

আনানির মুখের দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনতে শুনতে নিদারুণ ভয়ে কেঁপে উঠল ফোমার বুক। ওর অন্তরে রয়েছে এক সুদৃঢ় বিশ্বাসের ঝঙ্কারময় সুর। সেই বিশ্বাসের শক্তিই ওকে বিচলিত করে তুলল। ভুলে গেল যা-কিছু জানে সে ঐ বৃদ্ধের সম্পর্কে—মুহূর্ত আগেও যে কথা সত্যি বলে ওর মনে জন্মেছিল সুদৃঢ় বিশ্বাস।

দেহকে যে শ্রম থেকে মুক্তি দেয়, হত্যা করে সে তার আত্মাকে।—এমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে ফোমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল আনানি যেন সে দেখতে পাচ্ছে ওর পিছনে দাড়িয়ে রয়েছে একটা মানুষ। দারুণ আহত হয়েছে ওর কথায়। ভীত হয়ে পড়েছে। তার ভয় ও ব্যথা ওকে আনন্দিত করে তুলল।

তোমরা একালের মানুষ ঐ মুক্তির ভিতর দিয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে। পড়েছ তোমরা শয়তানের খপ্পরে। সে কেড়ে নিয়েছে তোমাদের শ্রম আর হাতে তুলে দিয়েছে যন্ত্র, দিয়েছে টেলিগ্রাফ। মুক্তি কেমন করে মানুষের আত্মা কুরে কুরে খাচ্ছে! বলো দেখি, ছেলেরা কেন তাদের বাবাদের চাইতে খারাপ? তাদের স্বাধীনতার জন্যে। হাঁ, ঠিক তাই। তাই তারা মদ খায় আর মেয়েমানুষ নিয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করে। তাদের শক্তি কম, কারণ তাদের কাজ কম। আর চিন্তা ভাবনা কম বলেই আনন্দের অনুভূতিও কম। বিশ্রামের মুহূর্তেই আসে আনন্দ। কিন্তু আজকাল কেউ-ই পরিশ্রম-ক্লান্ত হয় না।

আচ্ছা,—কোমল মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল ফোমা,—আগের কালেও যেমন লোক মদ খেত, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করত, আমার ধারণা আজকালও তেমনি-ই করে।

জানো তুমি? চুপ করে থাকো!—তীব্র দৃষ্টি মেলে চিৎকার করে উঠল আনানিন।

আগের কালে মানুষের শক্তি ছিল ঢের বেশি। আর পাপও করত সেই শক্তিরই অনুপাতে। কিন্তু তোমরা আজকালকার লোকেরা—তোমাদের শক্তি কম। কিন্তু পাপ করো বেশি। তাছাড়া তোমাদের পাপ আরো বেশি ঘৃণ্য। তখন মানুষ ছিল বট-গাছের মতো। ঈশ্বরের বিচারও হয় মানুষের শক্তির অনুপাতে। ওজন করা হয় তাদের দেহ। দেবদূতেরা তাদের দেহের রক্তের পরিমাপ করে আর ঈশ্বরের দূতেরা দেখবে পাপের ওজন যেন দেহের রক্তের ওজনের চাইতে বেশি না হয়। বুঝলে? নেকড়ে যদি মেষ মেরে খায়, তার জন্যে ঈশ্বর তাকে শাস্তি দেয় না। কিন্তু যদি এক হতভাগ্য ইঁদুর একটা মেষের মৃত্যু ঘটায় ঈশ্বর ঐ ইঁদুরটাকেই শাস্তি দেবেন।

মানুষ কি করে বলতে পারে ঈশ্বর কেমন করে মানুষের বিচার করেন? চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করল ফোমা।—প্রকাশ্য বিচারের প্রয়োজন।

প্রকাশ্য বিচারের প্রয়োজন কেন?

মানুষ যাতে বুঝতে পারে।

ঈশ্বর ছাড়া কে আমার বিচারকর্তা?

বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকাল ফোমা তারপর মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইল। আবার ওর মনে পড়ে গেল সেই পলাতক ফেরারী আসামীর কথা, যাকে খুন করে পুড়িয়ে ফেলেছিল শ্চুরভ। ওর মনে হল কথাটা সত্য। তাছাড়া ঐ মেয়েরা—ওর স্ত্রী ও উপপত্নীর দল—নিশ্চয়ই তারা মরেছে অকালে, বৃদ্ধের আলিঙ্গনে। তাদের হাড়গুলো বুকে চেপে পিষে মেরেছে তাদের। তাদের জীবনের নির্যাসটুকু চুষে খেয়েছে ঐ পুরু মোটা দুটো ঠোঁট দিয়ে। সেই নারীদেহের জমাট রক্তে রক্তে এখনো লাল হয়ে রয়েছে ঠোঁটদুটো। ওর দীর্ঘ, শিরাবহুল হাতের পেষণে ফেলেছে তারা অন্তিমনিঃশ্বাস। আর নিজে এখন অপেক্ষা করছে মৃত্যুর। ইতি-মধ্যেই যার ছায়া ঘুরতে শুরু করেছে ওর পিছে পিছে। এখন সে কিনা হিসেব করছে পাপের। বিচার করছে অন্য লোককে। হয়তো বিচার করছে নিজেকে আর বলছে ঈশ্বর ছাড়া কে আমার বিচারকর্তা।

ও কি ভয় পেয়ে গেছে নাকি?—নিজের কাছেই প্রশ্ন করল ফোমা। আর আড়চোখে বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করতে লাগল।

ভাবো। ভেবে দেখো, হাঁ,—মাথা নাড়তে নাড়তে বলল শ্চুরভ।—ভাবো কেমন করে কাটাবে জীবন। তোমার অন্তরের মূলধন খুবই কম—সামান্য। কিন্তু তোমার অভ্যাস অনেক। দেখো, নিজের কাছেই যেন নিজে দেউলে হয়ে পড়ো না। হোঃ হোঃ হোঃ!

আমার অন্তরে কতটুকু কী আছে না আছে কেমন করে জানলেন আপনি?—আনানির হাসিতে চটে গিয়ে মুখ গোমড়া করে প্রশ্ন করল ফোমা।

দেখতে পাচ্ছি আমি। জানি সব। কারণ আমি বেঁচে আছি দীর্ঘদিন ধরে। কত গাছ জন্মাল, বড়ো হল, কেটে নিয়ে গেল। তা দিয়ে তৈরি হল কত বাড়ি-ঘর। আর সে-সব বাড়িঘরও পুরানো হয়ে উঠেছে। আমি যখন এতসব দেখেছি আর এখনো বেঁচে আছি—। সময় সময় ভাবি আমি আমার নিজের জীবনের

কথা। মনে হয়, একটা মানুষের দ্বারা এত সব হয়েছে, তাও কি সম্ভব? এ কি সত্য যে আমি দেখেছি এত সব?—বলতে বলতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ফোমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে চুপ করে গেল।

ঘরময় নেমে এল নিস্তব্ধতা। জানালার বাইরে ছাদের উপরে জেগে উঠেছে কিসের যেন মৃদু মর্মর শব্দ। নিচে থেকে গাড়ির চাকার শব্দের সঙ্গে মিশে মানুষের কণ্ঠের অস্পষ্ট কোলাহল আসছে ভেসে। টেবিলের উপরে সামোভারটা গেয়ে উঠেছে করুণ সুরে। একদৃষ্টে শুরভ তাকিয়ে আছে তার চায়ের গ্লাসের দিকে আর আস্তে আস্তে দাড়িতে হাত বোলাচ্ছে। কান পাতলে শোনা যায়, ওর বুকের ভিতরে কী যেন ঘড়্‌ঘড় করছে। যেন একটা ভারি বস্তু গড়াচ্ছে।

বাবাকে ছেড়ে থাকতে খুবই কষ্ট হচ্ছে, না?—বলল আনানি।

না, অভ্যাস হয়ে গেছে।—বলল ফোমা।

তুমি ধনী, যখন ইয়াকভ মারা যাবে তখন আরো ধনী হবে। সব কিছুই দিয়ে যাবে তোমাকে।

আমার দরকার নেই।

তবে তার ধন-সম্পত্তি আর কাকে দেবে? থাকার মধ্যে আছে তো একটা মেয়ে। তোমার উচিত তাকে বিয়ে করা। অবশ্য সে তোমার ধর্মবোন। তাতে কিছু যায় আসে না। সেসব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর তোমাদের বিয়ে হবে। এখন যেমন আছ তেমনি জীবন কাটিয়ে লাভ? সারাটা জীবনই বুঝি মেয়েদের পিছন পিছন ঘুরতে চাও?

না।

বলো না আর সে কথা। হেঃ হেঃ হেঃ! ব্যবসায়ীরা মরে যাচ্ছে। এক বনরক্ষক বলেছিল,—জানি না সত্যি কি মিথ্যে। বলেছিল যে আগে কুকুরগুলো ছিল নেকড়ে বাঘ। তারপর নিচে নামতে নামতে কুকুরে পরিণত হয়েছে। আমাদের সম্পর্কেও খাটে ও কথা। দেখো শিগ্‌গিরই আমরাও কুকুরে পরিণত হয়ে যায়। আমরা বিজ্ঞান শিখব, কেতাদুরস্ত টুপি পরব মাথায়, করব সব কিছু যাতে আমাদের চেহারা যায় বদলে। অন্যের সঙ্গে আর এতটুকু পার্থক্যও বজায় থাকে। আজকাল একটা রেওয়াজ হয়ে গেছে, সব ছেলেকেই স্কুলের ছাত্র বানাবার। ব্যবসায়ী, জমিদার, সাধারণ লোক—সবাইকেই ঢালা হচ্ছে একই ছাঁচে। ওদের পরায় ধূসর রঙের পোশাক, শেখায় একই বিষয়। যেমন করে গাছ জন্মায় তেমনি করেই ওরা তৈরি করছে মানুষ। কেন এমন করছে কেউ জানে না। একটা গাছের টুকরোও অন্য একটা গাছের টুকরো থেকে আলাদা। কিন্তু ওরা মানুষকে এমনভাবে পালিশ করতে যাচ্ছে যাতে সবাইকে একই রকমের দেখতে হয়। আমাদের বুড়োদের জন্যে তো কফিন তৈরি হয়েই আছে। হাঁ! পঞ্চাশ বছর পরে হয়তো কেউ বিশ্বাসই করবে না যে আমি ছিলাম এ দুনিয়ায়, বাস করতাম। আমি আনানি,—সাভার ছেলে যার একই পদবী—শুরভ। তবে? আমি আনানি—ঈশ্বরকে ছাড়া যে আর কাউকে ভয় করে না এ দুনিয়ায়। যৌবনে আমি ছিলাম এক চাষী—যার জমি মাত্র দু'বিঘে। অরা আজ বৃদ্ধ বয়সে আমার সঞ্চয় বারো হাজার বিঘে—গোটা একটা বন। তাছাড়া নগদ বোধহয় বিশ লাখ।

এইতো, সবাই বলে টাকার কথা।—অসন্তুষ্ট মনে বলে উঠল ফোমা,—টাকা থেকে কী আনন্দ মানুষ পায়?

বটে!—গর্জে উঠল শুরভ। টাকার শক্তি কতখানি তা যদি তুমি না বোঝ

তবে ব্যবসায়ী হিসাবে আদৌ সাফল্য অর্জন করতে পারবে না।

কে বোঝে?—প্রশ্ন করল ফোমা।

আমি।—দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল শ্চুরভ।—আর বোঝে যারা চতুর বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী। বোঝে ইয়াশ্‌কো। টাকার কথা বলছ? টাকা অনেকখানি, বুঝলে বাছা? সামনে টাকা ছড়িয়ে দিয়ে চিন্তা করো,—কী আছে এর ভিতরে? তখন জানতে পারবে, এ হচ্ছে মানুষের শক্তি। মানুষের বুদ্ধি—মানুষের মন। হাজার হাজার মানুষ জীবন দিয়েছে তোমার ঐ টাকার ভিতরে, দেবে আরো হাজার হাজার মানুষ। সব-গুলোকে আগুনে ঢেলে দাও, দেখবে কেমন করে টাকা পোড়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে অনুভব করতে শিখবে নিজেকে মালিক হিসাবে।

কিন্তু কেউ-ই করে না তা।

করে না কারণ বোকা যারা তাদের টাকা নেই। টাকা খাটানো হয় ব্যবসায়ে। ব্যবসা মানুষের রুটি জোগায়। আর তারই জন্যে তুমি মানুষের প্রভু। কেন ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন মানুষ? মানুষ তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে বলে। তিনি ছিলেন একা। তাই নিজের মূর্তির অনুরূপ সৃষ্টি করলেন মানুষ। মানুষও চায় ক্ষমতা। টাকা ছাড়া কিসে ক্ষমতা আনে? এটাই হচ্ছে পথ। ভালো কথা, তুমি—তুমি আমার টাকা এনেছ?

না।—প্রত্যুত্তরে বলল ফোমা।

বুড়োর কথার তোড়ে ভারি হয়ে উঠছিল ফোমার মাথা। যন্ত্রণা হচ্ছিল মাথার ভিতরে। খুশি হয়ে উঠল, ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার মোড় নিতে।

ঠিক কাজ করোনি।—তীব্র দৃষ্টিতে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে বলল শ্চুরভ।—মেয়াদ অনেক দিন আগে শেষ হয়ে গেছে। তোমার টাকাটা দিয়ে দেয়া উচিত।

কাল পাবেন অর্ধেক।

অর্ধেক কেন? সবটাই কেন দিচ্ছ না?

এখন টাকার খুব দরকার কিনা!

কেন টাকা নেই তোমার? আমারও তো দরকার।

আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন।

না হে বাপু না। আর পারব না আমি অপেক্ষা করতে। তুমি তোমার বাবা নও। তোমার মতো বাচ্চা ছেলে, অর্বাচীনদের বিশ্বাস করতে নেই। এক মাসের ভিতরে তুমি তোমার ব্যবসা উড়িয়ে দিতে পারো। আর তখন লোকসানটি হবে আমার। কালই তুমি আমার সব টাকা দিয়ে দেবে। নইলে আদালতে নালিশ করে দেবো। তাতে একটুও দেরি হবে না আমার।

বিস্ফারিত চোখে ফোমা ওর মুখের দিকে তাকাল। মুহূর্ত আগে যে অমন বিজ্ঞের মতো বলছিল শয়তানের কথা, এর সঙ্গে যেন তার মিল নেই কোথাও এত-টুকুও। তখন চোখমুখের ভাব ছিল অন্য রকম। কিন্তু এখন ওকে দেখাচ্ছে ভয়ঙ্কর। ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছে নির্মম নিষ্করুণ হাসির রেখা। নাকের দুপাশে গালের উপরের শিরাদুটো কাঁপছে। ফোমার মনে হল, এক্ষুনি যদি ওর টাকা না ফেলে দেয়, তবে তার ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে হেয় প্রতিপন্ন করতে আদালতে নালিশ রুজু করে দিতে এতটুকুও ইতস্তত করবে না।

বোধ হয় ব্যবসার অবস্থা খারাপ, কেমন?—শ্চুরভ মুখ বাঁকাল।—বেশ, সত্যি-কথা বলো দেখি, কোথায় উড়িয়েছ বাবার টাকাগুলো?

ফোমার ইচ্ছে হল বুড়োকে একটু বাজিয়ে দেখে। বলল: ব্যবসার অবস্থা

তেমন ভালো নয়,—কপাল কুঁচকে বলল ফোমা,—কোনো চুক্তিও নেই আমাদের, তাই দাদনের টাকাও নেই। ফলে একটু সংকটের ভিতর দিয়ে চলেছি।

তাই বলো! তোমাকে সাহায্য করি তাই চাও?

যদি দয়া করে করেন। টাকা পরিশোধের তারিখটা কিছুদিন পিছিয়ে দিন। —অনুনয়ের ভঙ্গিতে চোখ নিচু করে বলল ফোমা।

হুঁ! তোমার বাবার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। তারই খাতিরে তোমাকে এ অবস্থা থেকে টেনে তুলি তুমি চাও? বেশ তাই-ই হোক! তোমাকে সাহায্য করব।

তাহলে কত দিনের জন্যে স্থগিত রাখছেন?—প্রশ্ন করল ফোমা।

ছ' মাসের জন্যে।

আন্তরিক ধন্যবাদ আপনাকে।

ও কথা বলো না। তুমি আমার কাছে ধারো এগারো হাজার দু'শ টাকা। এখন শোনো, দলিলটা নতুন করে লিখে দাও—পনেরো হাজার টাকার। আর সুদের টাকাটা অগ্রিম দিয়ে দাও। তাছাড়া জামিন হিসাবে তোমার দুখানা গাধাবোট আমি বাঁধা রাখব।

ফোমা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর মৃদু হেসে বলল :

কা'ল দলিলটা পাঠিয়ে দেবেন, আপনার সব টাকা দিয়ে দেব।

শ্চুরভও উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। তারপর ফোমার বিদ্রূপভরা মুখের দিকে তাকিয়ে বুক চুলকাতে চুলকাতে মিয়ানো সুরে বলল :

তা ভালো কথা, ঠিক আছে।

আপনার দয়ার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ।

ও কিছু না! তুমি তো আর সুযোগ দিলে না আমাকে সহৃদয়তা দেখাবার! তাহলে দেখতে কেমন আমার সহৃদয়তা।—দাঁত বের করে ধীরে ধীরে বলল বৃদ্ধ।

হাঁ, তা তো বটেই! কেউ যদি আপনার খপ্পরে পড়ে তবে—

সে বুঝবে তার উত্তাপ—

নিশ্চয়ই, একটু বেশি মাত্রায়ই উত্তাপ সৃষ্টি করবেন তার জন্যে।

বেশ বাপু, বেশ! ওতেই হবে!—রুক্ষকণ্ঠে বলে উঠল শ্চুরভ।—খুবই চালাক মনে করছ নিজেকে; কিন্তু তা করছ একটু অগ্রিম। এক কানা কড়িও লাভ করোনি এখন পর্যন্ত, এরই মধ্যে অহঙ্কার করতে শুরু করেছ! আগে আমাকে হারিয়ে জয়লাভ করো তখন না-হয় আনন্দে লাফাবে। নমস্কার! সব টাকাটাই কিন্তু কালকে চাই।

ভয় নেই! নমস্কার!

ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন।

ফোমা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এল, পিছনে শুনতে পেল বৃদ্ধের হাই তোলার শব্দ। তারপর কর্কশ গলায় গুন্‌গুন্ করে গেয়ে উঠল :

তব করুণার দুয়ার খুলিয়া দাও
আমাদের লাগি
হে কুমারী মাতা!...

* * *

দুই বিভিন্ন রকমের অনুভূতি নিয়ে ফিরে এল ফোমা বৃদ্ধের কাছ থেকে। শ্চুরভ যুগপৎ দিয়েছে ওকে তৃপ্তি, আর জাগিয়ে তুলেছে ঘৃণা।

ফোমার মনে পড়ল পাপ সম্পর্কে বৃদ্ধের কথা, ঈশ্বরের করুণা পাওয়া সম্পর্কে

তার বিশ্বাসের শান্তি। ফলে ঐ বৃদ্ধের প্রতি ওর মনে জেগে উঠেছে শ্রদ্ধার ভাব।

শুরভও বলে জীবনের কথা। জানে সে তার নিজের পাপ সম্পর্কে। কিন্তু তার জন্যে কান্নাকাটি করে না। করে না অভিযোগ। সে নিজে পাপ করেছে আর তার ফলভোগের জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু সে?—ফোমার মনে পড়ে গেল মেদিনস্কায়ার কথা। সঙ্গে সঙ্গেই ওর বুকখানা ব্যথায় মুচড়ে উঠল।

সেও করেছে অনুতাপ। কিন্তু বলা শক্ত যে বিচারের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে ইচ্ছে করেই করছে, না প্রকৃতই তার অন্তর ভরে উঠেছে ব্যথায়। 'প্রভু ছাড়া কে আমার বিচারকর্তা'?—বলে শুরভ। এমনি-ই হওয়া উচিত।

ফোমার মনে হল, সে আনানিকে ঈর্ষা করতে শুরু করেছে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল, ওকে ঠকাবার জন্যে আনানির প্রচেষ্টার কথা। মুহূর্তে বৃদ্ধের প্রতি ওর অন্তর বিমুখ হয়ে উঠল। অন্তরে জেগে-ওঠা ভাবগুলোর মধ্যে পারল না সামঞ্জস্য বিধান করতে। দারুণ বিরক্ত হয়ে উঠল মনে মনে। তারপর একটু হাসল, মৃদু হাসি।

হাঁ, গিয়েছিলাম শুরভের কাছে।—মায়াকিনের কাছে এসে বলল ফোমা। তারপর বসে পড়ল টেবিলের উপরে।

মায়াকিনের পরনে মসৃণ প্রভাতী পোশাক। হাতে হিসেবের স্লেট। চামড়ায় মোড়া চেয়ারের ভিতরে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ফোমার দিকে ফিরে তাকিয়ে উৎসাহভরা কণ্ঠে বলল ঃ

লিউবাভা, চা ঢেলে দে ওকে। হাঁ বলো তো! আমাকে আবার কাউন্সিলে যেতে হবে ন'টায়। তাড়াতাড়ি বলো।

মৃদু হেসে ফোমা বলল, কেমন করে দলিলটা পাল্টে লিখে দিতে বলেছিল বুড়ো।

ইস্!—তীব্র অনুশোচনাভরা কণ্ঠে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে উঠল তারাশভিচ—সব নষ্ট করে দিয়ে এসেছিস! লোকটার সঙ্গে অমন সোজাসুজি কথা বললি কেন? ছিঃ! শয়তানের বুদ্ধিতেই পাঠিয়েছিলাম তোকে ওর কাছে। আমার নিজের যাওয়াই উচিত ছিল। আঙুলের ডগায় করে ঘুরোতাম ব্যাটাকে!

সেটা একটু কঠিনই ছিল। বল্ল—"আমি একটা ওক গাছ।"

ওক গাছ? আর আমিও করাত। ওক! ওক ভালো গাছ সন্দেহ নেই, কিন্তু ওর ফল একমাত্র শুয়োরেরই খাদ্য! সুতরাং, মানে হচ্ছে ওক একটি নিছক নিরেট।

কিন্তু কথা তো একই। টাকা তো আমাদের পরিশোধ করতেই হবে। তা সে যেভাবেই হোক।

বুদ্ধিমান যারা, তারা এসব ব্যাপারে কখনো অমন জলদীবাজী করে না। আর তুই কিনা কত তাড়াতাড়ি টাকাটা শোধ দিতে পারিস তার জন্যে ছুটতে শুরু করে দিলি।

ধর্মছেলের উপরে দারুণ বিরক্ত হয়ে উঠল ইয়াকভ তারাশভিচ। ভ্রূ কুঁচকে নীরবে চা তৈরি-রত কন্যার উদ্দেশ্যে ক্রুদ্ধকণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠল ঃ

চিনিটা আমার দিকে ঠেলে দে! দেখছিস না অত দূরে হাত যায় না আমার!

লিউবভের মুখখানা পাংশু, বিবর্ণ হয়ে উঠল। মনে হল চোখদুটো উঠেছে ছল্‌ছল্ করে। অলস মন্থরতায় অদ্ভুতভাবে নড়ছে হাত। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবল ফোমা ঃ বাপের সামনে কেমন নিরীহ, ভেজা-বেড়ালটি!

আর কী বললে তোকে?—প্রশ্ন করল মায়াকিন।

বলল পাপের কথা।

বটে! নিজের ব্যাপার সব মানুষের কাছেই খুব প্রিয়। ও নিজেই একটা পাপের কারবারী। নরকের সবাই কাঁদছে ওর জন্যে দীর্ঘদিন ধরে। অধৈর্য হয়ে উঠেছে ওকে সেখানে পাবার জন্যে।

কিন্তু সে কথা বলে ওজন করে।—চায়ের ভিতরে চামচ ডুবিয়ে নাড়তে নাড়তে চিন্তিত মুখে বলল ফোমা।

আমাকে গাল পাড়লে বুঝি?—বিদ্বেষভরা বিকৃত মুখে প্রশ্ন করল মায়াকিন।

পেড়েছে কিছু কিছু।

আর তুই কী করলি তখন?

বসে বসে শুনলাম।

হুঃ! কী বললে?

বললে শক্তিমানেরা মার্জনা পাবে। কিন্তু যারা দুর্বল তাদের ক্ষমা নেই।

ভাবো একবার! কী গভীর জ্ঞান! মাছিগুলোও জানে সেকথা।

শুরভের প্রতি মায়াকিনের ঘৃণাভরা মনোভাবে কেন যেন ফোমা মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠল। মায়াকিনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ফোড়ন কেটে বলল :

সে কিন্তু আপনাকে আদৌ পছন্দ করে না।

কেউ-ই পছন্দ করে না আমাকে।—গর্বিত কণ্ঠে বলে উঠল মায়াকিন।—কোনো কারণ নেই যে আমাকে পছন্দ করতে পারে। আমি তো আর মেয়ে নই। কিন্তু সবাই শ্রদ্ধা করে। ওরা শ্রদ্ধা তাকেই করে, যাকে করে ভয়।—বলতে বলতে বৃদ্ধ গর্বোন্নত দৃষ্টি মেলে ফোমার দিকে তাকাল।

ওর কথার ওজন আছে।—বলল ফোমা। অভিযোগ করছিল যে প্রকৃত ব্যবসায়ীরা লোপ পেতে বসেছে। সকলকে দেয়া হচ্ছে একই ধরনের শিক্ষা যাতে সবাই সমান হয়ে একই ছাঁচে গড়ে ওঠে। সবাইকে একই রকমের দেখায়।

ওর মতে কি সেটা অন্যায় নাকি?

তাছাড়া কি?

মূর্খ! ঘৃণাভরা জড়িত কণ্ঠে বলে উঠল মায়াকিন।

কেন? সেটা কি ভালো?—সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ধর্মবাপের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল ফোমা।

জানি না কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারি কোন্‌টা বুদ্ধি-বিবেচনার কাজ। যখন দেখি, সমস্ত মানুষ ছুটেছে একই দিকে, অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে একই আদর্শে, ধরে নিতে হবে সেটাই বুদ্ধি-বিবেচনার কাজ। কারণ একটা গোটা সাম্রাজ্যের ভিতরে একটা মানুষ কতটুকু? একখানা ইটের চাইতে বেশি নয়। বুঝেছিস? তাছাড়া যদি সব মানুষ একই আকারের একই প্রকারের হয়, তবে যেখানে খুশি আমি আমার স্থান বেছে নিতে পারি।

কিন্তু কেবলমাত্র ইট হয়ে কে খুশি থাকতে পারে?—বিমর্ষ মুখে প্রশ্ন করল ফোমা।

খুশি হওয়া না-হওয়ার প্রশ্ন নয়—এটাই বাস্তব। যদি তুমি শক্ত ধাতুর গড়া হয়ে থাকো, কেউই তোমাকে পালিশ করতে পারবে না। সবার গায়ের ছ্যাতলাই তুমি ঘঁসে তুলে ফেলতে পারো না। কিন্তু অনেক মানুষ আছে যাদের হাতুড়ি পিটলে পরে সোনা হয়ে ওঠে। তাতে যদি এমন হয় যে মাথাটা ফেটেই গেল, তবে কি

আর করা যাবে? কেবলমাত্র প্রমাণ হল যে ওটা ছিল দুর্বল।

আনানিও বলছিল শ্রমের কথা। বলল, সবকিছুই আজকাল হচ্ছে যন্ত্রের সাহায্যে। আর তাতে মানুষ যাচ্ছে নষ্ট হয়ে।

ওর কি বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে নাকি?—ঘৃণাভরা কণ্ঠে হাত নাড়া দিয়ে বলে উঠল মায়াকিন।—অবাক হয়ে যাচ্ছি কেমন করে এসব বাজে কথা বসে বসে শুনতে ইচ্ছে হল তোর? এসব কথা আসে কোত্থেকে?

কেন কথাটা কি সত্য নয়?—শুষ্ক হাসি হেসে প্রশ্ন করল ফোমা।

কোন্ সত্যটা জানে সে? যন্ত্র! বুড়ো বেকুফটার ভাবা উচিত ছিল কী দিয়ে যন্ত্র তৈরি হয়। যন্ত্র তৈরি হয় লোহায়। তাই যন্ত্র অবহেলার বস্তু নয়। ওটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে তোমার জন্য টাকা সৃষ্টি করে চলে। কথা নেই, ঝামেলা পোয়ানো নেই চালিয়ে দাও, ঘুরতে থাকবে। কিন্তু একটা মানুষ, দেখবে অসুখী, দীন। চিৎকার করবে, শোক করবে, কাঁদবে, ভিক্ষা করবে। কখনো বা মাতাল হবে। মানুষের ভিতরে কত কিছু আছে যা আমাদের কাছে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু একটা যন্ত্র? যন্ত্র হল গজকাঠির মতো। ওর ভিতরে ঠিক ততটুকুই থাকে যতটুকু আমার প্রয়োজন। ভালো কথা, আমি চললাম কাপড় পরতে। সময় হল।

মায়াকিন উঠে দাঁড়াল। তারপর মেঝের উপরে চটির চটপট শব্দ করতে করতে চলে গেল। তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে অস্ফুট কণ্ঠে বলল ফোমাঃ

শয়তান নিজেও এত সব বুঝে উঠতে পারে না। এ বলে একথা, ও বলে সে কথা, আর একজন বলে আর এক কথা।

বইয়ের ব্যাপারও ঠিক তাই।—তেমনি মৃদুকণ্ঠে বলে উঠল লিউবভ।

হাসিমুখে ফোমা ওর দিকে তাকাল। প্রত্যুত্তরে লিউবভও একটু রহস্যময় হাসি হাসল। ওর দুটি চোখ মনে হয় ক্লান্ত ম্লান বিষণ্ণ।

এখনো বই পড়ছ?—প্রশ্ন করল ফোমা।

হাঁ—বিষণ্ণ মুখে জবাব দিল লিউবা।

তেমনি একা একা লাগছে এখনো?

দারুণ বিরক্তি লাগছে। আমি একা। একটা মানুষ নেই যার সংগে দুটো কথা বলি।

খুবই খারাপ।

প্রত্যুত্তরে লিউবভ আর কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করে নীরবে তোয়ালের আঁচলা আঙুলে জড়াতে লাগল।

বিয়ে করা উচিত তোমার।—বলল ফোমা। কেমন যেন করুণার ভাব জেগে উঠল ওর অন্তরে।

দয়া করে আমাকে একটু একা থাকতে দাও দেখি।—কপাল কুঁচকে বলল লিউবভ।

কেন দেবো একা থাকতে? আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি তুমি বিয়ে করবে।

তাই বটে!—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে মৃদুকণ্ঠে বলল তরুণী।—আমিও ভাবছি তাই। বিয়ে করা দরকার। তার মানে বিয়ে আমাকে করতেই হবে। কিন্তু কেমন করে বলো তো? আমার কী মনে হয় জানো? আমার আর অন্য লোকের মাঝখানে যেন একটা কুয়াশার ব্যবধান গড়ে উঠেছে। গভীর ঘন কুয়াশা।

ওটা এসেছে তোমার ঐ বই-পড়া থেকে।—প্রত্যয়ভরা কণ্ঠে বলল ফোমা।

থামো! আমার চারদিকে কী ঘটে যাচ্ছে তা যেন আমি বুঝি না। আদৌ

বুঝে উঠতে পারি না। কোনো কিছুতেই আনন্দ পাই না। মনে হয় সবই যেন কেমন অদ্ভুত। কোনো কিছুই যেন যেমনটি হওয়া উচিত তেমনটি নয়। সব কিছুই ভুল। আমি দেখতে পাই—আমি বুঝি তবুও যেন বলতে পারি না—এসব ঠিক নয়, ভুল। আচ্ছা বলো তো, কেন এমন হয়?

না, তা নয়।—বলল ফোমা,—ওসব তোমার ঐ বই পড়ার ফল। সত্যি। যদিও আমারও মনে হয় ঠিক অমনি-ই—যেন সব কিছুই ভুল। তার কারণ সম্ভবত এই যে, আমরা তরুণ। জ্ঞান বুদ্ধি আমাদের কম।

প্রথম প্রথম আমার মনে হত—ফোমার কথায় কান না দিয়েই বলে চলল লিউবভ, —বইতে যা-কিছু লেখা আছে সবই যেন আমার কাছে পরিষ্কার। সব কিছুই যেন স্পষ্ট বুঝতে পারছি। কিন্তু এখন—

বই পড়া ছেড়ে দাও।—ঘৃণা-বিকৃত-মুখে বলল ফোমা।

না, ওকথা বলো না! কেমন করে ছেড়ে দেবো? জানো, কতো রকমের চিন্তা-ধারা আছে দুনিয়ায়? হা ঈশ্বর! এমন সব ভাবধারা আছে যে তোমার মাথায় আগুন ধরিয়ে দেবে। কোনো কোনো বই বলে,—দুনিয়ায় যা-কিছু অস্তিত্ব আছে, তা সব কিছুই যুক্তিসংগত।

সব কিছু?—প্রশ্ন করল ফোমা।

সব কিছু। আবার অন্য বই বলে, উল্‌টোটাই সত্যি।

দাঁড়াও! তবেই দেখো, এ সব কিছুই কি বাজে কথা নয়?

কী সম্পর্কে আলোচনা করছ?—দোরের সামনে এসে প্রশ্ন করল মায়াকিন। গায়ে লম্বা ফ্রক কোট। জামার কলারে ও বুকে পদক আঁটা।

এই এমনি,—প্রত্যুত্তরে ম্লানকণ্ঠে জবাব দিল লিউবভ।

আমরা আলোচনা করছিলাম বই সম্পর্কে।—বলল ফোমা।

কী বই?

ও যেসব বই পড়ে। কোন্ বইতে নাকি পড়েছে যে দুনিয়ার সব কিছুই যুক্তি-সংগত।

সত্যি?

হাঁ। কিন্তু আমি বলি, ওকথা মিথ্যে।

হাঁ!—দাড়ির ভিতরে আঙুল ডুবিয়ে চোখদুটো কুঁচকে চিন্তা করতে লাগল ইয়াকভ তারাশভিচ।

কী ধরনের বই ওটা?—কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মেয়ের কাছে প্রশ্ন করল মায়াকিন।

একটা ছোট হলদে মলাটের বই।—নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও জবাব দিল লিউবভ।

বইটা আমার টেবিলে রেখে দিস গে! চিন্তা না করে ওকথা বলেনি। দুনিয়ার সব কিছুই র‍্যাশন্যাল—সব কিছুরই যুক্তি আছে। দেখলে! কেউ একজন কথাটা ভেবেছে। হাঁ, বেশ বুদ্ধিমানের মতোই বলেছে কথাটা। যদি মূর্খদের জন্যে না হয়ে থাকে তবে খুবই খাঁটি কথা বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু মূর্খেরা যখন সব সময়েই ভুল জায়গাটিতেই গিয়ে হাজির হয়, তখন একথা বলা যায় না যে দুনিয়ার সব কিছুরই তাৎপর্য আছে—সব কিছুই যুক্তিসংগত। তবুও বইটা আমি দেখব। হয়তো কিছুটা কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় থাকতেও পারে ওটার ভিতরে। আচ্ছা এখন চললাম ফোমা। তুমি এখন এখানেই থাকছ না পোঁছে দেবো গাড়িতে।

আরো কিছুক্ষণ থাকব।

বেশ, বেশ।

আবার লিউবভ আর ফোমা—দুজনে একা।

মায়াকিনের গমনপথের দিকে মুখ ফিরিয়ে লিউবভকে প্রশ্ন করল ফোমা ঃ

কী ধরনের মানুষ তোমার বাবা? মানে, কেমন লোক বলে মনে হয় তোমার বলো তো? প্রত্যেকটি কথারই প্রতিবাদ করেন—সব কিছুই ঢেকে দিতে চান কথা দিয়ে।

হাঁ, খুব বুদ্ধিমান। কিন্তু তবুও বোঝেন না কী দুঃখের জীবন আমার—কী ব্যথাভরা!

আমিও তো বুঝি না। বড্ডো কল্পনাপ্রবণ তুমি।

কী কল্পনা করি আমি?—প্রত্যুত্তরে বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলল লিউবভ।

কেন, এ সব তো আর তোমার নিজের চিন্তা নয়, অন্য কারুর।

অন্য কারুর! অন্য কারুর!—লিউবভের ইচ্ছে হল কিছু বলে। কিন্তু হঠাৎ থেমে গিয়ে চুপ করে রইল। ফোমা ওর মুখের দিকে তাকাল। তারপর মনে মনে মেদিনস্কায়াকে ওর পাশে দাঁড় করিয়ে ব্যথাভরা অন্তরে ভাবল ঃ

সব কিছুর ভিতরেই কী পার্থক্য! পুরুষ স্ত্রীলোক—কেউ কাউকে এক রকম মনে করতে পারে না।

দুজনে বসে রয়েছে মুখোমুখি। দুজনেই ডুবে গেছে গভীর চিন্তায়। এমন-কি কেউ তাকাচ্ছে না পর্যন্ত কারুর দিকে। বাইরে ঘনিয়ে এসেছে সন্ধ্যার কালো ছায়া। ইতিমধ্যেই ঘরের ভিতরে জমে উঠেছে অন্ধকার। লিন্ডেন গাছের শাখা-গুলি দলছে হাওয়ায়। চাইছে দেয়াল আঁকড় ধরতে। যেন শীতার্ত হয়ে ঘরের ভিতরে চাইছে আশ্রয়।

লিউবা!—মৃদুকণ্ঠে ডাকল ফোমা,—জানো, আমি ঝগড়া করেছি মেদিনস্কায়ার সঙ্গে?

কেন?—প্রশ্ন করল লিউবা। ওর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এমনি। মনে হয়েছিল সে আমাকে আঘাত দিয়েছে।

সে যাক, ভালোই হল যে তার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে তোমার।—বলল লিউবা,—নইলে তোমার মাথাটা খারাপ করে দিয়ে ছাড়ত। নোংরা জীব একটি। ছেনাল। এমনকি তার চাইতেও খারাপ। কত কি শুনেছি ওর সম্পর্কে!

মোটেই নোংরা জীব নয়।—ব্যথিত কণ্ঠে বলল ফোমা।—কিছুই জানো না তুমি ওর সম্পর্কে। সব মিথ্যে।

ওঃ! আচ্ছা মাপ করো।

না, দেখো লিউবা!—মৃদু গদগদ কণ্ঠে বলল ফোমা,—আমার সামনে ওর নিন্দে করো না। কিছু দরকার নেই। জানি আমি সব কিছু। দোহাই ঈশ্বরের! নিজের মুখেই সে বলেছে আমাকে।

নিজের মুখে?—অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করল লিউবা।—কী অদ্ভুত মেয়ে। কী বলেছে তোমাকে?

বলেছে সে অপরাধী।—অতি কষ্টে বলল ফোমা। ওর মুখের ওপর ভেসে উঠল ক্লিষ্ট হাসির ম্লান ছায়া।

ব্যাস্ ঐটুকুই?—লিউবার কণ্ঠে হতাশার সুর। ফোমা শুনল। তারপর একটু আশ্বাসভরা কণ্ঠে বলল ঃ এটুকুই কি যথেষ্ট নয়?

কী করবে এখন তুমি?

ভাবছি তাই ই।

খুব ভালোবাস তুমি ওকে?

জানলার পথে বাইরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল ফোমা। তারপর বলল : জানি না আমি। কিন্তু মনে হয় আগের চাইতে এখন ওকে আরো বেশি ভালোবাসি।

ঝগড়া হওয়ার আগের চাইতে?

হাঁ।

অবাক হয়ে যাই, কেমন করে মানুষ ওর মতো একটা মেয়েমানুষকে ভালোবাসতে পারে।—কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠল তরুণী।

কেমন করে অমন মেয়েকে ভালোবাসে? নিশ্চয়ই, কেন বাসবে না?—প্রত্যুত্তরে বলল ফোমা।

আমি বুঝি না ওসব। আমার মনে হয়, তুমি ওর দিকে আকৃষ্ট হয়েছ, তার কারণ ওর চাইতে সুন্দরী আর কাউকে দেখোনি।

না, ওর চাইতে ভালো কারুর সাক্ষাৎ পাইনি আমি।—স্বীকার করল ফোমা। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল :

হয় তো ওর চাইতে ভালো আর নেই কেউ।

আমাদের পরিচিতদের মধ্যে?—বলল লিউবা।

ওকে আমি চাই। একান্তভাবে চাই আমি ওকে। কিন্তু ওর সামনে কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ি।

কেন এমন হয়?

এক কথায় ওকে আমি ভয় করি। তার মানে অন্যের মতো আমার সম্পর্কে সে কোনো রকমের খারাপ ধারণা করুক এটা আমি চাই না। মাঝে মাঝে খুবই বিরক্তি লাগে। ভাবি—কেমন হয় যদি এমন আমোদপ্রমোদে ডুবে যাই যাতে আমার দেহের সমস্ত শিরা উপশিরা ঝন্ঝন্ করে বেজে ওঠে? পরক্ষণেই মনে পড়ে ওর কথা। আমার সমস্ত সাহস উবে যায়। এমনি সব কাজেই মনে পড়ে ওর কথা। ভাবি—ও যদি দেখে ফেলে? পরক্ষণেই সে কাজ করতে আমার ভয় হয়।

হাঁ,—চিন্তিত মুখে টেনে টেনে বলল লিউবা,—তার মানে তুমি তাকে ভালোবাস। আমি হলেও অমনি-ই হত। যদি কাউকে ভালোবাসতাম, ভাবতাম তার-ই কথা—কী বলবে সে?

ওর সবকিছুই এমন অদ্ভুত—মৃদুকণ্ঠে বলল ফোমা,—ও কথা বলে সম্পূর্ণ নিজস্ব ধরনে আর—কী সুন্দরই না দেখতে! আবার এমন ছোট যেন একটি শিশু।

তাহলে, কী ঘটল তোমাদের দুজনার ভিতরে?—প্রশ্ন করল লিউবা।

ফোমা তার চেয়ারটা লিউবার কাছে আর একটু এগিয়ে নিয়ে এসে কণ্ঠস্বর আরো নিচু করে বলতে লাগল কী কী ঘটেছিল ওর আর মেদিনস্কায়ার ভিতরে। বলতে লাগল ফোমা, যে সব কথা বলেছে মেদিনস্কায়াকে তা মনে পড়তেই তখনকার সেই মনোভাব জেগে উঠল তার অন্তরে।

আমি বললাম, আপনি—কেন আপনি খেলা করছেন আমাকে নিয়ে?—ভর্ৎসনা-ভরা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল ফোমা। শুনতে শুনতে দারুণ উৎসাহে লিউবার গাল-দুটো লাল হয়ে উঠল। সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে আরো উদ্দীপ্ত করে তুলল ফোমাকে।

ঠিক কথা! বেশ! তারপর কী বললে সে?

চুপ করে রইল।—কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়া বিমর্ষ কণ্ঠে বলল ফোমা।
তার মানে সে বলেছে অন্য কথা। কিন্তু কী লাভ তাতে?
হাতের একটা ভঙ্গি করে চুপ করে গেল ফোমা।
সামোভারটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ক্রমেই গভীর হয়ে উঠছে ঘরের অন্ধকার। লিন্ডেন গাছের কালো শাখা ক্রমাগতই আছাড়িপিছাড়ি করে চলেছে।
আলোটা জ্বাললে পারতে,—বলল ফোমা।
আমরা দুজনেই কী অসুখী!—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল লিউবা।
কিন্তু কথাটা কেমন যেন ভালো লাগল না ফোমার।
না, আদৌ অসুখী নই আমি।—দৃঢ়কণ্ঠে বলল ফোমা,—কেবলমাত্র এইটুকুই যে জীবন সম্পর্কে এখনো আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারিনি।
যে লোক জানে না কাল কী করবে, সেই অসুখী।—ব্যথাভরা কণ্ঠে বলল লিউবা,—আমিও জানি না, তুমিও জানো না। কোন পথে যাবো? তবুও চলতে হবে। কেন আমার মনে শান্তি নেই? প্রতিটি মুহূর্ত কিসের প্রতীক্ষা যেন আমার অন্তর স্পন্দিত করে তোলে।
আমারও তাই।—বলল ফোমা,—ভাবতে শুরু করেছি আমি। কিন্তু কী সম্পর্কে?—সে কথা স্পষ্ট করে বুঝে উঠতে পারি না। কেমন যেন একটা বেদনা-ভরা গুঞ্জন পূর্ণ করে রয়েছে আমার অন্তর। ও হো, আমাকে এখন ক্লাবে যেতে হবে।
যেও না।—অনুরোধ করল লিউবা।
যেতেই হবে। একজন অপেক্ষা করে থাকবে সেখানে আমার জন্যে। যাচ্ছি আমি—বিদায়!
আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত।—লিউবা ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। তারপর ব্যথাতুর দুটো চোখ মেলে ফোমার মুখের দিকে তাকাল।
এখন কি শুতে যাবে?—লিউবার হাতে ঝাঁকুনি দিতে দিতে প্রশ্ন করল ফোমা।
পড়ব কিছুক্ষণ।
মাতালের কাছে যেমন হুইস্কির বোতল, তোমার কাছে তেমনি বই।—করুণ কণ্ঠে বলল ফোমা।
ভালো কী আর করবার আছে এখানে?

* *

পথে চলতে চলতে বাড়িটার জানালার দিকে তাকাল ফোমা। একটা জানালায় দেখতে পেল লিউবার মুখ। আবছা—অস্পষ্ট। এ পর্যন্ত যা-কিছু কথা বলেছে লিউবা তারই মতো অস্পষ্ট। এমনকি ওর অন্তরে জেগে-ওঠা কামনারই মতো কুহেলীময়। লিউবার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল ফোমা। পরক্ষণেই ওর তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্বের চেতনায় সজাগ হয়ে ভাবল : আর একটির মতো এ-ও পথহারা হয়ে পড়েছে।
কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে মাথা নেড়ে উঠল ফোমা, যেন সে মেদিনস্কায়ার চিন্তাকে ভয় দেখিয়ে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছে। পরক্ষণেই দ্রুত পায়ে চলতে শুরু করল।
রাত বেড়ে চলেছে। পৃথের বুকের উপর দিয়ে তীব্র বেগে বয়ে চলেছে ঠাণ্ডা বাতাস। পায়ে-চলা পথের ধুলো উড়িয়ে এনে দিচ্ছে পথচারীদের চোখেমুখে। নেমে এসেছে গভীর অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দ্রুত পায়ে ছুটে চলেছে

লোকজন।

ফোমা মুখ কোঁচকাল। ওর চোখ ভরে উঠেছে ধুলোয়। ভাবল ঃ এখন যদি একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তবে তার মানে, সোফিয়া পাভলোভ্না ঠিক আগের মতো সৌহার্দ্যপূর্ণভাবেই আমাকে গ্রহণ করবে। তাহলে কাল আমি যাবো তার সঙ্গে দেখা করতে। আর যদি দেখা হয় কোনো পুরুষের সঙ্গে তবে কাল যাবো না। অপেক্ষা করব।

কিন্তু ওর দেখা হল একটা কুকুরের সঙ্গে। তাতে এমন দারুণ চটে গেল ফোমা যে ইচ্ছে হল হাতের ছড়িটা দিয়ে দেয় ঘা কতক লাগিয়ে।

ক্লাবের রেস্তোরাঁয় ওর দেখা হল সদাহাসিখুশি উখতিশ্চেভের সঙ্গে। গোঁফ-ওয়ালা মোটাসোটা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করছে দোরের সামনে দাঁড়িয়ে। গর্দিয়েফ্‌কে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সে এগিয়ে এল তার কাছে।

কেমন আছ লক্ষপতি সন্ন্যেসী?

ওর সদাপ্রফুল্লভাবের জন্যে ফোমা ওকে পছন্দ করে খুব। খুশি হয়ে ওঠে ওর সঙ্গে দেখা হলে। পরম আন্তরিকতার সঙ্গে ওর করমর্দন করে প্রশ্ন করল ফোমা ঃ

আমাকে সন্ন্যেসী ভাববার কারণ?

কি কথা! যে মানুষ সন্ন্যেসীর মতো জীবন কাটায়—মদ খায় না, খেলে না, মেয়েমানুষে যার রুচি নেই সে ওছাড়া আর কি? ভালো কথা, শুনেছ ফোমা ইগনাতিয়েভিচ্, আমাদের অতুলনীয়া পৃষ্ঠপোষিকা যে কাল গোটা গরমকালের জন্য চলে যাচ্ছে হে!

সোফিয়া পাভলোভনা?—মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল ফোমা।

নিশ্চয়ই। আমার জীবনের আলো যে অস্তগামী। বোধহয় তোমারও?

কৌতুকভরা দুষ্ট হাসি হেসে উখতিশ্চেভ ফোমার মুখের দিকে তাকাল। উখতিশ্চেভের সামনে দাঁড়িয়ে ফোমার মনে হল যেন তার মাথাটা আপনা থেকেই নুয়ে পড়ছে বুকের উপরে। কিন্তু কিছুতেই পারছে না বাধা দিতে।

হাঁ, সেই উজ্জ্বল উষসী।

কে, মেদিনস্কায়া চলে যাচ্ছে?—একটা গম্ভীর কণ্ঠ থেকে জেগে উঠল প্রশ্ন। তা ভালো। আমি খুশি।

কেন জিগগেস করি?—প্রশ্ন করল উখ্‌তিশ্চেভ। একটা নির্বোধ হাসি হেসে বিমূঢ় দৃষ্টিতে ফোমা তাকাল গোঁফওয়ালা লোকটির দিকে। খুব ভারিক্কিচালে লোকটা গোঁফে তা দিচ্ছিল। ওর মুখ থেকে ঝরে পড়ল ফোমার কানে একটা কুৎসিত কথা ঃ

কারণ, অন্তত একটি ছেনাল কমবে শহর থেকে।

লজ্জিত হওয়া উচিত মার্তিন নিকিতিচ্!—ভ্রূ কুঁচকে ভর্ৎসনাপূর্ণ কণ্ঠে বলল উখতিশ্চেভ।

আপনি কি করে জানলেন যে সে ছেনাল?—গোঁফওয়ালা লোকটির কাছে এগিয়ে গিয়ে তীব্র কণ্ঠে প্রশ্ন করল ফোমা। ঘৃণাভরা দৃষ্টি মেলে লোকটি ফোমার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে এক পাশে সরে গিয়ে হাঁটু নাচাতে নাচাতে টেনে টেনে বলল ঃ

আমি বলিনি—ছেনাল।

কোনো ভদ্রমহিলা সম্পর্কে অমনভাবে কথা বলবেন না মার্তিন নিকিতিচ! যে—উপদেশের সুরে বলতে আরম্ভ করল উখতিশ্চেভ। কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে বলল

ফোমা ঃ মাপ করো! একমিনিট! আমি ঐ ভদ্রলোককে জিগ্‌গেস করতে চাই যে যে তিনি যে কথাটি বলেছেন তার অর্থ কী?—শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলেই ফোমা হাতদুটো ট্রাউজারের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল। মুহূর্তে ওর সর্বাঙ্গ ঘিরে জেগে উঠল একটা বিদ্রোহের ভাব।

বিদ্রূপভরা অবজ্ঞার দৃষ্টি মেলে গোঁফওয়ালা লোকটি আবার ফোমার মুখের দিকে তাকাল।

ভদ্রমহোদয়গণ!—মৃদুকণ্ঠে বলল উখ্‌তিশ্চেভ।

আমি বলেছি ছে-না-ল,—ঠোঁট নেড়ে যেন প্রত্যেকটি শব্দের আস্বাদ নিতে নিতে বলল গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক,—আর যদি তার মানে না বুঝে থাকেন তবে আমি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পারি।

তাই বলুন।—লোকটির মুখের উপর তেমনি দৃষ্টি রেখে একটা গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল ফোমা। হাত মুঠো করে উখতিশ্চেভ একপাশে সরে গিয়ে দাঁড়াল।

ছেনাল—মানে যদি জানতে চান তো বলি,—একটি বেশ্যা।—ফোমার মুখের কাছে চর্বিবহুল বিরাট মুখটা এগিয়ে এনে গলা নিচু করে বলল গোঁফওয়ালা লোকটি।

ফোমার কণ্ঠে জেগে উঠল একটা অস্ফুট গর্জন। গোঁফওয়ালা লোকটিকে সরে যাবার অবসরমাত্র না দিয়ে ফোমা ডান হাতে ওর ধূসর কোঁকড়া চুল শক্তমুঠোয় ধরে ফেলল। তারপর ওর স্থূল দেহ সমেত মাথাটায় জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বাঁ হাত তুলে ক্রুদ্ধকণ্ঠে শাসাতে লাগল ঃ

কারুর অসাক্ষাতে নিন্দে করবে না। যদি করতে হয় করবে তার মুখের সামনে, চোখের উপর দাঁড়িয়ে।

কেমন হাস্যকর ভঙ্গিতে ঐ মোটা লোকটার হাতদুটো হাওয়ায় আছাড়িপিছাড়ি করছে, পাদুটো দাপাদাপি করছে মেঝের উপরে—দেখে এক জ্বালাময় আনন্দে ফোমার অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল। চেনের সঙ্গে পকেট থেকে সোনার ঘড়িটা বেরিয়ে এসে মোটা ভুঁড়ির উপরে দুলছে। নিজের শক্তির উন্মত্ততা ও ঐ ভারিক্কি লোকটার শোচনীয় অবস্থা মিলে ফোমার অন্তর এক বিজাতীয় বিদ্বেষে পূর্ণ হয়ে উঠল। প্রতিহিংসা চরিতার্থতার তীব্র আনন্দে রোমাঞ্চিত-দেহ ফোমা লোকটাকে হিঁচড়ে মেঝের উপর দিয়ে টানতে লাগল। শয়তানিভরা একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল ওর গলার ভিতর দিয়ে। যে অসহনীয় দুঃখ, ব্যথা, ও বিষাদের গুরুভারে ওর অন্তর পিষে যাচ্ছিল এই মুহূর্তে যেন তা ঘাম দিয়ে বেরিয়ে গেল—এমনি একটা অনুভূতি জেগে উঠল ওর মনে। ফোমার মনে হল কে যেন পিছন থেকে ওর কোমর ও ঘাড় আঁকড়ে ধরেছে। বুঝিবা কেউ ওর হাত ধরে বাঁকাতে শুরু করে দিয়েছে ভেঙে ফেলার জন্যে। পাড়িয়ে দিচ্ছে ওর পায়ের আঙুল। কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। অন্ধকারের ভিতরে রক্তাক্ত চোখ মেলে দেখল, একটা বিরাট স্থূল বস্তু কাতরাচ্ছে ওর হাতের ভিতরে—মোড়ামুড়ি খাচ্ছে। অবশেষে, ওরা ওকে ছাড়িয়ে সরিয়ে নিয়ে এল। যেন দেখতে পেল পায়ের কাছে মেঝের উপরে একটা লাল কুয়াশার মতো পড়ে আছে সেই লোকটা, যাকে ও এইমাত্র দিয়েছে প্রহার। বিস্রস্ত অবস্থায় লোকটা মেঝের উপরে পা আছড়াচ্ছে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টায়। কালো পোশাক-পরা দুজন লোক ওর হাত ধরে রয়েছে। ভাঙা ডানার মতো হাতদুটো শূন্যে ঝটপট্ করছে আর কান্নাভরা কণ্ঠে বলছে ফোমাকে উদ্দেশ করে ঃ আর মেরো না! মেরো না বলছি, খবরদার! সরকারী পদক আছে আমার,

পাজী! আমার ছেলেপ্‌লে আছে। সবাই চেনে আমাকে। বদমাশ! জঙ্গলি! ডুয়েল লড়বো মনে রাখিস!

আর উখতিশ্চেভ ফোমার কানের কাছে মুখ এনে চেঁচিয়ে বলছে :

দোহাই ঈশ্বরের! চলে এসো ওখান থেকে!

দাঁড়াও ওর মুখে একটা লাথি মেরে নি আগে,—বলল ফোমা। কিন্তু কে যেন ওকে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল। ফোমার দু কানের ভিতরে ঝাঁ ঝাঁ করছে। দ্রুত তালে ওঠানামা করছে বুক। কিন্তু তবুও ফোমা অনুভব করছে ভার মুক্তির হালকা অনুভূতি।

ক্লাবের প্রবেশ পথে এসে পেঁাছে ফোমা একটা আরামের দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। তারপর বিমল হাসিতে মুখখানা উদ্ভাসিত করে তুলে উখতিশ্চেভকে বলল :

আচ্ছা করে ঠুকে দিয়েছি ব্যাটাকে, কি বলো?

শোনো!—বলল্‌ সদাপ্রফুল্ল ক্লাবের সম্পাদক—মাপ করো, কাজটা কিন্তু বর্বরোচিত হয়েছে। এমনটি আর দেখিনি আমি কোনোদিন!

আচ্ছা বলো তো ভাই!—সৌহার্দ্যপূর্ণকণ্ঠে বলল ফোমা,—মার খাওয়ার যোগ্য কাজ করেনি কি লোকটা? লোকটা বদমাশ নয়? কেমন করে একজনের অসাক্ষাতে অমন করে বলতে পারে সে? পারে? যাক না, তার কাছে গিয়ে সোজা বলুক।

মাপ করো, তুমি জাহান্নামে যাও! কেবলমাত্র তার জন্যেই ওকে প্রহার দিয়েছ?

তার মানে কী বলতে চাইছ তুমি?—শুধু ওর জন্যেই নয় কি? তবে, কার জন্যে?—অবাক হয়ে প্রশ্ন করল ফোমা।

কার জন্যে? সে আমি জানি না। মনে হয় আগের কোনো ঝাল ঝাড়লে। হা ঈশ্বর! সে কী একটা দৃশ্য! জীবনেও ভুলব না।

সে—ঐ লোকটা, কে বল দেখি?—প্রশ্ন করল ফোমা। পরক্ষণেই হো হো করে হেসে উঠল।—কী চিৎকারটাই করলে—বেকুফ!

অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল উখ্‌তিশ্চেভ :

আচ্ছা সত্যি করে বলো দেখি, যাকে মেরেছে তাকে তুমি চেনো না? তাছাড়া মেরেছ কেবলমাত্র সোফিয়া পাভ্‌লোভনারই জন্যে?

হাঁ, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি।

এর ফলাফল যে কী হবে তা শয়তানই জানে।—বলতে বলতে থেমে গেল উখতিশ্চেভ। তারপর কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চিন্তিত মুখে হাত নেড়ে নেড়ে পায়চারি করতে করতে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফোমার মুখের দিকে তাকাল।

এর জন্যে ভুগতে হবে তোমাকে ফোমা ইগনাভিচ্‌!

কেন, নালিশ করবে নাকি আদালতে?

করতেও পারে, ভগবানই জানেন। ও হল সহকারী প্রদেশপালের শ্যালক।

তাই নাকি?—মৃদুকণ্ঠে বলল ফোমা। ওর মুখখানা অন্ধকার হয়ে উঠল।

হাঁ। কিন্তু লোকটা ভীষণ পাজী—বদমাইশ। সেদিক থেকে মার খাওয়াটা ওর ঠিকই হয়েছে। কিন্তু যে ভদ্রমহিলার সম্মানের জন্যে তুমি এ কাজ করলে, সেদিক থেকে বিচার করলেও—

ভাই!—উখতিশ্চেভের কাঁধের উপরে হাত রেখে দৃঢ় কণ্ঠে বলল ফোমা,—তোমাকে আমার ভালো লাগে। এখন তুমি হাঁটছ আমার সঙ্গে। তার মানে আমি বুঝি—আর হৃদয়ঙ্গমও করি। কিন্তু একান্ত অনুরোধ, আমার সামনে ওর সম্পর্কে

কোনো কুৎসিত কথা বলো না। যা-ই হোক না কেন সে তোমার মতে, আমার কাছে খুবই প্রিয়। দুনিয়ার সবার চাইতে ভালো সে আমার কাছে। তোমাকে বললাম আমার কথা অকপটে। আমার সঙ্গে যতক্ষণ আছ তাকে স্পর্শ করো না। ভালো মনে করি আমি তাকে।

এক নিদারুণ আবেগের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠল ফোমার কণ্ঠে। অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে চিন্তিতমুখে বলল উখতিশ্চেভ ঃ

আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি—তুমি একটি অদ্ভুত লোক!

সহজ সরল মানুষ আমি। বর্বর। ওকে ধরে আচ্ছা করে ঠুকে দিয়েছি, এখন মনটা হালকা লাগছে। তারপর যা-ই কিছু পরিণতি হোক না কেন ভ্রুক্ষেপ করি না।

ভয় হচ্ছে, ফলটা খুবই খারাপ হবে। জানো তুমি—তোমার অকপট স্বীকারোক্তির বদলে আমিও অকপটেই বলছি—তোমাকে আমি ভালোবাসি। যদিও...হুঁ..,খুবই বিপজ্জনক তোমার সঙ্গ। এমন বাদশাহি মেজাজ এসে তোমার উপরে ভর করবে যে যে-কোনো লোকই তোমার হাতে উত্তমমধ্যম লাভ করতে পারে।

তা কেন? এই তো প্রথম। রোজই তো আমি আর লোকজনদের ধরে মারপিট করি না। কি বলো, করি?—একটু বিব্রত হয়ে বলল ফোমা। ওর সঙ্গী হেসে উঠল।

তুমি একটি দৈত্য বিশেষ! শোনো আমার কথা। লড়াই করাটা বর্বর প্রথা। মাপ করো, ব্যাপারটা লজ্জাজনক। তবুও আমি বলব, এ ব্যাপারে তোমার নির্বাচনটা খুবই ভালো হয়েছে। তুমি মেরেছ একটা লোফারকে। নাস্তিক একটা পরগাছাকে। যে-লোক তার ভাইকে ঠকিয়ে সর্বস্বান্ত করে পথে বসিয়েছে ঘৃণ্যভাবে।

ভালো কথা, তার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও।—পরিতৃপ্ত কণ্ঠে বলল ফোমা।—মাত্র একটুখানি শাস্তি দিলাম।

একটুখানি? ভালো কথা, না হয় ধরে নিলাম একটুখানি-ই। কিন্তু শোনো খোকা, একটু উপদেশ দিচ্ছি তোমাকে। আমি আমি আইনজীবী মানুষ। সে—মানে ঐ কায়াজেভ, একটা বদমাইশ লোক। সত্যি কথা। কিন্তু তবু একটা বদমাইশ লোককেও তুমি মারতে পারো না। কারণ, সে সামাজিক লোক—আইনের সংরক্ষণাধীন। যতক্ষণ না সে ফৌজদারী আইনের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাকে স্পর্শ করতে পারো না। আর তখনো তুমি নও, আমরা—বিচারকেরা তাকে তার প্রাপ্য সাজা দেবো। ততদিন তোমাকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে।

ও কি শিগ্‌গিরই তোমাদের হাতে পড়ছে নাকি?—সরলভাবে প্রশ্ন করল ফোমা।

সে কথা বলা শক্ত। মোটেই বোকা নয় লোকটা। হয়তো আদৌ ধরা পড়বে না। আইনের চোখে তোমার আমার মতো সমান হিসাবেই জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত কাটিয়ে দেবে। হা ভগবান্! কী সব বলছি তোমাকে!—কৌতুকপূর্ণকণ্ঠে বলেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল উখ্‌তিশ্চেভ।

গোপন কথা ফাঁস করে দিয়েছ বুঝি?—প্রত্যুত্তরে বলল ফোমা।

কথাটা গোপন নয়। কিন্তু বেশি কথা বলা ঠিক নয় আমার। শয়তান! কিন্তু তবুও এ ব্যাপারটায় খুবই আনন্দ হচ্ছে আমার, কিন্তু নেমেসিস্ যখন ঘোড়ার

মতো পা ছোঁড়েন তখনও নিজের কাছে খাঁটি থাকেন।

ফোমা থমকে দাঁড়াল—যেন হঠাৎ একটা বাধা পেয়েছে পায়ের কাছে।

নেমেসিস্—ন্যায়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।—বলল উখতিশ্চেভ।—ও কি —কী হল তোমার?

এসব ঘটল—ম্লান মৃদুকণ্ঠে বলল ফোমা—তার কারণ তুমি বললে যে সে চলে যাচ্ছে।

কে?

সোফিয়া পাভলোভনা।

হাঁ সে চলে যাচ্ছে। কী হল তাতে?

ফোমার মুখোমুখি দাঁড়াল উখ্‌তিশ্চেভ। ওর দুটো চোখের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে হাসির আভা। মাথা নিচু করে গরদিয়েফ হাতের ছড়িটা দিয়ে পথের পাথরের উপরে মৃদু মৃদু আঘাত করে চলেছে।

এসো।—বলল উখতিশ্চেভ।

চলো।—নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে চলতে শুরু করল ফোমা।

আর আমি এখন একা।

সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে উখতিশ্চেভ হাতের ছড়িটা দোলাতে দোলাতে শিস দিতে লাগল।

ওকে ছেড়ে থাকতে পারব না আমি?—সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে বলল ফোমা। তারপর একটু থেমে নিজের প্রশ্নের জবাবে নিজেই বলল:

নিশ্চয়ই পারব।

আমার কথা শোনো,—উখতিশ্চেভ বলল,—একটু সদুপদেশ দিচ্ছি তোমাকে। মানুষ তার স্বধর্ম পালন করবে। তুমি হলে গিয়ে বীররসের মানুষ। কাব্যিক হওয়া তোমার পোষায় না। ওটা তোমার ধাতের নয়।

আর একটু সহজ করে বলুন মশাই!

আরো সহজ করে? বেশ, আমি বলতে চাই ঐ মহিলাটির সম্পর্কে আর ভেবো না। উনি তোমার কাছে বিষবৎ।

সে-ও ঐ কথাই বলেছে আমাকে।—বিষাদভরা গম্ভীর মুখে বলল ফোমা।

বলেছে নাকি সে-ও?—প্রশ্ন করে চিন্তিত হয়ে পড়ল উখতিশ্চেভ। আচ্ছা আমি বলছি কি, এখন একটু খেয়ে নিলে কেমন হয়?

চলো।—সম্মতি জানাল ফোমা। পরক্ষণেই হাত মুঠো করে হাওয়ায় আন্দোলিত করতে করতে গর্জে উঠল:

চলো। এর পর থেকে এমনভাবে বাঁধন ছিঁড়ব যে কেউ আর আমাকে ধরে রাখতে পারবে না।

কিসের জন্যে? যা করতে হয় স্বাভাবিকভাবে করবে।

না থামো!—ওর কাঁধের উপরে হাত রেখে চিন্তিত মুখে বলল ফোমা।—কেন? আমি কি অন্য লোকের চাইতেও খারাপ? সবাই বাঁচে, ঘুরে বেড়ায়। তার নিজস্ব চিন্তাধারা আছে। আর আমি ক্লান্ত। সবাই খুশি নিজেকে নিয়ে। তারা যা কিছু অভিযোগ করে, বলে মিথ্যে কথা—পাজীগুলো নিছক ভান করে। ভান করার কিছুই নেই আমার। আমি নির্বোধ। কিছুই বুঝি না আমি, ভাই। বিশ্রী লাগে। কেউ বলে একথা, কেউ বলে অন্যকথা। ছিঃ! কিন্তু সে,—ওঃ! যদি তুমি জানতে! আমার সমস্ত আশা, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা তাকে কেন্দ্র করে। তার কাছ

থেকে আশা করেছিলাম—যা আমার কাম্য। কী, বলতে পারি না তা। কিন্তু তবুও সে নারীরত্ন। আমার এতখানি বিশ্বাস ছিল তার উপরে! যখন বলত যত সব অদ্ভুত কথা—তার একান্ত আপনার কথা। তার চোখদুটো—জানো ভাই, এত সুন্দর! হা ঈশ্বর! সে দুটো চোখের দিকে তাকাতে পারতাম না আমি—সংকোচ লাগত। সত্যি বলছি তোমাকে—সে বলত অল্প কয়েকটি কথা, সঙ্গে সঙ্গে আমার সব কিছুই যেন পরিষ্কার হয়ে যেত। আমি তো কেবলমাত্র ভালোবাসা নিয়েই যাইনি তার কাছে—ওর কাছে গিয়েছিলাম আমার সমস্ত অন্তরাত্মা নিয়ে। আমি ভেবেছিলাম—ভেবেছিলাম ও এত সুন্দরী, আর সেইজন্যেই আমি ওর পাশে পাশে থাকব।

উখতিশ্চেভ শুনল তার সঙ্গীর মুখের ব্যথাভরা অসংলগ্ন কথা। দেখল, কেমন করে ওর মুখের প্রতিটি মাংসপেশী আকুঞ্চিত হয়ে বেরিয়ে আসছিল প্রতিটি কথা: প্রবল প্রচেষ্টায় ওর চিন্তাধারা রূপান্তরিত হচ্ছিল কথায়। অনুভব করল এই বিস্ফোরণের পিছনে রয়েছে এক বিরাট দুঃখ। কেমন যেন এক নিদারুণ করুণ কি একটা রয়েছে ঐ শক্তিশালী বর্বর তরুণের পিছনে,—অসংলগ্ন ভারি পদক্ষেপে যে নাকি পায়ে-চলা পথের বুকের উপর দিয়ে চলে এসেছে এগিয়ে। ছোট পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ফোমার পিছু পিছু চলতে চলতে মনে হল উখতিশ্চেভের যে ফোমাকে একটু সান্ত্বনা দেয়। আজকের সন্ধ্যায় যা-কিছু বলেছে, যা কিছু করেছে ফোমা, সেসব ঐ সদাপ্রফুল্ল হাসিখুশি সেক্রেটারির মনে ওর প্রতি জাগিয়ে তুলেছে কৌতূহল। পরক্ষণেই ঐ তরুণ ধন-কুবেরের অকপট সারল্যে অনুভব করল আত্মপ্রসাদ। ঐ সরলতার আবেগময় অন্ধ শক্তিতে কেমন যেন বিমূঢ় করে ফেলল। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল ওর চিন্তাধারা। যদিও বয়সে তরুণ, তবুও জীবনের সমস্ত অবস্থার জন্যেই মজুত থাকত ওর কথার ভাণ্ডার। কিন্তু বেশ খানিকটা সময় লাগল ওর স্বভাব-সুলভ বাগ্মিতায় ফিরে আসতে।

সব কিছুই যেন অন্ধকার—সব কিছুই যেন অপরিসর মনে হচ্ছে আমার কাছে।—বলল ফোমা,—মনে হয় যেন একটা গুরুভার বোঝা চেপে বসেছে আমার কাঁধে। কিন্তু কী সেটা, বুঝে উঠতে পারি না। এনে দিচ্ছে এক নিদারুণ বাধা। জীবনের চলার পথে প্রতিহত করছে আমার স্বাধীনতা। লোকের কথা শুনব? প্রত্যেকটি মানুষই বলে ভিন্ন ধরনের কথা। কিন্তু একমাত্র সে পারত—

আলতো করে ওর হাতখানা ধরে বাধা দিয়ে বলে উঠল উখ্‌তিশ্চেভ:

শোনো ভাই! ওটা ঠিক কথা নয়। সবেমাত্র তোমার জীবনের শুরু। এরই মধ্যে শুরু করলে দার্শনিকতা! না, না, ওটা ঠিক নয়! বেঁচে থাকার জন্যে পেয়েছি আমরা জীবন। তার অর্থ—নিজে বাঁচো আর অন্যকে বাঁচতে দাও। এ-ই হল জীবন-দর্শন। তাছাড়া ঐ মহিলা—বাঃ! দুনিয়ায় কি কেবল ঐ একটিমাত্র নারীই আছে? ঢের বড়ো দুনিয়াটা। যদি চাও আমি তোমাকে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর এমন চমৎকার এক নারীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি যে তোমার অন্তর থেকে সব কিছু দার্শনিকতা এক মুহূর্তে দূর হয়ে যাবে। উঃ! কী চমৎকার মেয়ে! জানে জীবনকে কী করে উপভোগ করতে হয়! জানো, ওর ভিতরেও খানিকটা বীররসাত্মক ভাব আছে। অদ্ভুত সুন্দরী! তাছাড়া, কী চমৎকার মানাবে তোমার সঙ্গে। সত্যি ভালো মতলব পেয়েছি। তোমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবো। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে।

আমার বিবেক সায় দিচ্ছে না।—বিমর্ষ মুখে তিক্ত কণ্ঠে বলল ফোমা। যতদিন

সে বেঁচে থাকবে, অন্য কোনো নারীর দিকে ফিরেও তাকাতে পারব না আমি।

এমন একটা শক্তিমান স্বাস্থ্যবান তরুণের মুখে কিনা এই কথা! হাঃ! হাঃ! —শিক্ষকের মতো উপদেশভরা কণ্ঠে বলল উখতিশ্চেভ। তর্ক জুড়ে দিল ফোমার সঙ্গে যে ওর অন্তরের জমে-ওঠা রুদ্ধ আবেগ বের করে দেয়ার জন্যেও ফোমার পক্ষে প্রয়োজন আমোদ-প্রমোদের ভিতর দিয়ে একটু নারীসঙ্গ করা।

চমৎকার হবে, দেখো। আর সেটা একান্ত দরকারও তোমার পক্ষে। বিশ্বাস করো আমার কথা। তাছাড়া বিবেক—ম:প করো,—বিবেক কী সে সম্পর্কেও সঠিক ধারণা নেই তোমার। যা তোমাকে বাধা দিচ্ছে, আমার বিশ্বাস সেটা বিবেক নয়, ভীরুতা। তুমি থাকো সমাজের বাইরে। লাজুক, অসামাজিক তুমি। এ সব সম্পর্কে ধারণা তোমার অস্পষ্ট। আর এই অস্পষ্ট চেতনাকেই ভুল করছ তুমি বিবেক বলে। এ ক্ষেত্রে বিবেক বলে কিছু থাকতেই পারে না। যেখানে পুরুষের পক্ষে ভোগ করাটাই হচ্ছে স্বাভাবিক, আর কেবল স্বাভাবিকই নয় একান্ত প্রয়োজন; আর অধিকার, সেখানে বিবেকের প্রশ্ন আসে কোথা থেকে?

সঙ্গীর চলার তালে পা মিলিয়ে হেঁটে চলেছে ফোমা সামনের পথের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়ে। দু-পাশে বাড়ি। মাঝখানে পথ। মনে হচ্ছে যেন অন্ধকারভরা বিরাট একটা খাদ। বুঝিবা এ পথের শেষ নেই কোথাও। কী যেন একটা অফুরন্ত শ্বাসরোধকারী বস্তু ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে দূরের পানে। উখ্‌তিশ্চেভের দরদভরা কথার একঘেয়ে সুর বেজে চলেছে ফোমার কানে। যদিও সে ওর কথা শুনছে না, তবুও অনুভব করছে ফোমা ওর কথার ভিতরে রয়েছে এমন একটা অনমনীয় অদম্যভাব যে আপনা থেকেই সেগুলো ওর স্মৃতির পথে গিয়ে বিঁধে যাচ্ছে। যদিও একটি লোক রয়েছে ফোমার সঙ্গে—চলেছে ফোমার সঙ্গে সঙ্গে তবুও মনে হচ্ছে যেন চলেছে একা নিকষ অন্ধকারের বুক বেয়ে। ঐ অন্ধকার যেন ওকে আঁকড়ে ধরে টেনে নিয়ে চলেছে। ফোমা অনুভব করল কোথায় কোন অজানা দেশে যেন টেনে নিয়ে চলেছে ওকে কিন্তু তবুও থামবার উপায় নেই এতটুকুও। নেই ইচ্ছে। কেমন যেন একটা ক্লান্তি নেমে এসে ওর চিন্তায় বাধা দিল। এতটুকুও ইচ্ছে নেই ওর যে সঙ্গীর ঐ প্রস্তাবে বাধা দেয়। আর কেনই বা দেবে বাধা?

দার্শনিকতা করা সবার পক্ষে সাজে না।—শূন্যে হাতের ছড়িটা দোলাতে দোলাতে বলল উখতিশ্চেভ।—সবাই যদি দার্শনিক হয়ে ওঠে তবে বাঁচবে কারা? তাছাড়া মাত্র একবারই বাঁচি আমরা। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চেষ্টা করা উচিত বাঁচবার। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, এটাই সত্য। কিন্তু অত কথায়ই বা দরকার কি? তোমাকে একটু নাড়াচাড়া দেবার অনুমতি দেবে কি? চলো, এক্ষুনি. আমার চেনা একটা আমোদ-প্রমোদের স্থানে যাই। দু বোন থাকে সেখানে। কী সুন্দরভাবেই না থাকে তারা! যাবে?

বেশ যাবো।—শান্তকণ্ঠে বলল ফোমা।—কিন্তু বড্ডো দেরি হয়ে গেছে না?—মেঘভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল ফোমা।

সেখানে—মানে ওদের কাছে যাওয়ার জন্যে কোনো সময়ই অসময় নয়।—খুশিভরা কণ্ঠে বলে উঠল উখতিশ্চেভ।

৮

সেদিনের ক্লাবের সেই ঘটনার পরে তৃতীয় দিনে ফোমাকে দেখা গেল শহর থেকে মাইল সাতেক দূরে ব্যবসায়ী জ্‌ভান্ত্‌জেভের কাঠের জেটির উপরে একদল ব্যবসায়ীদের ছেলের সংগে। সে দলে আছে উখতিশ্চেভ, মাথাভরা টাক আর ছূঁচলো গোঁফওয়ালা গম্ভীর প্রকৃতির এক ভদ্রলোক আর চারটি মহিলা। তরুণ জ্‌ভান্ত্‌জেভের চোখে চশমা, শীর্ণ পাণ্ডুর দেহ। যখন দাঁড়ায় পায়ের খোর দুটো কাঁপতে থাকে থর থর করে। যেন ও দুটো ঐ লম্বা ডোরাকাটা ওভারকোটে ঢাকা ক্ষীণ দেহটির ভার বহন করছে একান্ত বিরক্তির সংগে। কোটের ভাঁজের ভিতর থেকে জকি-টুপি পরা ছোট্ট মাথাটা বেরিয়ে রয়েছে কৌতুকোদ্দীপকভাবে। গোঁফ-ওয়ালা ভদ্রলোকটি ওকে ডাকে জিন বলে। আর এমনভাবে উচ্চারণ করে যেন সে ভুগছে দারুণ সর্দিতে।

জিনের সঙ্গিনীটির লম্বা মোটাসোটা চেহারা, পীনোন্নত বুক। মাথার দু পাশ চাপা, কপালটা নিচু হয়ে ঢুকে গেছে ভিতরের দিকে; দীর্ঘ ছূঁচলো নাক ওর মুখখানাকে এনে দিয়েছে পাখির আদল। তাছাড়া ঐ কুৎসিত মুখখানা অভিব্যক্তি-হীন। কেবলমাত্র ভাবলেশহীন গোলগোল খুদে চোখদুটোর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে শয়তানিভরা হাসির আভা।

উখতিশ্চেভের সঙ্গিনীর নাম ভেরা। লম্বা পাণ্ডুর চেহারা। চুলগুলি লাল। ওর এত চুল, মনে হয় যেন সে কানঢাকা একটা বিরাট টুপি পরেছে মাথায়। গাল দুটোও পড়েছে ঢাকা। উঁচু কপালের নিচে আয়ত দুটি নীল চোখ প্রশান্ত অলস দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রয়েছে। একটি গোলগাল হাসিখুশি তরুণীর পাশে বসেছে গোঁফওয়ালা লোকটি। থেকে থেকে ওর পিঠের উপরে ঝুঁকে কী যেন বলছে কানে কানে। সংগে সংগেই রিনরিনে সুরে খিলখিল করে হেসে উঠছে মেয়েটি।

ফোমার সঙ্গিনী পিঙ্গলবর্ণা। জমকালো চেহারা। পরনে কালো পোশাক। মাথায় ঢেউ-খেলানো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। মাথা উঁচু করে আশপাশের সবকিছুর দিকে এমন গর্বোন্নত দৃষ্টি মেলে তাকায় যে মনে হয় এ-সভায় নিজেকে সে একটা কেউকেটা মনে করছে। ভাবছে নিজেকে সবার চাইতে বিশিষ্ট।

নদীর বিস্তীর্ণ বুকের উপরে বিছানো জেটির শেষ প্রান্তে বসেছে ওদের দল। মাঝখানে যেমন তেমন করে তৈরি একটা টেবিল। খালি বোতল, খাবারের ঝুড়ি, মিছরিজড়ানো কাগজ, লেবুর খোসা সর্বত্র ছড়ানো। জেটির পাশে উঁচু মাটির ঢিবির উপরে জ্বলছে আগুন। তারই সামনে উবু হয়ে বসে পশমের কোট-পরা একটি চাষী আগুনে হাত সেঁকছে। আর থেকে থেকে আড়চোখে তাকাচ্ছে টেবিলের লোকগুলোর দিকে।

দুদিনের উদ্দাম আমোদপ্রমোদ আর এইমাত্র শেষ-করা গুরুভোজনে সবাই ক্লান্ত।

অবসন্নমনে নদীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে বসে। গালগপ্প করছে। কিন্তু থেকে থেকে ওদের সে গল্পগুজব যাচ্ছে থেমে। নেমে আসছে দীর্ঘ নীরবতা।

বসন্তকালের মতো মেঘমুক্ত নির্মল দিন—সতেজ। স্বচ্ছ শীতল আকাশ—সমুদ্রের মতো বিশাল, বিস্তীর্ণ, কূলে কূলে ভরা নদীর ঐ আকাশেরই মতো প্রশান্ত খোলা বুকের উপরে পড়েছে ঢলে। দূরে পরপারের পাহাড়ী তীর নীল রঙের কোমল কুয়াশার স্নেহাবরণে আচ্ছাদিত। আর তারই ভিতর থেকে পাহাড়ের মাথার গীর্জার উপরের ক্রুশগুলি বড়ো তারার মতো চমকে চমকে উঠছে থেকে থেকে।

নদী উচ্ছল হয়ে উঠেছে পাহাড়ী তীরের স্পর্শে। ইতস্তত চলছে জাহাজ। আর তারই শব্দ গভীর কান্নার সুরের মতো জেটি আর তৃণভূমি পূর্ণ করে আসছে ভেসে যেখানে শান্ত ঢেউ-এ বাতাস পূর্ণ করে জেগে উঠেছে মৃদু মর্মর শব্দ।

বিরাট বিরাট গাধাবোটগুলো ভেসে চলেছে উলটো স্রোতে—একটার পিছনে আর একটা। যেন নিস্তরঙ্গ শান্ত নদীর বুক ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে চলেছে অতিকায় শুয়োরের পাল। জাহাজের চিমনির মুখে গল্ গল করে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। তারপর রৌদ্রোজ্জ্বল বাতাসে ধীরে ধীরে যাচ্ছে মিলিয়ে।

কখনো বা জেগে উঠছে অতিকায় শ্রান্ত জানোয়ারের ক্রুদ্ধ গর্জনের মতো জাহাজের বাঁশির প্রতিধ্বনিময় শব্দ। জেটির আশপাশের তৃণভূমি নীরব শান্ত। বানের জলে ডুবে-যাওয়া একক গাছগুলো ছেয়ে জেগে উঠেছে হালকা সবুজ রঙের পাতার চুমকি। গোড়া ডুবিয়ে ডগার ছায়া প্রতিবিম্বিত করে জল ঐ গাছগুলোকে দিয়েছে চিত্র-গোলকের আকার। মনে হয় মৃদু বাতাসেই ঐ আয়নার মতো স্বচ্ছ অপূর্ব সুন্দর নদীর বুকে ভেসে চলে যাবে।

ভাবমগ্ন দৃষ্টি দূরের পানে প্রসারিত করে দিয়ে কটাচুল মেয়েটি গান ধরল :

"ভলগা নদীর উপর দিয়া
নাওখানি ঐ যায় ভাসিয়া রে..."

আয়ত চোখদুটো ঘৃণাভরে কুঞ্চিত করে মেয়েটির দিকে না তাকিয়েই বলে উঠল পিঙ্গলবর্ণা : ও গান না গাইলেও চলবে। এমনিতেই আমরা খুব বিষণ্ণ অনুভব করছি।

ওর পিছনে লেগো না। গাইতে দাও।—মিনতিভরা কণ্ঠে বলে উঠল ফোমা। ওর মুখখানা পাংশু হয়ে উঠেছে। কেবলমাত্র থেকে থেকে চোখদুটো উঠছে জ্বলে। ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছে একটা অনির্দিষ্ট অলস হাসির মৃদু রেখা।

এসো সবাই মিলে কোরাস গাই।—প্রস্তাব করল গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক।

না, ওরা দুজনেই গা'ক।—পরমোৎসাহে বলে উঠল উখতিশ্চেভ।—সেই গানটা গাও ভেরা, সেই যে তোমার জানা গানটা,—"আমি যাবো ভোরের বেলা।" কেমন? গাও পাভ্লিঙ্কা।!

সদা হাস্যময়ী তরুণী পিঙ্গলবর্ণার দিকে তাকাল। তারপর সসম্ভ্রমে জিগ্গেস করল : ধরব গান, সাশা?

আমি গাইব।—প্রত্যুত্তরে বলল ফোমার সঙ্গিনী। তারপর পাখির মতো মুখ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হুকুম করল :

আমার সঙ্গে গাও।

সঙ্গে সঙ্গে ভাস্সা জ্ভান্তজেভের সঙ্গে কথা বন্ধ করে হাত তুলে গলাটা রগ্ড়াল। তারপর দিদির মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সাশা উঠে দাঁড়াল। টেবিলের উপরে হাতের ভর দিয়ে গর্বভরে মাথাটা উঁচু করে সতেজ পৌরুষ

কণ্ঠে শব্দাড়ম্বরপূর্ণ গান ধরল :

"সংসারেতে পরাণ রেখে সুডে উথলায়
ও যাহার, ভাবনা-চিন্তা বুকে না জ্বলে,
পরাণটা যার পুড়ে পুড়ে খাক হল না হায়
পিরিতির দারুণ অনলে!"

ধীর করুণ সুরে মাথা দুলিয়ে ওর বোন ধরল :

"মরি হায়!
রূপবতী কন্যে আমার কী হবে উপায় রে।"

বোনের দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে খাদে গাইতে আরম্ভ করল সাশা :

"তৃনেরই সরান আরার শুকাইল গন,
হেজে-মজে গেল মন।"

দুজনার মিলিত কণ্ঠের সুর জলের বুকের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে কেঁপে কেঁপে। একজনার কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ছে অন্তরের অসহনীয় বেদনার করুণ মর্মস্পর্শী অভিযোগ। সে অভিযোগের বিষাক্ত বেদনাময় মদির আবেশে কান্নাভরা দুঃখ পড়ছে গলে। অসহনীয় বেদনার তীব্র জ্বালাময় আগুন নিভিয়ে দেওয়া অশ্রুজল। অন্যজনের অনুচ্চ পৌরুষকণ্ঠের রক্তঝরা মর্মবেদনা প্রবল বাতাসে আবর্তিত হয়ে গুমরে উঠছে প্রতিশোধস্পৃহা।

প্রতিটি শব্দের সুস্পষ্ট ধ্বনি যেন ওর অন্তরের সুগভীর কন্দর থেকে স্রোতের মতো বেগে আসছে ধেয়ে। প্রতিটি কথা যেন ফুটন্ত রক্ত-সিক্ত, দুর্জয় ক্রোধে আন্দোলিত আর অপরাধের বিষে বিষাক্ত হয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে দাবি জানাচ্ছে প্রতিহিংসার।

"আমি শোধ তুলিব,
ইহার শোধ তুলিব,"

মুদ্রিত চোখে করুণ সুরে গেয়ে চলেছে ভাস্‌সা :

"দগ্ধে মারব তারে
শুকায়ে মারিব,"

স্যাশার সতেজ দরাজ কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল প্রতিজ্ঞা। মনে হল, আঘাতের শব্দের মতো হঠাৎ সেই উত্তাপভরা সঙ্গীতের উচ্চগ্রাম পরিবর্তিত হ'য়ে গেল। খাদে নেমে এসে বোনের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইতে লাগল। আর সে কণ্ঠ থেকে প্রবল ধারায় ঝরে পড়তে লাগল সাবধান-বাণী :

"খ্যাপা বাতাস চাইতে শুখা,
নিড়ান ঘাসের চাইতে শুখা,
ওহো! নিড়ান আর শুখা ঘাসের প্রায় রে।"

টেবিলের উপরে কনুইয়ের ভর রেখে মাথা নিচু করে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছে ফোমা ঐ নারীর অর্ধ-নিমীলিত চোখের দিকে। দূরের পানে প্রসারিত স্থির অপলক দুটি চোখের দৃষ্টি বেয়ে ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠছে এমন অপূর্ব উজ্জ্বল আলোর ঝিলিমিলি যেন সেই আলোর আভায় অন্তরের অন্তস্তল থেকে বেরিয়ে আসা মখমলের মতো কোমল কণ্ঠস্বরও মনে হচ্ছে ওর চোখেরই মতো কালো, চোখেরই মতো আলোর ঝলকানি মাখা। পরক্ষণেই ওর আলিঙ্গনের কথা মনে পড়ে ভাবল ফোমা :

কেমন করে ঐ নারী অমন হতে পারে? ওর সঙ্গে থাকাও ভীতিজনক।

সঙ্গিনীর গায়ের কাছে ঘন হয়ে বসে উথ্‌তিশ্চেভ। তার চোখেমুখে ফুটে

উঠেছে আনন্দের আভা। পরম তৃপ্তির সঙ্গে শুনছে গান। গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক, জ্ভান্তজেভ মদ খেয়ে চলেছে। থেকে থেকে সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে কী যেন বলছে কানে কানে। কটাচুল তরুণী তার নিজের হাতের উপরে ওর হাতখানা তুলে নিয়ে একান্ত মনোযোগের সঙ্গে দেখছে উখ্‌তিশ্চেভের হাতের রেখা। হাসিখুশি তরুণীটির মুখে নেমে এসেছে বিষাদের ম্লান ছায়া। মাথা নিচু করে নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে শুনছে গান। যেন ঐ সঙ্গীতের সুরে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

আগুনের কাছ থেকে উঠে এল চাষীটি। তক্তার উপর দিয়ে পা টিপে টিপে এসেছে এগিয়ে। ওর হাত মুঠো-করা—পিছনের দিকে। দাড়িগোঁফে সমাচ্ছন্ন চওড়া মুখের উপরে ফুটে উঠেছে বিস্ময়ভরা সরল আনন্দের আভা।

"ও দরদী বঁধু আমার, জোয়ান মরদ রে!
শুধু একবার জ্বলিয়ো।"

মাথা দোলাতে দোলাতে করুণ সুরে গেয়ে চলেছে ভাস্‌সা। আর ওর বোন বুক উঁচু করে হাত তুলে জোরাল কণ্ঠে গেয়ে উঠল শেষের কলি :

"পিরিতির এ জ্বালা-পোড়ায়
একবার জ্বলিয়ো!"

গান শেষ করে গর্বোন্নত দৃষ্টি মেলে চারদিকে তাকাল সাশা। তারপর ফোমার পাশে বসে পড়ে শক্তহাতে ফোমার গলা জড়িয়ে ধরে বলল :

কি গো, ভালো লাগল গান?

চমৎকার!—প্রত্যুত্তরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে হাসিভরা মুখে ওর দিকে তাকিয়ে বলল ফোমা। গানের সুরে পূর্ণ হয়ে উঠেছে ওর অন্তর। জাগিয়ে তুলেছে প্রণয়ের কোমল তৃষ্ণা। তেমনি মনোমুগ্ধকর সুরের রেশ উঠছে কেঁপে কেঁপে। কিন্তু এত লোকের চোখের সামনে ঐ নারীর বাহুস্পর্শে কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়ছে—লাগছে সঙ্কোচ।

বাহবা! বাহবা! আলেকসান্দ্রা সাভেলিয়েভনা!—চিৎকার করে বলে উঠল উখ্‌তিশ্চেভ। সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। কিন্তু ভাস্‌সা সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে ফোমাকে আরো দৃঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে বলল :

তাহলে গানের জন্যে কিছু একটা বখশিস দাও!

বেশ দেবো।

কী দেবে?

কী চাই তোমার বলো?

বলব শহরে ফিরে গিয়ে। আমি যা চাই তা যদি দাও তবে, ওঃ! কী ভালোই না বাসব তোমাকে!

উপহারের জন্যে?—মৃদু হেসে বল্‌ল ফোমা।—এমনিতেই ভালোবাসা উচিত।

তরুণী শান্ত দৃষ্টি মেলে ফোমার মুখের দিকে তাকাল তারপর খানিকক্ষণ কী যেন চিন্তাকরে দৃঢ়কণ্ঠে বল্‌ল :

এত তাড়াতাড়ি ভালোবাসা জন্মায় না, তা যাই বলো। মিথ্যে কথা বলব না। কেন মিথ্যে বলতে যাবো তোমার কাছে? খোলাখুলিই বলছি তোমাকে। তোমার দেয়া উপহার—তারই জন্যে তোমাকে আমি ভালোবাসি। কারণ, টাকা-ছাড়া পুরুষের দেবার মতো আর কিছুই নেই। আর কিছুই দিতে পারে না তারা টাকা ছাড়া। কোনো মূল্যবান বস্তুই নয়। এরই মধ্যে সেটা আমার জানা হয়ে গেছে। এমনি এমনিও মানুষ ভালোবাসতে পারে। হাঁ। একটু অপেক্ষা করো।

আর একটু চিনতে দাও তোমাকে ভালো করে। তখন হয়তো বিনা মূল্যেই আমি তোমাকে ভালোবাসব। ইতিমধ্যে—হাঁ, ভুল বুঝো না আমাকে। যেভাবে আমি জীবনযাপন করি তাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

ওর কথা শুনতে শুনতে ফোমা মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। ভাস্‌সার যৌবনভরা পরিপূর্ণ দেহের ঘনায়মান সান্নিধ্যে ওর সর্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠছে। জ্‌ভান্তজেভের বিরক্তিকর খন্‌খনে গলার স্বর ভেসে এল ওর কানে :

আদৌ পছন্দ করি না আমি এটা। বিখ্যাত রুশ সংগীতের সৌন্দর্য এতটুকুও বুঝতে পারি না আমি। কী সুর আছে ওর ভিতরে? নেকড়ের গর্জন। কেমন যেন বুভুক্ষ—বন্য। হাঁ। রুগ্ন কুকুরের গোঙানি। একেবারেই পাশবিক। নেই আনন্দ, নেই সৌন্দর্য। নেই কোনো সজীব প্রাণবন্ত ধ্বনি, ঝঙ্কার। ফরাসি চাষীরা কী আর কেমন করে গান করে একবার শোনা উচিত তোমাদের।

মাপ করো ইভান নিকোলায়েভিচ্!—উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল উখতিশ্চেভ।

তোমার সঙ্গে আমি একমত যে রুশ সংগীতের একঘেয়ে, বিষাদময়। এর ভিতরে নেই কোনো সাংস্কৃতিক চাকচিক্য,—মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে ক্লান্তকণ্ঠে বলল গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক।

তবুও সে সংগীতের ভিতরে রয়েছে উত্তপ্ত প্রাণের স্পন্দন।—বলল কটাচুল তরুণী কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে।

সূর্য অস্তগামী। তৃণভূমির তীরপ্রান্তে সুদূর বনরেখা ছাড়িয়ে দূরে—বহু দূরে কোথায় যেন ডুবে যাচ্ছে। সমগ্র বনভূমি রক্তিম আভায় রাঙিয়ে দিয়ে গোলাপী আর সোনালী আলোর ছোপ পড়েছে কালো জলের সুগভীর শীতল বুকে। অস্ত-গামী সূর্য-কিরণের ঐ অপরূপ আলোর খেলার দিকে তাকাল ফোমা। দেখল, কেমন করে সুবিস্তীর্ণ প্রশান্ত জলরাশির বুকে কেঁপে কেঁপে ওরা করছে স্থান পরিবর্তন। কানে ভেসে আসা কথাগুলো মনে হচ্ছে যেন একদল কালো প্রজাপতি দ্রুত উড়ে চলেছে বাতাসে। ফোমার কাঁধের উপরে মাথা রেখে কোমল মৃদু সুরে অবিরাম গুঞ্জন তুলে চলেছে সাশা। ক্ষণে ক্ষণে লজ্জায় লাল হয়ে উঠছে ফোমার মুখ। পড়ছে বিমূঢ় হয়ে। কারণ অনুভব করছে যে ঐ তরুণী প্রয়াস পাচ্ছে ওকে উত্তেজিত করে তুলতে যাতে করে তাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে অজস্র চুম্বনে ভরিয়ে দেয় তার মুখ। ঐ তরুণী ছাড়া আর কেউ ভ্রূক্ষেপও করছে না ওর দিকে। তাছাড়া জ্‌ভান্তজেভ আর গোঁফওয়ালা লোকটিকে দারুণ বিরক্তিকর মনে হচ্ছে ফোমার।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছ কী, অ্যাঁ? ফোমার কানে এল উখতিশ্চেভের পরিহাস-ভরা তীব্র কণ্ঠ।

যে চাষীটিকে অমন করে ধমকে উঠল উখতিশ্চেভ মাথা থেকে টুপি খুলে হাঁটুর সঙ্গে ঠেকিয়ে রেখে সে মৃদু হেসে জবাব দিল :

এজ্ঞে এলাম একটু মাঠাকুরুনের গান শুনতে।

কি হে, খুব ভালো গায় নাকি?

কী যে বলেন এজ্ঞে, নিশ্চয়ই।—প্রশংসাভরা দৃষ্টিতে সাশার দিকে তাকিয়ে বলল চাষীটি।

বহুত আচ্ছা!—উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠল উখ্‌তিশ্চেভ।

তেজী সুর রয়েছে মাঠাকুরুনের বুকের মধ্যে।—মাথা নাড়তে নাড়তে নিচু কণ্ঠে বল্‌ল চাষীটি।

তরুণীরা উচ্চ হাসির ধমকে ফেটে পড়ল। আর পুরুষেরা দ্ব্যর্থক ভাষায় পরিহাসভরা কণ্ঠে মন্তব্য করল সাশাকে ইঙ্গিত করে।

একটি কথাও না বলে নীরবে শুনছিল সাশা ওর কথা। এতক্ষণে প্রশ্ন করল চাষীটিকে :

গাইতে পারো তুমি?

এই একটু একটু করে থাকি আমরা—হাত নাড়তে নাড়তে জবাব দিল চাষীটি।

কী গান জানো?

সব রকমের। গান গাইতে খুব ভালোবাসি আমি।—বলেই একটু বিনয়ের হাসি হাসল।

এসো আমরা দুজনে মিলে একটা গান করি—তুমি আর আমি।

তা কেমন করে হবে! আপনার সঙ্গে কি আমার জুড়ি মিলবে?

মিলবে, মিলবে, ধরো।

আমি তাহলে একটু বসি?

এদিকে এসো, টেবিলে এসে বসো।

কী চমৎকার প্রাণবন্ত!—মুখ কুঁচকে বলে উঠল জ্‌ভান্তজেভ।

যদি তোমার ভালো না লাগে, ডুবে মরো গে, যাও।—ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে জ্‌ভান্ত-জেভের দিকে তাকিয়ে বলল সাশা।

না, জল ঠাণ্ডা।—ওর ক্রুদ্ধ দৃষ্টির ঘায়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে বলল জ্‌ভান্তজেভ।

তবে যা খুশি করোগে, যাও।—তরুণী কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিল।

কিন্তু...তাছাড়া জলও আছে প্রচুর, তোমার ঐ নোংরা শরীরটা ডুবিয়ে দিলেও সবটা জল নষ্ট করতে পারবে না।

মরি মরি কী রসিকা—বলেই যুবক মুখ ফিরিয়ে বসল। তারপর ঘৃণাভরা কণ্ঠে পাশের সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল :

রুশিয়ার বেশ্যাগুলোর পর্যন্ত রুক্ষমেজাজ।

প্রত্যুত্তরে সে কেবলমাত্র একটু হাসল মাতালের হাসি। উখতিশ্চেভও পড়েছে মাতাল হয়ে। সঙ্গীর মুখের দিকে তাকিয়ে অর্ধনিমীলিত চোখে কী যেন বলল বিড়বিড় করে। কিন্তু ওর কোনো কথাই কারুর কানে ঢুকল না। পাখির মুখের মতো মুখ তরুণীটি নাকের তলায় বাক্‌স তুলে মিছরি খাচ্ছে। পাভ্‌লিঙ্কা জেটির কিনারে দাঁড়িয়ে লেবুর খোসা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে জলে।

জীবনে কোনোদিন আমি এমন অদ্ভুত প্রমোদ-ভ্রমণে যাইনি। কিংবা এমন সব সঙ্গীসাথীর সঙ্গও করিনি।—বিমর্ষমুখে বলল জ্‌ভান্তজেভ। মৃদু হেসে ফোমা ওর দিকে তাকাল। মনে মনে খুশি হয়ে উঠল এই ভেবে যে, ঐ দুর্বল কুৎসিত-দর্শন লোকটা আহত হয়েছে আর সাশা ওকে করেছে অপমান। থেকে থেকে ফোমা সম্মতিসূচক দৃষ্টিতে সাশার দিকে তাকাতে লাগল। ফোমা খুশি যে সাশা সবার সঙ্গেই করছে এমন নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার আর নিজেকে এমন গর্বোন্নত করে রাখছে যেন সত্যিই একটি ভদ্রমহিলা।

সাশার পায়ের কাছে তক্তার উপরে বসেছে চাষীটি। দু'হাতে হাঁটু জড়িয়ে মুখ তুলে সাশার মুখের দিকে তাকিয়ে শুনছে ওর কথা।

আমি যখন খাদে গাইব, তুমি তখন ধরবে চড়া সুরে, বুঝলে?

এঁজ্ঞে, বুঝলাম। কিন্তু মা ঠাকরুন, কিছু একটু দিন আমাকে যাতে বুকে বল পাই!

এক প্লাস ব্রান্ডি দাও তো ওকে ফোমা!

প্লাসটি শেষ করে তৃপ্ত মনে গলা খাঁকারি দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে বলল ঃ

আজ্ঞে এখন পারি।

ভ্রূ কুঁচকে হুকুম করল সাশা ঃ

তবে ধরো।

চাষাটি চোখেমুখে ফুটিয়ে তুলল একটা বিষাদের ক্লান্ত ছায়া। তারপর সাশার মুখের উপরে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়ে সপ্তমে ধরল গান ঃ

"পোড়া মুখে অন্ন রোচে না,
মুখে জলও রোচে না।"

তরুণীর সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। এক অদ্ভুত কান্নাভরা বিষাদময় কম্পিত কণ্ঠে গেয়ে উঠল ঃ

"মিষ্টি মদে মন মজে না"

মধুর মিষ্টি হাসি হেসে চাষীটি মাথা দোলাতে দোলাতে মুদ্রিত চোখে বাতাসে ছড়িয়ে দিল তার সপ্তম সুরের-কম্পিত ধ্বনি ঃ

"ও আমার গৃহবাসের কাল ফুরুলো রে!"

সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা-ঝরা করুণ কাতর কণ্ঠে গেয়ে উঠল সাশা ঃ

"ওহো! ঘরের মানুষ পর করিতে হবে।"

গলা আরো খাদে নামিয়ে দুলতে দুলতে চাষীটি অদ্ভুত সুরেলা কণ্ঠে গেয়ে চলেছে। সে গানের সুরে ঝরে পড়ছে সুতীব্র বেদনা ঃ

"আহা যেতে হবে বিদেশ বিভুঁই চলে।"

সন্ধ্যার সুমধুর শান্ত নীরবতা প্লাবিত করে দুটি মিলিত কণ্ঠের ব্যাকুল কান্না ঝরে পড়তে লাগল। আশপাশের সব কিছুই যেন উষ্ণ হয়ে উঠেছে মধুর আবেগে। কী এক অদৃশ্য অমোঘ শক্তি একটি মানুষকে তার আত্মীয়-পরিজন—তার দেশের মাটি থেকে ছিঁড়ে নিয়ে কোন দূরদেশের কঠোর দুর্দশাময় জীবনের পথে টেনে নিয়ে চলেছে। তার-ই প্রতি বেদনাময় সহানুভূতির মৌন ম্লান হাসির আভায় নয়—মানব অন্তরের তপ্ত অশ্রুজল যেন উদ্‌বেলিত হয়ে উঠেছে করুণ বিলাপে। যেন ঐ অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে উঠেছে বাতাস। জীবন-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত দেহমনের ঘায়ের মুখে ঝরে পড়ছে অসহনীয় দুঃখ—সুতীব্র বেদনা। দারিদ্রের লৌহ কঠিন আঘাতের সেই নিদারুণ ক্ষত-জ্বালা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে ঐ সহজ সরল কথা ক'টির ভিতরে; আর তার বিষাদময় ঝঙ্কার সুদূর শূন্যে আকাশের পানে ধেয়ে চলেছে।—যেখান থেকে কারুর জন্যে, কোনো কিছুর জন্যেই আসে না ফিরে কোনো প্রতিধ্বনি।

গাইয়েদের কাছ থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াল ফোমা। তারপর অপলক দৃষ্টি মেলে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ভয়ের মতো এক অনুভূতি জেগে উঠেছে ওর অন্তর জুড়ে। ঐ সঙ্গীত যেন বিশাল ঢেউয়ের মতো ছুটে এসে আছড়ে পড়ছে ওর বুকে। আর সেই অনন্ত দুঃখাবেগের অন্ধ, বন্য শক্তি যেন দৃঢ় মুষ্ঠিতে ওর হৃদপিণ্ডটা চেপে ধরে নিদারুণ ব্যথায় অভিভূত করে ফেলেছে।

ফোমার মনে হল, বুঝিবা এক্ষুনি ওর বুকের ভিতর থেকে উথলে উঠবে কান্নার প্লাবন। কিসে যেন ওর টুঁটি টিপে ধরেছে। রুদ্ধ করে ফেলেছে কণ্ঠ। মুখখানা কাঁপছে থর থর করে। আবছা দেখতে পাচ্ছে সাশার কালো চোখ—স্থির

অচঞ্চল। বেদনা-ম্লান দৃষ্টির ক্ষণপ্রভা থেকে থেকে চমকে উঠছে সেই দুটি কালো-চোখের চাউনি বেয়ে। ওর মনে হল চোখদুটি বিরাট। ক্রমেই যেন বড়ো হয়ে চলেছে।

ফোমার মনে হল কেবলমাত্র দুটি মানুষই নয়—সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতি যেন ওকে ঘিরে গাইছে গান। কাঁদছে, কাঁপছে আর অনাবিল দুঃখের প্রবাহে ঝট্‌পট্‌ করতে করতে আশ্রয় খুঁজে ফিরছে। যা কিছু জীবন্ত সব কিছুই যেন এক অমোঘ শক্তিশালী হতাশার দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে ও নিজেও যেন ঐ মানুষ, নদী, ঐ তীর—যেখান থেকে গানের সুরের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে ভেসে আসছে করুণ কাতর ধ্বনি সব কিছুর সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়ে গাইছে গান।

এতক্ষণে চাষীটি হাঁটু গেড়ে বসে সাশার মুখের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়তে আরম্ভ করল। সাশাও ওর দিকে ঝুঁকে হাতের দোলার তালে তালে মাথা দোলাতে শুরু করল। দুজনেই গাইছে এখন কথাহীন গানের কলি। কিছুতেই যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না ফোমা কেমন করে শুধু দুটি কণ্ঠের মিলিত সুর এমন প্রবল শক্তিতে ব্যথা ও কান্নার কাতর ক্রন্দনে প্লাবিত করে তুলতে পারে সমগ্র আকাশ বাতাস।

যখন গান শেষ হল, ফোমার সর্বাঙ্গ তখন প্রবল উত্তেজনায় কাঁপছে। অশ্রু কলঙ্কিত মুখ তুলে ওদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল—ব্যথাতুর ম্লান হাসি।

কিগো, গান তোমার মনকে নাড়া দিয়েছে?—ক্লান্তিভরা পাংশু মুখে প্রশ্ন করল সাশা। দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসে ওর বুকখানা ওঠা নামা করছে।

ফোমা চাষীর মুখের দিকে তাকাল। চাষীটি কপালের ঘাম মুছতে মুছতে চারদিকে তাকাতে লাগল। যেন আশেপাশে কী ঘটছে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।

সবাই নীরব নির্বাক। সবাই স্তব্ধ—কথাহারা।

হা ভগবান্‌!—একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ফোমা।—সাশা! চাষী! কে তোমরা?—প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল ফোমা।

আমি—স্তেপান।—একটু বিব্রত বিমূঢ় হাসি হেসে বলল চাষী। সঙ্গে সঙ্গে সেও উঠে দাঁড়াল।

কী অপূর্ব তোমার গান! আঃ!—অবাক বিস্ময়ে বলে উঠল ফোমা। তারপর নিদারুণ অস্বস্তিতে একবার এ-পা একবার ও-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে লাগল।

হুজুর!—চাষীর বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল সুগভীর দীর্ঘশ্বাস। তার-পর প্রত্যয়ভরা দৃঢ় অথচ কোমল কণ্ঠে বলল ঃ

দুঃখ একটা ষাঁড়কেও কোকিলের মতো গাইতে বাধ্য করে। কিন্তু মা ঠাক্‌রুন যে কেন অমন করে গাইতে পারলেন তা ঈশ্বরই জানেন। সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে যেন গাইলেন। যাকে বলে—তুমি শুয়ে পড়ো আর দুঃখে মরে যাও। অথচ উনি কিনা একজন ভদ্রমহিলা!

বেড়ে গেয়েছ!—মাতালের জড়িত কণ্ঠে বলল উখতিশ্চেভ।

না, এ যে কী তা শয়তানই জানে!—প্রায় কান্নাভাঙা গলায় চিৎকার করে বলে উঠল জ্‌ভান্ত্‌জেভ। তারপর নিদারুণ বিরক্তিতে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।—কোথায় এলাম এখানে একটু ফুর্তি করতে—আনন্দ করতে, আর ওরা কিনা শুরু করে দিল আমার সৎকারের ব্যবস্থা। কী ভীষণ! এক মুহূর্তও আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এক্ষুনি চলে যাবো।

জিন, আমিও চলে যাচ্ছি। আমিও দারুণ ক্লান্ত।—বলল গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক।

ভাস্‌সা—ওর সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল জ্‌ভান্তজেভ,—পোশাক পরে নাও।

হাঁ যাবার সময় হল বটে—কটাচুল তরুণী বলল উখ্‌তিশ্চেভকে।—ঠাণ্ডা পড়েছে, এক্ষুনি অন্ধকার হয়ে আসবে।

স্তেপান সবকিছু পরিষ্কার করে ফেল—হুকুম করল ভাস্‌সা।

সবাই মিলে জটলা করতে শুরু করল। সবাই বলছে কথা। দুশ্চিন্তাভরা দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে নিদারুণ বিরক্তিতে কেঁপে উঠল ফোমা। অলস পায়ে ওরা পায়চারি করে ফিরছে জেটির উপরে। ক্লান্ত, অবসন্ন। পরস্পরের সঙ্গে করছে অসংলগ্ন বাক্যালাপ—অর্থহীন কথাবার্তা। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে নিতে সাশা ওদের ধাক্কা দিতে লাগল।

স্তেপান! গাড়ি জুততে বলে দাও।

আমি কিন্তু আর একটু কনিয়াক খাবো। কে খাবে আমার সঙ্গে?—জড়িত কণ্ঠে বলে উঠল গোঁফওয়ালা লোকটি। তার হাতে একটা বোতল। একটা স্কার্ফ নিয়ে ভাস্‌সা জড়িয়ে দিচ্ছিল জ্‌ভান্তজেভের গলায়। ভাসসার সামনে দাঁড়িয়ে জ্‌ভান্তজেভ। ভ্রূ কোঁচকানো, বিরক্ত, অসন্তুষ্ট। ঠোঁটদুটো বেঁকে উঠেছে, পায়ের গুটি দুটো কাঁপছে। ওর দিকে দৃষ্টি পড়তেই নিদারুণ বিরক্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠল ফোমার অন্তর। অন্য জেটিতে সরে গেল ফোমা। অবাক হয়ে গেল এই দেখে যে, ওরা এমন ব্যবহার করছে যেন গানটি আদৌ শোনেনি কানে। গানটা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে ওর অন্তরে। আর সেখান থেকে যেন শুনতে পাচ্ছে জীবনের এক অস্থির কামনাভরা আহ্বান। কিছু একটা করবার, কিছু একটা বলবার আকুলি-বিকুলি উঠেছে জেগে। কিন্তু কেউ নেই সেখানে যার সঙ্গে বলবে দুটো কথা।

সূর্য অস্ত গেছে। দিগন্ত ছেয়ে জেগে উঠেছে নীল কুয়াশা। সেদিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল ফোমা। ঐ লোকগুলোর সঙ্গে শহরে ফিরে যেতে আদৌ ইচ্ছে নেই ওর। কিংবা ইচ্ছে নেই ওদের সঙ্গে এখানে থাকতে। অসংলগ্ন পায়ে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে বলতে ওরা জেটি কাঁপিয়ে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে। পুরুষদের মতো অতটা মাতাল হয়ে পড়েনি মেয়েরা। কেবলমাত্র কটাচুল মেয়েটি বহুক্ষণ পর্যন্ত উঠতে পারেনি বেঞ্চ ছেড়ে। অবশেষে সে উঠে দাঁড়াল, তারপর ওদের উদ্দেশ্যে বলে উঠল :

নেশা হয়েছে আমার। মাতাল হয়ে পড়েছি।

একটা লম্বা কাঠের উপরে বসে পড়ল ফোমা। তারপর যে কুড়ুলটা দিয়ে চাষীটি জ্বালানি কাঠ কাটছিল সেটা হাতে তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

হা ভগবান! কী নীচ!—ফোমা শুনল জ্‌ভান্তজেভের গলা। অনুভব করল সব কিছুর উপরেই ওর অন্তর জুড়ে জেগে উঠেছে নিদারুণ ঘৃণা। নিজের উপরে—অন্য সবার উপরে। একমাত্র সাশা ছাড়া। সাশা ওর অন্তরে জাগিয়ে তুলেছে কেমন যেন এক অস্বস্তির অনুভূতি। কিন্তু সে অনুভূতির ভিতরে রয়েছে শ্রদ্ধা—রয়েছে কেমন যেন একটু ভয়। যেন যে-কোনো মুহূর্তে পারে কোনো অপ্রত্যাশিত ভয়ঙ্কর কিছু একটা করে ফেলতে।

জানোয়ার!—তীক্ষ্ন রিন্‌রিনে গলায় চিৎকার করে উঠল জ্‌ভান্তজেভ।

ফোমা দেখল জ্ভান্তজেভ চাষীটির বুকের উপরে ঘুসি মারল। সংগে সংগে চাষীটি বিনীতভাবে মাথার টুপি খুলে একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াল।

মূর্খ!—আবার হাত উঁচিয়ে ওকে তেড়ে মারতে এল জ্ভান্তজেভ। মুহূর্তে ফোমা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল তারপর তীব্র গর্জনে শাসিয়ে উঠল ঃ

খবরদার! ওর গায়ে হাত দিও না বলছি!

কী?—ফোমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল জ্ভান্তজেভ।

স্তেপান! এদিকে এসো!—ডাকল ফোমা।

এ-ই ব্যাটা চাষা!—ফোমার দিকে তাকিয়ে ঘৃণা উদ্গিরণ করল জ্ভান্তজেভ।

কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওর দিকে দুপা এগিয়ে এল ফোমা। কিন্তু হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল ওর মাথায়। বিদ্বেষভরা এক ঝলক তীব্র হাসি হেসে গলা নামিয়ে জিগ্গেস করল স্তেপানের কাছে ঃ

জেটির তিন জায়গায় কাছি দিয়ে বাঁধা—তাই না?

হাঁ, তিন জায়গায়।

দড়ি কেটে দাও।

তারপর?

চুপ! কেটে ফেল!

কিন্তু......

কেটে ফেল। খুব আস্তে। কেউ যেন না টের পায়।

চাষীটি কুড়ুল তুলে নিল হাতে। তারপর যেখানে কাছি বাঁধা সন্তর্পণে সেখানে এগিয়ে গিয়ে কয়েকটা ঘা মেরেই ফিরে এল ফোমার কাছে।

আমি কিন্তু দায়ী নই হুজুর!

ভয় পেও না।

ওরা যে ভেসে চল্ল!—ভীত কণ্ঠে ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠল চাষীটি। তারপর তাড়াতাড়ি ক্রুশ করল।

দেখতে দেখতে ফোমা চাপা কণ্ঠে হেসে উঠল। কেমন যেন একটা ব্যথাভরা অনুভূতির তীব্র স্পন্দনের সংগে অদ্ভুত আনন্দময় সুমধুর ভীতি জেগে উঠল ওর অন্তরে।

জেটির উপরের লোকগুলো তখনও মন্থর পায়ে পায়চারি করে ফিরছে। জটলা করছে। মেয়েদের পোশাক পরতে সাহায্য করছে হাসতে হাসতে। আর ধীরে মন্থর গমনে মৃদু মৃদু দুলতে দুলতে জেটিটা চলেছে ভেসে।

স্রোতের টানে যদি গিয়ে জাহাজের সংগে ধাক্কা খায়?—ফিস্ ফিস্ করে বলল চাষীটি।—গলুইয়ের উপরে গিয়ে আছড়ে পড়বে। আর ওরা ছাতু ছাতু হয়ে যাবে।

চুপ!

ডুবে মরবে যে!

তখন একটা নৌকা নিয়ে গিয়ে তুমি ওদের তুলে আনবে।

তাই বলুন! ধন্যবাদ! তারপর হাজার হোক ওরা মানুষ তো বটে। আর এর জন্যে তখন দায়ী হবো আমরাই।

এতক্ষণে খুশি মনে চাষীটি এক লাফে জেটির উপর থেকে নিচে নেমে এল। জলের কিনারায় দাঁড়িয়ে ফোমা। ইচ্ছে হল চিৎকার করে কিছু একটা বলে ওঠে। কিন্তু সে ইচ্ছে দমন করে চুপ করে রইল, যাতে জেটিটা আরও খানিকটা দূরে ভেসে যায়। আর ঐ মাতালের দল নোঙরের দড়ি ডিঙিয়ে লাফিয়ে না পারে এসে উঠতে

পাকে। ওর সর্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত করে জেগে উঠল একটা আলিঙ্গনভরা আনন্দের শিহরণ। প্রতি মুহূর্তে জেটিটা ভাসতে ভাসতে জলের উপরে দুলতে দুলতে দূরে সরে যাচ্ছে।

এতক্ষণ ধরে যে বোঝার মতো ভারি বিষাদময় কালো অনুভূতি ওর অন্তর আচ্ছন্ন করে জুড়ে বসেছিল, জেটির উপরের ঐ অপসৃয়মান লোকগুলোর মতো তাও যেন দূরে ভেসে যেতে লাগল। শান্ত হয়ে ফোমা টাট্‌কা তাজা বাতাসে নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে কী যেন একটা বস্তু ওর মাথার ভিতরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে লাগল।

অপসৃয়মান জেটির কিনারে দাঁড়িয়ে রয়েছে সাশা ফোমার দিকে পিছন ফিরে। ওর পরিপূর্ণ সুন্দর দেহসৌষ্ঠবের দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ ফোমার মনে পড়ে গেল মেদিনস্কায়ার কথা। মেদিনস্কায়া ওর চাইতে ক্ষীণকায়। মেদিনস্কায়ার স্মৃতি যেন ওর সর্বাঙ্গে হুল ফুটিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রূপভরা উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ঃ

ওহে শুনছ? বিদায়! হাঃ হাঃ হাঃ!

হঠাৎ লোকগুলোর কালো মূর্তি যেন ওর দিকে এগিয়ে এল। তারপর জেটির মাঝখানে দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু ইতিমধ্যেই ফোমা আর ওদের মাঝখানে তিন গজ স্বচ্ছ জলের ব্যবধান গড়ে উঠেছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে নেমে এল কঠোর নিস্তব্ধতা। পরক্ষণেই ভীত জানোয়ারের বিশ্রী কাতর আর্তনাদের প্রবল ঘূর্ণি জেগে উঠে ঝাপ্‌টার মতো বর্ষিত হতে লাগল ফোমার উপরে। সব চাইতে উচ্চ জ্‌ভান্তজেভের তীক্ষ্ণ খন্‌খনে গলার তীব্র আর্তনাদ। ফোমার কানে তালা লেগে গেল।

বাঁচাও!

কে যেন—সম্ভবত গম্ভীর প্রকৃতি গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক হেঁড়ে গলায় গর্জে উঠল ঃ

ডুবিয়ে মারছে! ওরা জলে ডুবিয়ে মারছে মানুষ!

তোরা আবার মানুষ নাকি?—প্রত্যুত্তরে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে বলল ফোমা। ওদের আর্তনাদ যেন ওকে কামড়ে ধরেছে। ভয়ে পাগলের মতো ছোটাছুটি করছে লোকগুলো জেটির উপরে। ওদের পায়ের চাপে দুলতে দুলতে জেটিটা আরো দ্রুত ভেসে চলে যাচ্ছে দূরে। বিক্ষুব্ধ জল জোরে জোরে আছড়ে পড়ছে জেটির গায়ে। আর্ত চিৎকারে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে বাতাস। হাত তুলে লাফাতে শুরু করে দিয়েছে লোকগুলো। কেবলমাত্র সাশার ঋজু দেহ অচঞ্চল। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে জেটির কিনারে।

কাঁকড়াগুলোকে গিয়ে আমার নমস্কার জানিও!—ওদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে উঠল ফোমা। ওরা যতই দূরে ভেসে যাচ্ছে ততই আনন্দে ভরে উঠছে ফোমার অন্তর।

ফোমা ইগনাতিচ্‌—শান্ত ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠল উখ্‌তিশ্চেভ,—দেখো, এটা কিন্তু মারাত্মক পরিহাস। আমি নালিশ করব তোমার নামে।

জলের তলায় গিয়ে? তা বেশ করো নালিশ—উৎফুল্ল কণ্ঠে জবাব দিল ফোমা।

তুমি একটা খুনে!—কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠল জ্‌ভান্তজেভ। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে শোনা গেল কী যেন একটা পড়ল ঝুপ্‌ করে। বুঝি-বা ভয়ে বিস্ময়ে গর্জে উঠল জল। চমকে উঠল ফোমা। ওর সর্বাঙ্গ ছেয়ে জেগে উঠল এক

তড়িৎ শিহরণ। যেন মুহূর্তে পাথর হয়ে গেল ফোমা। সঙ্গে সঙ্গেই জেগে উঠল নারীকণ্ঠে কান-ফাটানো তীক্ষ্ম চিৎকারের সঙ্গে ভয়ার্ত পুরুষের আর্তনাদ, যেন জমে পাথর হয়ে গেছে জেটির উপরের মানুষগুলো। অপলক দৃষ্টিতে জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফোমার মনে হল সে-ও যেন অমনি প্রস্তরিভূত হয়ে গেছে। উদ্‌বেলিত জলরাশির ভিতর থেকে কী যেন একটা কালো বস্তু ভেসে আসছে ওর দিকে। মুহূর্তে নিজের অজ্ঞাতেই—হয়তো-বা সংস্কারবশেই ফোমা জেটির উপরে বুকের ভর দিয়ে জলের দিকে মাথা নুইয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। কেটে গেল কয়েকটি বোবা মুহূর্ত। দুখানা ঠাণ্ডা ভিজে হাত এসে ওর গলা জড়িয়ে ধরল। পরক্ষণেই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল দুটো কালো চোখ। এতক্ষণে বুঝল ফোমা—সাশা।

যে বোবা ভীতির কম্পন ওকে ফেলেছিল অসাড় করে তা যেন মুহূর্তে উবে গেল। পরিবর্তে এক অনাবিল আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল ওর অন্তর। সাশাকে জল থেকে টেনে তুলে তার কোমর জড়িয়ে ধরে বুকের ভিতরে টেনে আনল ফোমা। তারপর কী বলবে ভেবে উঠতে না পেরে বিস্ময়ভরা অপলক দৃষ্টি মেলে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

শীতে জমে গেছি।—কোমল মৃদু কণ্ঠে বলে উঠল সাশা। ওর সর্বাঙ্গ কাঁপছে।

সাশার গলার স্বরে আনন্দে হেসে উঠল ফোমা। পরক্ষণেই হাত বাড়িয়ে দুহাতে ওকে বুকে তুলে নিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতেই জেটি ছেড়ে তীরে নেমে এল।

সাশার সর্বাঙ্গ ভেজা, ঠাণ্ডা। কিন্তু ওর উত্তপ্ত নিঃশ্বাস যেন ফোমার গাল দুটোকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। জেগে উঠেছে ওর বুক এক অনির্বচনীয় আনন্দের ঢেউ।

আমায় ডুবিয়ে মারতে চেয়েছিলে তুমি?—দুহাতে শক্ত করে ফোমাকে আঁকড়ে ধরে বলল সাশা।—কিন্তু বড্ডো তাড়াতাড়ি—একটু অপেক্ষা করো।

কিন্তু কী চমৎকার কাজটিই না করলে তুমি!—ছুটে চলতে চলতে বলল ফোমা।

তুমি চমৎকার! বীরপুরুষ! যদিও তোমার উদ্‌ভাবিত কৌশলটা একটু খারাপ আর তোমাকে দেখতে শান্তশিষ্ট নিরীহ ভালো মানুষটি!

এখনো ওরা সেখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে, হাঃ হাঃ!

জাহান্নামে যাক! কিন্তু যদি ডুবে মরে, আমাদের নির্বাসনে পাঠাবে সাইবেরিয়ায়।—বলল সাশা। একই সঙ্গে যেন সে ওকে সান্ত্বনা আর উৎসাহ দিতে প্রয়াস পাচ্ছে। কাঁপতে শুরু করেছে সাশা। ওর দেহের কম্পন প্রেরণা জোগাল ফোমাকে আরো দ্রুত ছুটে চলতে।

নদীর বুক থেকে ভেসে আসছে কান্নাভরা সাহায্যের করুণ আর্তনাদ। নিস্তরঙ্গ জলের বুকে ঘনায়মান সন্ধ্যার আবছা আলোকে একটি দ্বীপ চলেছে ভেসে। ভেসে চলেছে তীর থেকে নদীর মূল স্রোতের দিকে। আর ঐ ক্ষুদ্র দ্বীপের উপরে গুটিকয়েক মানুষের কালো মূর্তি ছুটোছুটি করে ফিরছে।

ধীরে নেমে আসছে রাত্রির কালো ছায়া।

১

এক রবিবার সন্ধ্যেয় ইয়াকভ তারাশভিচ মায়াকিন বাগানে বসে চা খেতে খেতে মেয়ের সঙ্গে গল্প করছিল। শার্টের কলার খোলা। গলায় তোয়ালে জড়ানো। একটা চেরী গাছের ছায়ায় বেঞ্চের উপরে বসে হাত দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে চলেছে।

যে লোকের পেটটাই সর্বস্ব, সে মূর্খ পাজী। খাওয়ার চাইতে বড়ো কি কিছুই নেই দুনিয়ায়? কী নিয়ে তুমি লোকসমাজে অহঙ্কার করবে যদি শুয়োরের মতো গেলাটাই মুখ্য বস্তু হয়ে ওঠে?

নিদারুণ বিরক্তি ও ক্রোধে চোখদুটো চকচক করছে। ঘৃণায় বেঁকে উঠেছে ঠোঁট। মেঘাচ্ছন্ন মুখের বলিরেখাগুলো কাঁপছে থর থর করে।

ফোমা যদি আমার নিজের ছেলে হত, ওকে একটা মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলতাম।

একটা ঝিকরগাছের ডাল হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে লিউবভ শুনছিল বসে বাবার কথা। থেকে থেকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছিল বাবার উত্তেজনা-ভরা কম্পিত মুখের দিকে। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজ্ঞাতেই বাবার প্রতি ওর সন্দিগ্ধ ও নির্লিপ্ত মনোভাবের হয়েছে পরিবর্তন। তার কথার ভিতর এখন যেন ও পাচ্ছে ওর পড়া বইয়ের ভাবধারা। আর তারই ফলে ওর অন্তর আপনা থেকেই ঝুঁকে পড়েছে বাবার দিকে। বই-এর শুক্‌নো পাতার চাইতে বাবার জীবন্ত কথাগুলো যেন ঢের বেশি পছন্দ হচ্ছে লিউবার। সব সময়েই ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ডুবে থাকেন। সব দিক থেকেই সচেতন চতুর। তিনি তাঁর নিজের পথে চলেছেন একা। লিউবা অনুভব করল তাঁর নিঃসঙ্গ একাকিত্ব। জেনেছে সে ঐ বেদনাভরা একাকিত্বের অসহনীয়তা। তাই বাবার প্রতি ওর অন্তর ক্রমেই দ্রবীভূত হয়ে উঠতে লাগল।

কখনো কখনো তর্ক করে লিউবা বাবার সঙ্গে। ওর মন্তব্যে অবজ্ঞা প্রকাশ করে বৃদ্ধ—বিদ্রূপ করে। কিন্তু তার চাইতেও ঢের বেশি সময় শোনে মনোযোগ দিয়ে, পরম স্নেহের সঙ্গে।

যদি মৃত ইগনাত খবরের কাগজ পড়তে পেত তবে খুন করে ফেলত ফোমাকে। কী নোংরা জীবনই না যাপন করছে তার ছেলে!—টেবিল চাপড়ে বলে উঠল মায়াকিন। কী সব লিখেছে! লজ্জাকর!

ওর মতো লোকের পক্ষে সেটাই উচিত হয়েছে।—প্রত্যুত্তরে বলল লিউবভ।

অবশ্য আমি বলছি না যে লিখেছে যা-খুশি তাই। যতটুকু দরকার ছিল ততটুকু গাল-ই দিয়েছে। কিন্তু কে সে লোকটা যে এতটা ঝাল ঝাড়ল?

যেই হোক না কেন, তাতে তোমার কী এল গেল?—বলল লিউবা।

জানা দরকার। কী অদ্ভুত চাতুর্যের সঙ্গে বর্ণনা করেছে ফোমার ব্যাপার? নিশ্চয়ই সেও ছিল ওর সঙ্গে আর নিজের চোখেই দেখেছে নোংরামিগুলো।

না না, কখ্খনো সে ফোমার সঙ্গে ফুর্তি উড়াতে যায়নি—যাবেও না কখনো! —দৃঢ়কণ্ঠে বলল লিউবভ। পরক্ষণেই বাবার সন্ধানী দৃষ্টির সামনে নিদারুণ লজ্জায় সঙ্কোচে লাল হয়ে উঠল।

তাই বল! বেশ চমৎকার বন্ধু জুটেছে তো তোর!—পরিহাসভরা তিক্তকণ্ঠে বলল মায়াকিন।

বেশ, বেশ, কে লিখেছে বল তো?

কেন জানতে চাইছ বাবা?

নে, এখন বল দেখি!

ওর আদৌ ইচ্ছে নেই যে বলে। কিন্তু দারুণ পীড়াপীড়ি করতে লাগল ওর বাবা। ক্রমেই তার কণ্ঠ রুক্ষ, ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল। অবশেষে একান্ত অস্বস্তি-ভরা কণ্ঠে বলল লিউবা :

এর জন্যে তুমি তার কোনো অনিষ্ট করবে না বলো?

আমি? আমি তার মাথাটা চিবিয়ে খাবো। মূর্খ। কী ক্ষতি করতে পারি আমি তার? ওরা—ঐ লেখকরা আদৌ মূর্খ নয়। তাই তারা একটা শক্তি,—হাঁ একটা শক্তি ঐ শয়তানগুলো। তাছাড়া আমি গভর্নর নই। অবশ্য তাঁরও এক্তিয়ার নেই কারুর হাত ভেঙে দেয়ার, কি জিভ কেটে নেয়ার। ইঁদুরের মতো ওরা আমাদের একটু একটু করে কুরে কুরে খায়। আর আমাদেরও মারতে হয় ওদের বিষ দিয়ে। দেশলাই জেলে নয়, টাকা দিয়ে। হাঁ। ভালো কথা বল তো কে?

মনে আছে তোমার, আমি যখন স্কুলে পড়তাম একটা কলেজের ছেলে প্রায়ই আসত আমাদের বাড়ি? ইয়ঝভ—সেই কালো বেঁটেখাটো ছেলেটি।

হুঁ, নিশ্চয়ই মনে আছে। দেখেছি তাকে। চিনি। তাহলে সেই লোকটাই? ব্যাটা নেংটি ইঁদুর। সেই সময়ে দেখেই বোঝা যেত যে একদিন ওর দ্বারা খুবই অনিষ্ট সংঘটিত হবে। সেই বয়েস থেকেই ও লোকের পিছনে লাগতে শুরু করেছে। খুব তুখোড় ছেলে। তখনই আমার উচিত ছিল ওর দিকে নজর দেয়া। হয়তো একটা মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলতে পারতাম।

বাবার মুখের দিকে তাকাল লিউবভ। তারপর একটু বিদ্বেষভরা তিক্ত হাসি হেসে বলল :

তুমি কি বলতে চাও যারা সংবাদপত্রে লেখে তারা মানুষ নয়?

কন্যার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বহুক্ষণ পর্যন্ত বৃদ্ধ চুপ করেই রইল। চিন্তা-গম্ভীর মুখে আঙুল দিয়ে টেবিলের উপরে টোকা দিচ্ছে। পালিশ-করা উজ্জ্বল সামোভারের গায়ে প্রতিবিম্বিত নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে। অবশেষে এক সময়ে মাথা তুলে চোখ মুখ কুঁচকে বিরক্তিভরা দৃঢ়কণ্ঠে বলল :

ওরা মানুষ নয়, পচা ঘা। রুশিয়ার মানুষের রক্ত সংমিশ্রিত হয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর ঐ সব কু-রক্ত থেকে সৃষ্টি হচ্ছে বই আর সংবাদপত্রের লেখক—ঐ সাংঘাতিক, ফারিসি, ইহুদির দল। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে ওরা। এখনও পড়ছে, আরো বেশি সংখ্যায়। কোত্থেকে আসছে এই খারাপ রক্ত? গতির মন্দা থেকে। যেখান থেকে জন্মায় মশা। জলাভূমি থেকে। সব রকমের নোংরা জমে স্রোতবিহীন জলে। উচ্ছৃঙ্খল বিকৃত জীবন সম্পর্কেও ঐ একই কথা সত্য।

না, ওটা সত্যি নয় বাবা।—মৃদুকণ্ঠে বলল লিউবভ।
তার মানে? কী বলতে চাস তুই, ঠিক নয়?
লেখকরা হচ্ছে সব চাইতে নিঃস্বার্থ। ওরা মহৎ। কিছুই চায় না ওরা। সত্য-ই ওদের একমাত্র কাম্য। ওরা মশা নয়।
গ্রন্থের লেখকদের প্রশংসা করতে করতে লিউবা উত্তেজিত হয়ে উঠল। মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এমন আবেগভরা দৃষ্টি মেলে সে তার বাবার মুখের দিকে তাকাল যেন তাকে বোঝাতে না পেরে মিনতি করছে ওর কথা বিশ্বাস করতে।
অ্যাঁ, থাম তুই!—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বৃদ্ধ ওকে থামিয়ে দিলে।
বড্ডো বেশি পড়েছিস। বিষাক্ত হয়ে গেছিস। আচ্ছা বল দেখি আমাকে, কে ওরা? কেউ জানে না। ঐ ইয়ঝভ—কী তার পেশা? একমাত্র ভগবানই জানেন তা। ওরা শুধু চায়—সত্য? এই বলতে চাস তুই? উঃ কী নিরহঙ্কার সরল লোক ওরা! মনে করিস সত্য-ই হচ্ছে একমাত্র প্রিয় ওদের কাছে? বোধহয় নীরবে সবাই তারই সাধনা করছে। বিশ্বাস কর আমার কথা—মানুষ কখনো নিঃস্বার্থ হতে পারে না। যে জিনিস তার নয়, তার জন্যে মানুষ সংগ্রাম করে না। যদি করে তবে সে বোকা। তার দ্বারা জগতে কারুর কোনো উপকার হয় না। মানুষকে সমর্থ হতে হবে তার নিজের জন্যে দাঁড়াতে। তবেই সে অর্জন করতে পারে সাফল্য। এখানে...এই দেখ, সত্য! আজ চল্লিশ বছর ধরে আমি খবরের কাগজ পড়ে আসছি। খুব ভালো করেই দেখেছি আমি। এই তোর চোখের সামনেই রয়েছে আমার মুখখানা। আর আমার সামনের ঐ সামোভারের গায়েও আমারই মুখে প্রতিচ্ছায়া। কিন্তু এ আর-একখানা মুখ। দেখবি খবরের কাগজে সব কিছুরই ছবি দেয়—কিন্তু তা ঐ সামোভারের মুখের মতোই। প্রকৃত বস্তু দেখতে পায় না। আর তবু কিনা তুই বিশ্বাস করছিস। দেখতে পাচ্ছিস সামোভারের গায়ে আমার যে মুখের ছায়া পড়েছে সেটা বিকৃত। প্রকৃত সত্য যে কি, কেউ তা বলতে পারে না। মানুষের কণ্ঠ বড়োই দুর্বল এ ব্যাপারে। তাছাড়া প্রকৃত সত্য কারুরই জানা নেই।
বাবা!—ব্যথাভরা কণ্ঠে ডেকে উঠল লিউবা।—কিন্তু বই কি সংবাদপত্র সমস্ত মানুষের সাধারণ স্বার্থই সংরক্ষণ করে।
বেশ, বল দেখি, কোন কাগজে লিখেছে যে তুই জীবনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিস? তোর এখন বিয়ে হওয়া দরকার? তাহলে তোর স্বার্থ সংরক্ষিত হয়নি বল! কী বলিস? কিংবা আমার স্বার্থও না।
আমি তোমার যুক্তি খণ্ডন করতে পারছি না সত্য, কিন্তু মনেপ্রাণে অনুভব করছি, কথাটা ঠিক নয়।—বলল লিউবভ।
ঠিক।—দৃঢ়কণ্ঠে বলল বৃদ্ধ।—সমগ্র রুশিয়া আজ সংশয়াচ্ছন্ন। এর ভিতরে কিছুই স্থির, কিছুই অচঞ্চল নয়। সব কিছুই টলায়মান। দোদুল্যমান। সবাই চলেছে বাঁকা পথে, তির্যক গতিতে। সবাই চলেছে একই পথে। জীবনে নেই কোনো "হারমনি", নেই সংহতি। সবাই চিৎকার করছে বিভিন্ন সুরে, বিভিন্ন কণ্ঠে। একজন বোঝে না আর একজন কী চায়, কী তার প্রয়োজন। সবকিছু ঘিরে কুয়াশার ঘন আবরণ। সবাই সেই কুয়াশার নিঃশ্বাস নিচ্ছে। তাই সবার রক্তই দুষ্ট হয়ে গেছে—বিষাক্ত হয়ে গেছে। আর সেই জন্যেই এই পচন—এই ঘা। যুক্তিকে বড়ো বেশি স্বাধীনতা দিচ্ছে মানুষ। কিন্তু দিচ্ছে না কাজ করবার স্বাধীনতা। তাই মানুষ পারছে না বাঁচতে। পচছে—দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

তাহলে কী করা উচিত মানুষের?—টেবিলের উপর কনুইয়ের ভর রেখে ঝুঁকে প্রশ্ন করল লিউবভ।

সব কিছু।—উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল বৃদ্ধ,—করো সব কিছু। এগিয়ে চলো! প্রত্যেকটি মানুষ যে যা জানে সে তাই করুক। কিন্তু তার জন্যে তাকে স্বাধীনতা দিতে হবে। পূর্ণ স্বাধীনতা। এখন এমন একটা যুগ এসেছে যখন যে-কোনো কাঁচা বয়সের তরুণই মনে করে,—আর শুধু মনেই করে না, বিশ্বাস করে যে সে সব কিছুই জেনে বসে আছে, আর জীবনকে সংগঠিত করার জন্যেই তার জন্ম, দাও না তাকে অবাধ স্বাধীনতা। এসো—চালাও, বাঁচো। এসো না! বাঁচো! আঃ: তারপরে দেখবে এমন একটা নাটক শুরু হয়ে গেছে! যখন বুঝবে লাগাম খুলে গেছে! তখন লাফালাফি করতে শুরু করে দেবে, আর পালকের মতো এধার-ওধার উড়তে থাকবে হাওয়ায়! নিজেকে মনে করবে একটা কর্মঠ—করিতকর্মা লোক আর তখনই দেখতে পাবে তার সত্যিকারের শক্তি কতটুকু।—বলতে বলতে বৃদ্ধ একটু থামল। তারপর গলা নিচু করে একটু বিদ্বেষভরা শয়তানি হাসি হেসে বলতে আরম্ভ করল :

কিন্তু তেমন সৃজন-শক্তি খুব সামান্যই আছে তাদের ভিতরে। দু'চার দিন খুব লাফালাফি করবে; ছোটাছুটি করবে এদিক ওদিক চতুর্দিক। তারপর সেই হতভাগ্য ক্রমেই আসবে নিস্তেজ হয়ে। কারণ, ওর হৃদয় পচন-ধরা। হিঃ হিঃ হিঃ! তারপর—হিঃ হিঃ হিঃ! তারপর সেই মহাশয় ব্যক্তি এসে পড়বে সত্যিকারের উপযুক্ত মানুষের খপ্পরে। সত্যিকারের মানুষ—যারা প্রকৃত নাগরিক জীবনের প্রভুত্ব করতে জানে। যারা জানে জীবন সংগঠিত করতে—লাঠি দিয়ে নয়, কলম দিয়ে নয়,—মস্তিষ্ক দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে।—বলতে বলতে কণ্ঠস্বর চড়িয়ে কর্তৃত্বভরা সুরে তার বক্তৃতা শেষ করল মায়াকিন।

কী? কী বলবে তারা? বলবে, তুমি শ্রান্ত হয়ে পড়েছ মশাই? তোমার প্লীহা সত্যিকারের আগুন সহ্য করতে পারে না। পারে কি? সুতরাং—। বেশ, বেশ, তাহলে এখন ওরে ছোটলোকের দল, মুখ বুজে থাক্! আর গজর গজর করিস না। যদি করিস, তবে গাছ ধরে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে যেমন পোকা দূর করে তেমনি করেই তোদের দূর করে দেবো দুনিয়ার বুক থেকে। চুপ করে থাকুন এখন ভদ্রমহোদয়েরা! হাঃ হাঃ হাঃ! এই হবে শেষ পর্যন্ত—এই হতে চলেছে লিউবভকা! হিঃ হিঃ হিঃ!

দারুণ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে বৃদ্ধ। থেকে থেকে ওর মুখের বলিরেখাগুলি উঠছে কেঁপে কেঁপে। পরক্ষণেই আবার কথার তোড়ে যাচ্ছে ভেসে। বৃদ্ধ কাঁপছে। থেকে থেকে চোখ বুজছে। ঠোঁট চাটছে শব্দ করে। যেন সে তার নিজের বুদ্ধির আস্বাদ গ্রহণ করছে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে।

তারপর, যারা ঐ সংশয়ের ভিতর দিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবে, বুদ্ধিমানের মতো সংগঠিত করে তুলবে জীবন তাদের মতো করে, তখন কিছুই আর চলবে না বিশৃঙ্খল ভাবে। বরং চলবে আপসে—তোতা পাখির মুখস্থ বুলির মতো।

বৃদ্ধের কথাগুলো যেন একটা বিরাট শক্ত জালের ফাঁসের মতো এসে পড়তে লাগল লিউবভের গায়ে। যতই পড়ছে ততই ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। কিছুতেই সে কঠিন ফাঁস থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না পেরে তরুণী স্তব্ধ হয়ে রয়েছে বসে। বাবার কথায় ধাঁধিয়ে হকচকিয়ে গিয়ে তীব্র দৃষ্টি মেলে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে লিউবভ ঐ কথার ভিতরে খুঁজে ফিরছে সমর্থন। যেন শুনতে

পাচ্ছে ওর পড়া বইয়ের অনুরূপ কথা। আর মনে হতে লাগল—কথাগুলো সত্য। কিন্তু ওর বাবার জয়ের অট্টহাসি যেন ওর অন্তরে হুল ফুটিয়ে দিতে লাগল। তাঁর মুখের উপরের বলিরেখাগুলো যেন কতগুলো কালো সাপের মতো মুখময় কিলবিল করে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ওর অন্তর থেকে এক নিদারুণ ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে এল। কল্পনায় যা ভেবেছিল সহজ সরল, তা যেন সম্পূর্ণ উল্‌টে গেল।

বাবা!—হঠাৎ অতি অপ্রত্যাশিতভাবেই একটা অদম্য কৌতূহল জেগে উঠল ওর অন্তরে। প্রশ্ন করল লিউবা ঃ

আচ্ছা বাবা, তোমার মতে কী ধরনের মানুষ তারাস?

চমকে উঠল মায়াকিন। রাগে নেচে উঠল চোখের দুটো ভ্রূ। তারপর কুত্‌কুতে দুটো চোখের তীক্ষ্ন দৃষ্টি কন্যার মুখের উপর নিবদ্ধ করে শুক্‌নো গলায় বলল ঃ

এ ধরনের কথার মানে?

কেন, তার নামও কি মুখে আনা যাবে না?—সংশয়জড়িত মৃদুকণ্ঠে বলল লিউবভ।

কোনো কথাই বলতে চাই না আমি তার সম্পর্কে। আর তোকেও বলে দিচ্ছি, তুইও বলবি না তার কথা।—তর্জনী তুলে শাসানোর ভঙ্গিতে বলল বৃদ্ধ লিউবাকে। তারপর ভ্রূ কুঁচকে মাথা নিচু করল।

কিন্তু যখন সে বলল, 'তার সম্পর্কে কোনো কথা আমি বলতে চাই না'—তখন সে নিজেও ভালো করে বুঝে উঠতে পারেনি। কেননা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে পরমুহূর্তেই ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল ঃ

তারাসকা—সে একটা পচা ঘা। জীবনের নিঃশ্বাস বর্ষিত হচ্ছে তোর উপরে। আর তুই কোন্‌টা প্রকৃত সুবাস তার পার্থক্য বুঝতে না পেরে সব রকমের নোংরাই গলাধঃকরণ করিস। তাই তোর মাথায় এত সব বাজে চিন্তা ঢুকে বসেছে। তার মানে, কোনো কাজেরই যোগ্য নোস তুই। আর ঐ অযোগ্যতার জন্যে তুই অসুখী। তারাস্‌কা—হাঁ, তার বয়েস এখন চল্লিশের উপরে। আমার কাছে এখন সে মৃতেরই সামিল। ঘানি টানা!—ঐ কি আমার ছেলে? থ্যাবড়া নাক শুয়োর! একটা কথাও বলত না সে তার বাপের সংগে। আর—।—বলতে বলতে মায়াকিন যেন হোঁচট খেল।

কী করেছে সে?—বৃদ্ধের কথায় উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করল লিউবা।

কে জানে? এমনও হতে পারে যে, এখনও সে বুঝতে পারছে না নিজেকে। যদি বুদ্ধিমান হত—নিশ্চয়ই ওর উচিত ছিল বুদ্ধিমান হওয়া। এমন বাপের ছেলে যে নাকি আদৌ বোকা নয়। তাছাড়া কম কষ্টও তো পায়নি! ওরা প্রশ্রয় দিয়েছে তাদের—ঐ নিহিলিস্টগুলোকে। উচিত ছিল ওদের আমার হাতে ফিরিয়ে দেওয়া। দেখিয়ে দিতাম কী করতে হয় ওদেরকে। মরুভূমিতে! নির্জন স্থানে. —মার্চ! এসো বাছাধনেরা! পণ্ডিত ভদ্রলোকেরা! এসো, তোমাদের খুশিমতো জীবন গড়ে তোল সেখানে। যাও—এগিয়ে চলো! আর কর্তা হিসাবে ওদের উপরে রেখে দিতাম জোয়ান চাষীদের। ভালো কথা মহামান্য ভদ্রলোকেরা! তোমাদের খাওয়ানো হয়েছে, পরানো হয়েছে, লেখাপড়া শেখানো হয়েছে, কিন্তু কী শিখেছ? অনুগ্রহ করে তোমাদের দেনাটি শোধ করে যাও। হাঁ, একটা ফুটো পয়সাও ওদের জন্যে খরচ করতে রাজী নই আমি। সবটুকু দান নিঙড়ে বের করে নিতাম। দাও—দিয়ে দাও! তুমি কাউকে জড়িয়ে ফেলতে পারো না! ওদের

জেলে দেওয়াটাই যথেষ্ট নয়! আইন-শৃঙ্খল ভেঙেছ তুমি,—তুমি কি ভদ্রলোক? ভেবো না, তোমাকে কাজ করতে হবে। একটা ক্ষুদ্র বীজ থেকে এক শিষ ধান পাওয়া যায়। মানুষ তো মিছামিছি অব্যবহৃত হয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে না! একটা মিতব্যয়ী ছুতোর প্রত্যেক টুকরো কাঠকেই তার উপযুক্ত ব্যবহার করে থাকে। তেমনি প্রত্যেক মানুষকেই ব্যবহার করতে হয় লাভজনক কাজে। আর ব্যবহার করতে হয় তার শেষ রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত। সংসারে প্রতিটি বাজে জিনিসেরও স্থান আছে। আর মানুষ তো আর বাজে জিনিস না। হুঁ, শক্তি যখন যুক্তি ছাড়া থাকে, তখন সেটা খারাপ। কিন্তু যখন কেবল যুক্তি থাকে শক্তি ছাড়া, সেটাও ভালো নয়। ঐ ফোমাকেই ধরো না কেন? দেখ তো কে আসছে?

ঘুরে দাঁড়াল লিউবা। দেখল, "ইয়েরমাক"-এর ক্যাপটেন ইয়েফিম আসছে এগিয়ে বাগানের পথ ধরে। সসম্ভ্রমে মাথার টুপি খুলে লিউবাকে অভিবাদন জানাল। ওর চোখে মুখে ফুটে উঠেছে নিদারুণ অপরাধী ভাব। যেন সে দারুণ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। ইয়াকভ তারাশভিচ চিনল তাকে। সঙ্গে সঙ্গেই চিৎকার করে উঠে জিগ্‌গেস করল ঃ

কোথা থেকে আসছ? কী ঘটেছে?

আমি—আমি এলাম আপনার কাছে।—মাথা নুইয়ে নমস্কার করে টেবিলের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল ইয়েফিম।

তা তো আমি দেখতেই পাচ্ছি যে তুমি এসেছ। কিন্তু ব্যাপার কী? স্টিমার কোথায়?

ওখানে।—হাত দিয়ে কোনো এক দিক দেখিয়ে সশব্দে পা বদল করে দাঁড়াল।

সে শয়তানটা কোথায়? ঠিক করে বল, কী হয়েছে?—ক্রুদ্ধকণ্ঠে চিৎকার করে প্রশ্ন করল বৃদ্ধ।

এ'জ্ঞে একটা দুর্ঘটনা—ইয়াকভ...

ডুবে গেছে জাহাজ?

না। ভগবান রক্ষা করেছেন!

পুড়ে গেছে? বল জলদি!

একটা নিঃশ্বাস টেনে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল ইয়েফিম ঃ

ন' নম্বর গাধাবোটখানা ডুবে গেছে—ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। একটা লোকের পিঠ ভেঙে গেছে। একজন নিখোঁজ। মনে হচ্ছে ডুবে মরেছে। প্রায় জনা পাঁচেক আহত। অবশ্য আঘাত খুব বেশি নয়। যদিও কেউ কেউ কাজকর্মে অসমর্থ হয়ে পড়েছে।

তা-ই!—জড়িত কণ্ঠে বলল মায়াকিন। একটা ভীতিজনক দৃষ্টি মেলে ওর আপাদমস্তক দেখতে লাগল।

শোনো ইয়েফিম! আমি তোমার গায়ের চামড়া খুলে নেবো।

আমি কিছু করিনি।—প্রত্যুত্তরে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল ইয়েফিম।

তুমি করোনি?—রাগে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে উঠল মায়াকিন,—কে করেছে তবে?

মালিক নিজে।

ফোমা? আর তুমি—তুমি কোথায় ছিলে?

জাহাজের খোলের পথের উপরে শুয়ে ছিলাম।

অ্যাঁ! শুয়ে ছিলে?

কণ্ঠে গেয়েছিল ঃ

তাই বলি ভাই যদিন পারি
বেঁচে নি মনের সুখে
তারপরে—বুঝিবা ঘাসটিও আর
জন্মাবে না ধরার বুকে

সমস্ত মানুষ যেন ওর-ই মতো হিংস্র—ওর-ই মতো পাশবিক হয়ে উঠেছে। যেন ওর-ই মতো এক অন্ধকার উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে আবর্জনার মতো ভেসে চলেছে। সমস্ত মানুষ বুঝিবা ওর ই মতো ভয় পাচ্ছে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখতে যে, ঐ অমিত শক্তিশালী হিংস্র, ক্রুদ্ধ, উত্তাল তরঙ্গ কোথায় তাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। তাই ওদের সেই আতঙ্ক মদের ফেনায় ডুবিয়ে দিয়ে উদ্দামভাবে ছুটে চলেছে স্রোতের সঙ্গে। আছাড়ে-পিছাড়ি করছে! চিৎকার করছে। নির্বোধের মতো করছে যত অসম্ভব অর্থহীন কাজ—হৈ-হল্লা। কিন্তু এতটুকুও আনন্দ পাচ্ছে না। ওদের ভিতরে ঘুরে ঘুরে ফোমা নিজেও করছে তাই-ই। আর এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, নিজের অন্তরে জেগে-ওঠা ঐ আতঙ্কের জন্যেই করছে সে এসব। যত শীঘ্র সম্ভব জীবনের সীমারেখা অতিক্রম করে যাওয়া যায় তারই প্রচেষ্টায়। যাতে করে না ভাবতে হয়, ভবিষ্যতে কী হবে।

পানোৎসবের ঐ উত্তপ্ত কোলাহলের ভিতরে উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ত কাম-লালসায় বিভ্রান্ত—নিজেদের ভুলে থাকার অত্যুগ্র কামনায় অর্ধোন্মাদ, ঐ মানুষগুলোর ভিতরে একমাত্র সাশা রয়েছে স্থির, শান্ত, সমাহিত। পান করে কখনো মাতাল হয়ে পড়ে না সাশা। সব সময়েই কথা বলে দৃঢ় কর্তৃত্বভরা কণ্ঠে। ওর সমস্ত ভাবভঙ্গি এমন দৃঢ় প্রত্যয়ভরা যেন ঐ স্রোত পারেনি ওকে গ্রাস করতে। বরং নিজেই যেন সে ঐ উন্মত্ত গতির উপরে করছে প্রভুত্ব বিস্তার। ফোমার মনে হল যারা রয়েছে ওকে ঘিরে—মদ খাচ্ছে, হল্লা করছে, তাদের ভিতরে সবচাইতে বুদ্ধিমতী হচ্ছে সাশা। সবাইকে সে শাসন করে। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবন করে। আর একই প্রভুত্বব্যঞ্জক সুরে কথা বলে সকলের সঙ্গে। কোচোয়ান, মোসাহেব, লস্কর, সবার সঙ্গেই ওর কথা বলার ধরন ঐ একই রকম—যে সুরে কথা বলে সে তার নিজের বন্ধুদের সঙ্গে, ফোমার সঙ্গে। পেলাগিয়ার চাইতেও বয়েস ওর কম। আরো বেশি সুন্দরী। কিন্তু ওর আলিঙ্গন ঠাণ্ডা—বোবা। ফোমার মনে হয় সবার চোখের আড়ালে ওর অন্তরের অন্তস্তলে ভয়ঙ্কর কী যেন কিছু একটা লুকিয়ে রেখেছে। যেন সে ভালোবাসে না কাউকেই—কারুর কাছেই নিজেকে ধরা দেয় না সম্পূর্ণভাবে। ঐ নারীর অন্তরের গোপন রহস্যজাল যেন দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছে ফোমাকে। ওর শান্ত ঠাণ্ডা আত্মার সম্পর্কে জাগিয়ে তুলেছে এক বিরাট কৌতূহল। ফোমার মনে হয় ওর অন্তর গভীর কালো দুটি চোখের মতোই অতল—অন্ধকারাচ্ছন্ন।

একদিন ফোমা ওকে বলল ঃ কী পরিমাণ টাকাটাই না উড়োলাম—তুমি আর আমি!

সাশা ফোমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল ঃ টাকা জমাব-ই বা কেন?

সত্যিই তো কেন?—অবাক বিস্ময়ে ভাবল ফোমা।—কী সহজ সরল যুক্তি।

কে তুমি?—আর একদিন ওকে প্রশ্ন করেছিল ফোমা।

কেন, তুমি কি ভুলে গেছ নাকি আমাকে?

বাঃ! কী কথা!

তবে কী জানতে চাও?

তোমার বংশ-পরিচয় জানতে চাই আমি।

ওঃ! আমি ইয়ারোস্লাভল প্রদেশের লোক। আমার বাড়ি উগলিচ্। আগে ছিলাম বাঁশকর। আমি কে, কী, জেনে কি আরো মিষ্টি লাগছে নাকি?

জানলাম কি?—হাসতে হাসতে বলল ফোমা।

যেটুকু জানলে সেটুকু-ই কি যথেষ্ট নয়? এর চাইতে বেশি আর কিছু বলব না তোমাকে। কিসের জন্যে বলব? আমরা সবাই এসেছি একই জায়গা থেকে—মানুষ-পশু সব। নিজের সম্পর্কে কী আর আছে আমার যা বলতে পারি তোমাকে? আর বলব কিসের জন্যে? কোনো মানে নেই এসব কথার। বরং দিনটা কি করে কাটানো যায় এসো সে সম্পর্কে একটু ভাবি।

সেদিন একটা অর্কেস্ট্রা পার্টি নিয়ে স্টিমারে করে ওরা বেরিয়েছিল জলভ্রমণে। উড়ল প্রচুর শ্যাম্পেন। দারুণ মাতাল হয়ে পড়েছে সবাই। অদ্ভুত করুণ সুরে সাশা গেয়েছিল গান। ওর গানে এতটা বিচলিত হয়ে পড়েছিল ফোমা যে শিশুর মতো কাঁদতে শুরু করে দিয়েছিল। তারপর নেচেছিল সাশার সঙ্গে 'রুশ-নৃত্য'। অবশেষে কাপড়-জামাশুদ্ধই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জলে। সেদিন আর-একটু হলেই ডুবে মরেছিল।

এই মুহূর্তে সেদিনের কথা, আরো অনেক কিছু মনে পড়ে নিজের কাছেই লজ্জা পেল ফোমা। সঙ্গে সঙ্গে দারুণ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল সাশার উপরে।

সাশার যৌবন-পরিপূর্ণ সুগঠিত দেহের পানে তাকাল। শুনল তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। অনুভব করল, সে ঐ নারীকে ভালোবাসেনি। সম্পূর্ণ অনাবশ্যক সে ওর কাছে। কেমন যেন এক অসহনীয় ধূসর চিন্তা জেগে উঠল ওর যন্ত্রণায় ভারি-হয়ে-ওঠা মাথার ভিতরে। মনে হল যে-জীবন সে এতদিন ধরে যাপন করে এসেছে তা সবকিছুই যেন তালগোল পাকিয়ে একটা ভারি ভিজে বলের মতো হয়ে উঠেছে। আর সেই ভারি বলটা এই মুহূর্তে যেন ওর বুকের ভিতরে গড়িয়ে খুলছে আর সরু দড়ি দিয়ে কষে বাঁধছে।

এ কী হচ্ছে আমার ভিতরে?—ভাবল ফোমা।—আমি কি মাতলামি শুরু করে দিয়েছি? কেন? জানি না কেমন করে বেঁচে থাকতে হয়। বুঝি না আমি নিজেকে। কে আমি?

এই প্রশ্নে বিস্মিত হয়ে গেল ফোমা। ভাবতে লাগল, নিজের কাছেই প্রশ্নটাকে পরিষ্কার করতে। কেন সে অন্যের মতো দৃঢ়তার সঙ্গে পারে না জীবনযাপন করতে? এখন এই মুহূর্তে আরো বেশি করে অনুভব করছে বিবেকের দংশন। এই চিন্তায় অস্বস্তি অনুভব করছে আরো বেশি। বিরক্ত হয়ে উঠেছে। বিছানার উপরে এপাশ ওপাশ করতে করতে কনুইয়ের খোঁচা দিল সাশার গায়ে।

সাবধান!—ঘুমজড়িত চোখে বলে উঠল সাশা।

ঠিক আছে। এমন একজন মহামান্যা ভদ্রমহিলা নও তুমি!—বিড় বিড় করে বলল ফোমা।

কী হল তোমার?

কিছু না।

পাশ ফিরে শুলো সাশা। তারপর ফোমার দিকে একটা অলস দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জড়িত কণ্ঠে বলল :

স্বপ্ন দেখলাম যেন আবার আমি হয়েছি বীণা-বাদিকা। একা একা একটা জলে

গাইছি। আমার সামনে দাঁড়িয়ে মস্ত বড়ো একটা নোংরা কুকুর। গর্জন করতে করতে অপেক্ষা করছে আমার গান শেষ হওয়ার। দারুণ ভয় পেয়ে গেছি আমি কুকুরটাকে দেখে। বুঝেছি, যে মুহূর্তে আমি গান শেষ করব—সেই মুহূর্তেই কুকুরটা আমাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। তাই আমি গান গেয়েই চলেছি। হঠাৎ আমার মনে হল গলায় স্বর ফুটছে না। কী ভীষণ! অমনি কুকুরটাও দাঁত বের করল। হে ঈশ্বর, দয়া করো! আচ্ছা বলতে পারো, এর অর্থ কি?

বাজে গপ্প থামাও!—ধমকে উঠল ফোমা। তার চাইতে বলো দেখি কী জানো আমার সম্পর্কে?

তোমার সম্পর্কে জানি, এই ধরো যেমন—তুমি জেগে উঠেছ ঘুম ভেঙে।—ফোমার দিকে না তাকিয়েই জবাব দিল সাশা।

জেগে উঠেছি? সত্যি কথা?—চিন্তিত মুখে বলে উঠল ফোমা। তারপর হাতের উপরে মাথার ভর রেখে বলতে লাগল :

তাই জিগ্‌গেস করছিলাম তোমাকে। আচ্ছা আমি কেমন লোক? কী মনে হয় তোমার?

একটা মানুষ, মদ খাওয়ার জন্যে মাথাধরায় কষ্ট পাচ্ছে।—আড়চোখে তাকিয়ে জবাব দিল সাশা।

আলেকসান্দ্রা!—মিনতিভরা কণ্ঠে বলে উঠল ফোমা,—বাজে বকো না, সত্যি করে বলো, কী ভাবো তুমি আমার সম্পর্কে?

কিছুই ভাবি না আমি।—শুকনো কণ্ঠে জবাব দিল সাশা,—কেন বাজে বকে বকে আমাকে আমাকে বিরক্ত করছ।

এটা কি বাজে বকা হল?—দুঃখিত মনে বলল ফোমা। ওঃ! শয়তানি! এটাই হচ্ছে মুখ্য কথা—সব চাইতে প্রয়োজনীয় কথা আমার কাছে।—একটা গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছেড়ে চুপ করে রইল ফোমা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সাশা তার স্বভাবসুলভ নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল :

ও কে, তাই বলতে হবে ওকে! কিন্তু এমন কেন? এমনটি দেখেছ কি কখনো? একথা আমাদের মতো মেয়েমানুষের কাছে কেউ আবার জিগ্‌গেস করে নাকি? তাছাড়া কেন আমি প্রত্যেকটি মানুষ সম্পর্কে ভাবতে যাবো? বলে, নিজের কথা ভাববারই সময় নেই আমার! আর বোধহয় ওসব ভাবনা চিন্তা আসেও না আমার।

একটু শুষ্ক হাসি হাসল ফোমা।

আমি যদি অমনটি হতে পারতাম! যদি কোনো কিছু সম্পর্কেই কোনো কামনা না থাকত আমার!

বালিশের উপরে মাথা তুলে সাশা ফোমার মুখের দিকে তাকাল; পরক্ষণেই আবার শুয়ে পড়ল।

তুমি বড্ডো ভাবো। দেখে নিও, এতে আদৌ তোমার কোনো ভালো হবে না। কিছুই আমি বলতে পারি না তোমার সম্পর্কে। কোনো পুরুষের সম্পর্কেই সত্যি করে কিছু বলা অসম্ভব। কে পারে তাদের বুঝতে! তবুও আমি বলছি—তুমি অন্য লোকের চাইতে ভালো। কিন্তু তাতে কি এল গেল?

কী হিসেবে আমি ভালো?—গম্ভীর চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করল ফোমা।

কী হিসেবে? যখন কেউ সত্যিকারের ভালো গান করে, তোমার চোখে জল আসে। যখন কেউ নোংরা কিছু করে, তুমি তাকে ধরে পেটো। মেয়েদের সঙ্গে

তোমার ব্যবহার অকপট। নির্লজ্জ বেহায়াপনা করো না তুমি। তুমি শান্তিপ্রিয়। আবার দুর্দান্তও হয়ে ওঠো কখনো কখনো।

বুঝলাম। কিন্তু আমি যা জানতে চাই সেই সঠিক কথাটাই বলছ না তুমি।—মৃদুকণ্ঠে বলল ফোমা।

আমি জানি না কী তুমি চাও। কিন্তু শোনো, বোট তোলা হয়ে গেলে কী করব আমরা?

কী আবার করব?—বলল ফোমা।

নিঝনি কি কাজানে যাচ্ছি কি আমরা?

কিসের জন্যে?

ফুর্তি করতে।

আর ফুর্তি করতে চাই না আমি।

তাছাড়া আর কি করবে তুমি?

কী? কিছু না।

বটে!

দুজনেই বহুক্ষণ চুপ করে রইল। কেউ কারুর দিকে তাকালও না।

তোমার স্বভাবটা দারুণ বিরক্তিকর—বলল সাশা,—দারুণ ক্লান্তিকর।

সে যাই হোক মদ আর স্পর্শ করছি না আমি।—দৃঢ়কণ্ঠে বলল ফোমা।

মিথ্যা কথা বলছ।—প্রত্যুত্তরে শান্তকণ্ঠে খোঁচা দিয়ে বলল সাশা।

দেখে নিও। কী মনে করো তুমি? যেমন চলেছি এমনিভাবে জীবন কাটানোই কি ভালো?

দেখে নেবো।

না, সত্যি করে বলো, এটা কি ভালো?

কিন্তু এর চাইতে কোন্‌টা ভালো?

প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে ফোমা ওর মুখের দিকে তাকাল। দারুণ বিরক্ত হয়ে উঠল মনে মনে।

কী বিরক্তিকর তোমার কথাবার্তা!

এই দেখো, আবার পারলাম না আমি ওকে খুশি করতে!—মৃদু হাসতে হাসতে বলল সাশা।

কী চমৎকার দল!—বলল ফোমা। তীব্র ব্যথায় কুঁচকে উঠল মুখ।—ওরা যেন এক একটা গাছ। তবুও বেঁচে আছে। কেমন করে বেঁচে থাকে ওরা? কেউ জানে না তা। কোথায় যেন চলেছে হামাগুড়ি দিয়ে। কিন্তু, না নিজের কাছে, না অপরের কাছে তার কোনো জবাবদিহি করতে পারে। একটা আরশুলা যখন চলে হামাগুড়ি দিয়ে, সেও জানে কেন আর কোথায় সে যেতে চায়। কিন্তু তোমরা? কোথায় চলেছ তোমরা?

থামো!—ওকে বাধা দিয়ে শান্তকণ্ঠে বলল সাশা,—কেন লাগছ আমার পিছনে? তোমার যা খুশি নাও, কিন্তু আমার অন্তরের ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করো না।

তোমার অন্তরে!—টেনে টেনে বলল ফোমা। ওর কণ্ঠে বেজে উঠল ঘৃণার সুর।—কোন্‌ অন্তরের ভিতরে? হিঃ হিঃ!

ঘরের ভিতরে ইতস্তত ছড়ানো জামা-কাপড় গুছিয়ে নিতে নিতে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল সাশা। ফোমা দেখতে লাগল। দারুণ বিরক্ত হয়ে উঠেছে মনে মনে এই দেখে যে, ওর অন্তর সম্পর্কে অমন করে বলায়ও চটে উঠল না সাশা।

সাশার মুখখানা শান্ত, নিস্পৃহ, নির্বিকার। কিন্তু ফোমা চাইছিল ওকে ক্রুদ্ধ আহত দেখতে। মানবোচিত কিছু একটা দেখতে চেয়েছিল ওর ভিতরে।

অন্তর!—ওর সে উদ্দেশ্য সফল করার অভিপ্রায়ে আবার বলতে আরম্ভ করল, —যার ভিতরে অন্তর আছে, সে কি তোমার মতো জীবনযাপন করতে পারে?

অন্তরের ভিতরে থাকে আগুন। তা জ্বলে ভিতরে ভিতরে। লজ্জা বলে একটা বস্তু থাকে তার ভিতরে।

একটা বেঞ্চের উপরে বসে পায়ে মোজা পরছিল সাশা। এতক্ষণে মুখ তুলে তীব্র দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তাকাচ্ছ কেন অমন করে?—প্রশ্ন করল ফোমা।

ও ভাবে কথা বলছ কেন তুমি?—ফোমার মুখের উপর থেকে চোখ না নামিয়েই পাল্টা প্রশ্ন করল সাশা।

বলব, আমার খুশি।

দেখো—বলবে তুমি, সত্যি?—ওর প্রশ্নের ভিতরে কেমন যেন মূর্ত হয়ে উঠল একটা শাসানোর সুর।

কেমন যেন একটু ভয় পেল ফোমা। কোনোরকমের খোঁচা না দিয়ে সহজভাবেই বলল : না বলে কি করি বল?

বটে! তুমি!—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল সাশা। তারপর আবার পোশাক পরতে আরম্ভ করল।

কী আমি ?

কিছু না। এমনি। মনে হয় তুমি দুবাপের জন্ম। জানো মানুষের ভিতরে আমি কী লক্ষ্য করেছি?

কী?

মানুষ যখন তার নিজের কাজের জবাবদিহি করতে পারে না, তার অর্থ হয় এই যে সে নিজেকেই ভয় করে। তার মানে, তার মূল্য কানাকড়ি।

একথা কি আমার সম্পর্কে বলছ?—একটু থেমে প্রশ্ন করল ফোমা।

তোমার সম্পর্কেও।

একটা লাল প্রভাতী পোশাক মাথা দিয়ে গলিয়ে দিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পায়ের তলায় শায়িত ফোমার দিকে হাত বাড়িয়ে গম্ভীর মৃদুকণ্ঠে বলল সাশা :

আমার অন্তর সম্পর্কে কথা বলার কোনো অধিকার নেই তোমার। কোনো প্রয়োজনও নেই। সুতরাং মুখ সামলে কথা বলো। আমিও বলতে পারি। ইচ্ছে করলে তোমাদের সবাইকে বলতে পারি। কেমন করে বলব! শুধু—যদি আমি চিৎকার করে বলি, কার সাহস আছে সেকথা শুনবে? অনেক কিছু বলবার মতো আছে তোমাদের সম্পর্কে। সেগুলো তখন হাতুড়ির ঘা-এর মতো পড়বে। আর তোমাদের মাথা এমনভাবে গুঁড়িয়ে যাবে যে খেপে উঠবে। যদিও তোমরা সবাই পাজী, তোমাদের তো আর শোধরানো যাবে না! তোমাদের পুড়তে হবে আগুনে যেমন করে কড়া আগুনে পোড়ায় লেন্ট-এর সোমবার।

হঠাৎ হাত তুলে সাশা চুল খুলে ফেলল। ঘন কালো গোছায় ছড়িয়ে পড়ল পিঠময়। তারপর ঘৃণাভরা ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বলতে শুরু করল :

ভেবো না আমি উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করছি। অনেক সময়ে দেখা যায় যে মানুষ নোংরা পাঁকের ভিতরে বাস করছে। কিন্তু সিল্কের পোশাক পরা লোকের চাইতে সে অনেক পবিত্র। যদি জানতে, তোমাদের সম্পর্কে আমি কী ভাবি!

কুকুরের দল। তোমাদের প্রতি কী নিদারুণ বিদ্বেষই না জ্বলছে আমার অন্তরে! আর এই বিদ্বেষ—এই ক্রোধের জন্যেই আমি থাকি চুপ করে। ভয় হয়, একবার যদি সে গান গেয়ে ফেলি তোমাদের কাছে—অন্তর আমার শূন্য হয়ে যাবে। বেঁচে থাকার কোনো অবলম্বনই আর আমার থাকবে না।

ফোমা ওর মুখের দিকে তাকাল। এতক্ষণে সে খুশি হয়ে উঠেছে সাশার কথার ভিতরে পেয়েছে সে তার নিজের অন্তরের ভাবধারার প্রতিচ্ছায়া। আনন্দোজ্জ্বল মুখে হাসতে হাসতে খুশি-ঝরা কণ্ঠে বলল ঃ

আমিও অনুভব করছি—কী যেন জেগে উঠেছে আমার অন্তরে। যখন সময় আসবে আমারও বলবার থাকবে অনেক কিছু।

কার বিরুদ্ধে?—প্রশ্ন করল সাশা একান্ত অসতর্কভাবে।

আমার? সবার বিরুদ্ধে।—লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করল ফোমা ঃ মিথ্যার বিরুদ্ধে। আমি জিগ্‌গেস করব—

জিগ্‌গেস করো দেখি সামোভার তৈরি হয়েছে কিনা।—একান্ত নির্বিকার চিত্তে হুকুম করল সাশা।

জাহান্নামে যাও। নিজে জিগ্‌গেস করো গে।—ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ফোমা।

বেশ, ভালো কথা। নিজেই জিগ্‌গেস করছি গে। তা বলে অমন ঘেউ ঘেউ করে বেড়াচ্ছ কেন?—বলতে বলতে সাশা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

তীব্র কন্‌কনে বাতাস নদীর বুকে ঝাপটা মেরে মেরে উদ্দাম বেগে বয়ে চলেছে। বিক্ষুব্ধ কালো কালো ঢেউরাশি ক্রুদ্ধ গর্জনে ফুঁসে উঠছে বাতাসের দিকে। নুয়ে নুয়ে পড়ছে তীরের উইলো ঝোপ—মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। কাঁপতে কাঁপতে কখনো-বা পড়ছে নুয়ে, পরক্ষণেই আবার যেন বাতাসের ঘায়ে ভয় পেয়ে আসছে সরে। বাতাসে জেগে উঠছে ক্রুদ্ধ গোঙানির সঙ্গে কাতর কাতরানি আর হিস্‌ হিস্‌ শব্দ। যেন বহু মানুষের বুকের ভিতর থেকে ফেটে আসছে বেরিয়ে।

চলেছে! চলেছে! চলেছে!

ঐ অতর্কিত হর্ষধ্বনি আঘাতের মতো—এক বিরাট বুকের ভিতর থেকে জেগে ওঠা ভারি নিঃশ্বাসের মতো, শ্রান্তিতে অবরুদ্ধ-হয়ে-আসা নদীর উপরে পড়ছে ছড়িয়ে। ছড়িয়ে পড়ছে ঢেউয়ের উপরে। বুঝিবা ঝড়ের সঙ্গে ওদের খেলায় দিচ্ছে উৎসাহ। আর ঢেউগুলি তাদের সবটুকু শক্তি দিয়ে আছড়ে পড়ে তীরের উপরে হানছে আঘাত।

পাহাড়ী তীরে নোঙর করা দুটো খালি গাধাবোট। উঁচু মাস্তুল দুটো ঊর্ধ্ব আকাশের পানে মাথা তুলে কী এক অদৃশ্য চিত্র-লেখা এঁকে চলেছে শূন্যে।

দুটো গাধাবোটের পাটাতনের উপরেই বাদামি রঙের কড়ি-বরগায় তৈরি মঞ্চ। সর্বত্র ঝুলছে বড়ো বড়ো কপিকল। সেগুলোর সঙ্গে কাছি আর শিকল বাঁধা। গোড়াগুলো মৃদু শব্দে বাজছে ঝন্‌ ঝন্‌ করে নীল আর লাল জামা-পরা একদল চাষী ডেকের উপর দিয়ে একটা ভারি বীম টেনে নিয়ে চলেছে। জেগে উঠছে তাদের পায়ের শব্দ। বুকের সবটুকু শক্তি দিয়ে ওরা চিৎকার করে উঠছে ঃ

হেই চল্‌ল জোয়ান হেই ও!

মঞ্চের এখানে সেখানে মানুষের মূর্তিগুলো যেন বড়ো বড়ো লাল নীল স্তূপের মতো তালগোল পাকিয়ে ঝুলে রয়েছে। হাওয়ায় উড়ছে তাদের গায়ের জামা, পরনের ট্রাউজার। অদ্ভুত দেখাচ্ছে মানুষগুলোকে। কখনো মনে হচ্ছে কুঁজো,

কখনো-বা বেলুনের মতো ফোলা, ফাঁপানো। ডেক ও মঞ্চের উপরের লোকগুলো বাঁধা-ছাঁদা করছে, কাটছে, করাত করছে, পেরেক ঠুকছে। সর্বত্র দেখা যাচ্ছে ওদের আস্তিন গোটানো বিশাল বাহু। বাতাসে কাঠের টুকরোগুলি দিচ্ছে ছড়িয়ে। আর ছড়িয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন সুরের চঞ্চল দ্রুতশব্দ। করাত কুরে কুরে কাটছে কাঠ—শয়তানি আনন্দের চাপা হাসি উঠছে গুমরে। কুড়ুলের ঘায়ে শুকনো কণ্ঠে কাতরে উঠছে কড়ি-বরগা। আঘাতের ঘায়ে শীর্ণ রুগ্ন স্বরে গোঙিয়ে উঠে তক্তাগুলো পড়ছে ভেঙে। বিদ্বেষভরা কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠছে ছুতোর। শিকলের লোহার ঝন্‌ঝনানি আর কপিকলের চাকার কড় কড় শব্দ, হিংস্র তরঙ্গ-গর্জনের সঙ্গে মিশছে। নদীর বুকের উপরে কর্ম-কোলাহল ছড়িয়ে দিয়ে মেঘগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে জেগে উঠছে বাতাসের ক্রুদ্ধ গর্জন.

মিশ্‌কা! জাহান্নামে যা—

মঞ্চের উপর থেকে কে যেন চিৎকার করে বলে উঠল। আর ডেকের উপর থেকে বিশাল দেহ এক চাষী উপরের দিকে মুখ তুলে জবাব দিল ঃ

কী?—বাতাসে ওর লম্বা দাড়ির গোছা উড়িয়ে এনে চোখ মুখ ঢেকে দিচ্ছে।

দড়ির গোড়ার দিকটা আমার হাতে দে।

একটা গম্ভীর কথা-বলা-চোঙের মতো গর্জে উঠল ঃ

কেমন করে তক্তা বেঁধেছিস চোখ মেলে দেখেছিস রে অন্ধ শয়তান! চোখে দেখতে পাস না নাকি? তোর চোখদুটো গেলে দেবোখন!

টানো হে ছোকরারা!—উচ্চ কণ্ঠে কে যেন চিৎকার করে উঠল।

সুন্দর পরিপাটি পরিচ্ছদে সুসজ্জিত ফোমা একটা খাটো ঝুলের জামা আর উঁচু বুট পরে মাস্তুলের গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে। কম্পিত হাতে দড়িগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে প্রশংসমান দৃষ্টি মেলে দেখছে চাষীদের দুঃসাহসী কাজ। ওকে ঘিরে কর্মকোলাহল এক দুর্নিবার ইচ্ছে জাগিয়ে তুলল ওর অন্তরে। ইচ্ছে হল, চাষীদের সঙ্গে মিশে অমনি করে চিৎকার করতে করতে করে কাজ। অমনি করে কাঠ কাটে, বোঝা বয়, হুকুম করে। প্রত্যেকটি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ওর দিকে। আর ওদের দেখায় ওর শক্তি, নৈপুণ্য আর অন্তরের অনাবিল উচ্ছল প্রাণ-প্রাচুর্য। কিন্তু সে ইচ্ছে দমন করল। তেমনি নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কেমন যেন এক নিদারুণ লজ্জা—কিসের যেন এক ভীতি জেগে উঠল ওর অন্তর আচ্ছন্ন করে। এই চিন্তাই ওকে বিরক্ত করে তুলল যে, এখানেও ও মালিক—সবার মনিব। যদি নিজে ফোমা কাজ করতে শুরু করে দেয় ওদের সঙ্গে, কেউ বিশ্বাস করবে না একথা যে ও কাজ করছে শুধু ওর নিজের ইচ্ছেরই বশবর্তী হয়ে। কেবলমাত্র আত্মসন্তুষ্টির জন্যে। ওদের উপরে কাজ করার চাপ দেয়ার জন্যে নয়। তাছাড়া ঐ চাষীরা উপহাসও করতে পারে ওকে। তরাও সম্ভাবনা আছে।

গলার বোতাম খোলা একটা শার্ট গায়ে সুন্দর চেহারার কোঁকড়া চুল একটি লোক কখনো-বা কাঠ কাঁধে বয়ে, কখনো-বা কুড়ুল হাতে বার বার যাওয়া আসা করছিল ওর সামনে দিয়ে। ছাগলছানার মতো চলছিল লাফিয়ে লাফিয়ে চারদিকে খুশি-ভরা হাসি ঠাট্টার ঝড় তুলে। কখনো গাল পাড়ছে দারুণভাবে আর অক্লান্তভাবে করে চলেছে কাজ। একে সাহায্য করছে কখনো, কখনো সাহায্য করছে ওকে আর একান্ত নিপুণতার সঙ্গে কাঠ, মঞ্চ প্রভৃতির বাধা কাটিয়ে ডেকের উপর দিয়ে করছে চলাফেরা। তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে ফোমা ওকে দেখতে লাগল। ঐ হাসি খুশি চঞ্চল

মানুষটি যেন কি এক স্বাস্থ্য সমুজ্জ্বল উন্মাদনায় ভরপুর। দেখে দেখে ওর মনে হিংসা হতে লাগল।

নিশ্চয়ই ও সুখী।—মনে মনে ভাবল ফোমা। পরক্ষণেই ওকে অপমান করে খেপিয়ে দেবার এক অদম্য স্পৃহা জেগে উঠল ওর মনে। ফোমাকে ঘিরে সমস্ত মানুষ কর্মোন্মাদনায় মত্ত। ক্ষিপ্র হাতে বাঁধছে মঞ্চ, ঠিক করছে পুলি। ব্যবস্থা করেছে নদীর তলা থেকে ডুবন্ত গাধাবোটটাকে টেনে তুলতে। সবাই খুশি, সবাই স্বাস্থ্যে, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। আর ও কিনা একা একা—এক পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওদের থেকে দূরে। জানে না কী করবে। এই বিরাট কর্মচাঞ্চল্যের ভিতরে একান্ত অনাবশ্যক মনে হচ্ছে নিজেকে। মনে মনে দারুণ বিরক্ত হয়ে উঠল ফোমা। অনুভব করল এই সব লোকজনের ভিতরে ও সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। যতই ভাবতে লাগল ততই ওর বিরক্তি আরো বেড়ে যেতে লাগল। সব চাইতে এই চিন্তাটাই শূলের মতো বিঁধে যেতে লাগল ওর অন্তরে যে, এ সমস্ত কিছুই হচ্ছে ওর জন্যে, আর তবুও ও নিজে কিনা এখানে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

তা হলে স্থান কোথায় আমার?—ভারাক্রান্ত মনে ভাবল ফোমা।—কোথায় আমার কাজ? আমি তবে পঙ্গু—একটা অকর্মণ্য লোক! ওদের মতোই রয়েছে আমার দেহে শক্তি। কিন্তু তার প্রয়োজনীয়তা কী আমার কাছে?

জেগে উঠল শিকলের ঝন্‌ঝনানি। পুলির কড়কড়ে আর্তনাদ। কুড়ুলের ঘায়ের শব্দ নদীর বুকে প্রতিধ্বনি তুলে ফিরতে লাগল। ঢেউয়ের দোলায় দুলে উঠল গাধাবোট। কিন্তু ফোমার মনে হল, গাধাবোট ওর পায়ের তলায় ঢেউয়ের দোলায় দুলে ওঠেনি, দুলে উঠেছে ও নিজে। কারণ, কোথাও দাঁড়াতে পারছে না ফোমা দৃঢ় হয়ে। দৃঢ় হয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার শক্তি নেই ওর এতটুকুও।

ঠিকাদার—বেঁটেখাটো একটি চাষী। মুখে ধূসর রঙের ছুঁচলা একটু দাড়ি। বলি-কুঞ্চিত মুখের উপরে কুতকুতে দুটো চোখ। ফোমার কাছে এগিয়ে এসে বললঃ

সবকিছুই প্রস্তুত, সবকিছুই তৈরি—ফোমা ইগনাতিচ্! এবার ভগবানের নাম নিয়ে কাজ শুরু করলেই হয়।—উচ্চকণ্ঠে নয় কিন্তু প্রত্যেকটি কথায় একটু বিশেষ জোর দিয়ে সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে বলছিল কথা।

বেশ, তবে শুরু করে দাও।—সংক্ষেপে জবাব দিয়েই ফোমা ওর কুত্‌কুতে চোখের সন্ধানী দৃষ্টির সামনে থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

হে ঈশ্বর! তোমাকে ধন্যবাদ!—কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে ভারিক্কি চালে বলে উঠল ঠিকাদার। তারপর ধীরে মুখ ঘুরিয়ে চারিদিকের মঞ্চগুলো ভালো-ভাবে দেখে নিয়ে হঠাৎ রিন্‌রিনে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বলে উঠল ঃ

নিজরে নিজের জায়গায় দাঁড়াও ছেলেরা!

ডেকের উপরের ইতস্তত দাঁড়ানো চাষীরা সঙ্গে সঙ্গে চরকি-কলগুলোকে ঘিরে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দুপাশে দাঁড়াল। থেমে গেছে ওদের কথাবার্তা। কেউ কেউ একান্ত নিপুণতার সঙ্গে মঞ্চের উপরে উঠে গিয়ে দড়ি ধরে নীরবে নিচের দিকে তাকিয়ে রইল।

শোনো ছেলেরা!—আবার বেজে উঠল ঠিকাদারের রিন্‌রিনে কণ্ঠস্বর।—সব ঠিক আছে কিনা ভালো করে দেখে শুনে নাও! বিয়োবার সময় মেয়েদের আর জামা সেলাই করার সময় থাকে না। আচ্ছা, এবার ভগবানের নাম স্মরণ করো!

মাথার টুপিটা খুলে ডেকের উপরে ছুঁড়ে দিয়ে ঠিকাদার আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল তারপর ক্রুশ করল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চাষী মেঘমেদুর আকাশের

দিকে তাকিয়ে হাত দুলিয়ে বুকের উপরে আঁকল ক্রুশ-চিহ্ন। কেউ কেউ উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা করতে শুরু করল। ঢেউয়ের গর্জনের সংগে মিশে জেগে উঠল একটা গম্ভীর মর্মর ধ্বনি।

হে প্রভু! আশীর্বাদ করো! পবিত্র কুমারী মেরীমাতা! সেন্ট নিকোলাস!

ফোমা শুনতে লাগল ওদের প্রার্থনার বাণী। এক নিদারুণ বোঝার মতো সে বাণী যেন ওর অন্তরে আছড়ে পড়তে লাগল। সবার মাথা খালি। কেবল ফোমা ভুলে গেছে তার নিজের মাথা থেকে টুপি খুলতে। প্রার্থনা শেষে ইশারায় ঠিকাদার বলল ফোমাকে ঃ

আপনারও উচিত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা।

নিজের কাজ করো। আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না।—ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলল ফোমা। যতই কাজ এগুতে লাগল ততই বেদনাভরা বিরক্তিতে ওর অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। অনুভব করল ঐ কর্মরত মানুষ-গুলির ভিতরে ও একান্ত অবান্তর। কী শান্ত দৃঢ়তা ও আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ ঐ মানুষগুলো! বহু হাজার পাউন্ডের একটা ভারি বস্তুকে নদীর তলা থেকে টেনে তোলার জন্যে হয়েছে প্রস্তুত। ওর ইচ্ছে হল, ওরা যেন অকৃতকার্য হয়। অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে ওর সামনে নিজেদের অক্ষমতার জন্যে। সংগে সংগে একটা দুষ্ট চিন্তা জেগে উঠল ফোমার মনে ঃ

হয়তো শিকলটা ছিঁড়ে যাবে।

ঠিক হয়ে দাঁড়াও ছেলেরা!—চিৎকার করে বলে উঠল ঠিকাদার।—এক সংগে সবাই হাত লাগাও! ভগবান আমাদের সহায়।

হঠাৎ মুষ্ঠিবদ্ধ হাত উপরে তুলে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ঠিকাদার ঃ

ছেড়ে দাও!

শ্রমিকেরা শ্রমক্লান্ত উত্তেজনাভরা কণ্ঠে ওর কণ্ঠ মিলিয়ে এক সংগে বলে উঠল ঃ

চলল! নড়েছে!

কড়্‌কড় করে উঠল কপিকলের চাকা। ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে উঠল শিকল। চাকার হাতলে বুক দিকে ভারি পায়ে শব্দ তুলে চিৎকার করতে লাগল মজুরেরা। চলকে উঠল গাধাবোট-দুটোর মাঝখানের ঢেউ—যেন ঐ কর্মরত লোকগুলোকে তাদের শ্রমের পুরস্কার দিতে একান্ত অনিচ্ছুক। ফোমাকে ঘিরে দড়ি, কাছি, শিকল। ভারে কেঁপে কেঁপে উঠছে। একটা ধূসর বড় পোকার মতো সেগুলো যেন ওর পায়ের তলায় সরসর করতে করতে হামাগুড়ি দিয়ে কোথাও চলে যাচ্ছে। সবকিছু শব্দ ছাপিয়ে জেগে উঠছে কর্মরত লোকগুলোর কান ফাটানো উচ্চ কোলাহল ঃ

চল্‌লে জোয়ান্‌ হেই ও!

জেগে উঠছে সমবেত কণ্ঠের বিজয়োল্লাস। কিন্তু ঠিকাদারদের তীব্র কণ্ঠ ঐ মিলিত কণ্ঠের গভীর ঢেউকে রুটির ভিতরে ধারালো ছুরির মতো খান খান করে দিচ্ছে ঃ একসংগে ছেলেরা! সবাই একসংগে!

এক অদ্ভুত উত্তেজনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল ফোমার মন। নদীর মতো প্রশস্ত, নদীর মতোই শক্তিশালী ঐ কর্মরত মানুষগুলোর সংগে এক হয়ে মিশে যাওয়ার এক অদম্য আগ্রহ জেগে উঠল ওর মনে। চাকার শব্দ, শিকলের ঝন্‌ঝন্‌, লোহালক্কড়ের ঠং ঠং শব্দের সংগে জলোচ্ছ্বাসের শব্দ মিশে একাকার হয়ে গেছে। ঐ অদম্য তীব্রতায় ফোমার মুখে কপালে দেখা দিয়েছে ঘর্মবিন্দু, নেমে আসছে অবিরল

ধারায়। প্রবল উত্তেজনায় পাংশু হয়ে উঠেছে মুখ। হঠাৎ মাস্তুলের গা থেকে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে দ্রুতপদে চাকার কাছে এগিয়ে এল।

একসঙ্গে! একসঙ্গে মিলে!—তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ফোমা। তারপর চাকার হাতলের কাছে এগিয়ে এসে দেহের সমস্ত শক্তি এক করে হাতলে বুক লাগিয়ে ঠেলতে শুরু করল। এতটুকুও ব্যথা অনুভব করছে না ফোমা। চিৎকার করতে করতে ডেকের উপরে পা আছড়ে আছড়ে হাতল ঠেলে চাকার চারপাশে ঘুরতে লাগল। চাকা ঘুরানোর সমস্ত কষ্ট, ক্লান্তি ডুবিয়ে দিয়ে কী এক অদম্য শক্তি জেগে উঠেছে ওর বুকের ভিতরে। দেহমন প্লাবিত করে জেগে উঠেছে অব্যক্ত আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাস। আর তারই অভিব্যক্তি বেরিয়ে আসছে উত্তেজনাভরা উচ্চ কণ্ঠের চিৎকারে। ফোমার মনে হল ওর একার শক্তিতেই ঘুরছে চাকা। উঠে আসছে ঐ গুরুভার। আর ক্রমেই যেন ওর শক্তি যাচ্ছে বেড়ে। মাথা নিচু করে ষাঁড়ের মতো ঝুঁকে পড়ে ঐ গুরুভার শক্তিকে, যা নাকি ওকে পিছু হটিয়ে দিচ্ছিল, করল পরাভূত। প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ওকে উত্তেজিত করে তুলতে লাগল। প্রত্যেকটি দুঃসহ প্রচেষ্টা নিদারুণ উদ্দমশীলতার জ্বলন্ত আবেগে ডুবিয়ে দিতে লাগল। মাথা ঘুরছে। রক্তের মতো লাল হয়ে উঠেছে চোখ। যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কেবলমাত্র অনুভব করছে যে ওর শক্তির কাছে পরাভব মানছে ঐ গুরুভার। ওর শক্তির কাছে শীঘ্রই পরাভব মানবে ঐ বিরাট বাধা যা নাকি আগলে রয়েছে ওর পথ। তারপর বিজয় আনন্দে ছাড়বে দীর্ঘশ্বাস। জীবনে প্রথম এই এক অমিত শক্তিময় আনন্দের অনুভূতির আস্বাদ পেল ফোমা। ওর সবটুকু শক্তি দিয়ে—পিপাসিত অন্তরের সবখানি আকুল তৃষ্ণা মিটিয়ে পান করতে লাগল ঐ অনির্বচনীয় আনন্দের ধারা। উন্মত্ত হয়ে উঠল ফোমা ঐ আনন্দের অনাবিলতায়, আর তারই অভিব্যক্তি জেগে উঠল ওর শ্রমিকদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে চিৎকারে।

চলল জোয়ান হেই-ও! চল্‌ল! শক্ত করে ধরো ছেলেরা! বেঁধে ফেলো! শক্ত করে!

বুকের উপর ধাক্কা দিয়ে কী যেন ওকে পিছনের দিকে হটিয়ে আনল।

সাফল্যের জন্যে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, ফোমা ইগনাতিচ্!—ফোমার কাছে এগিয়ে এসে ওকে অভিনন্দন জানাল ঠিকাদার। আনন্দের আভায় ওর মুখের বলিরেখাগুলো কাঁপছে।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন নিশ্চয়ই। ফোমার চোখে মুখে এসে লাগল ঠাণ্ডা বাতাস। ওকে ঘিরে জেগে উঠেছে আনন্দগুঞ্জন। পরস্পর পরস্পরকে করছে ঠাট্টা। হাসিভরা মুখে ফোমাকে ঘিরে এসে দাঁড়াল চাষীরা। ফোমার চোখে মুখে ফুটে উঠল অপ্রস্তুতের হাসি। তখনো প্রশমিত হয়নি ওর ভিতরে জেগে-ওঠা সেই উত্তেজনা। আর তারই ফলে বুঝে উঠতে পারছে না কী ঘটেছে—কেনই বা খুশিভরা আনন্দে ঐ লোকগুলো ওকে ঘিরে এসে দাঁড়িয়েছে।

খেতের মুলো তোলার মতো করে তুলে আনলাম কয়েক হাজার মণ ভারি জিনিসটাকে।—কে যেন বলে উঠল।

মনিবের কাছে আমরা একটু হুইস্কির আশা করি।

একতাল জড়ানো তারের উপর দাঁড়িয়ে ফোমা সবার মাথার উপর দিয়ে তাকিয়ে দেখল, দুটো গাধাবোটের মাঝখানে আর-একখানা গাধাবোট—পিচ্ছল, কালো, ভাঙাচোরা, আষ্টেপৃষ্ঠে শিকল জড়ানো। মনে হয় যেন এক ভয়ঙ্কর রোগে সর্বাঙ্গ ফুলে উঠেছে। কুৎসিত দেহে অসহায়ের মতো ওর সাথীদের দেহে ভর দিয়ে

[illegible] দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাস্তুলটা দাঁড়িয়ে আছে মধ্যখানে—ভাঙা, [illegible] [illegible]। মরচে-পড়া ডেকের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে জলস্রোত। রক্তের মতো লাল। লোহা, কাঠ আর দড়ি স্তূপ হয়ে পড়ে রয়েছে ডেকের উপরে।

তোলা হয়ে গেছে?—ঐ কুৎসিত-দর্শন ভারি কস্তুটার দিকে তাকিয়ে কি বলবে বুঝে উঠতে না পেরে প্রশ্ন করল ফোমা। পরক্ষণে এই ভেবে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল যে, ঐ কুৎসিত ভাঙাচোরা দৈত্যটাকে জলের তলা থেকে তুলতে ওর অন্তর অতখানি আনন্দে উদ্‌বেলিত হয়ে উঠেছিল।

গাধাবোটটার অবস্থা কী?—নির্লিপ্ত কণ্ঠে ঠিকাদারকে প্রশ্ন করল ফোমা।

মোটামুটি ভালোই। এক্ষুনি মাল খালাস করে ফেলব। তারপর জনা কুড়ির একটা ছুতোরের দল লাগিয়ে দেবো। অল্প সময়ের ভিতরেই মেরামত করে ফেলবে!—ফোমাকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে বলল ঠিকাদার।

পরক্ষণেই সেই হাল্‌কা রঙের চুলওয়ালা লোকটি খুশিমনে একগাল হেসে ফোমার কাছে এসে বলল :

আমরা কি একটু ভদ্‌কা পাবো?

তর সইছে না? সময় পেরিয়ে গেল?—রুক্ষকণ্ঠে ধমকে উঠল ঠিকাদার,—দেখছিস না ভদ্রলোক ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

চাষীরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে :

ঠিকই উনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

কাজটা তো আর খুব সোজা নয়।

নিশ্চয়ই, যার অভ্যেস নেই সে তো খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। বলে, অভ্যেস না থাকলে খিচুড়ি খেতেও কষ্ট লাগে।

না, না, আমি মোটেই ক্লান্ত হইনি—গম্ভীর মুখে বলল ফোমা। পবক্ষণেই শুনতে পেল চাষীদের সম্ভ্রমভরা মন্তব্য। আরো ঘন হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ওরা।

কাজ—বুঝলে কিনা, যে কাজ ভালোবাসে তার কাছে খুবই আনন্দের।

ঠিক যেন খেলার মতো।

ছুঁড়িদের সংগে ফষ্টি-নষ্টি করারই সামিল।

লাল চুলওয়ালা লোকটি কিন্তু তার নিজের প্রার্থনারই পুনরাবৃত্তি করল :

আমাদের জন্যে খানিকটা ভদ্‌কা আজ্ঞা হোক হুজুর! কি বলেন?—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে মৃদু হেসে বলল।

সামনের ঐ দাড়িওয়ালা লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে ফোমার ইচ্ছে হল, আচ্ছা করে বকুনি দেয়। কিন্তু কেন যেন সব কিছুই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে ওর মাথার ভিতরে। আদৌ কোনো চিন্তার লেশমাত্র নেই। কী বলছে সেদিকে খেয়ালমাত্র না করে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল :

দিনরাত মদ গিলতে পেলে আর তোরা কিছুই চাস না, না? কী করিস তাতে কিছুই এসে যায় না! ভেবে দেখা উচিত, কেন? কী উদ্দেশ্যে? বুঝেছিস?

ওকে ঘিরে যারা রয়েছে দাঁড়িয়ে—ঐ নীল, লাল জামা গায়ে দাড়িওয়ালা মানুষগুলো—ওদের চোখে মুখে ফুটে উঠল বিমূঢ় ভাব। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। কেউ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল, কেউ টান হয়ে দেহটাকে ছড়িয়ে দিল, কেউবা পা বদলাল। বাকি সবাই হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ফোমার মুখের দিকে।

হাঁ! হাঁ!—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল ঠিকাদার—তাতে ক্ষতি নেই কিছু।

মানে ঐ একটু চিন্তা করার—কেন আর কিসের জন্যে? এ সব হল গিয়ে জ্ঞানের কথা।

কাজ করার জন্যে আমাদের অত ভাবনা চিন্তা করার দরকার হয় না। যদি কাজ পাই তো করে যাই। আমাদের ব্যাপার খুবই সোজা। ঈশ্বরের ইচ্ছের যদি টাকা রোজগার হয় সব কিছু কাজই আমরা করতে পারি।

কিন্তু কোন্ কাজটা করা উচিত জানো?

ওর মুখে মুখে কথা বলায় বিরক্ত হয়ে উঠল ফোমা।

সব কাজই করা উচিত—এটা, ওটা, সেটা—সব।

কিন্তু তার অর্থ আছে কিছু?

আমাদের শ্রেণীর মানুষের সমস্ত কাজকর্মের ভিতরে একটিমাত্র মানেই আছে —যদি পেটের ভাত আর খাজনা দেবার টাকা রোজগার করতে পারে তবেই বেঁচে যায়। তারপর যদি কুলোয় তো মদ খাও।

অ্যাঁ, তোরা!—ঘৃণাভরা কণ্ঠে বলে উঠল ফোমা,—তোরাও কথা বলছিস! কী বুঝিস তোরা?

বোঝা-শোনা কি আমাদের কাজ?—নমস্কার করে বলল ফিকে রঙের চুলওয়ালা লোকটি। এতক্ষণ ফোমার সঙ্গে কথা বলতেই বিরক্তি লাগছিল ওর। মনে মনে ধারণা হয়েছিল যে ওদের ভদ্‌কা দিতে আদৌ ইচ্ছুক নয় ফোমা।

ঠিক কথা।—উপদেশভরা কণ্ঠে বলল ফোমা। মনে মনে খুশি হয়ে উঠল এই ভেবে যে, ওরা শেষ পর্যন্ত ওর কথা মেনে নিয়েছে। কিন্তু লোকটির মুখের উপরে ফুটে-ওঠা বিরক্তি বা বিদ্রুপের চিহ্নের উপরে ওর নজর পড়ল না।

মানে ঈশ্বরের জন্যে—চাষীদের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গভরে বলে উঠল ঠিকাদার। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ভক্তিপূর্ণ গদ গদ কণ্ঠে বলল ঃ

সত্যি কথা। ওঃ কী নিদারুণ সত্যি কথা।

এমন কিছু একটা কথার মতো কথা বলার জন্যে উদ্‌গ্রীব উঠল ফোমা যাতে করে ঐ লোকগুলি অন্য দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। কারণ মনে মনে দারুণ অসন্তুষ্ট হয়ে হয়ে উঠেছে এই দেখে যে কেবলমাত্র ঐ হাল্‌কা রঙের চুলওয়ালা লোকটি ছাড়া আর সবাই রয়েছে চুপ করে প্রশ্নভরা বিরস মুখে ওর মুখের দিকে ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

এমন কাজ করা উচিত,—ভ্রু নাচিয়ে বলল ফোমা,—যা আগামী হাজার বছরও লোকে স্মরণ করে রাখবে। বগোরদ্‌স্‌ক্‌-এর চাষীরা করেছিল বটে তেমন কাজ। হাঁ।

বিস্মিত দৃষ্টি মেলে পাতলা-চুল লোকটি ফোমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল ঃ

বোধহয় ভল্‌গার সবটুকু জল শুষে খেয়ে ফেলতে হবে আমাদের?—তারপর মাথা দুলিয়ে, নাক কুঁচকে বলল,— তা কিন্তু আমরা পারব না। তাহলে সবাই পেট ফেটে মরে যাবো।

লোকটির কথায় ফোমা যেন কেমন হকচকিয়ে গেল। চাষীরা ম্লান মুখে হাসল বিদ্রুপভরা মৃদুহাসি। আর ঐ হাসি তীক্ষ্ম কাঁটার মতো বিঁধলো গিয়ে ফোমার অন্তরে। পাকা চাপদাড়িওয়ালা বিশিষ্ট চেহারার একটি চাষী এতক্ষণ গম্ভীর মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল এক পাশে। সে হঠাৎ মুখ খুলে ফোমার কাছে এগিয়ে এসে ধীরে ধীরে বলল ঃ

যদি আমরা বদলে জলাধার জল শুষে খেয়েও ফেলি, কিংবা ঐ পাহাড়টাও খেয়ে ফেলি তাও লোক দুদিন পরে ভুলে যাবে, হুজুর। সব কিছুই ভুলে যাবে। জীবন অনেক বড়ো, দীর্ঘ। সে সব কাজ আমাদের জন্যে নয়—যা নাকি সবকিছু ছাড়িয়ে, সব কিছুর উপরে জেগে থাকবে। কিন্তু আমরা মণ্ড বাঁধতে পারি। তা খুব পারি।

বলতে বলতে লোকটি পায়ের তলায় থুতু ফেলল। তারপর যেমন করে করাত-চেরা গাছের ভিতরে গোঁজ ঢুকিয়ে দেয়, তেমনি করেই ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ফোমার কাছ থেকে সরে গিয়ে ভিড়ের ভিতরে মিশে গেল। ওর কথায় সম্পূর্ণ-ভাবে দমে গেল ফোমা। মনে হল ঐ চাষীদের চোখে ও একটা মূর্খ, বিরক্তিকর লোক হিসেবেই প্রতিপন্ন হয়েছে। পরক্ষণেই মনিব হিসেবে ওদের চোখে ওর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে—ওদের নিঃশেষিত মনোযোগ পুনরায় আকর্ষণ করতে যেন ছলছলিয়ে উঠল ফোমা। তারপর অদ্ভুত ভঙ্গিতে গাল ফুলিয়ে গম্ভীর ভারিক্কি গলায় ঘোষণা করল ঃ

তোমাদের কাজের পুরস্কার হিসেবে তিন জালা মদ দিচ্ছি তোমাদের।

কম কথা সব সময়েই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। তার প্রতিক্রিয়া গভীর ছাপ রাখে মানুষের মনে। শ্রদ্ধাবিগলিত অন্তরে চাষীরা ওর কাছ থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর মাথা নুইয়ে নমস্কার করে খুশি মনে কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে ওর বদান্যতার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে সমবেতকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল।

পারে পৌঁছে দাও আমাকে!—বলল ফোমা। অন্তরে অন্তরে অনুভব করল যে-উত্তেজনা এইমাত্র ওর মন ভরিয়ে তুলেছে তা দীর্ঘস্থায়ী নয়। একটা বিষাক্ত কীট যেন ওর অন্তর কুরে খাচ্ছে আর ওকে ক্লান্ত করে ফেলছে।

দারুণ বিশ্রী লাগছে আমার!—কুঁড়ে ঘরের ভিতরে ঢুকেই বলে উঠল ফোমা। গোলাপী রঙের একটা পোশাক পরে টেবিলে মদ ও খাবার সাজাচ্ছিল সাশা।

ভীষণ খারাপ লাগছে আলেক্‌সান্দ্রা! কিছু একটা করতে পারো?

নিবিড় দৃষ্টি মেলে সাশা ওর মুখের দিকে তাকাল। তারপর ওর গায়ের সঙ্গে গা মিশিয়ে বেঞ্চের উপরে এসে বসল।

যখন খারাপ লাগছে, তার মানে কিছু চাইছ তুমি। বলো তো কী চাই?

তা আমি জানি না।—ক্ষোভভরা কণ্ঠে মাথা নিচু করে বলল ফোমা।

ভালো করে ভেবে দেখো দেখি? খুঁজে দেখো নিজের অন্তরে।

ভাবতে পারছি না আমি। ভেবে ভেবে কূলকিনারা কিছুই পাচ্ছি না—কোনো হদিশই পাচ্ছি না।

হায় খোকন!—পরিহাসভরা মৃদুকণ্ঠে বলল সাশা, একটু দূরে সরে গিয়ে বসল ফোমার কাছ থেকে,—তোমার শরীরের ভিতরে মাথাটা হচ্ছে একটা বাড়তি জিনিস।

ওর কণ্ঠস্বরে ফুটে ওঠা অবজ্ঞাভরা পরিহাস, কিংবা ওর দূরে সরে গিয়ে বসা কিছুই লক্ষ্য করল না ফোমা। সামনের দিকে ঝুঁকে মেঝের উপরে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে শরীরটা দোলাতে দোলাতে বলতে লাগল ঃ

সবসময়ে ভাবি, খুব চিন্তা করি। সমস্ত অন্তরাত্মা সেই চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আলকাতরার মতো আটকে যায়। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার সবকিছু যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে। বিন্দুমাত্র নিদর্শনও থাকে না। তারপর সমস্ত অন্তরাত্মা জুড়ে নেমে আসে নিকষ অন্ধকার—যেন একটা অন্ধকার গহ্বর। স্যাঁৎসেতে শূন্যময় অন্ধকার,

যেন কিছু নেই তার ভিতরে। এমনি এক ভয়ঙ্কর অনুভূতি জেগে ওঠে যেন আমি মানুষ নই,—একটা সীমাহীন অতল গহ্বর। জানতে চাও, কী আমি চাই?

প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে সাশা ওর দিকে তাকাল। তারপর গুন্ গুন্ করে গাইতে শুরু করল :

"হায় গো! বহে যখন ঝড়ো হাওয়া
সাগর পারের কুহেলী আসে ভেসে..."

পানোৎসব আর আমার ভালো লাগে না। দারুন বিরক্তিকর—বিশ্রী লাগে। সব সময়েই ঐ এক জিনিস—একই লোকজন একই ফূর্তি আর মদ। যখন সহ্য হয় না টিপিটি ধরে লোকগুলোকে। মানুষজন আমার বরদাস্ত হয় না। কী ওরা। ওদের বুঝে ওঠা অসম্ভব। কেন ওরা বেঁচে আছে? তাছাড়া যখন আবার তত্ত্ব কথা বলে—কার কথা শুনবে? এ বলে একথা, ও বলে সেকথা। কিন্তু আমি—আমি বলতে পারি না কিছুই।

"তুমি বিনে হায়, হে প্রিয়তম
জীবন আমার ফাঁকা—"

সামনের দেয়ালের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে গেয়ে চলেছে সাশা। কিন্তু তেমনি দুলতে দুলতে বলে চলেছে ফোমা :

লোকজনের সামনে অনেক সময়ে অপরাধী মনে হয়। সবাই বাঁচে, হৈ-হুল্লোড় করে আর আমি—ভীত, সন্ত্রস্ত, সঙ্কুচিত। যেন আমার পায়ের তলায় মাটির স্পর্শটুকুও অনুভব করতে পারি না। হয়তো উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি এটা আমার মায়ের কাছ থেকে। বোধহয় এটা মায়েরই দান—এই বিমুখীনতা। ধর্মবাবা বলেন, মা ছিলেন বরফের মতো ঠাণ্ডা। তাছাড়া কিসের এক ব্যাকুল তৃষ্ণায় সব সময়েই উন্মুখ হয়ে থাকতেন। আমিও খুঁজে বেড়াই—কী এক আকুল কামনায় আমার অন্তরও তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকে। ইচ্ছে হয় ওদের কাছে ছুটে গিয়ে বলি,—ভাই আমাকে সাহায্য করো, শেখাও! কেমন করে বাঁচতে হয় আমি জানি না। আর যদি অপরাধ করে থাকি, আমাকে মার্জনা করো। কিন্তু আশেপাশে তাকিয়ে এমন কাউকেই দেখি না যার সঙ্গে দুটো কথা বলি। কেউ চায় না—সবাই পাজী। মনে হয় আমার চাইতেও ওরা খারাপ। আমার লজ্জা হয় এমন করে জীবন কাটাতে। কিন্তু ওদের সেটুকু পর্যন্ত নেই। এমনি জীবন যাপন করে ওরা।—কতগুলো অশ্লীল কুৎসিত গালাগালি দিয়ে চুপ করে গেল ফোমা।

গান থামিয়ে সাশা ওর কাছ থেকে আরো একটু দূরে সরে গিয়ে বসল। বাইরে প্রবল হাওয়া জানলার সার্শির উপরে চলেছে অবিশ্রাম ধূলোবৃষ্টি করে। উঠোনে কোথায় যেন একটা বাছুর ডেকে চলেছে করুণ সুরে।

কৌতুকভরা দৃষ্টি মেলে সাশা ফোমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর বিদ্রুপের হাসি হেসে বলল :

ঐ শোনো, আর একটি অসহায় জীব ডাকছে হাম্বা হাম্বা করে। ওর কাছে যাও। বোধহয় ওর সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইলে তোমার গান জমবে ভালো।—বলতে বলতে ওর কোঁকড়া চুলেভরা মাথাটায় হাত দিয়ে একটা ঠেলা দিল।

তোমার মতো মানুষ কী কাজে আসে? এ কথাটাই তোমার ভেবে দেখা উচিত ভালো করে। কিসের জন্যে এমন করে গুমরে গুমরে মরছ? অলস জীবন যাপন করে করে বিরক্তি ধরে গেছে তোমার। ভালো করে ব্যবসায় লেগে পড়ো।

হা ঈশ্বর!—মাথা নাড়ল ফোমা,—নিজেকে বোঝানো কী কষ্ট। সত্যি দারুণ কষ্ট!

তারপর নিদারুণ বিরক্তিতে প্রায় চিৎকার করে বলতে লাগল :

কিসের ব্যবসা? ব্যবসার উপরে এতটুকুও স্পৃহা নেই আমার। ব্যবসাটা কী? কেবলমাত্র একটা নাম। যদি তার ভিতরের দিকে তাকাও দেখতে পাবে, একটা বাজে ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি কি বুঝি না? সব বুঝি। শুধু আমার মুখ বন্ধ। কথা বলতে পারি না। ব্যবসার লক্ষ্য কী? টাকা? অঢেল আছে আমার। এত আছে যে তোমাকে ঢেকে দিতে পারি। দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে তুমি। কিন্তু ব্যবসা জোচ্চুরি ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করি আমি। কী ধরনের লোক তারা? লোভ তাদের অপরিসীম। তবুও তারা ইচ্ছে করে ব্যবসার চারপাশে ঘুরে ঘুরে মরে—যাতে নিজেরা নিজেদের না দেখতে পায়। নিজেদের ওরা লুকিয়ে রাখে—শয়তানের দল! ঐ কোলাহলের ভিতর থেকে মুক্ত করে নিতে চেষ্টা করো তাদের, কী ঘটবে তখন? অন্ধের মতো ওরা এদিক সেদিক হাতড়ে মরবে। মাথা-খারাপ হয়ে যাবে—পাগল হয়ে যাবে। খুব ভালো করেই জানি আমি সেকথা। তুমি কি মনে করো ব্যবসা মানুষকে সুখী করে? না তা নয়। কী যেন একটা নেই এখানে। নদী বয়ে চলে। মানুষ তার উপর দিয়ে বেয়ে চলে নৌকা। গাছ জন্মায় কাজে লাগার জন্যে। কুকুর বাড়ি পাহারা দেয়। দুনিয়ায় সবকিছুরই একটা মানে আছে। কিন্তু মানুষ—পৃথিবীর বুকে ঐ আরশুলাগুলোরই মতো অপ্রয়োজনীয়, অবাঞ্ছিত। সবকিছুই তাদের জন্যে। কিন্তু তারা কিসের জন্যে? কোথায় আছে এর যৌক্তিকতা? হাঃ হাঃ হাঃ!—যেন জয়ের গর্বে ভরে উঠল ফোমার বুক। মনে হল যেন একটা হাতিয়ার খুঁজে পেয়েছে। মানুষের বিরুদ্ধে একটা কঠিন, ভীষণ হাতিয়ার।

তোমার না মাথা-ব্যথা করছে?—চিন্তিত মুখে ফোমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করল সাশা।

ব্যথা করছে আমার অন্তর।—আবেগভরা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল ফোমা।—আর ব্যথা করছে সেইজন্যেই যে আমার অন্তর খাঁটি। তুচ্ছ জিনিসে ভরে ওঠে না আমার অন্তর—তৃপ্ত হয় না। ঐ আমার ধর্মবাপকেই দেখ না, তিনি বুদ্ধিমান। তিনি বলেন,—জীবন গড়ে তোল। কিন্তু এমন মানুষ তিনি একাই। ভালো কথা। আমি তাঁকে বলি, দাঁড়ান! বাকি সবাই বলে জীবন তাদের নিঃস্ব করেছে! টুঁটি টিপে ধরেছে। তবে কেমন করে আমরা গড়ে তুলব জীবন? তা করতে হলে তোমাকে হাতের মুঠোয় রাখতে হবে—অর্জন করতে হবে গড়ে তোলার ক্ষমতা। একটা হাড়িও তৈরি করা যায় না, যদি না কাদার তাল হাতে থাকে।

শোনো,—গম্ভীর কণ্ঠে বলল সাশা,—আমার মনে হয় তোমার বিয়ে করা উচিত। বুঝলে?

কিসের জন্যে?

লাগামের দরকার হয়ে পড়েছে তোমার।

বেশ তো, তোমার সঙ্গেই তো বসবাস করছি। সবাই তোমরা একই জাতের। তাই না? একজন কিছু আর আর-একজনের চাইতে মিষ্টি না। তোমার আগেও ছিল একজন। ঠিক তোমারই মতো—একই জাতের। না। কিন্তু সে বসবাস করত ভালোবেসে—নিছক ভালোবাসার খাতিরে। আমার উপরে তার জন্মেছিল ভালোবাসা। তাই সে দিয়েছিল দেহ। খুব ভালো মেয়ে ছিল সে। কিন্তু অন্য সবদিক থেকে কোনো প্রভেদই ছিল না। অবশ্য তুমি তার তুলনায় সুন্দরী। কিন্তু আমি ভালোবেসেছিলাম একটি মহিলাকে। উচ্চবংশের একটি

নারীকে। লোকে বলে, সে উচ্ছৃংখল, চরিত্রহীন। কিন্তু আমি তা পাইনি তার ভিতরে। খুবই বুদ্ধিমতী। বিলাসিতার ভিতরে জীবনযাপন করত। ভাবতাম, এখানেই আমি পাবো খাঁটি বস্তুর আস্বাদ। কিন্তু আমি পাইনি তাকে। কিন্তু এখন মনে হয় যদি পেতাম সবকিছু হয়তো অন্য রকমের হয়ে যেত। অন্তর আকুল হয়ে ধেয়েছিল তার দিকে। ভেবেছিলাম, নিজেকে বুঝি আর ছিঁড়ে আনতে পারব না। আর এখন, মদের কাছে বিকিয়ে দিয়েছি নিজেকে। ডুবিয়ে দিয়েছি তার স্মৃতি মদের ভিতরে। তাকে ভুলে যাচ্ছি। কিন্তু তাও ভুল। হায় মানুষ! কী ভীষণ পাজী!—বলতে বলতে ফোমা চুপ করে গেল। ডুবে গেল নীরব চিন্তায়। সাশা উঠে দাঁড়িয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে ঘরময় পায়চারি করে ফিরতে লাগল। তারপর দুহাতে মাথাটা চেপে ধরে ফোমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল:

আমি কি বলছিলাম জানো? তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমি।

কোথায় যাবে?—মুখ না তুলেই প্রশ্ন করল ফোমা।

জানি না। যেখানেই হোক!

কিন্তু, কেন?

সব সময়েই তুমি বাজে বকো। তোমার সংগ একাকিত্বে ভরা। মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

মাথা তুলে ফোমা ওর মুখের দিকে তাকাল তারপর একটু বিষাদক্লিষ্ট হাসি হাসল।

সত্যি? তাও কি সম্ভব?

তোমার কথায় আমার অন্তর বিষাদময় হয়ে ওঠে। যদি একটু ভেবে দেখি, বুঝতে পারি তুমি কী বলছ, কেন বলছ। কারণ আমিও তোমারই মতো। যখন সময় আসবে, আমিও ভাবব এমনি করেই। আর তখন আমিও এমন করেই নিঃশেষ হয়ে যাবো। কিন্তু এক্ষুনি বড্ডো তাড়াতাড়ি। না, এখনও আমি বাঁচতে চাই, শেষে যা-ই আসুক না কেন!

আর আমি—আমিও কি নিঃশেষ হয়ে যাবো?—উদাস কণ্ঠে প্রশ্ন করল ফোমা। ইতিমধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বকে বকে।

নিশ্চয়ই।—শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে বলল সাশা।—এ ধরনের মানুষ এমনি করেই নিঃশেষ হয়ে যায়। যার চরিত্র নমনীয় নয়, মস্তিষ্ক বলে যার কিছুই নেই, কী ধরনের মানুষ সে? আমরা এমনই মানুষ।

আমার কোনো চরিত্র নেই।—সোজা হয়ে উঠে বসে বলল ফোমা। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল: তাছাড়া মস্তিষ্কও নেই আমার।

দুজনে দুজনার দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল।

তাহলে এখন আমরা কী করছি?—প্রশ্ন করল ফোমা।

এখন খাবো।

না আমি জিগ্গেস করছি সাধারণভাবে। এর পরে?

জানি না।

তাহলে সত্যি সত্যিই আমাকে ছেড়ে চললে?

হাঁ। বিদায়ের আগে এসো একবার পানোৎসব করা যাক। চলো কাজানে। সেখানে গিয়ে খুব খানিকটা ফূর্তি করা যাক। আমি গাইব বিদায়ের গান।

বেশ।—সম্মতি জানাল ফোমা।—বিদায়ের সময়ে ওটা খুবই দরকার। শয়তান! স্ফূর্তির জীবন! শোনো শাসা! লোকে বলে তোমরা—তোমাদের জাতের মেয়ে-

মানুষেরা খুবই লোভী। অর্থলোভী। এমনকি চোর পর্যন্ত হয়।

বলে বলুক।—শান্তকণ্ঠে জবাব দিল সাশা।

আঘাত লাগে না তোমার মনে?—উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করল ফোমা।—কিন্তু তুমি তো লোভী নও। আমার কাছে থাকা তোমার লাভজনক। আমি ধনী। কিন্তু তবুও তুমি আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ। তাতেই প্রমাণ হয় তুমি লোভী নও।

আমি?—খানিকক্ষণ কী যেন ভাবল সাশা।—সম্ভবত আমি লোভী নই। কিন্তু কী হল তাতে? আমি তো আর রাস্তার নীচ মেয়েমানুষ নই! তাছাড়া, অভিযোগ করব কার বিরুদ্ধে? বলুক যার যা খুশি। মানুষের সততা আর পবিত্রতা ঢের জানা আছে আমার। খুব ভালো করেই জানি। আমি যদি বিচারক হতাম, মরা-মানুষ ছাড়া আর কাউকেই আমি খালাস দিতাম না।—পরক্ষণেই বিষাক্ত হাসির ধমকে ফেটে পড়ল।—আচ্ছা ঢের হয়েছে! এতেই চলবে। অনেক বাজে বকা হল। এখন এসো দেখি টেবিলে!

* * *

পরদিন সকালে একটা জাহাজের ডেকের উপরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ফোমা আর সাশা। ধীরে জাহাজটা এগিয়ে চলেছে উস্‌তিয়ে পোতাশ্রয়ে। সবার দৃষ্টি সাশার মাথার শাদা পালকশোভিত কালো টুপির উপরে নিবদ্ধ। ওর পাশে দাঁড়িয়ে দারুণ অস্বস্তি বোধ করছিল ফোমা। মনে হচ্ছে সবার অনুসন্ধিৎসু ছুঁচ্টি সরসর করে হামাগুড়ি দিয়ে ফিরছে ওর মুখের উপরে। জাহাজটা যতই এগিয়ে আসছে পার-ঘাটার কাছে ততই কাঁপছে আর বাঁশি বাজাচ্ছে। ঝক্‌ঝকে পোশাকপরা অপেক্ষমান জনতার ভিড় জমেছে তীরে। ফোমার মনে হল, বিভিন্ন ধরনের ঐ চেহারা ও মুখের ভিতরে রয়েছে ওর পরিচিত একটি মুখ। ভিড়ের ভিতরে রয়েছে লুকিয়ে, কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও তার দৃষ্টি ওর মুখের উপর থেকে সরে যাচ্ছে না।

চলো কেবিনের ভিতরে যাই।—উদ্‌বিগ্ন কণ্ঠে সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে বলল ফোমা।

লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজের পাপ গোপন করার অভ্যাস করো না।—প্রত্যুত্তরে মৃদু হেসে বলল সাশা।—মনে হচ্ছে কোনো পরিচিত লোক দেখতে পেয়েছ?

হাঁ, কে যেন লক্ষ্য করছে আমাকে।

বোধহয় দুধের বোতল হাতে দাই। হাঃ হাঃ হাঃ!

বাঃ! বেশ তো ঘোড়ার মতো চেঁচাচ্ছ।—ক্রুদ্ধকণ্ঠে সাশার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল ফোমা।—ভাবছ আমি ভয় পেয়েছি?

দেখতেই তো পাচ্ছি কত বড়ো বীরপুরুষ।

দেখবে'খন! সবার মোকাবিলা করব আমি।—ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল ফোমা। কিন্তু আর একটু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অপেক্ষমান ভিড়ের দিকে তাকিয়েই ওর মুখের চেহারা পালটে গেল। পরক্ষণেই মৃদুকণ্ঠে বলল :

ওঃ ধর্মবাবা যে!

সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে ইয়াকভ তারাশভিচ। দুটো মোটা লোকের মাঝখানে চেপ্টে দাঁড়িয়ে বিদ্বেষভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথার টুপি খুলে নেড়ে চলেছে। দাড়ি নড়ছে। টাকভরা মাথাটা চক্‌চক্‌ করছে।

ব্যাটা শকুন!—বিড় বিড় করে বলে উঠল ফোমা তারপর টুপি খুলে নাড়তে নাড়তে ধর্মবাবার দিকে তাকিয়ে নমস্কারের ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল। ওকে নমস্কার করতে দেখে মায়াকিনের মনটা খুশি হয়ে উঠল। কোনো রকমে মোড়ামুড়ি দিয়ে

উঠে পা আছড়াল। বিদ্বেষভরা হাসির আভায় মুখখানা চক্‌চক করছে।

মনে হচ্ছে, খোকনকে বাদাম কিনে খাওয়াবার জন্যে পয়সা দেবে।—ফোমাকে খ্যাপাবার জন্যে বল্‌ল সাশা।

সাশার কথা আর বৃদ্ধের মুখের চাপা হাসি মিলে মুহূর্তে ফোমার বুকে আগুন ধরিয়ে দিল।

দেখা যাক কতদূর গড়ায়!—হিসিয়ে উঠল ফোমা। পরক্ষণেই এক বিজাতীয় বিদ্বেষের সুকঠিন নিস্তব্ধতা নেমে এল ওর দেহমন আচ্ছন্ন করে।

জাহাজ ঘাটে এসে লাগতেই ঢেউয়ের মতো লোকজন নেমে এল। ভিড়ের চাপে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল মায়াকিন। পরক্ষণেই আবার ভেসে উঠল তার বিদ্বেষভরা গর্বিত মুখ। ভ্রূ কুঁচকে স্থির দৃষ্টিতে ফোমা তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। পিছন থেকে লোকজন ওকে ধাক্কা দিচ্ছে, চেপে ধরছে, ঢলে পড়ছে গায়ে। ফলে আরো উত্তেজিত হয়ে উঠছে ফোমা। এতক্ষণে বৃদ্ধের মুখামুখি এসে দাঁড়াল ফোমা। একটি বিনীত নমস্কারের ভিতর দিয়ে ওকে সম্ভাষণ জানিয়ে প্রশ্ন করল ঃ

কোথায় চলেছ ফোমা ইগনাতিচ?

কিন্তু প্রত্যভিবাদন না করেই প্রত্যুত্তরে দৃঢ়কণ্ঠে বলল ফোমা ঃ আমার নিজের কাজে।

ওটা কি খুবই প্রশংসনীয় কাজ মহাশয়?—বলল ইয়াকভ তারাশভিচ। মুখখানা চাপা-হাসিতে উদ্ভাসিত।—ঐ যে পালক-আঁটা টুপি-পরা মহিলাটি উনি তোমার কে জিগ্‌গেস করতে পারি?

আমার রক্ষিতা।—বৃদ্ধের অনুসন্ধিৎসু তীক্ষ্ম দৃষ্টির সামনে মাথা নিচু না করেই বলল ফোমা।

ফোমার পিছনে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে সাশা দেখছিল বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে। ফোমার উচ্চকণ্ঠে আকৃষ্ট হয়ে মুখরোচক কুৎসার গন্ধ পেয়ে লোকজন ওর দিকে তাকাল। মুহূর্তে মায়াকিন বুঝতে পারল যে একটা কেলেঙ্কারি ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। কুঁচকে উঠল মুখের উপরের বলিরেখা, ঠোঁট কামড়ে আপোসের সুরে বলল ঃ

কিছু কথাবার্তা আছে তোমার সঙ্গে। তুমি কি একবার হোটেলে আসবে আমার সঙ্গে?

বেশ, কিন্তু অল্প সময়ের জন্যে।

তাহলে সময় নেই তোমার বলো? নিশ্চয়ই আর একটা গাধাবোট ডুবোতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, কী বলো?—আর ধৈর্য রক্ষা করতে না পেরে বলল বৃদ্ধ।

যখন ডুবোনো যায় তখন ডুবোবোই না কেন?—উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব দিল ফোমা।

তা তো বটেই, নিজে তো আর ওগুলো রোজগার করে করোনি! ছেড়ে দেবে কেন? বেশ, চলো। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্যে কি ঐ মহিলাটিকে আমরা জলে ডুবিয়ে দিতে পারি না?

সাশা একটা গাড়ি করে শহরে যাও। সাইবেরিয়ান হোটেলে গিয়ে একটা ঘর ভাড়া করো। আমি আসছি একটু পরে।—তারপর মায়াকিনের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ আমি প্রস্তুত। চলুন যাই।

পথে কেউ কারুর সঙ্গে একটি কথাও বলল না। ফোমা দেখল ওর সঙ্গে

চলতে গিয়ে বৃদ্ধকে চলতে হচ্ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। তাই ইচ্ছে করেই লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে শুরু করল ফোমা। বৃদ্ধ যে ওর সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারছে না এতে যেন ওর অন্তরে জেগে-ওঠা বিদ্রোহীভাবে আরো ইন্ধন জোগাতে লাগল।

ওয়েটার! এক বোতল ফলের রস!—হলে ঢুকে শান্তমৃদুকণ্ঠে আদেশ করল মায়াকিন।

আর আমার জন্যে কনিয়াক্—আদেশ করল ফোমা।

বটে! হাতে যখন তাস খারাপ থাকে তখন ছোট রঙই তদ্রূপ করা উচিত।—বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বলল মায়াকিন।

আপনি জানেন না আমার হাতের তাসের অবস্থা—টেবিলে বসতে বসতে প্রত্যুত্তরে বলল ফোমা।

বটে! ব'সো ব'সো! এমন অনেক খেলাই খেলছ বুঝি?

কিরকম?

এই যেমন করছ। প্রকাশ্যে, কিন্তু বোকার মতো।

আমি এমনভাবে খেলি যে, হয় মাথাটা গুঁড়িয়ে যাবে নয়তো দেয়াল ভাঙবে।—টেবিলের উপরে একটা ঘুসি মেরে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল ফোমা।

মদের ঘোর কাটেনি বুঝি এখনো?—মৃদু হেসে বলল বৃদ্ধ। আরো শক্ত হয়ে বসল ফোমা চেয়ারের ভিতরে। রাগে উত্তেজনায় থম থম করছে মুখ।

ধর্মবাবা!—বলল ফোমা,—আপনি বুদ্ধিমান! বুদ্ধির জন্যে আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি।

ধন্যবাদ বৎস!—একটু উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় টেবিলের সঙ্গে ঝুঁকে অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথা নিচু করল বৃদ্ধ।

আমি বলতে চাই যে এখন আর আমি বিশ বছরের খোকা নই।

নিশ্চয়ই নও।—বলল মায়াকিন,—অনেক দিন বেঁচে আছ, তা আর না বল্‌লেও চলে। একটা মশাও যদি এতদিন বেঁচে থাকত তো একটা বড়ো মুরগী হয়ে উঠত।

আপনার ঠাট্টাবিদ্রূপ বন্ধ করুন।—এমন শান্তকণ্ঠে বলল ফোমা যে বৃদ্ধ চমকে উঠল। এক নিদারুণ আশঙ্কায় কেঁপে উঠল মুখের বলি-রেখা।—এখানে কেন এসেছেন আপনি?—প্রশ্ন করল ফোমা।

এখানে কিছুটা নোংরা কাজ করে বসেছ তুমি—তাই দেখতে এসেছি ক্ষতির পরিমাণ কত? দেখ, আমি তোমার আত্মীয়—তাছাড়া একমাত্র আপনার জন।

বৃথাই আপনি কষ্ট ভোগ করছেন। আমি কি বলতে চাই জানেন বাবা? হয় আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিন, নয়তো সব কিছু নিয়ে নিন আমার হাত থেকে। সব কিছু—শেষ কর্পদকটি পর্যন্ত।

প্রস্তাবটি একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই বেরিয়ে এল ফোমার অন্তর মথিত করে। এর আগে পর্যন্ত এ-ধরনের কোনো চিন্তাও আসেনি ওর মনে। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর ধর্মবাবার কাছে কথাটা বলে ফেলেই অনুভব করল যে যদি ওর ধর্মবাবা ওর হাত থেকে সমস্ত ধনসম্পদ নিয়ে নেয় তবে ও পাবে পূর্ণ মুক্তি। যেখানে খুশি পারবে যেতে—করতে পারবে যা খুশি তাই। এই মুহূর্তের আগে পর্যন্ত যেন ওর হাত-পা ছিল বাঁধা—অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। কিসের যেন এক ফাঁদে আবদ্ধ ছিল এত দিন। কিন্তু কিসের শৃঙ্খল জানত না তা। তাই পারেনি সে বাঁধন ছিন্ন করতে। কিন্তু এখন যেন তা আপনা থেকেই পড়ছে খসে—অতি সহজে, অনায়াসে।

বুকের ভিতরে যুগপৎ জেগে উঠল এক ভয় ও আনন্দের সম্মিলিত শিখা। ওর ঐ অপরিচ্ছন্ন নোংরা জীবন উদ্ভাসিত নেমে এল আলোর প্লাবন। ওর পায়ের তলায় রচিত হয়েছে এক প্রশস্ত রাজপথ। অন্তরে ভেসে উঠেছে তারই প্রতিচ্ছায়া। আর তারই রূপান্তর লক্ষ্য করতে করতে আপন মনে বিড়বিড় করে বলে উঠল ফোমা :

সব কিছু নিন। সব কিছু নিয়ে সরে পড়ুন। আর আমি—বিস্তীর্ণ দুনিয়ার যেখানে খুশি চলে যাবো। যেন একটা ভারি পাথর ঝুলছে আমার গলায়—অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। ওখানে যেও না, এ করো না। আমি চাই বাঁচতে—স্বাধীন ভাবে। সব কিছু জানতে চাই, বুঝতে চাই, নিজে। নিজেই আমি খুঁজে বের করব জীবনের সন্ধান—জীবনের পথ। নইলে কী মূল্য রইল আমার? একজন বন্দী। দয়া করুন—সব কিছু নিয়ে নিন। জাহান্নামে যাক সব। নিয়ে আমায় মুক্তি দিন। কী ধরনের ব্যবসায়ী আমি? কিছুই ভালো লাগে না আমার। তাই আমি পরিত্যাগ করব মানুষের সঙ্গ।

একান্ত মনোযোগের সঙ্গে মায়াকিন শুনতে লাগল ওর কথা। মুখখানা স্থির, কঠিন—যেন পাথর হয়ে উঠেছে। জেগে উঠেছে পানশালার মৃদু কোলাহল। কতগুলো লোক পাশ দিয়ে চলে যেতে যেতে মায়াকিনকে অভিবাদন করল। কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য করল না মায়াকিন। স্থির অপলক দৃষ্টিতে ফোমার আনন্দ-বেদনা-ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

হায় রে টক জাম!—ফোমার বক্তৃতায় বাধা দিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল—দেখছি তুই পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিস। আর যত বাজে বকছিস। ভাবছি, কনিয়াক না তোর নির্বুদ্ধিতা—কে এর জন্যে দায়ী।

বাবা!—আবেগভরা কণ্ঠে বলল ফোমা,—এটা হতে পারে নিশ্চয়ই। অনেক নিদর্শন আছে এমন ঘটনার। মানুষ যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে বাঁচিয়েছে নিজেদের।

আমার যুগে তা হয়নি। বা আমার আপনার লোকের ভিতরেও কেউ তা করেনি।—তীব্র কণ্ঠে বলল মায়াকিন।—তা যদি হত, দেখিয়ে দিতাম কেমন করে চলে যেতে হয়।

তাদের অনেকেই তো চলে গেছে সাধু হয়ে।

হুঁ, আমার পাল্লায় পড়লে আর চলে যেতে হত না। বিষয়টা খুবই সরল—দাবা খেলা জানিস? যতক্ষণ না হেরে যাস এখান থেকে ওখানে সরে সরে যাস। আর যদি না হেরে যাস তবে লাভ করলে রাজা। তখন সব পথই খোলা তোর কাছে। বুঝলি? আর এর জন্যেই কি আমি এত গভীরভাবে বলছি তোকে? ছ্যা!

কেন আপনি রাজী হচ্ছেন না বাবা?—রাগত স্বরে বলল ফোমা।

শোনো আমার কথা! যদি তুমি চিমনি পরিষ্কারক হও, উঠে যাও ছাদে। যদি হও ফায়ারম্যান, যাও টাওয়ার ওয়াচে। প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রা। বাছুর তো আর ভল্লুকের মতো গর্জন করতে পারে না! যদি তুমি তোমার নিজের মতো জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে চাও, করো। বাজে বকো না। যে স্থান তোমার নিজের নয় সেখানে নাক গলাতে যেও না। নিজের মতো করেই জীবন নিয়ন্ত্রণ করো।

বৃদ্ধের কম্পিত কালো ঠোঁটের ভিতর থেকে তর তর করে বেরিয়ে আসতে লাগল শ্রুতিকঠোর কথার স্রোত। কিন্তু সেগুলো বহু পরিচিত ফোমার কাছে। মুক্তির চিন্তায় তার একটি বর্ণও শুনতে পেল না ফোমা। ঐ চিন্তা ওর মস্তিষ্ক

কুরে খাচ্ছে। প্রবল হয়ে উঠছে এই শূন্য ক্লান্তিকর জীবনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার আগ্রহ। ধর্মবাপ, জাহাজ, গাধাবোট, ঐ পানোৎসব—সমস্ত কিছু সংকীর্ণ শ্বাসরুদ্ধকারী যা নাকি অসহ্য করে তুলেছে ওর জীবন।

বৃদ্ধের কথাগুলো যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে ওর কানে। মাতাল কণ্ঠের চিৎকারের সঙ্গে মিশে পেয়ালা-পিরিচের টুং টাং শব্দ আসছে ভেসে। জেগে উঠছে পরিচারকদের দ্রুত চলাফেরার শব্দ। অনতিদূরে চারজন ব্যবসায়ী একটা টেবিলে বসে করছে আলোচনা। বাদানুবাদ করছে উচ্চ কণ্ঠে :

সওয়া দুই—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! লুকা মিত্রিচ্! তা কেমন করে পারি?

ঐ আড়াই করেই দাও।

তা-ই ঠিক। ওটা তোমার দেয়া উচিত। স্টিমারটা ভালো, খুব জোরে চলে।

না মশাইরা, সেটি সম্ভব নয়। সওয়া দুই।

তাছাড়া এ সব বাজে খেয়াল মাথায় এসেছে তারুণ্যের ভাবালুতা থেকে।—বলল মায়াকিন।—তোর সাহস হচ্ছে বোকামো। সমস্ত কথাই অর্থহীন, বাজে কথা। মঠে যাবে বোধহয়? না, পথে পথে ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছে হয়েছে?

নীরবে ফোমা শুনতে লাগল। মনে হল ওর চারপাশের জেগে-ওঠা কোলাহল ভেসে গেছে বহুদূরে। কল্পনায় দেখল ও দাঁড়িয়ে রয়েছে এক অস্থির জনতার ভিতরে। কিছুই না জেনে তারা এদিক-ওদিক জটলা করছে। ঝাঁপিয়ে পড়ছে একে অন্যের উপরে। লোভে চোখগুলো বড়ো বড়ো হয়ে উঠেছে। চিৎকার করছে, গালিগালাজ করছে। একজন আর-একজনকে ফেলছে গুঁড়িয়ে। আর একই স্থানে দাঁড়িয়ে করছে হৈ-হল্লা। ফোমা অনুভব করল, ওরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না—বোঝে না কিছুই। কিন্তু কেউ যদি নিজেকে ঐ আওতা থেকে ছিঁড়ে বের করে নিতে পারে—পারে জীবনের কিনারায় এসে দাঁড়াতে, তবেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। বুঝবে কী চায় ওরা। আর তখন খুঁজে পাবে তার নিজের স্থান।

আমি কি বুঝি না কিছু?—ফোমাকে গভীর চিন্তামগ্ন দেখে অপেক্ষাকৃত মৃদু কণ্ঠে বলল মায়াকিন। ধরে নিয়েছে যে ফোমা ভাবছে তারই কথাগুলো।—আমি বুঝি যে তুমিও চাও সুখী হতে। ভালো কথা, কিন্তু সেটা অত সহজে পাওয়া যায় না। বনে-জঙ্গলে যেমন করে লোকে ব্যাঙের ছাতা খুঁজে ফেরে—তেমনি পিঠ বাঁকিয়ে তোমাকে খুঁজে ফিরতে হবে সুখ। তারপর যখন পাবে, তখন দেখবে ওটা না ব্যাঙাচি হয়ে পড়ে।

তাহলে আপনি আমাকে মুক্তি দিচ্ছেন?—হঠাৎ হাত তুলে প্রশ্ন করল ফোমা। ওর চোখের সেই আগুন-ঝরা দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে মায়াকিন অন্য দিকে মুখ ফেরাল।

বাবা! অন্তত কিছুদিনের জন্যে আমাকে বুকভরে নিঃশ্বাস নিতে দিন। সবকিছু থেকে দূরে থাকতে দিন!—মিনতিভরা কণ্ঠে বলল ফোমা।—দেখতে দিন আমাকে দুনিয়াটা কেমন করে চলে। আর তারপর যদি তা না হয় আমি মাতাল হয়ে যাবো।

বাজে বকো না! কেন এমন বোকামো করছ,—ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল মায়াকিন।

তাহলে বেশ, ভালো কথা।—প্রত্যুত্তরে ক্লান্ত কণ্ঠে বলল ফোমা।—চান না তো আপনি? কিছুই আর হবে না তাহলে। সব আমি উড়িয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করে দেবো। আর আমাদের আলোচনা করবার কিছুই নেই। নমস্কার! বিদায়!

দেখে নেবেন আমিও কাজে লেগে গেছি। খুব আনন্দ দেবে আপনাকে। সব কিছু ধোঁয়ায় মিশে উড়ে যাবে।—ফোমা শান্ত। প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট দৃঢ়তায় ভরা। ওর মনে হল যখন স্থির করেছে তখন কিছুতেই আর ওর ধর্মবাবা পারবে না ওকে বাধা দিতে। কিন্তু মায়াকিন সোজা হয়ে উঠে বসল। তারপর স্পষ্ট ভাষায় শান্ত কণ্ঠে বলল : জানো তুমি, কেমন করে শায়েস্তা করতে পারি আমি তোমাকে?

যা খুশি করতে পারেন।—পরম নিশ্চিন্তভাবে হাত নেড়ে বলল ফোমা।

বেশ, এখন তাহলে তাই-ই করব আমি। শহরে ফিরে গিয়ে এমন ব্যবস্থা করব, যাতে তুমি পাগল বলে প্রতিপন্ন হও। আর তোমাকে ধরে পুরে দেয়া হয় পাগলা গারদে।

তাও কি করা যায়?—প্রশ্ন করল ফোমা। ও কণ্ঠে অবিশ্বাস আর ভয়।

ইচ্ছে করলে আমরা সব কিছুই করতে পারি বৎস!

বটে!—ফোমা মাথা নিচু করল। আড়চোখে ধর্মবাপের দিকে তাকাতেই ওর সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। ভাবল, যা বলছে করবে ঠিক তাই। রেহাই দেবে না।

যদি তুমি সত্যি সত্যিই বোকামি করতে চাও, আমিও উপযুক্ত ব্যবহারই করব তোমার সঙ্গে। দমন করব কঠোর হাতে। তোমার বাবার কাছে শপথ করেছিলাম, তোমাকে মানুষ হিসাবে গড়ে তুলব। আর করবও আমি তা। যদি তুমি তোমার নিজের পায়ে না দাঁড়াতে পারো, আমি তোমাকে গারদে বন্ধ করব। তখন হয়তো পারবে দাঁড়াতে। যদিও আমি জানি অত্যধিক মদ আর মাতালের কুৎসিত খাম খেয়ালিপনাই হচ্ছে তোমার ঐ ধর্মকথার উৎস, কিন্তু যদি তুমি না ছেড়ে দাও—এমনি কুৎসিত জীবন যাপন করে চলো, উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে উচ্ছন্নে যাও, আর যে ধন-সম্পদ তোমার বাবা রেখে গেছে যদি তা নষ্ট করে ফেল তবে আমি তোমাকে সব দিক থেকে বেঁধে ফেলব। আমার সঙ্গে চালাকি করতে এলে বিশেষ সুবিধা হবে না।—ধীর শান্ত কণ্ঠে বলছিল মায়াকিন। গালের সমস্ত বলিরেখা উঠে এসেছে, উপরে কোটরে-ঢোকানো ছোট্ট কুতকুতে চোখদুটো বিদ্রুপের চাপা-হাসিতে উদ্ভাসিত। কপালের বলিরেখাগুলো চাঁদির টাকের সঙ্গে মিশে এক অদ্ভুত আকার ধারণ করেছে। মুখখানা কঠিন—নিষ্ঠুর। ফোমার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিচ্ছে এক শৈত্যময় বিষ-নিঃশ্বাস।

তাহলে আর কোনো উপায়ই নেই আমার?—গম্ভীর বিমর্ষ মুখে বলল ফোমা। —আমার সব পথই বন্ধ করে দিচ্ছেন?

বৃদ্ধের আত্মবিশ্বাস তার নির্ভুল আত্ম-অহঙ্কারে নিদারুণ ঘৃণায় ক্রোধে পূর্ণ হয়ে উঠল ফোমার অন্তর। পাছে না তাকে মেরে বসে তাই হাতদুটো পকেটে ঢুকিয়ে চেয়ারের ভিতরে সোজা হয়ে উঠে বসল। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে মায়াকিনের মুখের সামনে মুখ এনে বলতে লাগল : কিসের এত অহঙ্কার? কী নিয়ে এত গর্ব করেন আপনি? আপনার নিজের ছেলে—কোথায় সে? আপনার মেয়ে—কী করে বেড়ায় সে? আর আমার জীবন গড়ে তোলার লোক আপনি! আপনি চতুর, বুদ্ধিমান, সবজান্তা। বলুন দেখি কিসের জন্যে বেঁচে আছেন আপনি? কিসের জন্যে টাকা জমাচ্ছেন? ভেবেছেন কি আপনার মৃত্যু নেই? আপনি আমাকে বন্দী করেছেন—জয় করেছেন। কিন্তু দাঁড়ান একটু, আমিও নিজেকে ছিঁড়ে নিতে পারি আপনার কাছ থেকে দূরে। তাতেও শেষ হবে না। কী করেছেন আপনি জীবনে? কিসের জন্যে লোক আপনার নাম করবে? একটা দুঃস্থাবাসের জন্যে দান করে গেছেন আমার বাবা। কিন্তু আপনি কি করেছেন?

কাঁপতে কাঁপতে মায়াকিনের মুখের বলিরেখাগুলো গভীর হতে লাগল। সমস্ত মুখখানা শীর্ণ, কাঁদো-কাঁদো।

কী দিয়ে আপনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন?—মায়াকিনের মুখের দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করল ফোমা।

মুখ সামলে কথা বল কুত্তির বাচ্চা!—শঙ্কিত দৃষ্টিতে ঘরের ভিতরে তাকিয়ে চাপা গলায় বলে উঠল মায়াকিন।

আমার যা বলবার তা বলেছি। এখন আমি চললাম। সাধ্য থাকে আমাকে ধরে রাখুন।—চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ফোমা।

যেতে পারো, কিন্তু আমি ধরবই তোমাকে। আমি যা বলি তাই করি।—ভাঙা গলায় বলল মায়াকিন।

আর আমিও চালাব পানোৎসব। সব কিছু দেবো উড়িয়ে।

ভালো কথা, দেখা যাক!

নমস্কার বীরবর! বিদায়!—হেসে উঠল ফোমা।

বিদায়। মাত্র কয়েকদিনের জন্যে। আমি কথার খেলাপ করব না। নিজের জন্যে ফিরে যাবো না। এ আমি ভালোবাসি। আর ভালোবাসি তোমাকেও। কিছু মনে করো না, তুমি লোক ভালো।—ক্ষীণ কণ্ঠে বলল মায়াকিন যেন তার দম আটকে আসছে।

আমাকে ভালবাসবেন না, বরং শিক্ষাই দিন। কিন্তু তবুও সৎ-শিক্ষা দিতে পারবেন না আপনি—বলতে বলতে ফোমা ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করল।

হোটেলে একা বসে রয়েছে ইয়াকভ তারাশভিচ। টেবিলের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে ট্রের উপরে কি যেন চিত্র এঁকে চলেছে। মাথাটা নিচু হয়ে পড়েছে টেবিলের উপরে, যেন কিছুতেই পারছে না তত্ত্ব উদ্ঘাটন করতে। শীর্ণ আঙুল দিয়ে চিত্র এঁকে চলেছে ট্রের বুকে।

মাথার টাকের উপরে ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বলিরেখাগুলো নড়ছে কেঁপে কেঁপে। হঠাৎ কী একটা তীক্ষ্ণ শব্দে এমনভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল বাতাস যে জানলার কাঁচগুলো পর্যন্ত কেঁপে উঠল। ভলগার বুক থেকে ভেসে আসছে চলন্ত জাহাজের বাঁশি। আর তার-ই সংগে চলমান চাকার গর্জন। জেগে উঠেছে মাল-বোঝাই-দেয়া লোকজনের কোলাহল চিৎকার। জীবন এগিয়ে চলেছে—নিরবচ্ছিন্ন, জিজ্ঞাসাহীন।

মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে পরিচারককে কাছে ডেকে কণ্ঠে একটু বিশেষ জোর দিয়ে জিগ্গেস করল :

কত দিতে হবে আমাকে?

১০

মায়াকিনের সঙ্গে ঝগড়ার আগে ফোমা পানোৎসব করত জীবনের ক্লান্তি অপনোদনের জন্যে। কখনো বা কৌতূহল থেকে—একটা আধা নির্লিপ্ততায়। কিন্তু এখন উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করছে একটা তীব্র ঘৃণা আর হতাশা থেকে। মানুষের প্রতি ওর অন্তর পূর্ণ হয়ে জেগে উঠেছে প্রতিহিংসা আর ঔদ্ধত্য। নিজেও অবাক হয়ে যায়। দেখেছে ফোমা ওর আশপাশের লোকেরা তারই মতো নিরলম্ব—তারই মতো যুক্তিহীন। কিন্তু প্রভেদ এই যে তারা তা আদৌ বোঝে না। কিংবা বোঝার চেষ্টাও করে না এতটুকু, পাছে তাদের ঐ অন্ধ জীবনযাত্রায় আসে বাধা—ব্যাহত হয় উচ্ছৃঙ্খলতার হাতে পূর্ণ আত্মসমর্পণ। ওদের চরিত্রে এতটুকু ধৈর্য, এতটুকু দৃঢ়তা দেখেনি ফোমা কোনোদিনও। যখন সুস্থ থাকে, ওদের দেখে মনে হয় অসহায়, নির্বোধ। কারুর প্রতিই ওর মনে জেগে ওঠে না শ্রদ্ধা—জেগে ওঠে না কোনো কৌতূহল। এমনকি কারুর নাম পর্যন্ত জিগ্‌গেস করার ইচ্ছে হয়নি কোনোদিন। ভুলে যায় কখন, কোথায় ওদের সঙ্গে হয়েছে ওর পরিচয়। সব সময়েই একটা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে ওদের। আর এমন সব কথা বলতে ইচ্ছে হয় যাতে ওদের অন্তরে লাগে আঘাত। দিনের পর দিন—রাতের পর রাত কাটিয়েছে ফোমা ওদের সঙ্গে। স্থানানুপাতেই জুটেছে ওর সঙ্গী-সাথী। খরচ-বহুল রেস্তোরাঁয় অভিজাত শ্রেণীর ঠগ-জোচ্চোরেরা থাকে ওকে ঘিরে—জুয়াড়ী, গাইয়ে, জাদুকর, অভিনেতা আর উচ্ছৃঙ্খলতায় বিষয়সম্পত্তি-উড়িয়ে-দেয়া দেউলে ধনীরা। প্রথম প্রথম ওরা খুব ভারিক্কি চালে কথা বলত ফোমার সঙ্গে। গর্ব করত তাদের মার্জিত রুচির। গর্ব করত মদ আর খাদ্যাখাদ্য সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের। শেষে ফোমার করুণা পাবার জন্যে করত হ্যাংলাপনা—টাকা ধার করত। ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনে, কিংবা হ্যাণ্ডনোট কেটে ধার করে নোটের তাড়া না গুণেই নিদারুণ অবজ্ঞায় ছুঁড়ে দিত ওদের সামনে।

সস্তা হোটেলের কেরানি, নাপিত, গাইয়ে, আমলা কর্মচারীরা শকুনির মতো ছেঁকে ধরত। ওদের ভিতরে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করত ফোমা—অনেক বেশি সহজ হয়ে উঠত। ওদের ভিতরে দেখতে পায় ফোমা সহজ মানুষ। অভিজাত হোটেলের তথাকথিত ধোপদুরস্ত সমাজের পঙ্গু বিকৃত মানুষের চাইতে ওরা কম উচ্ছৃঙ্খল, কম দুশ্চরিত্র। ঢের বেশি বুদ্ধিমান। ওদের বুঝতে পারে ফোমা অনেক বেশি। সময়ে ওরা অনেক বেশি সুরুচির পরিচয় দেয়—অনেক বেশি মানবিকতা রয়েছে ওদের ভিতরে। কিন্তু তবুও ঐ ধোপদুরস্ত সমাজের মানুষ-গুলোর মতোই টাকার লোভে নির্লজ্জের মতো ওকে ছেঁকে ধরে। দেখে দেখে ফোমা বিদ্রুপ কর রূঢ় কঠোর ভাষায়।

আসে অনেক নারী। স্বাস্থ্যবতী কিন্তু কামুকী নয়। কিনে আনে ওদের

ফোমা। কখনো চড়া দামে, কখনো সস্তায়। সুন্দরী আর কুৎসিত। অনেক টাকা দেয় তাদের। হপ্তায় হপ্তায় আসে নতুন। পুরুষদের চাইতে মেয়েদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে ফোমা। হয়তো কখনো ওদের বিদ্রূপ করত, গাল দিত কুৎসিত ভাষায়, অপমান করত। কিন্তু অর্ধোন্মত্ত অবস্থায়ও ওদের সামনে কেমন যেন লজ্জা কাটিয়ে উঠতে পারত না। ওদের সবাইকে—এমনকি যে সবচাইতে বেহায়া, সবচাইতে সবল, সবচাইতে লজ্জাহীনা যে, তাকেও ওর মনে হত শিশুর মতো অসহায়, দুর্বল। পুরুষদের ঠেঙাবার জন্যে যে ফোমার হাত সব সময়েই উঁচু হয়ে রয়েছে, মেয়েদের বেলায় কখনো তার হাত উঠত না। যখন রেগে যেত, কুৎসিত ভাষায় গাল পাড়ত। ফোমা অনুভব করত, যে-কোনো মেয়ের চাইতে ও শক্তিশালী, আর প্রত্যেকটি মেয়ে ওর চাইতে অনেক বেশি দুঃখী। যে মেয়ে প্রকাশ্যে কুৎসিত জীবন যাপন করত, বড়াই করত তাদের দুশ্চরিত্রতার জন্যে, তাকে দেখে দারুণ সঙ্কুচিত হয়ে উঠত ফোমা। কেমন যেন বিশ্রী লাগত। একটা ভীতি জেগে উঠত ওর অন্তরে।

এক সন্ধ্যায় খেতে বসে ঐ ধরনের একটি মেয়ে মাতাল হয়ে তরমুজের খোসা দিয়ে আঘাত করল ফোমার গালে। ফোমাও তখন মাতাল। রাগে পাংশু হয়ে উঠেছে মুখ। তীব্র ঘৃণায় কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে উঠল : বেরো এখান থেকে মরা-খেকো জানোয়ার! দূর হ! আর কেউ হলে তোর মাথা ভেঙে দিত। এখনো আমি অনেক ধৈর্য ধরে আছি। কারণ তোদের মতো মেয়েমানুষদের গায়ে আমার হাত ওঠে না। দূর করে দে ওটাকে! জাহান্নামে পাঠিয়ে দে!

কিছুদিন পরে ফোমা ফিরে এল কাজানে। সাশা এখন এক মদ্য ব্যবসায়ীর ছেলের রক্ষিতা। সেও ফুর্তি ওড়াত ফোমারই সঙ্গে। নতুন প্রভুর সঙ্গে 'কামা'-র দিকে কোথাও চলে যাবার সময়ে বলল :

বিদায়! হয়তো আবার আমাদের দেখা হবে। দুজনেই চলেছি একই পথে। কিন্তু আমার অনুরোধ, মনকে অতখানি স্বাধীনতা দিও না। আনন্দ করে যাও—পিছনের কোনো কিছুর দিকে না তাকিয়ে। যখন মধু শেষ হয়ে যাবে পান-পাত্রটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিও মাটিতে। বিদায়!—বলেই সাশা এক উত্তপ্ত চুম্বন এঁকে দিল ফোমার ঠোঁটে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হল, সাশার চোখের মণিদুটো যেন আরো কালো, আরো গভীর হয়ে উঠেছে।

ওকে ছেড়ে যাচ্ছে বলে ফোমা খুশি। ক্লান্ত হয়ে উঠেছে ওর সাহচর্যে। সাশার উত্তাপহীন ঔদাসীন্য ওর অন্তরে জাগিয়ে তোলে ভীতি। কিন্তু এই মুহূর্তে কী যেন কেঁপে উঠল ওর অন্তর আচ্ছন্ন করে। সাশার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মৃদু অস্ফুট কণ্ঠে বলল ফোমা : হয়তো খুব সুখে থাকবে না ওর সঙ্গে। তখন আবার ফিরে এসো আমার কাছে।

ধন্যবাদ!—প্রত্যুত্তরে বলল সাশা। পরক্ষণেই কি ভেবে যেন হো হো করে হেসে উঠল। অমন করে হেসে ওঠা একান্ত অস্বাভাবিক ওর পক্ষে।

এমনি করে বয়ে চলেছে ফোমার দিন। দিনের পর দিন একই স্থানে মরছে ঘুরে ঘুরে। একই ধরনের মানুষের মধ্যে—যারা ওর অন্তরে জাগিয়ে তোলে না কোনো মহৎ প্রেরণা। তাছাড়া নিজেকে ফোমা মনে করে সবার চাইতে বড়ো। কারণ বর্তমান জীবনের হাত থেকে মুক্তির সম্ভাবনা মূল বিস্তার করে চলেছে ওর অন্তরের গভীরে। ওর দেহমন আচ্ছন্ন করে জেগে উঠেছে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। অন্তরে

জেগে-ওঠা সেই মুক্তির কল্পিত চিত্র ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে ওর মানসপটে। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে ক্রমেই ভেসে চলেছে দিগন্তের পানে—কোলাহল আর সংশয়-ভরা জীবনকে পিছনে ফেলে। বহুদিন রাত্রে যখন একা থাকত, কল্পনায় এঁকে চলত ছবি—কালো কালো একদল মানুষ, বিরাট দেহ, এত বিরাট যে ভয়ঙ্কর-দর্শন। পাহাড়-ঘেরা ধূলিধূসর এক কুয়াশাময় উপত্যকায় পরস্পর পরস্পরের গায়ে গায়ে মিশে একই স্থানে দাঁড়িয়ে করছে জটলা। সংশয়ভরা কণ্ঠে করছে চিৎকার। ওদের দেখে মনে হচ্ছে যেন পেষণ-যন্ত্রের চোঙ্-এর ভিতরে শস্যের মতো। যেন ঐ ভিড়ের পায়ের তলায় লুকানো রয়েছে অদৃশ্য এক জাঁতাকল। আর সেই জাঁতাকল ওদের পিষে চলেছে। ঢেউয়ের মতো লোকগুলো ঐ জাঁতাকলের উপরে পড়ছে আছড়ে। কখনো লাফিয়ে মাটিতে, কখনো উঠছে উপরে ঐ নির্মম পেষণযন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা পেতে।

আছে আরো অনেক মানুষ যাদের মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র ধরে একটা ঝুড়ির ভিতরে পুরে রাখা কতগুলি কাঁকড়া। ওরা পরস্পর পরস্পরকে ধরছে আঁকড়ে, যাচ্ছে হামাগুড়ি দিয়ে—পরস্পর পরস্পরকে দিচ্ছে বাধা, কিন্তু মুক্তি পাবার কোনো উপায়ই করতে পারছে না।

ঐ ভিড়ের ভিতরে ফোমা দেখতে পেল পরিচিত মুখ। দৃপ্ত পদক্ষেপে হেঁটে চলেছে ওর বাবা। ধাক্কা দিয়ে ভিড় সরিয়ে চলেছে এগিয়ে। বুকের ধাক্কায় গুঁড়িয়ে দিচ্ছে সব কিছু আর উঠছে হেসে বজ্রগম্ভীর স্বরে।

পরক্ষণেই গেল অদৃশ্য হয়ে—ডুবে গেল কোথায় ঐ ভিড়ের পায়ের তলায়। ওরা সাপের মতো কিলবিল করছে, মোড়াগুড়ি করছে। কখনো বা লাফিয়ে উঠছে ঘাড়ে. কখনো বা পায়ের তলা দিয়ে গলে যাচ্ছে। ওর ধর্মবাপ—শীর্ণ নমনীয় শিরাবহুল হাতে চলেছে কাজ করে। আর লিউবভ আছাড়ি-পিছাড়ি করে কাঁদতে কাঁদতে চলেছে ওর বাবার পিছে পিছে। কখনো পড়ছে পিছিয়ে কখনো বা এগিয়ে আসছে কাছে। স্নেহমাখা হাসিভরা মুখে মৃদু পদক্ষেপে এক পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে আনফিসা পিসি—সবাইকে পথ ছেড়ে ছেড়ে দিয়ে। অন্ধকারে কম্পিত প্রদীপ শিখার মতো তাঁর ছায়া কেঁপে উঠছে ফোমার মানসপটে। পরক্ষণেই নিভে গিয়ে মিলিয়ে গেল ঘন অন্ধকারে। সোজা পথ ধরে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছে পেলাগিয়া। সোফিয়া পাভলোভ্না মেদিনস্কায়া রয়েছে দাঁড়িয়ে। অসহায়ভাবে অসাড় হয়ে ঝুলে পড়েছে দুটো হাত—যেমনটি দেখেছিল ফোমা তার বসার ঘরে শেষ বিদায়ের দিনে। চোখদুটো বিশাল, আয়ত—কিন্তু কেমন যেন এক ভয়ের ছায়া কাঁপছে থরথর করে। সাশাও রয়েছে সেখানে। নির্বিকার ঔদাসীন্যে রয়েছে দাঁড়িয়ে। যেন ঐ কোলাহল ওর কানে প্রবেশ করছে না। দৃপ্ত পদক্ষেপে চলেছে এগিয়ে জীবনের তলানির ভিতর দিয়ে পঞ্চম সুরে গান গাইতে গাইতে। ওর দুটি কালো চোখের তারা দূরের পানে নিবদ্ধ। ফোমা শুনতে পাচ্ছে হৈ-চৈ, গোলমাল, হাসির হুল্লোড়, মত্ত-কণ্ঠের চিৎকার, পয়সা নিয়ে দরকষাকষির বিরক্তিকর গণ্ডগোল। ঐ অস্থির খাদে-পড়া জ্যান্ত মানুষগুলোর ভিড়ের উপরে ঝুলছে গান আর কান্নার শব্দ।

পাখার ঝাপ্টায় ঝট্পট্ শব্দ করতে করতে ঐ ভিড়ের মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলেছে টাকা। আর ওরা লোলুপ আগ্রহে হাত বাড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করছে। জেগে উঠছে সোনা-রুপার ঝন্ঝনানি, বোতলের টুং টাং আর ছিপি খোলার শব্দ। কে

যেন কাঁদছে গুমরে গুমরে। নারী কণ্ঠের এক করুণ সুর উঠছে জেগে ঃ

তাই বলি ভাই যদিন পারি
বেঁচে নি মনের সুখে
তার পরে—বুঝিবা ঘাসটিও আর
জন্মাবে না ধরার বুকে।

ঐ ভয়ঙ্কর ছবি দৃঢ়ভাবে গেঁথে গেল ফোমার মনে। আর প্রত্যেকবারেই আরো বড়ো, আরো দৃঢ়, আরো স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠতে লাগল ওর মানসপটে। জাগিয়ে তুলল ওর মনে এক গোলমেলে অনুভূতি। নদীর বুকে স্রোতের ধারার মতো সেই অনুভূতির ভিতরে এসে মিশতে লাগল ভয়, বিদ্রোহ, করুণা, ক্রোধ—আরো অনেক কিছু। ঐ সমস্ত কিছু যেন ওর বুকের ভিতরে ফুটে উঠে এক বিক্ষুব্ধ কামনায় রূপায়িত হয়ে বুকখানাকে সজোরে গুঁড়িয়ে দিতে লাগল। ঐ কামনার প্রবল সংঘাতে রুদ্ধ হয়ে এল ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি—চোখ ফেটে বেরিয়ে এল জলের ধারা। ইচ্ছে হল চিৎকার করে ওঠে—পশুর মতো গর্জন করে উঠে সমস্ত মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে। থামিয়ে দেয় তাদের অর্থহীন কোলাহল। জীবনের কলরব অহঙ্কার আর গর্বের উপরে ঢেলে দেয় এমন কিছু যা নাকি নতুন—ওর একান্ত নিজস্ব। দৃঢ়কণ্ঠে চিৎকার করে বলে ওঠে এমন কথা যা নাকি ওদের একই পথে করবে পরিচালিত। দাঁড়াবে না একে অন্যের বিরুদ্ধে। ফোমার ইচ্ছে হল ঘাড় ধরে ওদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কাউকে প্রহার করে, কাউকে করে আদর আর সবাইকে ভর্ৎসনা করে। প্রজ্বলিত করে তোলে সবার অন্তরে এক অগ্নিশিখা।

কিন্তু কিছু নেই ওর অন্তরে—নেই উপযুক্ত বাণী, নেই সেই আগুন। কেবল মাত্র আছে একটা অত্যুগ্র কামনা। ঐ গভীর উপত্যকার ভিতরের জীবনের কোলাহলের উর্ধ্বে নিজেকে দাঁড় করাল ফোমা। দেখল, দৃঢ় পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে নির্বাক হয়ে। হয়তো চিৎকার করে বলে উঠতে পারত ঐ মানুষগুলোর উদ্দেশ্যে ঃ "চেয়ে দেখো, কী জীবন যাপন করছ তোমরা। তোমাদের কি লজ্জা হয় না?" তাছাড়া হয়তো ফোমা ওদের গাল পাড়ত। কিন্তু যদি ওর কথা শুনে বলত তারা ঃ তবে কেমন করে আমরা কাটাব জীবন? আর এটাও সুস্পষ্ট যে এমনি প্রশ্নের জবাবে ওকে ঐ উচ্চ স্থান থেকে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে ঐ ভিড়ের পায়ের তলায়—ঐ ঘূর্ণ্যমান জাঁতাকলের নিচে। তারপর ওদের মিলিত কণ্ঠের অট্টহাসির ভিতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ধ্বংসের পারাবারে।

কখনো কখনো ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্নে ফোমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসত প্রলাপ—অর্থহীন সামঞ্জস্যহীন অসংলগ্ন কথা। এমনকি ভিতরের ঐ বেদনাময় সংগ্রামে ঘর্মাক্ত হয়ে উঠত সমস্ত দেহ। এক এক সময়ে ওর মনে হয়, বুঝিবা নেশার ঘোরে মাতাল হয়ে পাগল হয়ে যাচ্ছে। আর সেই জন্যেই ঐ বিষাদময় ছবি আপনা থেকেই জেগে ওঠে ওর মনে। প্রবল প্রচেষ্টায় ইচ্ছাশক্তির জোরে মুছে ফেলে ঐ ছবি—ঐ উত্তেজনা। কিন্তু যখনই একা থাকে, নেশার ঝোঁক থাকে কম, তখনই ওর অন্তর আচ্ছন্ন করে জেগে ওঠে ঐ প্রলাপ। তারই গুরুভারে হারিয়ে ফেলে সংজ্ঞা। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির পিপাসা তীব্রতর হয়ে ওঠে। কিন্তু ধন-সম্পদের গুরুভার শৃঙ্খল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়া ওর সাধ্যাতীত। ফোমার যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য রক্ষণাবেক্ষণের পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া আছে মায়াকিনের উপরে। কিন্তু সে এমনভাবে কাজ করতে শুরু করেছে যাতে করে ফোমা প্রতি মুহূর্তে অনুভব

করতে পারে তার নিজের উপরে ন্যস্ত রয়েছে কী গুরুভার। প্রতিনিয়ত পাওনা টাকার তাগিদ আসছে ওর কাছে। ছোটখাটো ব্যাপারেও ওর কর্মচারীরা আসছে ওর কাছে পরামর্শ নিতে,—হুকুম নিতে। কখনো চিঠিপত্রে, কখনো বা ব্যক্তিগত-ভাবে হাজির হয়ে। আগে এ সব ব্যাপারে ওকে মাথা ঘামাতে হত না, নিজেরাই ওরা করত সে সব কাজ। খুঁজে খুঁজে ওরা হোটেলে এসে হানা দেয়—কী করতে হবে? কেমন করে করতে হবে জিগ্‌গেস করে। না বুঝেই ফোমা হয়তো নির্দেশ দেয়। লক্ষ্য করে, ওদের চোখেমুখে চাপা ঘৃণার ভাব। আর সব ক্ষেত্রেই দেখে ওর হুকুম মতো ওরা কাজ তো করেইনি, বরং করেছে অন্যভাবে আরো ভালো করে। এরই ভিতর দিয়ে অনুভব করে ফোমা তার ধর্মবাবার সুচতুর প্রচ্ছন্ন হাতের অস্তিত্ব। বুঝতে পারে এমনি করেই বৃদ্ধ ওকে পথে আনার জন্যে দিচ্ছে চাপ। সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করল ফোমা যে নিজে সে তার ব্যবসার মালিক নয়, কেবল মাত্র একটি অংশ—অতি নগণ্য একটি ভগ্নাংশ মাত্র। এ-ব্যাপার আরো খেপিয়ে তুলল ফোমাকে। আরো দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল বৃদ্ধের কাছ থেকে। এমনকি নিজেকে ধ্বংস করেও ব্যবসা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার অত্যুগ্র কামনায় আরো ইন্ধন জোগাল। দারুণ রেগে গিয়ে ফোমা মদের দোকানে, হোটেলে, নোংরা রেস্তোরায় জলের মতো টাকা উড়াতে লাগল। কিন্তু তাও চলল না বেশি দিন। ইয়াকভ তারাশভিচ সমস্ত জমা টাকা তুলে নিয়ে ব্যাঙ্কের সঙ্গের সমস্ত কাজ-কারবার বন্ধ করে দিল। অনতিবিলম্বেই অনুভব করল ফোমা, যে এখনও হ্যান্ডনোটে কেউ কেউ ওকে টাকা ধার দেয় বটে, কিন্তু আগের মতো দিতে আর তেমন ইচ্ছুক নয়। এতে দারুণ আঘাত লাগল ওর আত্মসম্মানে। আরো বেড়ে গেল বিক্ষোভ। কিন্তু যখন শুনল যে ওর ধর্মবাবা ব্যবসায়ী মহলে গুজব ছড়াতে শুরু করেছে যে ফোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে—ওর একজন মুরুব্বি নিয়োগ করা দরকার, দারুণ ভীত হয়ে পড়ল ফোমা। ফোমার সঠিক ধারণা ছিল না তার ধর্মবাবার ক্ষমতার পরিধি সম্পর্কে। কিংবা এ ব্যাপারে কারুর পরামর্শ নেবারও সাহস করল না। ওর দৃঢ় বিশ্বাস ব্যবসায়ী মহলে বৃদ্ধের ক্ষমতা অসীম। ইচ্ছে করলে যা খুশি তাই করতে পারে। মায়াকিনের ক্ষমতা প্রথম প্রথম ওকে আঘাত করত। কিন্তু পরে ভেবে নিয়েছিল, সবকিছু ত্যাগ করে মাতালের জীবনই বরণ করে নেবে। শুধু একটি মাত্র সান্ত্বনা ছিল সাধারণ মানুষ। দিনের পর দিন ওর এ বিশ্বাস দৃঢ়তর হতে লাগল যে মানুষ ঢের বেশি অবিবেচক—আদৌ র‍্যাশনাল নয়। ওর চাইতে অনেক বেশি নিকৃষ্ট। তারা তাদের নিজেদের জীবনের প্রভু নয়, হীন দাস মাত্র। আর জীবনই ওদের ইচ্ছে-মতো বাঁকিয়ে-চুরিয়ে-পুড়িয়ে ফেলছে আর ওরা করছে আত্ম-সমর্পণ। কেউই ওরা চায় না মুক্তি। কেবলমাত্র ফোমা নিজে ছাড়া। যেহেতু ও চায় মুক্তি সুতরাং সগর্বে মদের গ্লাসের সঙ্গীদের চাইতে নিজেকে বড়ো বলে ভাবে। মন্দ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না ওদের ভিতরে।

একদিন এক পানশালায় আধ-মাতাল একটা লোক অভিযোগ করছিল জীবন সম্পর্কে। খর্বাকৃতি ছোটখাটো মানুষ, চোখদুটো নিষ্প্রভ। মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। গায়ে জামা। গলায় চক্‌চকে গলাবন্ধ। করুণভাবে চোখ পিট্‌ পিট্ করে। কানদুটো নড়ে, আর কথা বলার সময়ে মৃদু শীর্ণ কণ্ঠ কাঁপে থরথর করে।

মানুষের মধ্যে মানুষ হয়ে দাঁড়াবার জন্যে বহু কঠিন লড়াই করলাম। করলাম সব কিছু। ষাঁড়ের মতো খাটলাম। কিন্তু জীবন আমাকে ধাক্কা মেরে পাশে ফেলে

দিয়েছে—দলে পিষে গঁড়িয়ে দিয়েছে পায়ের চাপে। সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়েছে আমার। তাই আমি শুরু করেছি মদ খেতে। বুঝতে পারছি এবার ধ্বংস হয়ে যাবো। হাঁ, ঐ একমাত্র পথই খোলা রাছে আমার সামনে।

মূর্খ!—ঘৃণাভরা কণ্ঠে বলে উঠল ফোমা।—কেন চেয়েছিলে মানুষের ভিতর দিয়ে পথ করে নিতে? উচিত ছিল ওদের দূরে রাখা। এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে ওদের ভিতরে কোথায় তোমার স্থান। তারপর ঠিক স্থানটিতে গিয়ে দাঁড়াতে।

বুঝলাম না আপনার কথা।—ছোট ছোট করে ছাঁটা-চুল মাথাটা নাড়তে নাড়তে বলল বেঁটেখাটো লোকটি। ফোমা হেসে উঠল—আত্মসন্তুষ্টির দরাজ হাসি।

একি আর তোমার বুঝবার মতো কথা?

না। জানেন, আমার মনে হয়, ঈশ্বর যাকে কৃপা করেন—

ঈশ্বর নয়, মানুষ—মানুষই সংগঠিত করে জীবন।—হঠাৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠল ফোমা। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের মন্তব্যের ধৃষ্টতায় নিজেই অবাক হয়ে গেল। তারপর প্রশ্নভরা সংকুচিত দৃষ্টি মেলে বেঁটে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ঈশ্বর তোমাকে যুক্তি দিয়েছেন?—একটু পরে বিরক্তি কাটিয়ে প্রশ্ন করল ফোমা।

নিশ্চয়ই। মানে একটি ক্ষুদ্র লোকের অংশে যতটুকু পড়ে।—অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল লোকটি।

বেশ কথা, তাহলে একটি দানা বেশি শস্যও তুমি তাঁর কাছে চাইতে পারো না। নিজের যুক্তি দিয়েই তোমাকে গড়ে তুলতে হবে জীবন। ঈশ্বর করবেন বিচার। আমরা সবাই তাঁর দাস। তাঁর চোখে প্রত্যেকের মূল্যই সমান। বুঝলে?

প্রায়ই এমন হত যে, ফোমা এমন সব কথা বলে ফেলত যে, সেটা ওর নিজের কাছেই মনে হ'ত ধৃষ্ট। ফলে, নিজের চোখে নিজেকে খুব বড়ো বলে মনে হত। কতগুলো অপ্রত্যাশিত দুঃসাহসী চিন্তা ও কথা এক এক সময়ে বিদ্যুৎচমকের মতো জেগে ওঠে, যেন ওর মাথার ভিতরের কোনো একটা ধারণা তার জন্ম দিচ্ছে। আর বহুবার লক্ষ্য করে দেখেছে যে যে-কথা একান্ত সতর্কতার সঙ্গে ভালোভাবে চিন্তা করে সেগুলো তেমন ভালোভাবে প্রকাশ করে বলতে পারে না। যেন আরো বেশি দুর্বোধ্য, আরো বেশি ধোঁয়াটে হয়ে প্রকাশ পায়, যেগুলো আকস্মিক চমক দিয়ে বেরিয়ে আসে ওর অন্তর থেকে, আর তুলনায়।

এমনভাবে চলেছে ফোমা যেন সে হেঁটে চলেছে জলাভূমির ভিতর দিয়ে। প্রতি পদক্ষেপে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা। চোরাবালুতে পা আটকে কিংবা কর্দমাক্ত পাঁকে ডুবে গিয়ে। অন্য দিকে ওর ধর্মবাপ নদীর মাছের মতো একটা শুকনো কঠিন মাটির উপরে মোড়াগুড়ি দিতে দিতে দূর থেকে তার ধর্ম-ছেলের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করে চলেছে।

ফোমার সঙ্গে ঝগড়ার পরে বিষাদক্লিষ্ট চিন্তিত মুখে বাড়ি ফিরে এল ইয়াকভ তারাশভিচ। শুকনো চোখে ঝরছে আগুনের ফুলকি। পাকানো দড়ির মতো সোজা টান হয়ে উঠেছে দেহ। নিদারুণ বেদনায় মুখের বলি রেখাগুলো উঠছে কুঁচকে। মুখখানা যেন আরো ছোট, আরো কালো হয়ে উঠেছে। ঐ অবস্থায় লিউবভ যখন ওকে দেখল, তার মনে হল, কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন বৃদ্ধ। কিন্তু প্রবল প্রচেষ্টায় তাকে চেপে রেখেছেন জোর করে। নীরব কম্পিত পায়ে ঘরময় পায়চারি করে ফিরতে লাগল বৃদ্ধ মায়াকিন। অল্প দু একটা কথায় মেয়ের

প্রশ্নের জবাব দিয়ে। অবশেষে চিৎকার করে উঠল ঃ একা থাকতে দে আমাকে! যাই হোক না কেন, তোর তাতে কী দরকার?

বৃদ্ধের তীক্ষ্ম সবুজ চোখ ব্যথায় ম্লান। সেই বেদনা-ঘন কালোছায়া লক্ষ্য করে লিউবার মন ব্যথাতুর হয়ে উঠল। ওর মনে হল কী হয়েছে জেনে নেওয়া দরকার। তারপর যখন মায়াকিন খাবার টেবিলে এসে বসল, হঠাৎ তার গলা জড়িয়ে ধরে—ঝুঁকে মুখের দিকে তাকিয়ে চিন্তাভরা কোমল কণ্ঠে বলল ঃ

তোমার কি অসুখ করেছে বাবা, বলো?

কচিৎ কখনো লিউবা তার বাবাকে অমন করে জড়িয়ে ধরে। কন্যার আলিঙ্গনে বৃদ্ধের অন্তর বিগলিত হয়ে ওঠে। অবশ্য কখনো তার অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয় না, কিংবা প্রতি-আলিঙ্গনও করে না। তবুও মেয়ের অন্তরের সেই ভালোবাসা অনুভব না করে পারে না। কিন্তু এবার সে কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে ওর হাতদুটো ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল ঃ নিজের কাজে যা! ইভের কৌতূহলের চুলকানিতে ছট্‌ফটিয়ে উঠেছিস!

কিন্তু লিউবা চলে গেল না। স্থির দৃষ্টিতে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আহত কণ্ঠে বলল ঃ

কেন তুমি সব সময়ে আমার সঙ্গে অমন করে কথা বলো বাবা? যেন আমি এখনো নেহাত একটা কচি খুকি, বা বোকা?

তার কারণ, তুই বড়ো হয়েছিস সত্য, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি এখনো হয়নি। এটাই হল কথা। যা বস গে, খেয়ে নে।

নীরবে লিউবা উঠে গিয়ে বাবার মুখোমুখি বসল। প্রবল চেষ্টায় দৃঢ়ভাবে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আছে, পাছে কোনো অসম্মানসূচক কথা বেরিয়ে আসে মুখ থেকে। ধীরে খেয়ে চলেছে মায়াকিন। যদিও সেটা তার স্বভাববিরুদ্ধ। বহুক্ষণ ধরে বাঁধাকপির ঝোলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ভিতরে চামচ ডুবিয়ে নাড়াচাড়া করে চলেছে।

যদি তোর নিরেটবুদ্ধি বাবার ভাবনাচিন্তাগুলি উপলব্ধি করতে পারত?—হঠাৎ শিস দিয়ে ওঠার মতো শব্দ করে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলে উঠল মায়াকিন।

হাতের চামচটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল লিউবভ ঃ কেন তুমি আমাকে অপমান করছ বাবা? দেখো, আমি একা, কেউ নেই আমার সঙ্গী-সাথী। বুঝতে পারো কী কষ্টের জীবন আমার! আর তুমি কিনা ভালোমুখে একটি কথাও বলো না আমার সঙ্গে। তোমার জীবনও সঙ্গীহীন। খুবই কষ্টের জীবন তোমার—সেটা আমি বুঝি। বেঁচে থাকা তোমার পক্ষে খুবই কষ্টকর। কিন্তু সে জন্যে দায়ী তুমি নিজে। তুমি একা!

নাও, এবার বালামের গাধীটাও কথা বলতে শুরু করেছে!—হাসতে হাসতে বলল মায়াকিন।—বেশ, তারপর?

তুমি তোমার নিজের বুদ্ধির অহঙ্কারেই বিভোর।

আর কি?

ওটা ভালো নয়। তাছাড়া বড্ডো কষ্ট দেয় আমাকে। কেন তুমি আমাকে অমন করে দূরে ঠেলে দাও? তুমি তো জানো তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।—বলতে বলতে লিউবার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। ওর বাবার চোখে পড়তেই তার মুখ-খানাও থরথর করে কাঁপতে শুরু করল।

যদি তুই মেয়ে না হতিস! মারফা পুসাদ্‌নিৎসার মতো মাথা থাকত তোর...কী বলিস লিউবা? তবে আমি সবাইকেই হেসে উড়িয়ে দিতে পারতাম। ফোমাকেও। থাম, এখন আর কাঁদিস নে।

ফোমার কী খবর?—চোখ মুছে প্রশ্ন করল লিউবা।

সে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। হাঃ হাঃ হাঃ! বলে, আমার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে আমাকে মুক্তি দিন। ও চায় ওর আত্মাকে রক্ষা করতে। এই খেয়াল ঢুকে বসেছে ফোমার মাথায়।

আচ্ছা এর মানে কি?—একটু ইতস্তত করে প্রশ্ন করল লিউবভ। লিউবা বলতে চেয়েছিল যে ফোমার ইচ্ছেটা ভালো—মহৎ অভীপ্সা। অবশ্য যদি সেটা খাঁটি হয়ে থাকে। কিন্তু পাছে বৃদ্ধ চটে যায় এই ভয়ে সে কেবলমাত্র প্রশ্নভরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কী এর মানে?—নিদারুণ উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠল মায়াকিন,—এ একটা খেয়াল ঢুকেছে ওর মাথায়। হয় অত্যধিক মদ খাওয়ার জন্যে, নয়তো—ঈশ্বর না করুন, ওর গোঁড়া মায়ের আত্মা থেকে। আর এমনিভাবে যদি ওর ভিতরে পৌত্তলিকতার গ্যাঁজলা উঠতে থাকে, তবে আমাকে কঠিন হাতে লড়াই করতে হবে ওর সঙ্গে ওকে পথে আনতে। দারুণ সংঘর্ষ হবে। আমার বিরুদ্ধেও বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে। চরম ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। বয়েস নেহাত কম, এখনো বুদ্ধিশুদ্ধি হয়নি। বলে কিনা আমি সব উড়িয়ে দেবো মদ খেয়ে—সব ধোঁয়া করে দেবো। দেখাচ্ছি আমি কেমন করে মদ খাও!—বলতে বলতে দারুণ ক্রোধে মায়াকিন ঘুসি পাকিয়ে মাথার উপরে হাত তুলল।—কী সাহস! কে দাঁড় করিয়েছে ব্যবসা? কে গড়ে তুলেছে? তুই? না, তোর বাবা। চল্লিশ বছরের কঠোর পরিশ্রম ঢেলে দিয়েছে ঐ ব্যবসার ভিতরে। আর তুই চাস কিনা তা উড়িয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিতে? আমরা ব্যবসায়ীরা শতাব্দীকাল ধরে গোটা রুশিয়াকে কাঁধে বয়ে নিয়ে এসেছি—আর এখনো চলেছি বহন করে। মহান পিটার ছিলেন দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন জার। তিনি বুঝতেন আমাদের মূল্য—আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আমাদের ব্যবসায় শিক্ষিত করে তোলার জন্যে বই ছাপালেন। আমার কাছে একখানা বই আছে। বইখানা ছাপা হয়েছিল ১৭২০ সালে, পলিদর ভিরগিলি উরবান্‌স্কির নির্দেশে। হাঁ, এ কথা বুঝে দেখা দরকার। ভালো করেই বুঝেছিলেন তিনি, তাই আমাদের জন্যে পথ পরিষ্কার করে দিয়ে গেছেন। আর আজ আমরা দাঁড়িয়েছি নিজের পায়ে। বুঝে নিতে পেরেছি নিজেদের স্থান। সুগম করো আমাদের পথ! আমরা স্থাপন করেছি জীবনের ভিত্তিমূল। ইটের বদলে মাটির ভিতরে পুঁতেছি আমাদেরকে। এখন আমাদের গড়ে তুলতে হবে ইমারত। কাজ করবার স্বাধীনতা দাও আমাদের। এখানেই হচ্ছে সমস্যা। কিন্তু ফোমকা কিছুতেই বুঝবে না তা। কিন্তু বুঝতেই হবে ওকে—কাজ শুরু করতে হবে আবার। ওর রয়েছে ওর বাবার সম্পদ। আমার মৃত্যুর পরে আমার বিষয় সম্পত্তিও বর্তাবে ওর হাতে। কাজ কর কুত্তির বাচ্চা! কিন্তু ও কিনা বকতে শুরু করেছে প্রলাপ। না দাঁড়াও! আমি তোমাকে তুলে এনে দাঁড় করাচ্ছি সঠিক স্থানে।—উত্তেজনায় বৃদ্ধের গলা বুজে এল। এমন আগুন-ঝরা ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে মেয়ের দিকে যেন তার সামনে লিউবার বদলে বসে রয়েছে ফোমা।' দারুণ ভীত হয়ে পড়েছে লিউবা। কিন্তু বাবার কথায় বাধা দেবার এতটুকু সাহসও ওর নেই। নীরব দৃষ্টি মেলে বাবার থম থমে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

পথ নির্মাণ করে গেছেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা। তোকে চলতে হবে সেই পথ বেয়ে। কিসের জন্যে পঞ্চাশ বছর ধরে আমি চলেছি হেঁটে? এই জন্যে যে, আমার মৃত্যুর পরে আমার বংশধরেরাও চলবে ঐ পথে। কিন্তু কোথায় আমার বংশধর?— নিদারুণ দুঃখে বেদনায় বৃদ্ধ মাথা নিচু করল। ভেঙে পড়ল কণ্ঠস্বর। তারপর ব্যথাতুর কণ্ঠে বলতে লাগল স্বগতোক্তির মতো :

একটা জেলের কয়েদী। একেবারে গোল্লায় গেছে। আর একটা মাতাল। এতটুকু আশাভরসা নেই ওর উপরে। বল দেখি মেয়ে, মরার আগে কার হাতে তুলে দিয়ে যাবো আমার এই কাজ, এই শ্রম? যদি একটা জামাইও থাকত! ভেবেছিলাম ফোমকা মানুষ হবে, ধারালো হয়ে উঠবে। তারপর তার হাতে তুলে দিয়ে যাবো তোকে আর তোর সঙ্গে আমার যা কিছু আছে সব। কিন্তু ফোমকা অপদার্থ। কিন্তু ওর বদলে আর কাউকেই তো নজরে পড়ছে না। আজকালকার ছেলেগুলো সব কী? আগের দিনের লোক ছিল যেন লোহা। কিন্তু আজকাল সব যেন ইণ্ডিয়া রবার। সবাই নমনীয়। কিছুই নেই ওদের ভিতরে—চরিত্রের দৃঢ়তা নেই এতটুকুও! কী ওরা? কেন এমন হয়?

শঙ্কিত দৃষ্টি মেলে মায়াকিন মেয়ের মুখের দিকে তাকাল। লিউবা নীরব।

বল দেখি—জিগ্‌গেস করল মায়াকিন,—কী তুই চাস? কেমন করে বাঁচা বাঞ্ছনীয় তোর মতে? কী চাস তুই? পড়েছিস শুনেছিস অনেক, বল আমাকে কী তোর দরকার?

সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে এই ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হল লিউবা। কেমন যেন একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। খুশিও হয়ে উঠল এই ভেবে যে, ওর বাবা এই সম্পর্কে জিগ্‌গেস করছেন ওর কাছে। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও পেল, পাছে ওর জবাবে বাবার চোখে হেয় হয়ে পড়ে। অবশেষে সাহস সঞ্চয় করে কাঁপা গলায় অনিশ্চিত-ভাবে বলতে শুরু করল : আমি চাই যে সবাই সুখী হবে, সন্তুষ্ট হবে। হবে সবাই সমান—সবারই থাকবে জীবনধারণের সমান অধিকার। সবাই পাবে স্বাধীনতা। যেমন সবাই পেয়ে থাকে বাতাস।

লিউবার উত্তেজনাভরা কথার গোড়ার দিকে ওর বাবা কেমন যেন একটু চিন্তাভরা ঔৎসুক্য নিয়ে তাকিয়েছিল ওর মুখের দিকে। কিন্তু যতই দ্রুত বলে চলল, মায়াকিনের চোখেমুখে ফুটে উঠতে লাগল অন্য ধরনের অভিব্যক্তি। অবশেষে ঘৃণাভরা শান্ত কণ্ঠে বলল :

আগেই জানতাম এ কথা। তুই হচ্ছিস একটা গিল্টি-করা মূর্খ।

লিউবা মাথা নিচু করল। কিন্তু পরক্ষণেই মাথা তুলে ব্যথাভরা কণ্ঠে বলল : তুমি নিজেই তো বললে এ কথা। স্বাধীনতা।

চুপ করে থাক!—রুক্ষকণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠল মায়াকিন।—কেমন করে সমস্ত মানুষ সমানভাবে সুখী হবে? যখন সবাই চায় অন্যের উপরে উঠতে? এমনকি একটা ভিক্ষুকের পর্যন্ত রয়েছে অহঙ্কার। সব সময়েই কিছু না কিছু নিয়ে গর্ব করে অন্যের কাছে। একটা ছোট শিশু পর্যন্ত চায় তার খেলার সাথীদের ভিতরে প্রথম হতে। তাছাড়া একটা মানুষ কখনো অন্য একটা মানুষের কাছে করবে না নতিস্বীকার। মূর্খেরাই কেবলমাত্র বিশ্বাস করবে এ কথা। প্রত্যেকটা মানুষের নিজের আত্মা আছে। আর আছে মুখ। কেবল যারা নিজেদের ভালোবাসে না, তাদেরই দাঁড় করানো যায় এ পর্যায়ে। কী বলিস? অনেক বাজে জিনিস পড়েছিস তুই আর তা গিলে বসেছিস।

বৃদ্ধের মুখের উপরে ভেসে উঠল তিক্ত ভর্ৎসনার ঘৃণাভরা অভিব্যক্তি। নিঃশব্দে চেয়ারটা সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর হাতদুটো পিছনে নিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে মাথা নাড়তে নাড়তে আপন মনেই বলতে লাগল। রাগে উত্তেজনায় পাংশু হয়ে উঠেছে লিউবার মুখ। বৃদ্ধের সামনে, তার অস্ফুট কণ্ঠের কথা শুনে নিজেকে মনে হচ্ছে নির্বোধ, শক্তিহীন। ওর বুকের ভিতরে হৃদপিণ্ডটা দ্রুত তালে চলতে শুরু করল।

: জেভ-এর মতো আমি একা। একেবারে একা। হা ঈশ্বর! কী করি আমি? আঃ! একা। আমি কি জ্ঞানী নই? বুদ্ধিমান নই? কিন্তু জীবন আমাকেও হতবুদ্ধি করে দিয়েছে। কী চায় জীবন? কাকে ভালোবাসে? যারা ভালো, তাদের আঘাত করে। যারা মন্দ, এতটুকুও কষ্ট পায় না। শাস্তি পায় না। কেউ বুঝে উঠতে পারে না জীবনের বিচার।

বৃদ্ধের জন্যে তরুণীর অন্তর ব্যথায় মুচড়ে উঠল। তাকে সাহায্য করবার এক সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল ওর অন্তরে। জেগে উঠল তার কাজে আসার জন্যে এক নিদারুণ ব্যাকুলতা। উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট মৃদুকণ্ঠে বলল : দুঃখ করো না বাবা, লক্ষ্মীটি! তারাস এখনো বেঁচে আছে। হয়তো সে—

মুহূর্তে মায়াকিন থমকে দাঁড়াল। বুঝিবা কেউ ওর পায়ে পেরেক ঠুকে স্তব্ধ করে দিয়েছে চলার গতি। ধীরে মায়াকিন মুখ তুলল :

যে গাছ যৌবনে বেঁকে যায়—যাকে সোজা করা যায়নি, বড়ো হলে নিশ্চয়ই সে ভেঙে যায়। কিন্তু তবুও তারাস—এখনো আমার কাছে ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো। যদিও আমার সন্দেহ আছে ফোমার চাইতে সে ভালো কিনা। গরদিয়েফের একটা চরিত্র আছে। ও পেয়েছে ওর বাবার সাহস। অনেক কিছুর ভারই ও নিতে পারে নিজের কাঁধে। কিন্তু তারাসকা—ঠিক সময়েই তার কথা তুই মনে করিয়ে দিয়েছিস। ঠিক কথা।

এক মুহূর্ত আগে যে বৃদ্ধ হারিয়ে ফেলেছিল সাহস, শুরু করেছিল অভিযোগ,—বেদনাভরা অন্তরে জালে আবদ্ধ ইঁদুরের মতো করছিল ছোটাছুটি এতক্ষণে ধীর পদক্ষেপে চিন্তাক্লিষ্ট মুখে এগিয়ে এল টেবিলের কাছে। তারপর চেয়ারটা সযত্নে ঠিক করে নিয়ে বসতে বসতে বলল :

বেশ, পেড়ে দেখব কথাটা তারাসকার কাছে। ও আছে এখন উসোলির কোনো একটা কারখানায়। এক ব্যবসায়ী খবর দিয়েছে আমাকে। মনে হয় তারা সেখানে সোডা তৈরি করে। খোঁজ-খবর নিচ্ছি। চিঠি লিখব ওকে।

অনুমতি দাও আমি ওকে চিঠি লিখি, বাবা।—মিনতিভরা কোমল কণ্ঠে বলল লিউবভ। খুশির আনন্দে ওর সর্বাঙ্গ কাঁপছে।

তুই?—লিউবার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল মায়াকিন। পরক্ষণেই চুপ করে গেল। তারপর কিছুক্ষণ ভেবে আবার বলল :

ঠিক আছে, সে-ই ভালো। তুই-ই লিখে দে। জিগ্গেস করিস ও বিয়ে করেছে কিনা। কেমন করে জীবন-যাপন করছে। কী ভাবছে? তারপর সময় হলে আমি ঠিক করে দেব কী লিখতে হবে।

এক্ষুনি করো বাবা!—বলল তরুণী।

এখন তোকে বিয়ে দেয়া দরকার। কটাচুল একটা ছেলের দিকে আমি নজর রাখছি। তেমন নির্বোধ মনে হয় না ছেলেটাকে। তাছাড়া বিদেশ থেকে শিখে পড়ে এসেছে।

কে বাবা, স্মলিন?—উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করল লিউবা। কেমন যেন একটা দুশ্চিন্তার সুর বেজে উঠল ওর কণ্ঠে।

ধর যদি সে-ই হয়? কী হল তাতে?—ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে প্রশ্ন করল মায়াকিন।

কিছু না। ওকে আমি চিনি না।—একটু ইতস্তত করে জবাব দিল লিউবভ।

তোদের পরিচয় করিয়ে দেবখন। সময় হয়েছে লিউবভ, সময় হয়েছে। ফোমা সম্পর্কে আমাদের আশা এখন খুবই কম। যদিও একেবারে আশা যে ছেড়ে দিয়েছি তা নয়।

ফোমার কথা আমি ভাবিনি কোনোদিনও। সে কি আমার যোগ্য?

ওটা ভুল কথা। তুই যদি বুদ্ধিমতী হতিস, বোধহয় সে এমনভাবে উচ্ছন্নে যেতে পারত না। যখনই আমি তোদের একসঙ্গে দেখতাম, ভাবতাম, মেয়েটা ওকে আকর্ষণ করছে নিজেই। খুবই ভালো হত তাহলে। কিন্তু দেখলাম, ভুল হয়েছিল আমার। ভেবেছিলাম নিজের কিসে ভালো হয় সেটা তুই না বললেও বুঝবি। ওটাই হচ্ছে পথ, বুঝলি?—উপদেশ-ছলে বলল মায়াকিন।

বাবার কথায় চিন্তিত হয়ে পড়ল লিউবা। সুস্থ, সবল, স্বাস্থ্যবতী লিউবা কিছুদিন ধরে ভাবছিল বিয়ে করার কথা। তাছাড়া তার নিজের একাকিত্ব ঘোচাবার আর কোনো উপায়ই পড়ছিল না তার চোখে। ওর মনে তীব্র হয়ে উঠেছিল বাবার আওতা থেকে দূরে সরে গিয়ে কিছু পড়াশুনা করার ইচ্ছে। কিন্তু সে ইচ্ছে বহুদিন থেকে দমন করে আসছে, যেমন পরিত্যাগ করতে হয়েছে আরো বহু ইচ্ছে, বহু আকাঙ্ক্ষা। বিলীন করে দিয়েছে তার নিজের অন্তরের মধ্যে। নানান ধরনের বই পড়ার ভিতর দিয়ে একটা ঘন তলানি পড়েছে ওর মনে। যদিও সেটা জীবন্ত, তার সজীবতা প্রোটোপ্লাজ্‌মের মতো। ঐ তলানি তরুণীর মনে জন্ম দিল জীবনের প্রতি এক তীব্র অসন্তোষের। দৈহিক মুক্তির এক উদগ্র কামনার। বাবার কড়া অভিভাবকত্ব থেকে মুক্তি পাবার আকুল অভিলাষের। কিন্তু এমন শক্তি নেই যে এ ইচ্ছেকে সফল করে তোলে। কিংবা সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট ধারণাও নেই সে মুক্তির সম্পর্কে। কিন্তু প্রকৃতির প্রভাব শুরু করে দিল তার স্বাভাবিক কাজ। শিশু-সন্তান বুকে কোনো তরুণী মাকে দেখলে পরেই ব্যথায় হতাশায় পূর্ণ হয়ে ওঠে ওর অন্তর। কখনো কখনো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে তার যৌবন-শ্রী মণ্ডিত পরিপূর্ণ দেহ, কালো চোখ ও মুখের দিকে তাকিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে। এক অব্যক্ত বেদনায় পূর্ণ হয়ে ওঠে দেহমন। অনুভব করে কোথায়, এক কোণে ওকে ফেলে রেখে জীবন বয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। এক্ষুনি বাবার কথা শুনে মনে ছবি এঁকে চলল,—কেমন দেখতে হবে স্মলিন। ওকে দেখেছে লিউবা, যখন সে ছিল স্কুলের ছাত্র। মুখময় দাগ, খাঁদা নাক, কিন্তু সব সময়েই থাকত পরিচ্ছন্ন। সদা গম্ভীর স্মলিন ভারি পায়ে নাচত থপ্ থপ্ করে অদ্ভুত বিশ্রীভাবে। আর কথাবার্তা ছিল নীরস। তারপর কেটে গেছে দীর্ঘদিন। এতদিন সে ছিল বিদেশে। করেছে পড়াশুনা। কেমন হয়েছে সে এখন? স্মলিন থেকে ওর চিন্তা মোড় নিল ভাইয়ের দিকে। ক্ষুব্ধ মনে ভাবতে লাগল, কী লিখবে সে ওর চিঠির জবাবে? কল্পনায় আঁকা ভাইয়ের ছবি এসে আড়াল করে দাঁড়াল ওর বাবা আর স্মলিনকে। তক্ষুনি মন স্থির করে ফেলল, যতক্ষণ তারাসের সঙ্গে দেখা না হচ্ছে ও বিয়েতে সম্মতি দেবে না।

হঠাৎ ওর বাবা উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন : কিরে লিউবভকা! চিন্তিত হয়ে পড়লি কেন? কী ভাবছিস অত?

সব কিছুই এত দ্রুত ঘটে যাচ্ছে,—মৃদু হেসে প্রত্যুত্তরে বলল লিউবা।

কী ঘটে যাচ্ছে দ্রুত?

সবকিছুই। এক সপ্তাহ আগেও এমন ছিল যে তারাসের নামও উচ্চারণ করা যেত না তোমার সামনে। কিন্তু এখন—

প্রয়োজন, বুঝলি খুকি! প্রয়োজন হচ্ছে এমন একটা শক্তি যে লোহার রড্‌কেও স্প্রিং-এ পরিণত করে তোলে। আর স্প্রিং হচ্ছে অনমনীয়। তারাস—দেখা যাক কী সে। জীবনের সঙ্গে যে সংগ্রাম করে তাকে তারিফ করতে হবে বৈকি। জীবন পারে না তাকে দুমড়ে মুচড়ে দিতে। বরং জীবনকে দুমড়ে মুচড়ে সে তার নিজের উপযুক্ত করে তোলে। সেই মানুষকেই আমি শ্রদ্ধা করি। এসো আমরা হাত মেলাই। এসো দুজনে মিলে চালাই ব্যবসা। কি বলো, আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি। কত অস্থির হয়ে উঠেছে আজকাল আমার জীবন। প্রতিটি বছর এগিয়ে আসছে, নিয়ে আসছে আরো বেশি আনন্দ, আরো বেশি আয়েস। ইচ্ছে হয় চিরদিন বেঁচে থাকি আর কাজ করে যাই।—বৃদ্ধ ঠোঁটে মুখে একটা শব্দ করে উঠে হাত ঘসল। কী এক নিদারুণ লুব্ধতায় ওর কুত্‌কুতে চোখদুটো চকচক করে উঠল।

কিন্তু তোরা ক্ষীণজীবীর দল। বয়সের আগেই তোদের আসে জরা। তারপর শেষ হয়ে যাস। বেঁচে থাকিস বুড়ো মুলোর মতো। দিনে দিনে জীবন সুন্দর হয়ে উঠছে এ কথা তোদের কাছে দুর্বোধ্য। এই সাতষট্টি বছর বেঁচে আছি আমি এই দুনিয়ার বুকে। গোরের পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছি। তবুও দেখতে পাচ্ছি আগের দিনে আমার বয়সকালে পৃথিবীতে ছিল মাত্র অল্প কয়েকটি ফুল। আর সে ফুল তো তেমন সুন্দর ছিল না আজকের দিনের প্রস্ফুটিত অজস্র ফুলের মতো। আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে সব কিছুই। আজকালকার বাড়িঘরগুলো পর্যন্ত কত সুন্দর। কী সুন্দর ব্যবসা-বাণিজ্যের যন্ত্রপাতি! কী বিরাট বিরাট সব জাহাজ, স্টিমার! মগজী দুনিয়ার সবকিছুর ভিতরেই মগজের পরিচয়। চেয়ে দেখো, আর ভাবো—তোমরা সব কী চালাক, কী চতুর! হায় মানুষ! তোমরা পুরস্কার পাবার যোগ্য—শ্রদ্ধা পাবার যোগ্যে। জীবনকে কী সুন্দর করেই না গড়ে তুলেছ তোমরা! সবকিছু সুন্দর, সবকিছু মনোরম। কেবলমাত্র আমাদের বংশধরেরা—তোমাদের নেই সেই প্রাণবন্ত অনুভূতি। সাধারণ মানুষের ভিতরের যে-কোনো একটা জুয়া-চোরও তোমাদের চাইতে চতুর। ধরো ঐ ইয়ঝভ। কী সে? তবুও কিনা সে আসে আমাদের বিচার করতে! এমনকি জীবনকে পর্যন্ত, কী দুঃসাহস! কিন্তু তোরা? ফুঃ! তোরা জীবন কাটাস ভিক্ষুকের মতো। আনন্দে পশুর মতো আর দুর্ভাগ্যে কীটপতঙ্গের মতো অসহায়। একেবারে অপদার্থ তোরা। যদি কেউ তোদের শিরায় আগুন ইন্‌জেকশন করে দেয়—যদি তোদের গায়ের চামড়া খসিয়ে তাতে নুন ছিটিয়ে দেয় তবে হয়তো তোরা লাফাতিস।

বেঁটে শীর্ণ বলিকুঞ্চিত দেহ ইয়াকভ তারাশভিচের মুখের কালো ভাঙা দাঁত, মাথায় টাক—যেন জীবনের উত্তাপে পুড়ে পুড়ে ধোঁয়ায় কালো হয়ে উঠেছে। নিদারুণ উত্তেজনায় ঘৃণাভরা কণ্ঠ উজাড় করে ঢেলে দিতে লাগল, তার সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, কোমলাঙ্গী তরুণী কন্যার উপরে। অপরাধী দৃষ্টি মেলে তরুণী তাকিয়ে রয়েছে তার বাবার মুখের দিকে। বিব্রত মুখে ফুটে উঠেছে অপ্রস্তুত হাসি। আর ঐ প্রাণবন্ত দৃঢ় অভিলাষী বৃদ্ধের প্রতি ক্রমেই তার শ্রদ্ধা চলেছে বেড়ে।

* * *

হোটেলে-হোটেলে, পানশালায়-পানশালায় পাগলের মতো প্রলাপ বকে বকে

ঘুরে বেড়াতে লাগল ফোমা। ক্রমেই ওর পার্শ্বচরদের সম্পর্কে ওর ঘৃণা আরো দৃঢ় বদ্ধমূল হয়ে উঠতে লাগল। কখনো কখনো ওর অন্তরে জেগে ওঠে আকাঙ্ক্ষা—ওদের ভিতর থেকে কেউ ওর ঐ শয়তানি অনুভূতির বিরুদ্ধে করুক প্রতিবাদ। ইচ্ছে হয় এমন একটা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সাহসী লোকের দেখা মিলুক যার কাছ থেকে ও পাবে তীব্র ভর্ৎসনা। লজ্জায় লাল হয়ে উঠবে ওর চোখমুখ। ক্রমেই ওর এ-আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। প্রত্যেকবার—যখনই ওর মনে জেগে ওঠে ঐ কামনা, ও চায় এগিয়ে আসুক এমন একটা মানুষ ওর সাহায্যে যে অন্তর দিয়ে অনুভব করবে ও হারিয়ে ফেলেছে পথ! আর তাই ছুটে চলেছে ধ্বংসের দিকে।

ভাইসব!—একদিন চিৎকার করে বলতে লাগল ফোমা এক পানশালার টেবিলে আধ-মাতাল অবস্থায়। ওকে ঘিরে রয়েছে দুর্বোধ্য চরিত্রের কতগুলো লুব্ধ মানুষ। ওরা এমনভাবে খানাপিনা চালিয়েছে যেন মনে হয় বহুদিন ওদের মুখে একটুকরো রুটিও পড়েনি।

ভাইসব! দারুণ বিরক্তি লাগছে আমার। হয়রান হয়ে উঠেছি আমি তোমাদের নিয়ে। মারো আমাকে—নির্দয়ভাবে প্রহার করো। তাড়িয়ে দাও। তোমরা পাজী, কিন্তু তবুও আমার চাইতে তোমরা পরস্পর খুব কাছাকাছি। কেন তা? আমিও কি তোমাদেরই মতো মাতাল আর পাজী নই? কিন্তু তবুও আমি তোমাদের কাছে অপরিচিত। দেখতে পাচ্ছি, আমি অচেনা। আমার পয়সায় তোমরা মদ খাচ্ছো আর গোপনে আমারই গায়ে থুতু ছিটোচ্ছো। আমি বুঝতে পারি সেটা। কেন অমন করো?

সত্যি, ওরা অন্য রকমের ব্যবহার করতে পারত ওর সঙ্গে। অন্তরে অন্তরে কেউ-ই হয়তো নিজেকে নিচু ভাবে না ফোমার চাইতে। কিন্তু ফোমা ধনী। তাই-ই ওকে নিজেদের সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে প্রধান অন্তরায়। তাছাড়া এমন সব বিবেকে-দংশন-করা বিদ্রূপাত্মক কথা বলে ফোমা যে তাতে ওরা দারুণ বিব্রত হয়ে ওঠে। তাছাড়া ফোমা শক্তিশালী, আর সব সময়েই মুখিয়ে আছে মারপিট করার জন্যে। তাই ওরা ওর বিরুদ্ধে একটি কথা বলতেও সাহস করে না। আর ফোমা কিনা চায় তাই। ফোমার তীব্র ইচ্ছে যে ওদের ভিতরের কেউ একজন দাঁড়াক ওর বিরুদ্ধে—দাঁড়াক মুখোমুখি। বলুক ওর মুখের উপরে কঠিন শক্ত কথা—যা নাকি যন্ত্রের মতো অমোঘ শক্তিতে ওকে উল্‌টে ফেলে দেবে ঢালু পথ থেকে। অবশেষে ফোমা যা চাইছিল তার সাক্ষাৎ মিলল। একদিন ওর দিকে তেমন মনোযোগ না দেয়ার জন্যে চিৎকার করে গাল পেড়ে উঠল ফোমা তার মদের গ্লাসের সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে।

এই ছোঁড়ারা চুপ! চুপ করে থাক সবাই! কে জোগাচ্ছে তোদের খানাপিনা? দাঁড়া শায়েস্তা করছি তোদের। কেমন করে মান্য করতে হয় আমাকে সেটা শিখিয়ে দিচ্ছি। জেলের ঘুঘুরা! আমি যখন কিছু বলব সবাই চুপ করে থাকবি।

সত্যি সত্যি সবাই চুপ করে গেল। ভয় হল ওদের, পাছে ওর নেকনজর থেকে বঞ্চিত হয়। কিংবা যেমন জানোয়ারের মতো শক্তিশালী, হয়তো ধরে বেদম প্রহার দেবে। মিনিটখানেক রাগ চেপে সবাই চুপ করে রইল। থালার উপরে ঝুঁকে পড়ে চেষ্টা করতে লাগল ওদের রাগ বা বিরক্তি না ফোমার চোখে পড়ে। আত্ম-সন্তুষ্টির দরাজ দৃষ্টি মেলে ফোমা ওদের দিকে তাকাল। তারপর ওদের দাসসুলভ আনুগত্যে খুশি হয়ে সগর্বে বলল ঃ ওঃ! এখন দেখছি সব বোবা মেরে গেছিস! এই হল

মানুষ। আমি কড়া লোক। আমি—

ছুঁচোর বাদশা।—শান্ত কণ্ঠে কে যেন বলে উঠল।

কী?—গর্জে উঠে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ফোমা।—কে বললে এ কথা?

টেবিলের শেষ প্রান্ত থেকে অপরিচিত একটি ক্ষীণদেহ লোক উঠে দাঁড়াল। লম্বা রোগা চেহারা। গায়ে ফ্রককোট। বিরাট মাথাভরা লম্বা রুক্ষ চুল। শনের নুড়োর মতো ঘন গোছায় চারদিকে পড়েছে ঝুলে। মুখখানা হলদে, খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফে ভরা। বাঁকানো লম্বা নাক। ওকে দেখলে মনে হয় জাহাজের ডেক মোছার একটা ন্যাতা। আধ-মাতাল। বেশ স্ফূর্তি লাগল ফোমার মনে।

কী চমৎকার! ঘেউ ঘেউ করছিস কেন?—বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বলল ফোমা।—জানিস আমি কে?

বিয়োগান্ত নাটকের অভিনেতার মতো হাতের একটা ভঙ্গি করে বাজীকরের মতো লম্বা সরু সরু আঙুলগুলো ফোমার দিকে মেলে ধরে গম্ভীর কর্কশ কণ্ঠে বলল:

তুই তোর বাপের একটা গলিত কুৎসিত ব্যাধি। যদিও তোর বাপও ছিল একটা দস্যু, লুণ্ঠনকারী, তবুও তোর তুলনায় সে ছিল একটা মানুষের মতো মানুষ।

আকস্মিক ঘটনার অপ্রত্যাশিততায় রাগে ফোমার অন্তর কুঁকড়ে উঠল। বিস্ফারিত চোখে ভয়ঙ্কর দৃষ্টি মেলে নীরবে ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর ঐ ঔদ্ধত্যের প্রতিবাদে একটি কথাও খুঁজে পেল না। আর লোকটা ওর সামনে দাঁড়িয়ে মোটা গলায় হিংস্র জানোয়ারের মতো নিষ্প্রভ ফোলা ফোলা চোখদুটো পাকিয়ে উত্তেজিত হয়ে বলে চলেছে: শ্রদ্ধা চাস? সম্মান চাস তুই মূর্খ! কী করেছিস যে শ্রদ্ধা পেতে চাস? কে তুই? একটা মাতাল। মদ খেয়ে বাপের সম্পত্তি উড়াচ্ছিস! ব্যাটা বর্বর! তোর গর্বিত হওয়া উচিত যে আমার মতো এক-জন খ্যাতিমান শিল্পী—নিঃস্বার্থ শিল্পের পূজারী তোর মতো একটা লোকের সঙ্গে বসে এক বোতলে মদ খাচ্ছে। আর ঐ বোতলে কী আছে? না, চন্দন আর গুড়, নস্যির তামাকের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে আর তুই ভাবছিস কিনা ওটা পোর্ট। তোর নাম হওয়া উচিত বর্বর—গাধা।

কী বললি ব্যাটা জেলঘুঘু!—গর্জে উঠে ফোমা লোকটার দিকে ধেয়ে গেল। কিন্তু সবাই মিলে ওকে ধরে আটকে রাখল। ছাড়াবার জন্যে ধস্তাধস্তি করতে করতে বাধ্য হচ্ছে ফোমা ওর কথাগুলো শুনতে। কিন্তু পারছে না প্রত্যুত্তর করতে ঐ ন্যাতার মতো লোকটার বজ্র কণ্ঠের কটু ভাষার।

তোর লুটের টাকা থেকে কয়েকটা পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে ভেবেছিস তুই একটা মস্ত বড়ো বাহাদুর? তুই তো ডবল চোর। একবার চুরি করেছিস টাকা আর এখন কয়েকটা পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে তার বদলে চুরি করছিস মানুষের কৃতজ্ঞতা। কিন্তু সেটা আমি হতে দিচ্ছি না। আমি—যে নাকি সারাটা জীবন পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছে—তোর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে বলছি: তুই একটা মূর্খ! তুই একটা পথের ভিক্ষুক! কেননা তুই ধনী। এটা হচ্ছে জ্ঞানের কথা। সমস্ত ধনীরাই হচ্ছে ভিখিরি। এমনি করেই বিখ্যাত সহজিয়া কবি রিমস্কি-কানি-বাল্স্কি সত্যের সন্ধান করে।

ঘিরে-ধরা জনতার ভিড়ের ভিতরে শান্ত নিরীহ মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফোমা।

পরম আগ্রহে শুনে চলেছে কবির বজ্র কণ্ঠের কথা। ওর মনে হচ্ছে কে যেন ওর শরীরের একটা দগদগে ঘা আঁচড়ে আঁচড়ে দিচ্ছে। আর তার চুলকানিভরা ব্যথা প্রশমিত হচ্ছে। লোকজন দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কেউ চেষ্টা করছে ওজস্বিনী ভাষায় বলে-চলা কবির কথাগুলোকে থামিয়ে দিতে। কেউ কেউ চেষ্টা করছে ফোমাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে। নীরবে ফোমা ওদের সরিয়ে একান্ত মনে শুনতে লাগল ওদের কথা। যতই শুনছে ততই যেন ঐ লোকের ভিড়ের সামনে অপমানিত হওয়ার তীব্র আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠছে ওর অন্তর। কবির কথায় জেগে-ওঠা সুতীব্র বেদনা যেন ওর অন্তর আচ্ছন্ন করে ঘন আলিঙ্গনে ওকে ধরেছে জড়িয়ে। আর কবিও বলে চলেছে নোংরা অভিযোগে উন্মত্ত হয়ে।

ভাবছিস তুই জীবনের মালিক? তুই একটা টাকার ঘৃণ্য দাসমাত্র।

ভিড়ের ভিতর থেকে কে যেন হেঁচকি তুলছে। যতবারই হেঁচকি তুলছে তত বারই গাল পেড়ে উঠছে ঃ শয়তান!

মোটাসোটা একটা লোক—মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ—ফোমার প্রতি করুণা-পরবশ হয়ে কিংবা দেখে শুনে বিরক্ত হয়ে হাত নেড়ে বলে উঠল ঃ যেতে দিন মশাইরা, যেতে দিন! এসব ভালো নয়। সবাই-ই তো পাপী আমরা—সবাই।

না, বলো—বলে যাও!—বিড়বিড় করে বলে উঠল ফোমা,—যা কিছু আছে বলার সব। আমি তোমার গায়ে হাত দেব না।

দেয়ালে আয়নার বুকে ফুটে উঠল উন্মত্ত সংশয়। লোকগুলোকে মনে হচ্ছে যেন আরো কুৎসিত।

আর বলতে চাই না আমি।—চিৎকার করে বলে উঠল কবি,—উলুবনে মুক্তো ছড়াতে চাই না। চাই না তোদের কাছে আমার সত্য, আমার বিক্ষোভ প্রকাশ করতে। —দ্রুতপায়ে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সগর্বে মাথা তুলে দোরের দিকে ফিরে দাঁড়াল।

মিথ্যুক!—ওর পিছনে ধেয়ে যাবার চেষ্টা করতে করতে চিৎকার করে বলে উঠল ফোমা,—দাঁড়া, আমাকে উত্তেজিত করে এখন আবার ঠাণ্ডা করতে চাস?

সবাই ওকে ধরে ফেলল। কী যেন বলতে চেষ্টা করছে ওর কাছে। কিন্তু সবাইকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হুড়মুড় করে এগিয়ে চলল ফোমা। ওদের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করার সময়ে যখন সে দৈহিক বাধা পেল, কেমন যেন আরাম পেল ফোমা। ওর সমস্ত উচ্ছৃংখল অনুভূতি এক হয়ে একটি ইচ্ছায় পরিণত হয়ে উঠল —যে ওকে বাধা দেবে তাকেই ছুঁড়ে ফেলে দেবে দূরে। সবাইকে ঠেলে সরিয়ে যখন রাস্তায় বেরিয়ে এল, ততক্ষণে ওর উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে এসেছে। পথের উপরে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল ঃ ঐ নোংরা ন্যাঙাটা আমাকে বিদ্রূপ করল, আমার বাবাকে গাল দিল চোর বলে—কেমন করে আমি তা সহ্য করলাম?

ওকে ঘিরে নেমে এসেছে অন্ধকার। মাথার উপরে উজ্জ্বল দীপ্তি বিকিরণ করে জেগে উঠেছে চাঁদ। বইছে মৃদু হাওয়া। হাওয়ার বিপরীত দিকে চলতে চলতে ফোমা মুখখানা মৃদু ঠাণ্ডা বাতাসের দিকে তুলে ধরল, তারপর দ্রুতপায়ে চলতে আরম্ভ করল। চলতে চলতে সভয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে পাছে পানশালার সঙ্গীরা না ওর পিছু ধাওয়া করে। বুঝতে পারছে ফোমা যে, ঐ সব লোকের চোখে নিজেকে সে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। চলতে চলতে ভাবতে লাগল, —কী হল ওর? একটা জোচ্চোর প্রকাশ্যে সবার সামনে ওকে অপমান করে গেল কুৎসিত ভাষায়, আর ও কিনা এক ধনী ব্যবসায়ীর ছেলে হয়ে একটা জবাবও দিতে

পারল না ওর কথার।

আমার মতো মানুষের পক্ষে উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে।—তিক্ত বিক্ষুব্ধ অন্তরে ভাবল ফোমা। ঠিকই হয়েছে। মাথা খারাপ করো না। বুঝতে চেষ্টা করো। তাছাড়া, আমি নিজেই তো চেয়েছিলাম তাই। লাগছিলাম সবার পিছনে। এখন নাও নিজের বখরা! নিজের জন্যে এক নিদারুণ বেদনায় মুচড়ে উঠল ওর অন্তর। ওদের হাতে শায়েস্তা হয়ে পথে পথে পায়চারি করতে করতে ফোমা কিছু একটা দৃঢ়, একটা শক্ত কিছু হাতড়ে বেড়াতে লাগল নিজের ভিতরে। কিন্তু সব কিছুই যেন কেমন সংশয়াচ্ছন্ন—সব কিছু মিলে কেমন যেন ওর অন্তর পিষে ফেলছে, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট আকার ধারণ করছে না। যেন কি একটা বেদনাদায়ক স্বপ্নের ঘোরে এসে দাঁড়িয়েছে নদীর তীরে। তারপর একটা কাঠের গুঁড়ির উপরে বসে ছোট ছোট ঢেউভরা নদীর শান্ত কালো জলের দিকে তাকিয়ে রইল। ধীর শান্ত গতিতে প্রায় নিঃশব্দে বয়ে চলেছে নদী বিরাট গুরুভার বোঝা বুকে নিয়ে। নদীর সর্বাঙ্গ জুড়ে কালো কালো জাহাজ স্টিমার নৌকা আর পথনির্দেশক আলো। জলের বুকে প্রতিফলিত তারার আলোর ঝিকিমিকি। ছোট ছোট ঢেউগুলি কুল-কুল শব্দ করে ভেঙে পড়ছে তীরের গায়ে, ফোমার পায়ের কাছে। আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে বেদনাভরা ঠাণ্ডা দীর্ঘশ্বাস। এক নিঃসঙ্গ একাকিত্বের অনুভূতি ফোমার অন্তর আচ্ছন্ন করে নিষ্পিষ্ট করে তুলছে।

হে প্রভু! হে যীশুখ্রীষ্ট!—আকাশের দিকে তাকিয়ে ব্যথাভরা অন্তরে ভাবল ফোমা—কী ব্যর্থই না আমার জীবন! কিছুই নেই আমার অন্তরে। কিছুই দেননি ঈশ্বর আমার ভিতরে। কী মূল্য আমার জীবনে? হে প্রভু! হে যীশু!

যীশুর নাম নেবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝিবা ফোমার অন্তর কিছুটা হালকা হয়ে উঠল—বুঝিবা দূরে হয়ে যেতে লাগল ওর নিঃসঙ্গ একাকিত্বের অনুভূতি। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে মনে মনে ভগবানের নাম নিতে লাগল।

হে প্রভু যীশুখ্রীষ্ট! মানুষ বোঝে না কিছুই, কিন্তু মনে করে সব কিছুই তাদের জানা। তাই সহজ তাদের পক্ষে জীবনধারণ করা। কিন্তু আমি—কোনো সার্থকতাই নেই আমার বেঁচে থাকার। এখন, এই রাত্রে আমি একা। কোনো ঠাঁই নেই আমার যাবার মতো। কারুর কাছে কিছুই বলতে পারি না মুখ ফুটে। কাউকেই বাসি না ভালো—কেবলমাত্র আমার ধর্মবাবাকে ছাড়া। কিন্তু তিনি হৃদয়-হীন। যদি তুমি তাঁকে শাস্তি দিতে! তিনি মনে করেন তাঁর চাইতে চালাক, তাঁর চাইতে ভালো লোক দুনিয়ায় আর নেই। আর তুমি কিনা তাও সহ্য করো! আমিও করি। যদি এক নিদারুণ দুর্ভোগ নেমে আসত আমার উপরে। যদি কোনো কঠিন অসুখ হত আমার। কিন্তু আমি লোহার মতো শক্ত। মদ খাই, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করি, বাস করি নোংরামির ভিতরে, কিন্তু দেহে এতটুকুও মরচে ধরে না। কেবল অসহ ব্যথায় আত্মা ককিয়ে ওঠে। হে প্রভু! কী উদ্দেশ্য এ জীবনের?

প্রতিবাদভরা অস্পষ্ট চিন্তা একটার পর একটা জেগে উঠতে লাগল ঐ নিঃসঙ্গ অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়ানো মানুষটার মনে। গভীর হতে গভীরতর হয়ে উঠছে নীরবতা ওকে ঘিরে। নিকষ হয়ে উঠছে রাত্রির অন্ধকার। তীরের অনতিদূরে নোঙর করা রয়েছে একখানা নৌকা। দুলছে এপাশ ওপাশ করে। কি যেন রয়েছে তলায়। চাপে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

কেমন করে আমি এ জীবনের হাত থেকে মুক্তি পাবো?—নৌকাটার দিকে

তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবছে ফোমা।—কী কাজে লাগব? সবাই করছে কাজ।

হঠাৎ ওর মনে জেগে উঠল একটা চিন্তা। মনে হল সেটা মহান। কঠিন শ্রম সহজ কাজের চাইতে শস্তা। একটা টাকার জন্যে কেউ নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলছে, আর কেউ আঙুলের ডগায় কামাচ্ছে হাজার হাজার টাকা।—এই চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল ফোমা। ওর মনে হল, জীবনের আর একটা মিথ্যা, আর একটা জোচ্চুরি যা এতকাল চাপা ছিল তা যেন ও আবিষ্কার করে ফেলেছে। মনে পড়ল ওরই সেই বৃদ্ধ আগ-ওয়ালার কথা। মাত্র দশটি পয়সার জন্যে পালা করে থাকত সে চুল্লীর পাহারায়। কাজ করত ওরই একজন সাথীর হয়ে একনাগাড়ে আট ঘণ্টা সেই দম-বন্ধ-হয়ে-আসা আগুনের কুণ্ডের ভিতরে। ঐ অমানুষিক পরিশ্রমে অসুস্থ হয়ে একদিন শুয়ে ছিল জাহাজের গলুইয়ের উপরে। ফোমা যখন ওকে জিগ্‌গেস করল কেন সে নিজেকে এমনি করে ধ্বংস করে ফেলছে? রুক্ষ তীব্র কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল ইলিয়া,—"তার কারণ এই যে, তোমার কাছে একশ টাকার চাইতে আমার কাছে একটি পয়সা ঢের বেশি প্রয়োজনীয়। হাঁ।"—বলেই বৃদ্ধ অতিকষ্টে নিদারুণ ব্যথায়-গুঁড়িয়ে-যাওয়া পাশ ফিরে ওর দিকে পিছন করে শুল।

ঐ বৃদ্ধের কথা ভাবতে ভাবতে ওর চিন্তা হঠাৎ সাধারণ মানুষ, যারা কঠিন পরিশ্রম করে জীবন ধারণ করে তাদের দিকে নিবদ্ধ হল। অবাক হয়ে যায় ফোমা এই ভেবে যে, কেন ওরা বেঁচে থাকে? কী আনন্দ রয়েছে এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকার ভিতরে? ওরা চিরদিন নোংরা কঠিন পরিশ্রম করে যায়। খায় নিতান্ত সাধারণ খদ্যা, পরে সাধারণ পোশাক, পান করে নিকৃষ্ট পানীয়। কারুর বা বয়স ষাট। তবুও সে তার তরুণ সঙ্গীদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ করে। ফোমার মনে হয় যেন বিরাট এক পোকার স্তূপ কেবলমাত্র কিছু খেতে পাবার জন্যে পৃথিবীর বুকে কিলবিল করে হেঁটে বেড়াচ্ছে। একটি একটি করে ফোমার স্মৃতিপটে ভেসে উঠতে লাগল ঐ সমস্ত মানুষের পরিচিত চেনা মুখ। ভেসে উঠতে লাগল জীবন সম্পর্কে তাদের যা কিছু মন্তব্য—কখনো ব্যঙ্গ-বিদ্রুপভরা, কখনো খেদসূচক। আবার কখনোবা হতাশাভরা বিষাদময় সে মন্তব্য মূর্ত হয়ে ওঠে তাদের কান্নাঝরা করুণ গানে। ওর মনে পড়ল, একদিন ইয়েফিম এসে লস্কর সংগ্রহকারী কেরানির কাছে বলছিল: লপুখিন থেকে কতকগুলো চাষী এসেছে কাজ চাইতে। মাসে দশটাকার বেশি মাইনে ধরবেন না। গত গ্রীষ্মে ওদের ঘর পুড়ে গেছে। এখন দারুণ অভাব। দশ টাকায়ই রাজী হয়ে যাবে।

নদীর তীরে সেই গুঁড়িটার উপরে বসে দুলছে ফোমা। অন্ধকারে নদীর বুক থেকে নীরবে উঠে এসে দাঁড়িয়েছে ওর সামনে নানান ধরনের মানুষের মূর্তি। মাঝি, আগওয়ালা, কেরানি, হোটেলের পরিচারক। অর্ধোন্মত্ত রঙ্‌করা মুখ নারী, পানশালার লোক। ছায়ার মতো ওরা ভেসে বেড়াতে লাগল বাতাসে। একটা লবণাক্ত স্যাঁৎসেতে কী যেন একটা ঝরে পড়তে লাগল ওদের নিঃশ্বাসে। শরতের আকাশের মেঘের মতো ঐ কালো অন্ধকারময় ভিড় নিঃশব্দে ভেসে বেড়াতে লাগল। ঢেউ-ভাঙ্গা মৃদু ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ করুণ সঙ্গীতের মূর্ছনার মতো ওর অন্তর প্লাবিত করে তুলল। বহুদূরে—নদীর পরপারে কোথায় যেন জ্বলছে কাঠের স্তূপ। চতুর্দিক ঘেরা অন্ধকারের ঘন আস্তরণে কখনো প্রায় সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাচ্ছে। কেবলমাত্র একটা অস্ফুট লাল দাগ ঘন অন্ধকারের ভিতরে কেঁপে কেঁপে উঠছে। পরক্ষণেই আবার জ্বলে উঠছে—পালিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার। আগুনের শিখা উর্ধ্বে

ওঠার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে। তার পরেই যাচ্ছে ডুবে।

হে প্রভু! হে প্রভু!—ব্যথাভরা তিক্ত অন্তরে ভাবতে লাগল ফোমা। ওর মনে হল একটা নিদারুণ দুঃখ প্রবল শক্তিতে ওর অন্তর পিষে দিয়ে চলেছে।

আমি একা—ঐ আগুনটার মতোই একা। কিন্তু প্রভেদ এই যে আমার ভিতর থেকে কোনো আলো বিচ্ছুরিত হয় না। কেবল ধোঁয়া আর বাষ্প। যদি একজন জ্ঞানী লোকের দেখা পেতাম! কথা বলতে পারতাম কারুর সঙ্গে! এমন একা একা বেঁচে থাকা—নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কিছুই করতে পারছি না আমি। যদি কারুর দেখা মিলত!

দূরে নদীর বুকে লাল রঙের দুটো বড়ো আলো ফুটে উঠল আর উপরে আরো একটা। জেগে উঠল প্রতিধ্বনিময় এক অস্পষ্ট শব্দ—দূরে বহুদূরে। কী যেন একটা কালো বস্তু ধীরে এগিয়ে আসছে ফোমার সামনে।

উজান বেয়ে এগিয়ে চলেছে একটা স্টিমার—ভাবল ফোমা। হয়তো শতাধিক লোক রয়েছে ঐ স্টিমারে,—ভাবল ফোমা,—কিন্তু ওঁরা কেউই ভাবছে না আমার কথা। সবাই জানে কোথায় চলেছে,—জানে ওদের গন্তব্যস্থল। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু একটা আছে যা তার একান্ত নিজস্ব। আমার বিশ্বাস, সবাই জানে কী তারা চায়। কিন্তু আমি কী চাই? কে বলে দেবে আমাকে সেকথা? কোথায় সেই লোক?

জাহাজের আলো নদীর বুকে প্রতিফলিত হয়ে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। আলোকিত জলরাশি কুলকুলু শব্দে দূরে সরে যাচ্ছে। স্টিমারটাকে মনে হচ্ছে যেন আগুনের মতো সুন্দর ডানা মেলে অতিকায় একটা কালো মাছ।

* * *

সেদিনের সেই বেদনাময় রাত্রির পর কেটে গেছে কয়েক দিন। আবার একদিন ফোমাকে দেখা গেল পানোৎসবে। এটা ঘটল একান্ত আকস্মিকভাবে—ফোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে। সংকল্প করেছিল ফোমা আর মদ খাবে না। সংযত রাখবে নিজেকে মদ খাওয়ার ব্যাপারে। তাই শহরের ভিতরের একটা খুব দামী হোটেলে যেত খেতে। ভেবেছিল ওর পানোৎসবের সঙ্গীরা কেউ যাবে না ওখানে—দেখা হবে না কারুর সঙ্গে। কারণ তারা সব সময়েই অপেক্ষাকৃত শস্তা কম অভিজাত হোটেলে যায় মদের আসর জমাতে। কিন্তু দেখা গেল ওর সে হিসেব ভুল। হঠাৎ ফোমা দেখল সেই মদ চোলাইকরের ছেলে, যে সাশাকে রেখেছে, তারই যেন আলিঙ্গনে ধরা পড়ে গেছে ফোমা। কোথা থেকে ছুটে এসে ফোমাকে জড়িয়ে ধরে দরাজ উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ল।

একেই বলে দেখা হওয়া। আজ তিন দিন থাচ্ছি আমি এখানে কিন্তু একা একা হাঁপিয়ে উঠেছি। গোটা শহরে যদি একটা ভদ্রলোক থাকত! তাই সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপ করে নিতে হল। ওরা স্ফূর্তিবাজ। কিন্তু প্রথম প্রথম ভান করে যেন কত বড়ো অভিজাত! অবজ্ঞা করে আমাকে। কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই সবাই মদে চুরচুরে হয়ে উঠি। আসবেখন আজও। বিশ্বাস করো বাবার সম্পত্তির নামে শপথ করে বলছি। ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবোখন তোমাকে। ওদের ভিতরে একজন আছে গল্পলেখক। তাকে তুমি চেন। সেই যে তোমার খুব প্রশংসা করে, কী নাম যেন তার? খুব স্ফূর্তিবাজ। জাহান্নামে যাক ব্যাটা! জানো অমন একটা লোক নিজের জন্যে ভাড়া করে রাখা ভালো। কিছু টাকা ছুঁড়ে দাও আর হুকুম করো আনন্দ দিতে। সেটা কেমন? আমার কর্মচারীদের ভিতরে ছিল

একজন গীতিকবি। তাকে বলতাম; রিম্‌স্কি আমাদের কিছু কবিতা শোনাও! অমনি সে শুরু করত। বিশ্বাস করো, হাসতে হাসতে তোমার পেট ফেটে যাবে। দুঃখের বিষয় লোকটা কোথায় যেন চলে গেল। খানা খেয়েছ?

না, খাইনি এখনো। আলেকসান্দ্রা কেমন আছে?

আরে, জানো না বুঝি সে কথা!—ভ্রূ কুঁচকে বলল লোকটি—তোমার ঐ আলেকসান্দ্রা একটা নোংরা মেয়েমানুষ। দুর্বোধ্য। দারুণ বিরক্তিকর ওর সঙ্গ। ব্যাঙের মতো ঠাণ্ডা। ছ্যাঃ! তাই ওকে দূর করে দেবো ভাবছি।

ঠাণ্ডা—তা বটে।—বলল ফোমা। পরক্ষণেই কী যেন ভাবতে শুরু করল।

প্রত্যেক লোকেরই উচিত তার নিজের কাজ সুন্দরভাবে করে যাওয়া।—বলল চোলাইকারের ছেলে,—যদি তুমি কারুর রক্ষিতা হও, তোমার কর্তব্য সুন্দরভাবেই পালন করে যাওয়া উচিত। অবশ্য যদি তুমি ভদ্র মেয়েমানুষ হও। ভালো কথা, এসো একটু মদ খাওয়া যাক।

ওরা মদ খেল। আর স্বভাবতই মাতাল হয়ে পড়ল। সন্ধ্যার দিকে একদল লোক এসে জুটল হোটেলে হৈ হল্লা করতে করতে। ফোমাও তখন মাতাল হয়ে পড়েছে। কিন্তু তেমনি বিমর্ষ তেমনি শান্ত। গম্ভীর কণ্ঠে সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলল ঃ আমি বুঝতে পেরেছি এটাই হচ্ছে পথ। মানুষের মধ্যে কতগুলি কীট আর কতকগুলি চড়ুই। ব্যবসায়ীরা হল চড়ুই। ওরা পোকা খুঁটে খুঁটে খায়। এটাই হল অমোঘ নিয়তি। ওদের প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমি আর তুমি—আমাদের সবারই জীবন উদ্দেশ্যহীন। আমরা বেঁচে থাকি যেন কোনো কিছুর সঙ্গেই আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, তুলনা নেই, কোনো হেতু নেই। কেবল বাঁচার জন্যেই বাঁচা। দুনিয়ায় আমরা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। এমনকি এখানে যারা রয়েছে—বা আর সকলে—কী উদ্দেশ্য এদের জীবনে? বুঝে দেখা দরকার তোমাদের। ভাই সব। সবাই আমরা ফেটে মরে যাবো। দোহাই ঈশ্বরের! কিন্তু কেন আমরা ফেটে মরব? কারণ, এমন কিছু আছে আমাদের মধ্যে যা অপ্রয়োজনীয়—অপ্রয়োজনীয় কিছু রয়েছে আমাদের আত্মায়। সমগ্র জীবন আমাদের অনাবশ্যক। বন্ধুগণ! আমি কাঁদি। কিসের জন্যে আমার জীবন? সম্পূর্ণ অনাবশ্যক আমি এ-দুনিয়ায়। আমাকে মেরে ফেল। মরতে চাই আমি। মাতালের চোখের জল ঝরিয়ে কাঁদতে লাগল ফোমা। বেঁটে একটি কালো লোক বসেছিল ওর পাশে। কী যেন ওকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছে। চেষ্টা করছে ওকে চুম্বন করতে। তারপর একটা ছুরি টেবিলের উপরে বসিয়ে দিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল ঃ সত্যি কথা! চুপ করো সব! এ হচ্ছে জোরালো কথা। উচ্ছৃংখল জীবনের হাতি আর অতিকায় জীবকে বলতে দাও। কাঁচা রুশিয়ার বিবেক বলছে পবিত্র বাণী। চিৎকার করে বলো গরদিয়েফ! সব কিছুর বিরুদ্ধে তোলো বজ্র গর্জন।—বলতে বলতে ফোমার গলা জড়িয়ে ধরে বুকের উপরে পড়ে ফোমার মুখের সামনে তার কালো বর্তুলাকার কটা চুলেভরা মাথাটা তুলে ধরল। মাথাটা এতক্ষণ নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘুরছিল এদিক-ওদিক যাতে না ফোমা ওর মুখ দেখতে পায়। এতে দারুণ রাগ হল ফোমার। ওকে ধাক্কা দিতে দিতে উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগল ঃ

দূর হ! তোর মুখটা কোথায়? সরে যা এখান থেকে!

ওদের ঘিরে জেগে-ওঠা মাতাল কণ্ঠের কান ফাটানো উচ্চ হাসির শব্দে বাতাস বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। হাসতে হাসতে প্রায় দমবন্ধ হয়ে আসছে চোলাইকরের ছেলের। যেন কাকে উদ্দেশ্য করে গর্জে উঠল ঃ আমার কাছে এসো! মাসে

মাসে একশ টাকা মাইনে আর খাওয়া-থাকা। ছেড়ে দাও কাগজের কাজ! জাহান্নামে যাক! আরো বেশি দেবো।

সবকিছু যেন দুলছে তালে তালে—দুলছে ঢেউয়ের দোলায়। এক্ষুনি যেন ঐ লোকগুলো দূরে সরে গেল ফোমার কাছ থেকে, পরক্ষণেই আবার ফিরে এল কাছে। ছাদটা নেমে আসছে। মেঝেটা ঠেলে উঠছে উপরের দিকে। ফোমার মনে হল এক্ষুনি সে চিৎপাত হয়ে পড়ে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গেই যাবে গুঁড়িয়ে। ওর মনে হল এক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বিরাট বিস্তৃত নদীর বুকের উপর দিয়ে চলেছে ভেসে কোথায় কোন অজানা দেশে। আছাড়িপিছাড়ি করছে, করছে সংগ্রাম আর নিদারুণ ভয়ে চিৎকার করে বলে উঠছে ঃ কোথায় ভেসে চলেছি আমরা? ক্যাপ্টেন কোথায়?

প্রত্যুত্তরে জেগে উঠল মাতাল কণ্ঠের উৎকট হাসির কলরোল আর তারই সঙ্গে ঐ কুৎসিতদর্শন কালো শীর্ণ লোকটার বিশ্রী তীক্ষ্ণ কণ্ঠের চিৎকার ঃ

সত্যি কথা! সবাই আমরা হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়ার দল! ক্যাপটেন কোথা? কী? হাঃ হাঃ হাঃ!

এক নিদারুণ দুঃস্বপ্নের ভিতর দিয়ে ঘুম ভেঙে জেগে উঠল ফোমা। এক অপরিসর ছোট কামরা—মাত্র দুটো জানালা। প্রথমে ওর যেটা চোখে পড়ল, সেটা একটা পাতাহীন শীর্ণ গাছ। গাছটা জানালার কাছে। গুঁড়িটা মোটা। কিন্তু ছাল নেই—ভিতর পচা। জানালাটাকে এমনভাবে বন্ধ করে দাঁড়িয়ে যে ঘরে আলো প্রবেশ করতে পারছে না। কালো কালো বাঁকানো ডাল—পাতা ঝরা। যেন নিদারুণ শোকে হতাশায় আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে এদিক ওদিক দুলে দুলে মৃদু সুরে গুমরে গুমরে উঠছে। ছাদ থেকে ঝরে-পড়া জলের ক্রন্দনোচ্ছ্বাস। ঐ কান্নার শব্দের সঙ্গে মিশে জেগে উঠছে কাগজের বুকে কলমের শিরশিরে শব্দ। নিদারুণ যন্ত্রণায় ছিঁড়ে-পড়া মাথাটা অতিকষ্টে বালিশের উপরে পাশ ফিরিয়ে ফোমা দেখল, একটি শীর্ণ কালো লোক টেবিলের সামনে বসে কাঁধে ঝাঁকুনি দিতে দিতে মাথা দুলিয়ে একখানা কাগজের উপরে খস্‌খস্‌ করে দ্রুত লিখে চলেছে। ওর পরনে রাত্রির পোশাক। লোকটা চেয়ারের ভিতরে ক্রমাগত নড়াচড়া করছে। যেন বসেছে আগুনের কুণ্ডের উপরে। কিন্তু কোনো একটা কারণে পারছে না উঠে আসতে। বাঁ হাতটা শীর্ণ—কাঠির মতো। কখনো ঐ হাতটা তুলে কপাল রগড়াচ্ছে, আবার কখনো বা শূন্যে কী একটা দুর্বোধ্য চিহ্ন এঁকে চলেছে। খালি পা দুটো ঘসছে মেঝের উপরে। কাঁধের উপরের একটা শিরা কাঁপছে থর থর করে। তাতে ওর কানদুটো পর্যন্ত কাঁপছে। যখন ফোমার দিকে তাকাল, ফোমা দেখল ওর পাতলা ঠোঁটদুটো কী যেন বিড় বিড় করে বকে চলেছে। সরু নাকটা বেঁকে ঝুলে এসে পড়েছে গোঁফের উপরে। হাসির সঙ্গে সঙ্গে গোঁফজোড়া লাফিয়ে উঠছে উপরের দিকে। মুখখানা হলদে, রক্তশূন্য আর তার উপরে ভেসে উঠেছে বলিরেখা। কিন্তু ওর কালো উজ্জ্বল দুটো চোখের দিকে তাকালে মনে হয় যেন ওদুটো ওর নয়।

ওর দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে ফোমা ধীরে চোখ ফিরিয়ে ঘরের ভিতরটা দেখতে শুরু করল। দেয়ালে পেরেক পোঁতা। তারই সঙ্গে ঝুলছে খবরের কাগজের স্তূপ। মনে হয় যেন দেয়ালটা স্থানে স্থানে ফুলে উঠেছে। ছাদের গায়ের কাগজ কোনো এক সময়ে হয়তো শাদা ছিল, কিন্তু বর্তমানে স্থানে স্থানে ছিঁড়ে গিয়ে খোসা ওঠার মতো হয়ে কালি ঝুলি মেখে ঝুলে রয়েছে। মেঝের

উপরে ছড়িয়ে রয়েছে কাপড়, জুতা, বই, ছেঁড়া কাগজ। সব মিলে মনে হয় যেন গরম জলে ঘরটার আঁশ ছাড়িয়ে নেয়া হয়েছে।

ছোট্ট মানুষটি কলম ফেলে টেবিলের উপরে ঝুঁকে আঙুল দিয়ে টেবিল বাজিয়ে গান গাইতে শুরু করল :

"ওঠাও দামামা দূরে রাখো ভয়,—
পশারিণীকেই দাও চুম্বন—
সব বিদ্যার সার এরে কয়
জীবনের এই সেরা দর্শন।"

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল ফোমা : একটু সোডা পেতে পারি?

অ্যাঁ!—ছোট্ট মানুষটি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। তারপর অয়েল ক্লথ মোড়া ফোমার বিছানার কাছে এগিয়ে এল।

কেমন আছো দোস্ত? সোডা? নিশ্চয়ই আছে। শাদা, না একটু কনিয়াক মিশিয়ে?

কনিয়াক মিশিয়ে দিলেই ভালো হয়। সামনে প্রসারিত তপ্ত শীর্ণ হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে প্রত্যুত্তরে বলল ফোমা। তারপর স্থির অপলক দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ইগরভনা!—দোরের কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাকল লোকটি। তারপর ফোমার দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করল :

চিনতে পারছ আমাকে, ফোমা ইগনাতিচ!

একটু একটু পারছি বলে মনে হচ্ছে। আগে কোথায় যেন দেখেছি।

সে দেখা দীর্ঘ চার বছর ধরে। কিন্তু তা বহুদিন আগের কথা! ইয়ঝভ।

হা ঈশ্বর!—অবাক বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠে সোফার উপর থেকে মাথা তুলল ফোমা।—তুমি? তাও কি সম্ভব?

অনেক সময়ে নিজেরও যেন বিশ্বাস হয় না, বন্ধু! কিন্তু বাস্তব হচ্ছে এমন একটা বস্তু যার গায়ে লেগে লোহার উপরে ছুঁড়ে মারা রবারের বলেরই মতো সন্দেহ লাফিয়ে ফিরে আসে।—অদ্ভুত হাস্যকরভাবে মুখ বিকৃত করল ইয়ঝভ। ওর হাতখানা বুকের উপরে উঠে হাতড়ে বেড়াতে শুরু করেছে।

বেশ বেশ জড়িত কণ্ঠে বলল ফোমা। কিন্তু কী বুড়োটে হয়ে গেছ! হায় হায়! বয়স কত হল তোমার?

ত্রিশ।

কিন্তু দেখাচ্ছে যেন পঞ্চাশ। তেমনি রোগা, হলদে। জীবনটা খুব সুখের নয় মনে হচ্ছে। মদও খাচ্ছো খুব দেখতে পাচ্ছি।—দুঃখ হল ফোমার যে তার শৈশবের প্রাণচঞ্চল সদানন্দ সেই স্কুলের সাথী অকালেই এমন শুকিয়ে গেছে। বাস করছে এই কুকুরের গর্তে। ফোমা ওর দিকে তাকাল। ওর দৃষ্টি বেয়ে কেমন যেন বেদনা ঝরে পড়তে লাগল। দেখল, ইয়ঝভের মুখখানা কুঁচকে কুঁচকে উঠছে। অসহ বিরক্তিতে জ্বলে জ্বলে উঠছে কুত্কুতে চোখদুটো। একমনে সোডার বোতল খুলতে চেষ্টা করছে ইয়ঝভ। তাই নীরব। দু হাঁটুর ভিতরে বোতলটাকে চেপে ধরে ছিপিটা খোলার বৃথাচেষ্টায় গলদঘর্ম হয়ে উঠেছে। ওর ব্যর্থতা বিচলিত করে তুলল ফোমাকে।

হাঁ জীবন নিংড়ে শুষে নিয়েছে তোমাকে। অথচ তুমি লেখা-পড়া শিখেছ। দেখছি বিজ্ঞান খুব সামান্যই সাহায্য করতে পারে মানুষকে।—চিন্তিত মুখে

বলল ফোমা।

নাও, খেয়ে নাও!—সোডার গ্লাসটা ফোমার দিকে এগিয়ে ধরে বলল ইয়ঝভ। ক্লান্তিতে পাংশু হয়ে উঠেছে মুখ। কপালের ঘাম মুছে ফোমার পাশে কৌচের উপরে এসে বসল।

বিজ্ঞানের কথা ছেড়ে দাও। বিজ্ঞান হচ্ছে ঈশ্বরের মদ। কিন্তু তাও এখনো ভালো করে পচেনি। তাই এখনো ওটা ব্যবহারের উপযুক্ত নয়। ভদকার মতোই—এখনো তেল থেকে আলাদা করে পরিষ্কার করা হয়নি। বিজ্ঞানটা মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে নয় বন্ধু! জ্যান্ত মানুষ যারা ওটা ব্যবহার করে মাথার ব্যথা ছাড়া আর কোনো কিছুই লাভ করে না তারা। এই এখন যেমন তোমার আর আমার অবস্থা। কিন্তু অত দারুণভাবে মদ খাও কেন বলো তো?

আমি? এ ছাড়া আর কি কাজ আছে আমার?

আধ-বোজা চোখের অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে ফোমার মুখের দিকে তাকাল ইয়ঝভ। তারপর বলল : গত রাত্রের তোমার সমস্ত প্রলাপগুলো জুড়ে জুড়ে আমার ব্যথাভরা অন্তর দিয়ে অনুভব করছি যে যদিও তোমার জীবন সুখের, তবুও তুমি আনন্দ পাচ্ছ না।

অ্যাঁ!—একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে উঠে বসল ফোমা।

আমার জীবনটা কী? অর্থহীন। আমি একা। কিছুই বুঝতে পারি না। তবুও আমার অন্তর কিসের তৃষ্ণায় যেন ছট্‌ফট্‌ করছে। সমস্ত কিছু ফেলে রেখে কোথাও চলে যেতে চাই নিশ্চিহ্ন হয়ে। সব কিছু থেকে পালিয়ে চলে যেতে চাই দূরে। হাঁপিয়ে উঠেছি আমি।

চমৎকার কথা।—হাত কচলাতে কচলাতে বলল ইয়ঝভ তারপর চারদিকে তাকাতে লাগল।—সত্যি খুবই চমৎকার যদি এটা সত্যি হয়ে থাকে, গভীরভাবে স্থান পেয়ে থাকে তোমার অন্তরে। কারণ এ থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে জীবনের উপরে বিতৃষ্ণার পবিত্র আত্মা ব্যবসায়ীদের শয়নঘরে এসে ঢুকে পড়েছে। ঢুকে পড়েছে পুরু চর্বিঢালা বাঁধাকপির ঝোল, চা আর অন্যান্য পানীয়ের হ্রদে ডুবিয়েদেয়া আত্মার মৃত্যুপুরীর ভিতরে। মোটামুটি আমাকে একটা প্রামাণ্য হিসাব দাও দেখি? দেখবে আমি একটা উপন্যাস লিখে ফেলেছি এর উপরে।

লোকমুখে শুনেছি ইতিমধ্যেই কী নাকি লিখেছ আমার সম্পর্কে।—উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করল। তারপর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার ঐ পুরানো বন্ধুর দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল : কী লিখতে পারে ঐ হতভাগ্য জীবটি?

নিশ্চয়ই লিখেছি। পড়েছ তুমি?

না সে সুযোগ হয়নি আমার।

কী বলেছে তারা?

বলেছে, খুব চতুরতার সঙ্গে গালাগাল করেছ নাকি আমাকে।

হুঃ! তবুও তোমার সেটা পড়ার আগ্রহ হয় না?—গরদিয়েফের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করল ইয়ঝভ।

পড়ব।—ইয়ঝভের সামনে কেমন যেন একটু বিব্রত হয়ে পড়ল ফোমা। কারণ ওর লেখার কদর দেয়া হচ্ছে না বলে হয়তো ক্ষুণ্ণ হতে পারে ইয়ঝভ।

আমার নিজের সম্পর্কে যখন, তখন নিশ্চয়ই খুব ভালো হয়েছে।—মৃদু হেসে বলল ফোমা। কিন্তু সেদিকে ওর আদৌ আগ্রহ নেই। কেবল ইয়ঝভের উপরে করুণাপরবশ হয়েই বলল কথাটা। সম্পূর্ণ অন্য ভাব জেগে উঠেছে ওর মনে।

কেমন মানুষ ইয়ঝভ? কেনই বা এমন অকালে বুড়িয়ে গেছে? ইয়ঝভের সংগে এই সাক্ষাৎ ওর অন্তরে জাগিয়ে তুলেছে করুণাভরা প্রশান্তি। জাগিয়ে তুলেছে বাল্য-স্মৃতি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকের স্নিগ্ধ দীপশিখা যেন বহুদূরে থেকে জ্বলে উঠেছে ওর চোখের সামনে।

ইয়ঝভ উঠে টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল। টেবিলের উপরে ফুটছে সামোভার। আলকাতরার মতো কড়া দুকাপ চা ঢেলে নিয়ে ডাকল ফোমাকে : এসো চা খাওয়া যাক। তারপর বলো দেখি তোমার কথা?

বলবার মতো কিছুই নেই। জীবনের ভিতরে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আমি। আমার জীবন শূন্য। বরং তোমার কথা বলো শুনি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আমার চাইতে ঢের বেশি জানো তুমি।

কেমন যেন একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল ইয়ঝভ। অবশ্য তার শরীর দোলানো বা মাথা-নাড়া বন্ধ হল না। কেবল চিন্তার দরুণ মুখের আকুঞ্চন থেমে গেছে। সমস্ত বলিরেখাগুলো যেন একত্র হয়ে উঠে এসেছে চোখের কাছে। মনে হয় যেন দীপ্তি বিকিরণ করে চোখদুটোকে ঘিরে রয়েছে। আর তারই ফলে চোখদুটো যেন ঢুকে গেছে কপালের গভীরে।

হ্যাঁ বন্ধু! একটু আধটু দেখা আছে আমার দুনিয়াটা। অনেক কিছুই জানি। —মাথা নাড়তে নাড়তে বলতে আরম্ভ করল ইয়ঝভ।—বোধহয় আমার পক্ষে যতটুকু জানা দরকার তার চাইতে ঢের বেশি জানি আমি। অবশ্য প্রয়োজনের চাইতে বেশি জানা অজ্ঞতার মতোই ক্ষতিকর। বলব শুনবে কেমন করে আমি জীবন কাটাচ্ছি? বেশ। মানে চেষ্টা করব বলতে। কারুর কাছে কোনোদিন আমি নিজের সম্পর্কে বলিনি কোনো কথা। কারণ বলার কোনো ইচ্ছেই হয়নি আমার। তোমার সম্পর্কে কারুর কোনো কৌতূহল জন্মাবে না, এমন জীবনযাপন করা অপরাধ!

তোমার মুখ, তোমার সব কিছু দেখে মনে হচ্ছে, জীবনটা তোমার তেমন আয়েসে কাটছে না।—বলল ফোমা। মনে মনে খুশি হয়ে উঠেছে এই দেখে যে ওর বন্ধুর জীবনও মোটেই মধুর নয়। একচুমুকে চাটুকু শেষ করে ইয়ঝভ গ্লাসটা সরিয়ে রেখে দিল তার পর পা দুটো চেয়ারের কিনারায় তুলে নিয়ে দুহাতে হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে তার উপরে থুতনিটা রাখল। এই ভঙ্গিতে আরো ছোট, আরো রবারের মতো নমনীয় দেখাচ্ছিল ওকে। আমার আগের শিক্ষক ছাত্র সাচ্‌কভ বর্তমানে যে ডাক্তার আর হুইস্ট খেলোয়াড়, সমস্ত দিক থেকেই সে একটা নীচ জঘন্য মানুষ। যখনই আমি ভালো পড়া শিখতাম বলত : চমৎকার ছেলে তুই কলিয়া! কাজের ছেলে। আমরা গরিবেরা—সাধারণ গরিব মানুষ—আমরা জন্মেছি পিছনের উঠোনে। আমরা লেখাপড়া শিখব আর শিখব যাতে সবার সামনে এসে দাঁড়াতে পারি। জ্ঞানী গুণী ও সৎ লোকের প্রয়োজন আছে রুশিয়ার। এমনি হতে চেষ্টা করো, দেখবে তুমি হয়ে উঠেছ অদৃষ্টের নিয়ন্তা। সমাজের একজন গণ্যমান্য লোক। দেশের সমস্ত আশা-ভরসা নির্ভর করছে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের উপরে। আমরা জন্মেছি সত্য ও আলো নিয়ে আসতে। বিশ্বাস করেছিলাম আমি ওর কথা—ঐ পশুটার কথা। আর তারপর থেকে প্রায় বিশ বছর কেটে গেছে। আমরা শ্রমজীবীরা বেড়েছি কিন্তু জ্ঞানলাভ করতে পারিনি। কিংবা জীবনেও পারিনি আলো আনতে। আগের মতো আজও রুশিয়া ভুগছে দুরারোগ্য ব্যাধিতে—পাজীদের ক্রমবৃদ্ধির রোগে। আর আমরা শ্রমজীবীরা তাদের ভিড় বাড়িয়েই চলেছি। আমার সেই শিক্ষকটা ভাগ্যবান, কিন্তু চরিত্রহীন। নির্বিচারে তালিম করে মেয়রের হুকুম।

আর আমি—আমি হচ্ছি সমাজের বুকে একটা ভাঁড় বিশেষ। সুনাম এ শহর পর্যন্ত আমার পেছু ধাওয়া করে এসেছে। রাস্তা দিয়ে চলি শুনতে পাই একটা গাড়োয়ান আর-একটা গাড়োয়ানকে বলছে ঃ ঐ যে যাচ্ছে ইয়ঝভ! লোকটা কি চমৎকার ঘেউ ঘেউ করে! জাহান্নামে যাক! হ্যাঁ। এটাও তো আর খুব সহজে অর্জন করা যায় না!

ইয়ঝভের মুখখানা কুঁচকে বিকৃত হয়ে উঠল। নিঃশব্দে হেসে উঠল। ফোমা বুঝতে পারল না ওর কথা। তবুও কিছু একটা বলার জন্যেই বলে উঠল ঃ তাহলে তোমার লক্ষ্যপথে পৌঁছতে পারোনি বলো?

হাঁ, ভেবেছিলাম আমি উঁচুতে উঠব। ওঠাও উচিত আমার। নিশ্চয়ই ওঠা উচিত —আমি বলছি!—বলতে বলতে ইয়ঝভ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর তীক্ষ্ন শিরশিরে গলায় বলতে বলতে অস্থির পায়ে ঘরময় পায়চারি করে ফিরতে লাগল।

জীবনের পরিধির ভিতরে নিজেকে পবিত্র রাখা, আর তারই ভিতরে নিজেকে স্বাধীন রাখা—তার জন্যে বিরাট শক্তির দরকার। আমার ছিল সে শক্তি। আমার ভিতরে ছিল নমনীয়তা, ছিল বুদ্ধি। কিন্তু সে সমস্ত আমি নষ্ট করে ফেলেছি যা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় তা শিখতে—আয়ত্ত করতে গিয়ে। নিজেকে একটা কেউ-কেটা হিসেবে গড়ে তুলতে গিয়ে আমার স্বাতন্ত্র্যকে সমস্ত দিক থেকে খর্ব করে ফেলেছি। পড়াশুনা চালাতে গিয়ে আর যাতে উপোসে উপোসে না শুকিয়ে মরি তার জন্যে দীর্ঘ ছ'বছর আমি গাড়োলগুলোকে লেখাপড়া শিখিয়েছি। পরিবর্তে তাদের বাপ-মায়ের কাছে থেকে পেয়েছি লাঞ্ছনা। অবলীলাক্রমে তারা করেছে আমাকে অপমান। রুটি আর চায়ের পয়সা রোজগার করতে গিয়ে জোটাতে পারিনি জুতার দাম। তাই দারিদ্রের উপরে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে দাতব্য-প্রতিষ্ঠানের কাছে গিয়ে। যদি বিশ্বপ্রেমিকেরা হিসেব করতে পারত—দৈহিক জীবন বাঁচাতে গিয়ে তারা মানুষের কতখানি মনুষ্যত্বকে গলা টিপে মারছে! যদি জানত যে তাদের দেওয়া প্রত্যেকটি টাকা—যা নাকি তারা দেয় রুটির জন্যে তাতে আত্মার জন্যে থাকে পৌনে ষোলো আনা বিষ। ওরা যদি ওদের দয়া ও অহঙ্কারের জন্যে ফেটে না পড়ত! যারা ভিক্ষা দেয় তাদের চাইতে নোংরা জীব দুনিয়ায় আর নেই। যেমন তাদের মতোও হতভাগ্য জীব আর সংসারে নেই যারা গ্রহণ করে ভিক্ষা।

মাতালের মতো টলতে টলতে ঘরময় পাগলের মতো পায়চারি করে ফিরতে লাগল ইয়ঝভ। পায়ের তলায় কাগজগুলো মড়মড় করছে, ছিঁড়ে যাচ্ছে, টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে যাচ্ছে। দাঁতে দাঁত কড়মড় করছে। মাথা নাড়ছে। হাতদুটো পাখির ভাঙা ডানার মতো অসহায়ভাবে শূন্যে ঝট্‌পট করছে। সব মিলে মনে হচ্ছে, কেউ যেন ওকে ফুটন্ত কেট্‌লির ভিতরে ফেলে সিদ্ধ করছে। বিস্মিত দৃষ্টি মেলে ফোমা ইয়ঝভের মুখের দিকে তাকাল। করুণায় ভরে উঠেছে ওর মন। সঙ্গে সঙ্গে খুশিও হয়ে উঠল ওকে কষ্ট পেতে দেখে।—আমি একাই নই ও-ও কষ্ট পাচ্ছে—ভাবল ফোমা ইয়ঝভের কথা শুনতে শুনতে। ভাঙা কাচের মতো কী যেন আটকে গেল ইয়ঝভের গলায়। কড়কড় করে উঠল মরচে-ধরা কব্জার মতো।

মানুষের দয়ার বিষে যেমন করে প্রত্যেকটি গরিবের তার নিজের ভবিষ্যত গঠনের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি আমিও—আমিও নষ্ট হয়ে গেছি। ধ্বংস হয়ে গেছি বিরাট কিছুর প্রত্যাশায় ছোট জিনিসের সঙ্গে সমঝোতা করার ক্ষমতা অর্জন করতে গিয়ে। ওঃ! জানো, যক্ষ্মায় যত লোক মরে তার চাইতে বেশি লোক মরে

আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন না থাকার ফলে। সম্ভবত সেই জন্যেই জননেতারা কাজ করেন জেলা ইন্‌সপেকটরের মতো।

জাহান্নামে যাক তোমার জেলা ইনস্পেক্টর!—হাতের একটা ভঙ্গি করে বলে উঠল ফোমা।—তোমার নিজের সম্পর্কে বলো শুনি।

নিজের সম্পর্কে? আমি এখন একা।—হঠাৎ ঘরের মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে উঠল ইয়ঝভ। তারপর বুকের উপরে একটা কিল মেরে বলতে লাগল : আমার যা করণীয় ছিল আমি করেছি। জনসাধারণকে আনন্দ দেবার দলে ভিড়ে পড়েছি। কী করা উচিত তা জানা আর তা না করতে পারা—সে কাজ করতে অক্ষম হওয়া—একটা নিদারুণ শাস্তি।

ঠিক কথা। একটু দাঁড়াও!—উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল ফোমা। বলো দেখি শান্তিতে থাকতে হলে মানুষের কী করা উচিত? যাতে মানুষ নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে?

কথাগুলো ফোমার কাছে বড়ো মনে হলেও যেন অন্তঃসারশূন্য। মিলিয়ে গেল কথার শব্দে। কিন্তু ওর অন্তর মথিত করে জাগিয়ে তুলল না কোনো ভাব, কোনো চিন্তা।

যা পাওয়া যায় না তারই সঙ্গে তুমি পড়বে প্রেমে। মানুষ বড়ো হতে পারে কেবল উচ্চাভিলাষের ভিতর দিয়ে।

এতক্ষণে ইয়ঝভ বন্ধ করেছে নিজের কথা। বলে চলেছে শান্ত কণ্ঠে—সম্পূর্ণ অন্য সুরে। কণ্ঠস্বর দৃঢ়। মুখের উপরে ফুটে উঠেছে একটা গম্ভীর কঠিন ভাব। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইয়ঝভ। হাতদুটো ছড়ানো। আঙুল উপরের দিকে তোলা। এমনভাবে কথা বলছে যেন সে কিছু পড়ে চলেছে :

মানুষ নীচ। কারণ তারা চায় তৃপ্তি। সচ্ছল মানুষ পশুর মতো। তৃপ্তি হচ্ছে আত্মসন্তুষ্টি। আত্মার পরিতৃপ্ততা মানুষকে পশু করে তোলে।—আবার সে এমনভাবে বলতে শুরু করল যেন ওর সমস্ত শিরা-উপশিরা, মাংসপেশী কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। পায়চারি করতে শুরু করেছে ঘরময়।

আত্মতৃপ্ত মানুষ হচ্ছে সমাজে বুকে শক্ত-হয়ে-বসে-যাওয়া ফোঁড়ার মতো। ওরা আমাদের মরণ শত্রু। শস্তা সত্য দিয়ে—ঘুণে-ধরা পচা বাসি জ্ঞানের নীতি দিয়ে নিজেদের ভরাট করে রাখে। যেমন করে কৃপণ গৃহিণীরা যত সব অব্যবহার্য বাজে আবর্জনা দিয়ে ভরে রাখে তাদের ভাঁড়ার তেমনি ঐ ভাঁড়ারের মতোই ওদের অস্তিত্ব। যদি ঐ সব মানুষগুলোকে ছোঁও—যদি ওদের দরজা খুলে দাও, তবে ধ্বংসের পচা দুর্গন্ধময় নিঃশ্বাস এসে লাগবে তোমার নাকে। আর যত সব নোংরা আবর্জনা এসে ছড়িয়ে পড়বে বাতাসে। ঐ হতভাগারা নিজেদের চরিত্রবান, দৃঢ়-চেতা বলে জাহির করে। কিন্তু কেউই দেখতে পায় না যে তাদের নগ্ন আত্মার গায়ে ভিখারীর চীর-বস্ত্র ছাড়া আর কিছুই নেই। ঐ সব মানুষের সূক্ষ্ম ভ্রূতে খোদাই করা থাকে চিরপরিচিত প্রশান্তি, আত্মবিশ্বাস। কী মিথ্যাই না সে চিহ্ন! শক্ত হাতে ঘসে দাও ওদের কপাল, তক্ষুনি দেখতে পাবে প্রকৃত বিজ্ঞাপন : দুর্বল আত্মা আর নীচ অন্তকরণ।

ফোমা ইয়ঝভকে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে দেখেছে, আর ভাবছে : কাকে গাল পাড়ছে? বুঝতে পারছি না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ভীষণভাবে আহত হয়েছে লোকটা।

এমন কত মানুষই না দেখেছি।—ক্রোধে ভয়ে চিৎকার করে বলে উঠল ইয়ঝভ।

—এমন কত খুচরো দোকানই না বেড়ে চলেছে জীবনে। সেগুলোতে পাবে তুমি পোশাকের জন্য সূক্ষ্ম বস্ত্র, আলকাতরা, মিছরি আর আরশুলা মারার জন্যে রোয়াক্‌স। কিন্তু পাবে না কোনো কিছুই তাজা, গরম রুচিকর। নিঃসঙ্গতার বেদনায় টনটন করে-ওঠা অন্তরে এসো এগিয়ে—এসো ছুটে তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে এমন কিছু শুনতে যার ভিতর রয়েছে জীবনের স্পন্দন, কিন্তু ওরা দেবে তোমাকে খানিকটা পোকাপড়া রোমন্থিত জাবর। বাসি, পচা, টক, জাবরকাটা কেতাবী চিন্তা। এতই দীনহীন ঐ সব শুকনো পচা চিন্তা যে সেগুলোর প্রকাশের জন্যে প্রয়োজন হয় অনেক অনেক বাগাড়ম্বর—বহু শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বর। যখন কেউ এমনি করে বলতে থাকে আমি মনে মনে বলি ঃ ঐ যাচ্ছে গলায় ঘণ্টা-বাঁধা একটা নাদুস-নুদুস ঘোটকী। আবর্জনা বয়ে নিয়ে চলেছে শহরের বাইরে। আর ঐ হতভাগ্য কিনা তার নিজের অদৃষ্টে তৃপ্ত, সন্তুষ্ট।

তাহলে, ওরা সমাজে অনাবশ্যক,—বলল ফোমা। ইয়ঝভ ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল তারপর একটু তিক্ত হাসি হেসে বলল,—না ওরা অনাবশ্যক নয়। নিশ্চয়ই না। ওরা থাকে সমাজে উদাহরণ হিসাবে। মানুষের কী না হওয়া উচিত তারই উদাহরণ হিসাবে। সত্যি কথা বলতে কি ওদের স্থান হচ্ছে মিউজিয়ামে। যেখানে সব রকমের অস্বাভাবিক, সব রকমের অতিকায় দানব, সব রকমের প্রকৃতির বিকৃতি সযত্নে সঞ্চয় করে রাখে। জীবনে এমন কিছু নেই যা অপ্রয়োজনীয়, বন্ধু! এমনকি আমারও প্রয়োজন আছে। কেবলমাত্র যাদের অন্তরে রয়েছে জীবন সম্পর্কে দাসসুলভ মরা হৃদয়ের বদলে আত্ম-প্রশংসার ভীরুতা, যাদের বুকের ভিতরে রয়েছে বিরাট দগদগে ঘা, কেবল তারাই দুনিয়ায় অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু তাদেরও প্রয়োজন আছে। আমার অন্তরের জমে-ওঠা ঘৃণা ওদের উপরে উজাড় করে ঢেলে দেবার জন্যে।

গোটা দিন—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ইয়ঝভ উত্তেজিত কণ্ঠে বিষোদ্গার করে চলল যাদের উপরে ওর ঘৃণা অপরিসীম। যদিও 'ওর কথার অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পূর্ণ ধোঁয়াটে আর দুর্বোধ্য লাগছিল ফোমার কাছে, কিন্তু তার উত্তপ্ত দুষ্ট প্রতিক্রিয়া ওর অন্তরে সংক্রামিত হল। আর তারই ফলে ওর অন্তরে জেগে উঠল সংগ্রাম-পিপাসা। কখনো কখনো ওর মনে জেগে উঠছে ইয়ঝভের প্রতি অবিশ্বাস। এমনি এক সময়ে ফোমা সোজাসুজি প্রশ্ন করল ইয়ঝভকে ঃ ভালো কথা, কিন্তু বলতে পারো একথা মানুষের মুখের উপরে?

সুযোগ পেলেই আমি বলে থাকি। আর লিখি প্রত্যেক রবিবারের কাগজে। যদি চাও তো কয়েকটা পড়ে শোনাই।—বলেই ফোমার প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করেই দেয়ালের গা থেকে কয়েকখানা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে এল আর তেমনি অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে পড়তে শুরু করল। পড়তে পড়তে কখনো গর্জে উঠছে, কখনো হাসছে, কখনো রাগে দাঁত কিড়মিড় করছে। যেন একটা ক্রুদ্ধ কুকুর নিষ্ফল আক্রোশে প্রাণপণে শিকল ভাঙার প্রচেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠেছে। এতক্ষণে বন্ধুর লেখার তাৎপর্য বুঝতে পারল ফোমা। অনুভব করল ওর দুঃসাহসী ধৃষ্টতা, তীব্র বিদ্রুপের দংশন, ওর অন্তরের বিদ্বেষ আর উত্তাপ। মনে মনে দারুণ খুশি হয়ে উঠল যেন আবক্ষ গরম জলে ডুবিয়ে করছে স্নান।

চতুর!—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে চিৎকার করে বলে উঠল ফোমা।—খুব চাতুর্যের সঙ্গে ঠোকা হয়েছে।

প্রতি মুহূর্তে ওর চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল পরিচিত ব্যবসায়ী,

শহরের গণ্যমান্য লোকেদের মুখ, যাদেরকে হুল ফুটিয়েছে ইয়ঝভ—কখনো সোজাসুজি, কখনো সসম্মানে ছুঁচের মতো সুক্ষ্ম তীক্ষ্ম হুলে।

ফোমার সমর্থন, তার খুশিভরা জ্বলজ্বলে চোখ উত্তেজনাভরা মুখ ইয়ঝভকে আরো উৎসাহিত করে তুলল। ইয়ঝভ আরো গলা চড়িয়ে চিৎকার করে পড়তে শুরু করল। কখনো ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ছে সোফার উপরে, কখনো লাফিয়ে উঠে ছুটে আসছে ফোমার সামনে।

এবার এসো তো, কী লিখেছ আমার সম্পর্কে পড়ো—বলল ফোমা। নিজের সম্পর্কে লেখা শুনতে ঔৎসুক্য জেগেছে ওর মনে। কাগজের স্তূপ ঘেঁটে ইয়ঝভ একটা কাগজ ছিঁড়ে আনল। তারপর দুহাতে কাগজটা মেলে ধরে ফোমার সামনে এসে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে পড়তে শুরু করল। ভাঙা চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে স্মিতমুখে বসে শুনতে লাগল ফোমা।

ফোমার সম্পর্কের লেখাটা শুরু হয়েছে জেটির উপরের সেই পানোৎসবের বিবরণ দিয়ে। পড়ার সময়ে ওর মনে হল যে লেখার ভিতরে কয়েকটি শব্দ যেন মশার মতো জ্বালাময় তীক্ষ্ম হুল ফুটিয়ে ওকে দংশন করে চলেছে। ক্রমেই ওর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠতে লাগল। ভারাক্রান্ত মনে মাথা নিচু করে রইল ফোমা। ক্রমেই যেন বেড়ে চলেছে সে দংশন।

ওটা কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।—বিরত অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বলল ফোমা।—কেমন করে মানুষকে অপদস্থ করতে হয় তা জানো বলেই তো আব ঈশ্বরের দয়া পেতে পারো না।

একটু থামো!—সংক্ষেপ জবাব দিল ইয়ঝভ। তারপর পড়তে লাগল। ব্যবসায়ীরা নোংরা কুৎসিত কাজে সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে ছাড়িয়ে যায়—প্রবন্ধের ভিতরে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করে প্রশ্ন করল ইয়ঝভ—কেন এমন হয়? তারপর নিজেই তার জবাব দিল—আমার মনে হয় এই বন্য কৌতুকপ্রবণতা আসে শিক্ষা-সংস্কৃতির অভাব থেকে। একদিকে প্রচুর প্রাণশক্তি অন্য দিকে কর্মহীন অলসতা—এরই ওপরে ওটা নির্ভরশীল। একথা নিঃসন্দেহ যে আমাদের ব্যবসায়ী ধনিক-শ্রেণী হচ্ছে সব চাইতে স্বাস্থ্যবান আর সব চাইতে অলস। অবশ্য কিছু যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়।

সত্যি কথা।—টেবিলের উপরে সজোরে একটা কিল মেরে উৎসাহিত কণ্ঠে বলে উঠল ফোমা।—সত্যি কথা। আমার ষাঁড়ের মতো শক্তি, কিন্তু করছি চড়াইয়ের কাজ।

ধনী ব্যবসায়ীরা কোথায় ব্যবহার করবে তাদের শক্তি? বাজারে তেমন কিছু ব্যয় করা যায় না। সুতরাং তাদের দৈহিক মূলধন অপচয় করে মদের দোকানে, পানোৎসবে। কারণ, অন্যভাবে যাতে আরো বেশি ফলপ্রসূ হয়, আরো বেশি মূল্যবান হয়ে ওঠে, জীবনকে তেমনিভাবে কাজে লাগাবার ধারণাই তাদের নেই। এখনো তারা পশুর মতো। তাই জীবন তাদের কাছে একটা লোহার খাঁচা। ঐ চমৎকার স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত অপরিসর। নেই শিক্ষা নেই সংস্কৃতি তাই তারা আত্মসমর্পণ করে উচ্ছৃঙ্খল জীবনের কোলে। খুবই খারাপ এটা সন্দেহ নেই। কিন্তু হায়! আরো খারাপ হয় তখনই যখন ঐ পশুরা তাদের দৈহিক শক্তির সঙ্গে কিছুটা বুদ্ধি ও জ্ঞান আহরণ করে। আর তাকে পরিচালিত করে সুশৃংখলভাবে। বিশ্বাস করো তখনো তারা বিরত হয় না কুৎসা সৃষ্টি করতে। কিন্তু সেগুলো তখন হয়ে ওঠে ঐতিহাসিক ঘটনা। কারণ, সেগুলো আসে ধনিকদের ক্ষমতালাভের

তৃষ্ণা থেকে। তখন তাদের লক্ষ্য হয়ে ওঠে এক শ্রেণীর প্রভুত্ব। আর ঐ লক্ষ্যে পৌঁছতে কোনো পন্থা গ্রহণ করতেই কুণ্ঠিত হয় না।...ভালো কথা, 'সম্পূর্ণ সত্য' —এ কথার মানে কি?—কাগজ পড়া শেষ করে এক পাশে রেখে দিয়ে প্রশ্ন করল ইয়ঝভ।

শেষের দিকটা আমি বুঝলাম না।—প্রত্যুত্তরে বলল ফোমা,—কিন্তু শক্তি সম্পর্কে যা বলেছ সেটা খাঁটি কথা। কোথায় ব্যবহার করব আমি আমার শক্তি যখন তার চাহিদা নেই? হয় আমাকে লড়তে হবে ডাকাতের সঙ্গে নয়তো নিজেকে ডাকাত হতে হবে। মোট কথা একটা বড়ো কিছু করতে হবে আমাকে। আর সেটা করতে হবে মস্তিষ্ক দিয়ে নয়, হাত আর বুক দিয়ে। কিন্তু কী করছি আমরা? শুধু বাজারে যাচ্ছি আর কোথায় একটা টাকা পাওয়া যায় তাই শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছি। কিসের দরকার আমাদের টাকার? কী মূল্য এর? চিরদিনই কি জীবন এমনিভাবে সংগঠিত থাকবে? কী ধরনের জীবন সেটা যখন সবাই অনুশোচনা করছে, সবাই মনে করছে জীবন নিতান্ত অপরিসর? মানুষের রুচির উপরে গড়ে উঠবে জীবন। যদি সেটা আমার কাছে অপরিসর মনে হয় তবে সেটাকে আমি ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলব যাতে হাত পা ছড়িয়ে বাস করতে পারি। ভেঙে ফেলে দিয়ে আবার গড়ে তুলব নতুন করে। কিন্তু মাথা নোয়ানো? ওখানেই হচ্ছে গিয়ে সমস্যা। কী করলে মুক্ত হবে জীবন? সেটা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। আর সেটাই হচ্ছে সব চাইতে বড়ো কথা।

হ্যাঁ,—জড়িত কণ্ঠে বলল ইয়ঝভ।—তাহলে এতদূর এগিয়েছ তুমি? তা বন্ধু, ওটা সুলক্ষণ সন্দেহ নেই! তোমার কিছুটা পড়াশুনা করা দরকার। বই কেমন লাগে? বই পড়ো?

না, আমি ওর ধার ধারি না। বই-টই কিছু পড়ি না আমি।

শুধু পছন্দ করো না বলেই পড়ো না?

পড়তে আমার ভয় করে। আমি একজনকে জানি। একটি মেয়ে। মদ খাওয়ার চাইতেও খারাপ ফল হয়েছে তার পক্ষে। তাছাড়া বই-এর মধ্যে কী-ই বা এমন জ্ঞানের কথা আছে? একজনে একটা কল্পনা করল আর সেটা ছাপিয়ে দিল। অন্যেরা তাই পড়ল। যদি মজার কথা হয় তবুও না হয় কিছু হল। কিন্তু বই পড়ে শিখতে হবে কেমন করে জীবন কাটাতে হবে! একটা একান্ত অসম্ভব কথা। বই তো মানুষে লেখে ভগবান তো আর নয়! তাছাড়া কী নিয়ম-শৃঙ্খলা মানুষ তার নিজের জন্য স্থাপন করতে পারে?

তাহলে গস্‌পেল সম্পর্কে কী বলতে চাও? সেগুলো কি মানুষে লেখেনি?

তাঁরা ছিলেন ঈশ্বরের প্রেরিত। এখন কেউ তাঁরা বেঁচে নেই।

ভালো, তোমার কথা যুক্তিপূর্ণ। একথা সত্য যে এখন আর ঈশ্বরের প্রেরিত কেউ নেই।

খুব ভালো লাগল ফোমার। কারণ দেখল যে ইয়ঝভ খুব মন দিয়ে শুনছে ওর কথা। ওর মনে হল প্রত্যেকটি কথা দেখছে ওজন করে। জীবনে এই প্রথম কেউ ওর কথায় গুরুত্ব আরোপ করছে। তাই সাহস করে ফোমা তার মনের কথা বলতে লাগল বন্ধুর কাছে। শব্দ-প্রয়োগের জন্য ভাবতে হচ্ছে না এতটুকুও। অনুভব করছে ইয়ঝভ বুঝছে ওর কথা। কারণ নিজে থেকেই সে চেষ্টা করছে বুঝতে।

* * *

একটি অদ্ভুত মানুষ তুমি!—দুদিন পরে বলল ইয়ঝভ।—যদিও বলো তুমি খুবই কষ্ট করে, তবুও লোকের মনে হবে যে তোমার ভিতরে অনেক কিছু আছে। অমিত সাহস রয়েছে তোমার অন্তরে। যদি জীবন সংগঠিত করা সম্পর্কে এত-টুকুও জানা থাকত তোমার। মনে হয় তবে আরো বলতে পারতে গলা ফাটিয়ে। সত্যি।

কিন্তু কেবল কথা দিয়ে তো আর নিজেকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে তোলা যায় না! বা মুক্তও করা যায় না নিজেকে।—একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল ফোমা।—তুমি বলেছ যে এমন অনেক লোক আছে যারা নিজেকে মনে ভাবে সবজান্তা আর সর্বকর্মপারদর্শী। সে ধরনের লোক আমিও কিছু কিছু চিনি। যেমন ধরো আমার ধর্মবাবা। ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারলে, ওদের কয়েদ করতে পারলে একটা কাজের মতো কাজ হয়। ভীষণ সাংঘাতিক লোক ওরা।

আমি বুঝেই উঠতে পারছি না ফোমা, তোমার মনের ভিতরে এসব জমা হয়ে থাকলে পরে জীবন কাটাবে কেমন করে?—চিন্তিত মুখে বলল ইয়ঝভ।

খুবই শক্ত। আমার ভিতরে রয়েছে দৃঢ়তার অভাব। হঠাৎ কিছু একটা করেও ফেলতে পারি হয়তো। বুঝি আমি যে আমাদের প্রত্যেকের কাছেই জীবন সংকীর্ণ—সঙ্কটবহুল। আমার ধর্মবাপও তা দেখতে পান জানি। কিন্তু ঐ সংকীর্ণতার ভিতর দিয়ে তিনি করেন মুনফা। এতে তার খুবই আনন্দ লাগে। ছুঁচের মতো তীক্ষ্ম উনি—তাই যেখান থেকে খুশি পথ করে নিতে পারেন। কিন্তু আমি বড়ো—ভারি মানুষ তাই আমার দম আটকে আসে। আমার আষ্টে-পৃষ্ঠে শৃঙ্খল বাঁধা। একটু চেষ্টা করলেই মুক্ত হতে পারি। দেহের সবটুকু শক্তি দিয়ে যদি একবার ঝাঁকুনি দেই সমস্ত শৃঙ্খল মুহূর্তে টুকরো হয়ে খসে পড়বে।

তারপর?—প্রশ্ন করল ইয়ঝভ।

তারপর?—একটু ভাবল ফোমা। এক মুহূর্ত চিন্তা করে হাতের একটা ভঙ্গি করে বলল: তারপর কী হবে, আমি জানি না। দেখা যাবে পরে।

আমরাও দেখব।—সমর্থন করল ইয়ঝভ।

জীবনের উত্তাপে ঝলসে-যাওয়া ঐ মানুষটি আশ্রয় করেছে মদ। এমনি করে তার শুরু হয় দিন: সকালে চা খেতে খেতে ইয়ঝভ পড়ে নেয় স্থানীয় সংবাদপত্র। সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধের জন্য মালমশলা খুঁজে নিয়ে তক্ষুনি লিখে রাখে টেবিলের কোণে। তারপর ছুটে যায় সম্পাদকীয় দপ্তরে। বিভিন্ন সংবাদপত্রের কাটিং থেকে তৈরি করে প্রাদেশিক চিত্র। শুক্রবার তৈরি করে রবিবারের প্রবন্ধ। এর জন্য ও মাসে পায় একশো পঁচিশ টাকা। ইয়ঝভ কাজ করে খুব দ্রুত। তারপর সমস্ত অবসর সময় কাটায় দাতব্য-প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে—আর তথ্য অনুসন্ধান করে। ফোমাকে সঙ্গে নিয়ে হোটেলে পানশালায় ঘুরে বেড়ায় আর সর্বত্রই খুঁজে বেড়ায়। তার প্রবন্ধের মালমশলা। একে ইয়ঝভ বলে সমাজের বিবেক সাফ করার ঝাড়ু। সংবাদপত্রের কর্মচারীদের বলে সে জীবনে সত্য ও নিষ্ঠা প্রসারের বাহক। আর সংবাদপত্রকে বলে যোগসূত্র। সাংঘাতিক ভাবধারায় পাঠকদের প্রভাবান্বিত করার বাহন। নিজে যে কাজ করে তাকে বলে, আত্মা বেচার খুচরা কারবার। পবিত্র সংস্থার বিরুদ্ধে ধৃষ্ট জেহাদ।

কখন যে ইয়ঝভ পরিহাস করে আর কখন যে সত্যি সত্যি বলে অনেক সময়েই সেটা বুঝে উঠতে পারে না ফোমা। সব কিছু সম্পর্কেই ও বলে দারুণ উৎসাহ আর আবেগের সুরে। সব কিছুকেই গাল দেয় তীব্র রুক্ষ কণ্ঠে। আর তা

পছন্দও করে ফোমা। কিন্তু প্রায়ই ইয়ঝভ নিজের যুক্তি নিজেই খণ্ডন করে বলতে থাকে পরম উৎসাহের সঙ্গে স্ববিরোধী কথা। শেষ পর্যন্ত ওর কথাবার্তা অন্য দিকে মোড় নিয়ে শেষ হয় বিশ্রীভাবে। তখন ফোমার মনে হয়, লোকটা ভালোবাসে না কিছুই। কোনো কিছুই ওর অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ নয়। কোনো কিছুর দ্বারাই ও হয় না পরিচালিত। কেবল যখন নিজের সম্পর্কে বলে, বলে খানিকটা অন্য সুরে, কম আবেগের সঙ্গে। আরো বেশি নির্দয়ভাবে। আর সব কিছুর বিরুদ্ধে, সব লোকের বিরুদ্ধে ওঠে নির্মম হয়ে। ফোমার সম্পর্কে ওর ব্যবহার দ্বি-মুখী। কখনো বলে ওকে গরম কথা। তখন দেয় সাহস। বলতে বলতে তখন সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে।

এগিয়ে চলো! যা পারো সব কিছু খণ্ডন করো, উপড়ে ফেল। সবটুকু শক্তি দিয়ে এগিয়ে চলো—সমস্ত বাধা-বিঘ্ন ঠেলে ফেলে দিয়ে। মানুষের চাইতে মূল্যবান আর কিছুই নেই। মনে রেখো একথা। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করো ঃ মুক্তি! মুক্তি! স্বাধীনতা!

কিন্তু ওর কথার অগ্নিস্ফুলিঙ্গে ফোমা যখন গরম হয়ে ওঠে—উত্তেজিত হয়ে ওঠে, আর ভাবতে থাকে, কেমন করে শুরু করবে সেইসব লোকের উচ্ছেদের কাজ যারা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের তাগিদে বৃহত্তর জীবনের প্রতি বিমুখ? কিন্তু তখনই ইয়ঝভ ওকে করে নিরুৎসাহ। বলে ঃ ছেড়ে দাও। কিছুই করতে পারবে না তুমি। তোমার মতো মানুষের প্রয়োজন নেই দুনিয়ায়। তোমাদের হল শক্তির যুগ, বুদ্ধির যুগ নয়। সে যুগ চলে গেছে বন্ধু! বয়ে গেছে সে কাল। জীবনে তোমার কোনো স্থান নেই।

নেই? মিথ্যা কথা।—ওর উল্টো পালটা কথায় দারুণ বিরক্ত হয়ে বলে ফোমা.

বেশ কী করতে পারো তুমি?

আমি?

হ্যাঁ তুমি।

কেন, খুন করতে পারি তোমাকে।—ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল ফোমা হাত মুঠো করে।

হায় রে দাঁড় কাক!—কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে করুণাভরা কণ্ঠে বলল ইয়ঝভ। —তাতে কী লাভ হবে? আমি তো আধমরা হয়েই আছি নিজের ঘায়ে!—তারপর হঠাৎ বিমর্ষ বিদ্বেষে সোজা হয়ে উঠে বসে বলতে লাগল ঃ আমার বাবাই আমার সর্বনাশ করে গেছেন। কেন আমি নিজেকে নিচু করলাম সাধারণের দয়ার দান গ্রহণ করে? এক নাগাড়ে দীর্ঘ বারো বছর কেন আমি ব্যয় করলাম পড়াশুনা করে? দীর্ঘ বারো বছর ধরে স্কুল কলেজে শুকনো বাজে আবর্জনা গিলে নষ্ট করলাম যা নাকি আমার কোনো কাজেই এল না? একজন সাংবাদিক হওয়ার জন্যে? জীবনে দিনের পর দিন ভাঁড়ের ভূমিকা অভিনয় করতে আর মনে মনে নিজেকে প্রবোধ দিতে যে এ-কাজ সাধারণের পক্ষে খুবই দরকারী কাজ? কোথায় আমার যৌবনের বর্ণসমারোহ? তিন পয়সার এক একটা গুলি ছুঁড়ে নিঃশেষ করে ফেললাম অন্তরের সবটুকু বারুদ। কী বিশ্বাস অর্জন করলাম নিজের জন্যে! কেবলমাত্র এই বিশ্বাসই অর্জন করলাম যে দুনিয়ার সবকিছুই বাজে। সবকিছুই ফেলতে হবে ভেঙে—গুঁড়িয়ে। কী ভালোবাসি আমি? নিজেকে। আর আমি অন্তরে অন্তরে অনুভব করি যে, যা নাকি আমার ভালোবাসার বস্তু তাও প্রীত নয়, খুশি নয় আমার ভালোবাসায়। কী করতে পারি আমি?—বলতে বলতে প্রায় কেঁদে ফেলল ইয়ঝভ। আর শীর্ণ হাতের কাঠির মতো আঙুল দিয়ে বুক ও গলা

আঁচড়াতে শুরু শুরু করল। কিন্তু কখনো কখনো ওর ভিতরে জেগে ওঠে সাহস।
আমি? না হে না। এখনো শেষ হয়নি আমার গান। কিছু একটা শুষছে আমার বুক। হিসিয়ে ওঠা চাবুকের মতো উঠবো ফুঁসে। একটু অপেক্ষা করো, ছেড়ে দেবো খবরের কাগজ। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করব তারপর লিখব একখানা বই। যার নাম দেব—"আত্মার মৃত্যু"। ঐ নামে একটা স্তোত্র আছে। পড়া হয় সেটা মৃত্যুপথ-যাত্রীদের উদ্দেশ্যে। অন্তরের ক্লীবত্বের অভিসম্পাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গুঁড়িয়ে যাওয়া সমাজের মৃত্যুর পূর্বক্ষণে আমার বইটা গ্রহণ করবে ধূপধুনার মতো।

ওর প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনে, ওকে লক্ষ্য করে দেখে, ওর মন্তব্যের বিচার করে দেখে ফোমা দেখতে পেল যে, ইয়ঝভ তেমনি রয়েছে দুর্বল। হারিয়ে ফেলেছে পথ। কিন্তু তবুও ইয়ঝভের ভাবধারা ওকে প্রভাবান্বিত করল। উন্নত হয়েছে ওর বলবার ধরন—ওর প্রকাশভঙ্গি। সময় সময় খুশি হয়ে ওঠে এই দেখে যে কী সুন্দরভাবেই না প্রকাশ করতে পারছে এটা ওটা। একদল অদ্ভুত ধরনের মানুষের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয় ফোমার ইয়ঝভের ঘরে। ওর মনে হয় তারা জানে অনেক বোঝে অনেক। সবকিছুই খণ্ডন করে উড়িয়ে দেয়। সব কিছুর ভিতরেই দেখতে পায় চাতুরী, জোচ্চুরি, মিথ্যার বেসাতি। নীরবে ফোমা ওদের লক্ষ্য করে। শোনে ওদের কথা। ওদের বিদ্রোহ, ওদের দুঃসাহস ওকে খুশি করে তোলে। কিন্তু ওর প্রতি তাদের করুণাভরা অবজ্ঞা, ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার ওকে দারুণ বিরক্ত করে তোলে—ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়। তাছাড়া স্পষ্ট দেখতে পায় ফোমা, ইয়ঝভের ঘরে যারা আসে তারা রাস্তা বা হোটেলের লোকদের চাইতে বুদ্ধিমান। তাদের চাইতে ভালো। ওদের কথাবার্তার ধরন অদ্ভুত। ব্যবহার করে বিশেষ ধরনের ভাষা, ভাবভঙ্গি যতক্ষণ ওরা থাকে ঘরের ভিতরে। কিন্তু ঘরের বাইরে আবার হয়ে ওঠে সাধারণ—মানবিক। ঘরের ভিতরে কখনো কখনো শুকনো কাঠের স্তূপের বিরাট অগ্নি-শিখার মতো জ্বলে ওঠে দাউ দাউ করে। ইয়ঝভ ওদের ভিতরে সবচাইতে উজ্জ্বল শিখা। কিন্তু তাতে খুব সামান্যই আলোকিত হয়ে ওঠে ফোমার অন্তরের গাঢ় নিকষ অন্ধকার। একদিন ফোমাকে বলল ইয়ঝভ: আজ আমরা একটা পানোৎসব করছি। আমাদের কম্পোজিটারেরা একটা ইউনিয়ন তৈরি করেছে। ওরা চায় প্রকাশকদের সমস্ত কাজ ফুরনে করতে। এই উপলক্ষে হবে আজ পানোৎসব। ওরা আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে। আমিই বলেছিলাম ওদের। যাবে? ওদের তুমি একটু ভালো করে খাওয়াও।

বেশ।—কাদের সঙ্গে বসে সময় কাটাচ্ছে, সেটা ওর কাছে বড়ো কথা নয়। সময়টাই ওর কাছে একটা বিরাট বোঝা।

সেদিনে সন্ধ্যায় ফোমা আর ইয়ঝভ শহরের বাইরে একটা ঝোপের কিনারায় এসে বসল রুক্ষ চেহারার একদল লোকের সঙ্গে। বারোজন কম্পোজিটার। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত। ওদেরই একজন লোকের মতোই ব্যবহার করছে ওরা ইয়ঝভের সঙ্গে। ফোমার কেমন যেন একটু অবাক লাগছে—বিব্রত হয়ে উঠছে। ফোমার চোখে ইয়ঝভ অবশ্য ওদের প্রভুশ্রেণীর লোক—উঁচু দরজার। বস্তুতপক্ষে ওরা তার ভৃত্য শ্রেণীর। লোকগুলো ফোমাকে যেন আদৌ আমলই দিচ্ছে না। যদিও ইয়ঝভ যখন ফোমাকে ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, সবাই হাত মেলাল। বলল, খুব খুশি হয়েছে ওকে পেয়ে। একটা

কোণের পাশে আধশোয়া হয়ে বসে ফোমা ওদের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। নিজেকে ঐ দলের ভিতরে মনে হল একজন নিতান্ত অপরিচিত, অনাহূত আগন্তুক-মাত্র। আর দেখল ইয়ঝভও ওর দিকে নজর না দিয়ে, ইচ্ছে করেই ওর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে বসেছে। কেমন যেন অদ্ভুত মনে হচ্ছে ওর ইয়ঝভের ব্যবহার। ঐ ছোট্ট প্রবন্ধ লেখক যেন ঐ কম্পোজিটারদের স্বর, তাদের ভাষার অনুকরণ করে বলছে কথা। ওদের সঙ্গে করছে হৈ-হল্লা। বিয়ারের বোতল খুলছে, হাসছে হো হো করে আর প্রাণপণে চেষ্টা করছে ওদের মতো হতে। স্বাভাবিকের তুলনায় ওর পোশাক-পরিচ্ছদও সাধারণ।

ভাই সব!—উৎসাহভরে বলে উঠল ইয়ঝভ—তোমাদের মধ্যেই আমার ভালো লাগে। একটা মস্ত কেউকেটা নই আমি। আমি হলাম আদালতের চাপরাসী নন্‌কমিশন্‌ড অফিসার মাত্‌ভিয়েই ইয়ঝভের ছেলে।

একথা কেন বলছে ইয়ঝভ?—ভাবল ফোমা।—কে কার ছেলে তাতে কী এলো-গেলো? মানুষ তার পিতৃপরিচয়েই সম্মানিত হয়ে ওঠে না। সম্মানিত হয় তার মাথার জন্যে—বুদ্ধির জন্যে।

রক্তিম আর সোনালী রঙে মেঘগুলোকে রঞ্জিত করে একটা বিরাট অগ্নিকুণ্ডের মতো সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বনানীর মৌন নিঃশ্বাসে ভেসে আসছে স্যাঁত্‌সেতে নীরবতা। আর তারই প্রান্তে মানুষের কালো ছায়ামূর্তিগুলো করছে কোলাহল। একটি শীর্ণকায় লোক বাজিয়ে চলেছে অ্যাকর্ডিয়ন। কালো গোঁফওয়ালা একটি লোক মাথার টুপিটা পিছনের দিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাজনার তালে তালে গেয়ে চলেছে গান। দুজনে টানাটানি করছে একটা লাঠি নিয়ে। পরীক্ষা করে দেখছে কার গায়ে বেশি জোর। জনকয়েক ব্যস্ত হয়ে উঠেছে বিয়ারের বোতল আর খাবারের ঝুড়িটা নিয়ে। লম্বা ধূসর দাড়িওয়ালা একটা ঢেঙা লোক ডালপালা ভেঙে দিচ্ছে আগুনে। আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘন ধোঁয়ায় সেগুলো যাচ্ছে ঢেকে। ভিজা ডালপালা আগুনে পড়ে মৃদু করুণ সুরে কাত্‌রে উঠছে। বেজে চলেছে অ্যাকর্ডিয়নের প্রাণময় জীবন্ত সুর। আর তাঁরই সঙ্গে গায়কের কণ্ঠ মিলে পূর্ণ হয়ে উঠছে উচ্চ সুরগ্রাম।

ওদের সবার থেকে একটু দূরে একটা নালার ধারে শুয়ে রয়েছে তিনটি যুবক। ওদের সামনে দাঁড়িয়ে ইয়ঝভ তার খন্‌খনে গলায় বলে চলেছে: তোমরা বহন করছ শ্রমের পবিত্র পতাকা। আর আমিও তোমাদেরই মতো ঐ একই বাহিনীর একজন স্বেচ্ছাসৈনিক। সবাই আমরা মহামহিম প্রেস মহারানীর নোকরি করে চলেছি। তাই আমাদের দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে।

ঠিক কথা নিকোলাই মাতভিচ!—কে যেন বলে উঠল মোটা গলায়।—আমরা চাই যে আপনি আপনার প্রভাব বিস্তার করুন প্রকাশকদের উপরে। কাজে লাগান আপনার প্রভাব। অসুখ করা আর মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়া—এ দুটোকে একই-ভাবে, একই চোখে দেখা চলতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে যা চলেছে তা এই: যদি আমাদের মধ্যে কেউ মাতাল হয়ে পড়ে তাকে জরিমানা করা হয় এক দিনের মাইনে। কিন্তু যদি কারুর অসুখ করে তাকেও ঐ একইভাবে জরিমানা করা হয়। অনুমতি দেয়া হোক আমাদের ডাক্তারি সার্টিফিকেট দাখিল করতে যাতে সত্যি অসুখ করেছে কিনা সেটা প্রমাণ হবে। আর যদি প্রমাণিত হয় তবে সেই অসুস্থ শ্রমিককে অন্তত আধ-রোজের মাইনে দিতে হবে। নইলে আমাদের পক্ষে নাচার। ধরুন, যদি আমাদের তিনজনের একই সঙ্গে অসুখ হয়ে পড়ল, তখন?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, এ তো যুক্তিসঙ্গত কথা।—বলল ইয়ঝভ।—কিন্তু দোস্ত,

বন্ধুর কথার দিকে আর কান নেই ফোমার। ওর মনোযোগ আকৃষ্ট হল ওদের কথার দিকে। দুজন লোক কথা বলে চলেছে। একজন লম্বা, ক্ষীণকায়, ক্ষয়রোগগ্রস্ত। ওর পরনে জীর্ণ পোশাক, চোখের দৃষ্টি উগ্র, অন্য জনার সুন্দর চুল, সুন্দর দাড়ি, বয়সে তরুণ।

আমার মতে—বলল লম্বা লোকটি রুক্ষ গলায় কাশতে কাশতে—ওটা মূর্খতা। আমাদের মতো লোকে আবার বিয়ে করবে কি করে? বিয়ে করলেই আসবে ছেলে-পুলে। তাদের প্রতিপালন করার মতো কী আছে আমাদের? তারপর জোগাতে হবে স্ত্রীর পরনের কাপড়। আর জানো না তুমি সে মেয়ে কেমন হবে না হবে।

সে মেয়ে খুব চমৎকার।—মৃদু কণ্ঠে বল সুন্দর-চুল লোকটি।

ভালো কথা, না হয় এখন চমৎকার আছে। বিয়ের কনে হল এক আর স্ত্রী হল আর এক। কিন্তু সেটাও বড়ো কথা নয়। চেষ্টা করে দেখতে পারো। হয়তো ভালোই হবে সে। কিন্তু তারপর তোমার টাকায় টানাটানি পড়বে। নিজে তো খেটে খেটে মরেই যাবে আর তাকেও শেষ করবে। বিয়ে করা আমাদের মতো লোকের পক্ষে অসম্ভব। তুমি কি মনে করো আমাদের এই আয়ে আমরা বিয়ে করতে পারি? এই আমাকেই দেখ না। মাত্র চার বছর হল আমি বিয়ে করেছি। এরই ভিতরে আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। এতটুকু আনন্দের মুখও দেখলাম না কোনো দিন। কেবল দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনাই সার।—বলতে বলতে লোকটি কাশতে শুরু করল। অনেকক্ষণ ধরে কেশে তারপর ধরা গলায় বলল : ছেড়ে দাও, কিছু হবে না ওতে।

ক্ষুন্ন মনে ওর সঙ্গী মাথা নিচু করল। ফোমা ভাবতে লাগল : বলেছে লোকটা যুক্তিসংগত কথা। এটা পরিষ্কার যে লোকটা বেশ ভালো যুক্তি দিয়ে কথা বলতে পারে।

ফোমার প্রতি ওদের ঔদাসীন্য ওকে আহত করল কিন্তু সংগে সংগেই সীসের গুঁড়োমাখা ঐ কালো-মুখ মানুষগুলির প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় ওর অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল। প্রায় সকলেই গভীর বাস্তব আলোচনায় রত। কেউ ওর কাছে এসে ওকে করছে না খোসামোদ। দুর্দশার কথা বলে ওকে বিরক্ত করছে না কেউ। হোটেলে, পানশালার সঙ্গীদের ভিতরে যেটা ব্যাপক। ফোমার অন্তর খুশি হয়ে উঠল।

দেখছ ওরা কেমন? আত্মসম্মানবোধ আছে ওদের।—মনে মনে হাসল ফোমা।

আর আপনি—নিকোলাই মাতভিচ্,—ভর্ৎসনার কণ্ঠে কে যেন বলে উঠল,—কেতাবী বুলি কপচে বিচার করবেন না। বিচার করুন জীবন্ত সত্যের ভিত্তিতে। কেউ আর রুটির গুঁড়োর জন্যে লড়াই করে না বই মিলিয়ে। করে প্রয়োজনের তাগিদে। তাদের মাথায় যেমন আসে তেমনি করে, কেতাবী কানুনে লেখা আছে বলে নয়।

মাপ করো দোস্ত! আমাদের অন্যান্য সভ্যদের অভিজ্ঞতা থেকে কী শিক্ষা পাই আমরা?

যেদিক থেকে ইয়ঝভ উচ্চকণ্ঠে কথা বলছিল সেদিকে তাকাল ফোমা। মাথা থেকে টুপি খুলে ঘোরাতে ঘোরাতে ইয়ঝভ বলছিল কথা।

আমাদের কাছে এগিয়ে এসে বসুন গরদিয়েফ!—ফোমার সামনে এসে দাঁড়াল বেঁটে একটি লোক। গোলগাল চেহারা। গায়ে জামা, পায়ে উঁচু বুট। ফোমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল প্রশান্ত দরাজ হাসি। ওর মোটা নাক, হাসিখুশি গোলগাল

মুখের দিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে উঠল। মৃদু হেসে প্রত্যুত্তরে বলল ফোমা : যাচ্ছি। কিন্তু কনিয়াকের সদ্ব্যবহারের সময় কি আসেনি এখনো? বোতল দশেক এনেছি সঙ্গে।

উঃ! প্রমাণ হয়ে গেল যে আপনি একজন খাঁটি ব্যবসায়ী। দলের কাছে গিয়ে আপনার বক্তব্য পেশ করছি।—বলেই নিজের কথায় নিজেই উচ্চ হাসির ধমকে ফেটে পড়ল। ফোমাও হেসে উঠল।

সূর্যের আভা ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম আকাশ থেকে যেন একটা নরম কোমল লোহিত যবনিকা ধীরে ধীরে নেমে আসছে নিচে ধরণীর বুকে। আসছে নেমে আকাশের গভীর অতলতা উন্মোচিত করে যেখানে ছোট ছোট তারা-গুলি আনন্দে লুটোপুটি করছে। বহু দূর থেকে যেন একখানা অদৃশ্য হাত শহরের কালো স্তূপের উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে আলো। আর এখানে আকাশের দিকে মুখ তুলে বিরাট এক কালো দেয়ালের মতো নীরব নিবিড় চোখে দাঁড়িয়ে বন। এখনো চাঁদ ওঠেনি। মাঠের বুকে এখনো রয়েছে গোধূলির আলোর উষ্ণ স্পর্শ।

আগুনের অনতিদূরে সমগ্র দলটি বসেছে গোল হয়ে। ইয়ঝভের পাশে বসেছে ফোমা আগুনের দিকে পিঠ করে। ওর চোখের সামনে একদল মানুষের সরল আনন্দোজ্জ্বল মুখ আলোর দীপ্তিতে ঝলমল করছে। মদ খাওয়ায় সবাই উঠেছে চনমনিয়ে। কিন্তু কেউই এখনো মাতাল হয়ে পড়েনি। সবাই হাসছে, হাসি-তামাশা করছে আর চেষ্টা করছে গান গাইতে। মদ খাচ্ছে। খাচ্ছে শশার সঙ্গে রুটি আর সসেজ। সব কিছু মিলে ফোমার অন্তরে জাগিয়ে তুলল এক অদ্ভুত আনন্দ। সবার অমায়িক ব্যবহারে ক্রমে ফোমার সংকোচ কেটে যেতে লাগল। উঠল সাহসী হয়ে। ওর ইচ্ছে হল, এই ভালো মানুষগুলোর সামনে কিছু একটা বলে যাতে ওরা খুশি হয়ে উঠবে। ওর পাশে মাটির উপরে বসে ইয়ঝভ। নড়াচড়া করছে। কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে ফোমাকে আর মাথা নাড়তে নাড়তে অস্ফুট কণ্ঠে কী যেন বলে চলেছে।

ভাই সব! এসো আমরা সেই ছাত্রদের গানটা গাই। আচ্ছা ধরো—এক, দুই!

"ঢেউ-এর মতো দ্রুত"—কে একজন মোটা গলায় গেয়ে উঠল :

"মোদের জীবনের দিনগুলি,"

বন্ধুগণ!—মদের গ্লাস হাতে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করল ইয়ঝভ। টলতে টলতে ফোমার মাথার উপরে বাকি হাতটা দিয়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। শুরু হয়েই থেমে গেল গান। সবাই মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল।

শ্রমিক ভাই সব! আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে জেগে-ওঠা কয়েকটি কথা আজ বলতে চাই তোমাদের কাছে। খুবই আনন্দ পাই আমি তোমাদের কাছে এলে। তাই তোমাদের মধ্যেই আমি ভালো থাকি। তার কারণ তোমরা মজুর—তোমরা শ্রমজীবী। তোমাদের সুখী হওয়ার অধিকার সম্পর্কে কারুরই কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। যদিও সেটা স্বীকৃত হয় না। তোমাদের মতো মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের ভিতরে—হে সৎ মানুষ এই নিঃসঙ্গ লোকটা—জীবন যাকে বিষে জর্জর করে তুলেছে সে পারে সহজে নিঃশ্বাস নিতে।—কাঁপতে কাঁপতে বুজে এল ইয়ঝভের গলা। মাথাটা দারুণভাবে নড়ে চলেছে। ফোমার মনে হল কী যেন গরম একটা বস্তু ঝরে পড়ল ওর হাতের উপরে। মুখ তুলে ইয়ঝভের বলিকুঞ্চিত মুখের দিকে তাকাল। বলে চলেছে ইয়ঝভ আর সঙ্গে সঙ্গে ওর সর্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠছে।

কেবলমাত্র আমি একা নই। আরো অনেক আছে আমার মতো জীবন যাদের

চৌচির করে তুলেছে। ভেঙে পড়ছে আর ভোগ করছে অশেষ লাঞ্ছনা। আমরা তোমাদের চাইতে আরো বেশি হতভাগ্য। কারণ দেহ ও মনের দিক থেকে তোমাদের চাইতে আমরা আরো বেশি দুর্বল। কিন্তু তবুও আমরা তোমাদের চাইতে শক্তিশালী। কেননা আমাদের হাতে রয়েছে জ্ঞানের অস্ত্র। কিন্তু তা প্রয়োগ করার মতো সুযোগ আমাদের নেই। সানন্দে আমরা রাজী আছি তোমাদের মধ্যে আসতে। তোমাদের হাতে নিজেদের ছেড়ে দিতে। আর বাঁচার লড়াইয়ে তোমাদের সাহায্য করতে। এছাড়া আমাদের করবার আর কিছুই নেই। তোমাদের ছাড়া আমাদের দাঁড়াবার মতো পায়ের তলায় মাটি নেই। আর আমরা ছাড়াও তোমরা আলোহীন। কমরেড! অদৃষ্ট আমাদের পরস্পরকে সৃষ্টি করেছে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে।

কী চায় ইয়ঝভ ওদের কাছে?—মনে মনে ভাবল ফোমা। নিতান্ত বিরক্তির সঙ্গে শুনতে লাগল ওর বক্তৃতা। তাকাল ফোমা কম্পোজিটারদের মুখের দিকে। দেখল, প্রশ্নভরা বিরক্ত ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রয়েছে ওরা বক্তার মুখের দিকে।

বন্ধুগণ! ভবিষ্যত তোমাদের।—মৃদু মৃদু মাথা নাড়তে নাড়তে বিষাদমাখা কণ্ঠে বলল ইয়ঝভ। যেন ভবিষ্যতের কথা মনে করে দুঃখিত হয়ে উঠেছে ওর অন্তর। আর তাই একান্ত অনিচ্ছায় ঐ লোকগুলোর কাছে করছে নতি স্বীকার।

ভবিষ্য সৎ শ্রমজীবীরা! তোমাদের সামনে রয়েছে মহান দায়িত্ব! সৃষ্টি করতে হবে তোমাদের নতুন সংস্কৃতি—মুক্ত, স্বাধীন, উজ্জ্বল, জীবন্ত ভবিষ্যত। আমি হচ্ছি তোমাদেরই একজন। তোমাদেরই রক্তমাংসে গড়া এক সৈনিকের সন্তান। তোমাদের ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে তুলে ধরছি এই পানপাত্র। হুররা!—এক চুমুকে গ্লাসটা খালি করে ধপ্‌ করে বসে পড়ল ইয়ঝভ।

ইয়ঝভের হর্ষধ্বনির সঙ্গে গলা মিলিয়ে এমন বজ্রকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ওরা যে, সেই শব্দ বাতাসে গড়াতে গড়াতে গাছের পাতাগুলোকে পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলল।

এবার একটা গান হোক।—প্রস্তাব করল সেই মোটা লোকটি।

এসো ধরা যাক!—একসঙ্গে বলে উঠল দু'তিন জন। কী গান ধরা হবে তাই নিয়ে শুরু হল আলোচনা। গোলমাল শুনে ইয়ঝভ মাথাটা একবার এদিকে, একবার ওদিকে হেলিয়ে সবার মুখের দিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল।

ভাই সব!—হঠাৎ চিৎকার করে উঠল ইয়ঝভ,—জবাব দাও—আমার অভিনন্দন বাণীর প্রত্যুত্তর বলো কিছু।

আবার সবাই চুপ করে গেল। যদিও সবাই একসঙ্গে নয়। কেউ কেউ উৎসুক দৃষ্টি মেলে ওর দিকে তাকাল। কেউ কেউ চেষ্টা করল বিরক্তি চেপে রাখতে। কারুর চোখে মুখে অসন্তুষ্টির ছাপ। আবার ইয়ঝভ মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করল। ওর কণ্ঠে উষ্মাভরা ঔদ্ধত্য।

দুজন আমরা উপস্থিত আছি এখানে জীবন যাদের রেখেছে কোণঠাসা করে। আমি আর ঐ আর-একজন। আমরা দুজনেই চাই মানুষকে শ্রদ্ধা করতে। নিজেদের অন্যের কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠার সুখ অনুভব করতে। কমরেড! কিন্তু ঐ বিরাট দেহ মূর্খ লোকটা—

নিকোলাই মাতভিচ্‌! আমাদের অতিথিকে অপমান করবেন না!—দারুণ বিরক্তিভরা গম্ভীর কণ্ঠে কে যেন বলে উঠল।

হ্যাঁ, ওসব বাজে কথায় প্রয়োজন নেই।—মোটা লোকটি, যে ফোমাকে ডেকে এনেছিল, আগের বক্তাকে সমর্থন করে বলল।—কেন আপনি অপমানসূচক কথা বলছেন?

আমরা এসেছি সবাই মিলে একটু আনন্দ করতে,—উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠল আর একজন,—একটু বিশ্রাম উপভোগ করতে।

মূর্খের দল!—একটু ক্ষীণ হাসি হেসে উঠল ইয়ঝভ। সহৃদয় মূর্খের দল! ওকে তোমরা দয়া দেখাচ্ছ? জানো ও লোকটা কে? ও হল তাদেরই একজন যারা তোমার রক্ত চুষে খায়।

যথেষ্ট! নিকোলাই মাতভিচ্!—সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল ইয়ঝভের বিরুদ্ধে। তারপর ওকে এতটুকুও আমলে না এনে পরস্পর কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করল। বন্ধুর দুর্দশায় এত দুঃখ হল ফোমার যে নিজের সম্পর্কে ওর ঐ অপমান-সূচক কথায় আহত হয়ে ওঠার অবকাশমাত্র পেল না। ফোমা দেখল যারা ওর হয়ে ঐ সাংবাদিকটির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল তারা আর এতটুকুও মনোযোগ দিচ্ছে না তার প্রতি। ফোমা বুঝল ব্যাপারটা যদি ওর নজরে পড়ে তবে দারুণ আহত হবে ইয়ঝভ, ব্যথা পাবে। তাই বন্ধুকে ঐ বিশ্রী অবস্থার ভিতর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে ওর কোঁকের উপরে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে দরাজ হাসি হেসে বলল: ওহে অভিযোগকারী! আরো মদ খাবে না বাড়ি যাবে এখন?

বাড়ি? মানুষের ভিতরে যে লোকের কোনো স্থান নেই তার বাড়ি কোথায়?—বলেই ইয়ঝভ আবার চিৎকার করে বলতে আরম্ভ করল: কমরেডস্!

কিন্তু ওর আহ্বানে কেউ সাড়া দিল না। ওদের গুঞ্জনের ভিতরে ডুবে গেল ওর কথা। পরক্ষণেই মাথা নিচু করে ফোমাকে বলল ইয়ঝভ,—চলো, চলে যাই এখান থেকে।

চলো। অবশ্য আর একটু থাকলেও চলত। বেশ লাগছে। ওদের ব্যবহার এত চমৎকার!

না আমার আর সহ্য হচ্ছে না। শীত করছে। দম আটকে আসছে।

বেশ চলো তবে।—ফোমা উঠে দাঁড়াল। টুপি খুলে কম্পোজিটারদের নমস্কার করে খুশিভরা উচ্ছল কণ্ঠে বলল: আপনাদের আতিথ্যের জন্য ধন্যবাদ। আসি এখন, নমস্কার।

ওরা ফোমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে অনুরোধ করে বলতে লাগল: আপনি থাকুন। কোথায় যাবেন? সবাই মিলে আমরা গান করব।

না আমাকে যেতে হবে। বন্ধুটি একা চলে যাবে, সেটা দেখতে খারাপ। ওকে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি আমি। প্রার্থনা করি আপনাদের পানাহার বেশ আনন্দের সঙ্গেই চলুক।

আঃ! আর খানিকক্ষণ থেকে যাওয়া উচিত ছিল আপনার।—বলল মোটা লোকটি। তারপর গলা নিচু করে ফিস্ ফিস্ করে বলল: অন্য কেউ একজন ওকে পৌঁছে দিয়ে আসবে'খন।

ক্ষয়রোগগ্রস্ত লোকটিও নিচু গলায় বলল: আপনি থাকুন। কেউ একজন ওকে শহরে পৌঁছে দিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়িতে তুলে দিয়ে আসবে'খন। তা হলেই হল।

ফোমার ইচ্ছে হল থেকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন একটু ভয়ও হতে লাগল। ততক্ষণে ইয়ঝভ উঠে দাঁড়িয়ে ফোমার ওভারকোটের হাতায় টান দিতে দিতে বিড়বিড় করে বলে উঠল: চলে এসো! জাহান্নামে যাক ওরা!

আচ্ছা আবার দেখা হবে। আমি যাচ্ছি।—বলেই ফোমা ওদের বিনম্র আপশোসের ভিতর দিয়ে বিদায় নিল।

হাঃ হাঃ হাঃ! আগুনের কুণ্ড ছাড়িয়ে কিছুদূর যেতে না যেতেই হো হো

করে হেসে উঠল ইয়ঝভ ঃ দুঃখিত হয়ে ওরা আমাদের বিদায় দিল। কিন্তু আমি চলে যাচ্ছি দেখে খুশি হয়েছে মনে মনে। ওদের পশু হয়ে ওঠার দিক থেকে বাধা জন্মাচ্ছিলাম আমি।

সত্যি কথা, তুমি ওদের বিরক্ত করছিলে।—প্রত্যুত্তরে বলল ফোমা।—কেন অমন বক্তৃতা দিতে গেলে? লোকগুলো এসেছে একটু স্ফূর্তি করতে আর তুমি কিনা শোনাতে লাগলে নীতিবাক্য। ওতে ওরা দারুণ বিরক্ত হচ্ছিল।

চুপ করে থাকো। কিছু বোঝ না তুমি।—রুক্ষ কণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠল ইয়ঝভ। ভেবেছ আমি মাতাল হয়ে পড়েছি? আমার দেহটাই যা মাতাল হয়ে পড়েছে, কিন্তু আমার আত্মা ঠিকই আছে। সব সময়েই থাকে সচেতন। সব কিছুই পারে অনুভব করতে। উঃ! দুনিয়ায় কত যে নীচতা, কত যে মূর্খতা আছে! আর মানুষ—এই সব মূর্খ হতভাগা মানুষের দল!—বলতে বলতে ইয়ঝভ একটু থামল। তারপর দুহাতে মাথাটা চেপে ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলতে লাগল।

হাঁ,—বলল ফোমা।—ওরা একজন অন্যজনের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। ওরা কত বিনয়ী, কত নম্র,—ঠিক যেন ভদ্রলোকের মতো। ওদের যুক্তিও ঠিক। সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধিও আছে। তবুও ওরা মজুর ছাড়া আর কিছুই নয়।

পিছনে গাঢ় অন্ধকারের ভিতর থেকে জেগে উঠল মিলিত কণ্ঠের সুর। ধীরে সে সুরতরঙ্গ বিরাট আকার ধারণ করে জনশূন্য মাঠের নৈশ বাতাসে ফেনিয়ে উঠতে লাগল।

হা ঈশ্বর!—একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে মৃদু কণ্ঠে বলে উঠল ইয়ঝভ ঃ কোথায় আমাদের স্থান? কোথায় বাঁধা রয়েছে আমাদের অন্তরাত্মা? কে মেটাবে আমাদের অন্তরের পিপাসা? বন্ধুত্বের, ভ্রাতৃত্বের, ভালোবাসার পিপাসা? পূত-পবিত্র শ্রমের তৃষ্ণা?

ঐ সবল মানুষগুলো,—সঙ্গীর কথায় কান না দিয়ে ধীরে চিন্তিত মুখে বলল ফোমা নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে—যদি কেউ ওদের দিকে তাকায়, দেখতে পাবে ওরা লোক খারাপ নয়। বরং খুবই চমৎকার। চাষী মজুর ওদের দিকে সহজ দৃষ্টিতে তাকালে দেখবে ওরা ঠিক ঘোড়ার মতো। ওরা বোঝা বয়।

পিঠে করে বহন করে আমাদের,—উষ্ণ কণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠল ইয়ঝভ।—ঘোড়ার মতোই ওরা আমাদের পিঠে করে বহন করে বিনা প্রতিবাদে—বোকার মতো। ওদের ঐ একান্ত বাধ্য ভাবই আমাদের দুর্ভাগ্য—আমাদের অভিশাপ।

নিজের ভাবনার সূত্র ধরেই বলতে লাগল ফোমা ঃ ওরা বোঝা বয়—সমস্ত জীবন-ভোর করে পরিশ্রম কেবলমাত্র তুচ্ছ সামান্য বস্তুর জন্যে। তারপর একদিন হঠাৎ এমন একটা কথা বলে ওঠে যা একশ বছরেও জাগবে না তোমার মনে। তার মানে ওরা অনুভব করে। হাঁ। খুবই চমৎকার ওদের সঙ্গ।

টলতে টলতে নীরবে হাঁটতে লাগল ইয়ঝভ। হঠাৎ শূন্যে হাত নেড়ে শুকনো চাপা গলায় আবৃত্তি করতে শুরু করল। মনে হল যেন ওর পেটের ভিতর থেকে আওয়াজ বেরিয়ে আসছে ঃ

"জীবনের হাতে পেয়েছি নিঠুর বঞ্চনা
আমি সয়েছি শতেক যন্ত্রণা।"

এ আমার নিজের লেখা কবিতা। থমকে দাঁড়িয়ে করুণভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল ইয়ঝভ। তারপর কী? ভুলে গেছি। কী যেন আছে স্বপ্ন সম্পর্কে। পবিত্র প্রত্যাশা। জীবনের বাষ্প আমার বুকের ভিতরটা চেপে শ্বাসরোধ করে ধরেছে। হায়!

"বুকের ভিতর ঘুমন্ত যত স্বপ্ন
ঘুম ভেঙে উঠবে না।"

ভাই! তুমি আমার চাইতে সুখী। কারণ তুমি মূর্খ। কিন্তু আমি—

অভদ্র হয়ো না বলে দিচ্ছি!—রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল ফোমা,—বরং চুপ করে শোনো, কেমন চমৎকার গান করছে ওরা।

চাই না শুনতে অন্য লোকের গান,—মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল ইয়ঝভ,—আমার নিজেরই গান আছে, আত্মার সঙ্গীত। যা নাকি চূর্ণ হয়ে গেছে জীবনের সংঘাতে।

তারপর চিৎকার করে বলতে শুরু করল কর্কশ বন্য কণ্ঠে :

"বুকের গহনে ঘুমন্ত যত স্বপ্ন
ঘুম ভেঙে উঠবে না......
কত অগণিত স্বপ্ন আমার!"

ছিল উজ্জ্বল জীবন্ত স্বপ্ন আর আশার বাগানভরা ফুল। তা শুকিয়ে গেছে। ঝরে গেছে নিঃশেষ হয়ে। মৃত্যু এসে বাসা বেঁধেছে আমার অন্তরে। আমার স্বপ্নের মৃতদেহ পচছে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে। হায় হায়!—বলতে বলতে ইয়ঝভ কেঁদে ফেলল। নারীর কান্নার মতো ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নায় পড়ল ভেঙে।

ফোমার অন্তর করুণায় পূর্ণ হয়ে উঠল। দারুণ বিরক্তিকর মনে হল ওর সঙ্গ। ইয়ঝভের কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ধৈর্যহীন কণ্ঠে বলে উঠল : কান্না থামাও। এসো, এসো! কী দুর্বল তুমি!

দুহাতে মাথাটা চেপে ধরে ইয়ঝভ ঝুঁকে-পড়া শরীরটাকে সোজা করে তুলল। তারপর একটু চেষ্টা করে আবার তার কর্কশ কণ্ঠে বলতে শুরু করল :

"কত অগণিত স্বপ্ন আমার!
বুকের কবরে ধরে না, ধরে না!
গানের কাফনে ওদের সাজাই—
কত-না করুণ গম্ভীর গান
কবরের পাশে থেকে থেকে গাই।"

হা ঈশ্বর!—হতাশ কণ্ঠে বলল ফোমা। দোহাই ঈশ্বরের, থামো! হা ভগবান! কী করুণ!

দূরে নিবিড় অন্ধকারের বুকে গুমরে গুমরে ফিরছে মিলিত কণ্ঠের সঙ্গীতের সুর। গানের তালে তালে কে যেন শিস্ দিচ্ছে। সঙ্গীতের তরঙ্গায়িত সুর ছাপিয়ে জেগে উঠছে তারই শিরশিরে তীক্ষ্ণ সুর। ফোমা ফিরে তাকাল; দেখল উঁচু বনানীর কালো প্রাচীরের পাশে আগুনের কুণ্ডলী ঘিরে মানুষের অস্পষ্ট ছায়া-মূর্তি। মনে হচ্ছে যেন ঐ প্রাচীর মানুষের বুক, আর ঐ আগুনের কুণ্ডলী সেই বুকে দগদগে ক্ষতচিহ্ন। বুকখানা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে আর ঐ ক্ষত বেয়ে আগুনের স্রোতের মতো ঝরে পড়ছে রক্তের ধারা। চারদিক থেকে ঘিরে-ধরা গভীর অন্ধকারের ভিতরে ঐ মানুষের ছায়ামূর্তিগুলো যেন একদল কাঁচ শিশু। যেন ঐ আগুনের দীপ্ত আভায় জ্বলে জ্বলে উঠছে—উঠছে আলোকিত হয়ে। ওরা হাত নেড়ে উচ্চকণ্ঠে গেয়ে চলেছে গান।

ফোমার পাশে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল ইয়ঝভ :

তুমি একটা পাষাণ-প্রাণ মূর্খ। কেন তুমি অবহেলা করছ আমাকে? শোনো মুমূর্ষু আত্মার গান আর শুনতে শুনতে চোখের জল ফেল। জানো, কেন ঐ আত্মা আহত? কেন ঐ আত্মা মুমূর্ষু? দূর হও তুমি আমার চোখের সামনে থেকে!

দূর হও! ভাবছ আমি মাতাল? আমি বিষাক্ত—দূর হও!

অন্ধকারে দূরের ঐ আগুন আর বনানীর সুন্দর দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই ফোমা ইয়ঝভের পাশ থেকে কয়েক পা দূরে সরে গেল। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল ঃ বোকামো করো না। কেন তুমি আমাকে যা খুশি তাই গাল পাড়ছ?

আমি একা থাকতে চাই আর শেষ করতে চাই আমার গান।

ইয়ঝভও টলতে টলতে ফোমার কাছ থেকে দূরে সরে গেল। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কান্নাভরা সুরে বলতে আরম্ভ করল ঃ

"গান তো ফুরোলো! এ-জীবনে আর
ভাঙাবো না কভু ওই কাল-ঘুম,
দাও, প্রভু, দাও জীবনমরণে শান্তি!
ক্ষতবিক্ষত নিরাশ এ-প্রাণ
প্রভু, দাও প্রাণে শান্তি!"

ঐ গানের করুণ কাতর শব্দে ফোমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। দ্রুত এগিয়ে এল ইয়ঝভের কাছে। কিন্তু ওকে ধরে ফেলার আগেই ঐ ক্ষুদে সাংবাদিক তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠে পরক্ষণেই উবু হয়ে মাটির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে রুগ্ন শিশুর মতো শীর্ণকণ্ঠে বিলাপ করে কাঁদতে শুরু করল।

নিকোলাই!—ওর কাঁধ ধরে তুলে বসিয়ে বলল ফোমা,—কান্না থামাও! কী ব্যাপার? ঢের হয়েছে নিকোলাই! লজ্জা করে না তোমার?

কিন্তু এতটুকুও লজ্জা পেল না ইয়ঝভ। জল থেকে তুলে-আনা মাছের মতো মাটির উপরে দাপাদাপি করতে শুরু করল। অবশেষে ফোমা যখন ওকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল, তখন সে শীর্ণ হাতে ফোমার কোমর জড়িয়ে ধরে বুকের উপরে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

জীবনের ক্ষুদ্রতার আঘাতে আহত বিধ্বস্ত ঐ মানুষটির প্রতি করুণার উত্তাপে উত্তেজিত ফোমার অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল। দূরে অন্ধকারের ভিতরে যে-দিক থেকে দেখা যাচ্ছিল শহরের আলোর রেখা, সে-দিকে তাকিয়ে নিদারুণ ব্যথায় গভীর উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠল ঃ

অভিশাপ! অভিশাপ নেমে আসুক! একটু অপেক্ষা করো। তুমিও অমনি রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠবে। পড়ুক অভিসম্পাত!

১১

লিউবভকা!—বাজার থেকে ফিরে এসে একদিন বলল মায়াকিন,—আজ সন্ধ্যার জন্যে তৈরি হয়ে নে। আমি যাচ্ছি তোর জন্যে বর আনতে। খুব ভালো খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করিস। আমাদের যত কিছু পুরানো রুপোর বাসনপত্র আছে তা দিয়ে টেবিল সাজাস। ফলের পাত্রটাও আনিস। যাতে সে আমাদের খাবার টেবিল দেখে অবাক হয়ে যায়। দেখুক যে আমাদের সব কিছুই দুষ্প্রাপ্য।

জানলায় বসে লিউবা তার বাবার মোজা রিপু করছিল। হাতের কাজের উপর নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়েছে মাথাটা।

কিসের জন্যে এসব বাবা?—ক্ষুণ্ণ অসন্তুষ্ট লিউবা প্রশ্ন করল।

কেন আবার! একটু স্বাদ, একটু গন্ধ, তারই জন্যে। তাছাড়া এখন উপযুক্ত সময়। মেয়ে তো আর ঘোড়া নয় যে বিনা জিন লাগামেই তাকে বিদেয় করা যায়!

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল লিউবা। হাতের কাজ ফেলে দিয়ে বিব্রতমুখে মাথা নাড়তে নাড়তে বাবার মুখের দিকে তাকাল। পরক্ষণেই আবার মোজাটা তুলে নিয়ে মাথা আরো নিচু করে মোজার উপরে ঝুঁকে পড়ল। চিন্তিত মনে বৃদ্ধ তার আগুন-রাঙা দাড়িগুলো টানতে টানতে ঘরের ভিতর পায়চারি করতে শুরু করল। চোখদুটো দূরের পানে নিবদ্ধ। দেখলেই মনে হয় যেন সে এক গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। তরুণী বুঝল, ওর কোনো কথায়ই কর্ণপাত করবে না বৃদ্ধ। স্বামী হিসেবে একটি বন্ধু পাবার রঙিন স্বপ্ন—একটি শিক্ষিত মানুষ যে ওর সঙ্গে বসে পড়বে বই, আত্ম-সন্ধানের সংশয়ভরা কামনার ভিতর থেকে নিজেকে খুঁজে পেতে যে ওকে করবে সাহায্য—ওর সে স্বপ্ন গেল ভেঙে। শ্বাসরোধ হয়ে গেল ওর বাবার অনমনীয় ইচ্ছের সংঘাতে। স্মলিনের সঙ্গে ওকে বিয়ের দেবার প্রস্তাবে সে স্বপ্নের হল অপমৃত্যু। পচে গলে অন্তরের অন্তস্তল তিক্ত তলানিতে ভরে উঠল। ব্যবসায়ীশ্রেণীর ঘরের অন্যান্য সাধারণ মেয়ের চাইতে নিজেকে লিউবা ভাবত অনেক বড়ো—অনেক উর্ধ্বে স্থান দিত নিজেকে। ঐ সব অন্তঃসারশূন্য নির্বোধ মেয়ের দল, পোশাক ছাড়া যারা ভাবে না আর কিছুই, অন্তরের স্বাধীন ইচ্ছের বদলে বাপ-মায়ের নির্বাচনেই যারা করে বিয়ে তাদের চাইতে নিজেকে মনে করত স্বতন্ত্র। আর আজ ও নিজেই কিনা বিয়ে করতে যাচ্ছে বয়স হয়েছে বলে আর ওর বাবার ব্যবসা পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে একটি জামাইয়ের তাই। ওর বাবা মনে করেন পুরুষের মনোযোগ আকর্ষণ করার দিক থেকে ও সম্পূর্ণ অক্ষম। তাই তিনি ওকে দিচ্ছেন রুপোয় মুড়ে। উত্তেজিত লিউবা অস্থির হাতে কাজ করে চলেছে। আঙুলে ফুটে গেল ছুঁচ—ভেঙে গেল। কিন্তু তবুও চুপ করে রইল। কেননা খুব ভালো করেই জানে লিউবা যে যা-কিছুই সে বলুক না কেন সে-কথা পৌঁছবে না ওর বাবার কানে।

অস্থির পায়ে ঘরময় পায়চারি করতে করতে বৃদ্ধ কখনো আওড়াচ্ছে কবিতা,

কখনো বা গভীর সুরে মেয়েকে উপদেশ দিচ্ছে কেমন করে ভাবী বরের সঙ্গে করবে ব্যবহার। তারপর ভ্রূ কুঁচকে মনে মনে কী যেন হিসেব করে আঙুল গুনতে গুনতে হেসে উঠল।

হুঁ! বটে! হে প্রভু! পরীক্ষা করছ আমাকে? বিচার করো! অপরাধকারী বাজে মানুষের হাত থেকে মুক্ত করো আমাকে! ভালো কথা, তোর মায়ের মুক্তোর গয়নাগুলো পরে নিস।

খুব হয়েছে, থামো এখন বাবা! সে যা করতে হয় আমি বুঝব এখন।

পা ছুড়িস না ছুঁড়ি! যা বলছি তা শোন।

পরক্ষণেই বৃদ্ধ আবার তার হিসেবে ডুবে গেল।

তাতে হয় শতকরা পঁয়ত্রিশ। হুঁ, এক নম্বরের পাজী লোকটা। হে প্রভু, তোমার সত্যের আলো বিকিরণ করো!

বাবা!—ব্যথাভরা ভীতকণ্ঠে ডাকল লিউবা।

কী?

কেন ওকে পছন্দ হল তোমার?

কাকে?

স্মলিনকে।

স্মলিন? হাঁ, বেটা বেজায় চালাক, পাজী—চমৎকার ব্যবসায়ী। ভালো কথা, আমি এখন চললাম। তৈরি হয়ে থাকিস।

বাবা চলে গেলে পর হাতের কাজ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেয়ারের উপরে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে পড়ে রইল লিউবভ। আহত আত্মসম্মানের তিক্ত অনুভূতিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছে অন্তর। কেঁপে উঠছে কী এক অজানা ভয়ে। নীরবে লিউবা প্রার্থনা করতে লাগল ঃ হে ঈশ্বর! হে প্রভু! যেন হৃদয়বান মানুষ হয় সে। যেন হয় সবল সহৃদয়। হে প্রভু! একটি অজানা মানুষ—দেখবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তারপর দীর্ঘদিনের জন্যে নেবে আপনার করে। অবশ্য, যদি তার মন জুগিয়ে চলতে পারা যায়। কী নিদারুণ অপমান! কী ভয়ঙ্কর! হা ঈশ্বর! যদি কোথাও ছুটে পালিয়ে যেতে পারতাম! আঃ যদি এমন কাউকে পেতাম যে আমাকে বলে দিতে পারত, কী আমার কর্তব্য? কে সে? কেমন করে তাকে আমি শিখব চিনতে? কিছুই করতে পারছি না আমি। অনেক ভেবেছি—কত যে ভেবেছি! কী দুর্ভাগিনী আমি! আঃ এ সময়ে যদি তারাসও থাকত এখানে!

দাদার কথা মনে পড়ে ওর অন্তর ব্যথায় মুচড়ে উঠল। আরো বেশি দুঃখ হল নিজের জন্যে। লিউবা তারাসকে লিখেছে আবেগভরা একখানা দীর্ঘ চিঠি। লিখেছে তাতে ওর প্রতি ওর গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কথা—লিখেছে তার উপরে ওর আশা-ভরসার কথা। সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসার জন্যে। দু হপ্তা ধরে ধৈর্যহীন আকুলতায় প্রত্যাশা করেছে চিঠির জবাবের। যখন পেল, আনন্দে আর মোহভঙ্গে কেঁদে ফেলল। চিঠিটা ছোট, নীরস, শুকনো। তারাস লিখেছে, এক মাসের মধ্যেই ব্যবসা উপলক্ষে আসছে ভলগা অঞ্চলে। তখন যদি সত্যি সত্যিই ওর বাবার আপত্তি না থাকে, তবে নিশ্চয়ই গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করে আসবে। চিঠিটা ঠাণ্ডা—উত্তাপহীন, বরফের মতো। বার বার করে পড়ল লিউবা—ভাঁজ করল, দোমড়ালো, কিন্তু এতটুকুও উত্তাপ সৃষ্টি হল না। বরং ভিজেই গেল। ঐ শক্ত কাগজটুকুর ভিতর থেকে যেন বাবারই মতো শীর্ণ হাড়-বের-করা একখানা বলিকুঞ্চিত ভ্রূকুটিকুটিল মুখ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

ছেলের চিঠি ইয়াকভ তারাশভিচের অন্তরে জাগাল অন্য ভাব। চিঠির বক্তব্য শুনে চমকে উঠল বৃদ্ধ। তারপর অদ্ভুত হাসি হেসে খুশিভরা উজ্জ্বল দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ

কই দেখি চিঠিটা! দেখা আমাকে। হিঃ হিঃ! দেখি পড়ে দেখি জ্ঞানী লোকটি কেমন লিখেছেন। চশমাটা কই আমার? হুঁ! প্রিয় বোনটি! হাঁ!

বৃদ্ধ চুপ করে গেল। নিজেই পড়ল ছেলের পাঠানো সংবাদ। তারপর টেবিলের উপরে রেখে দিল। তারপর ভ্রূ কুঁচকে বিস্ময়ভরা মুখে ঘরময় পায়চারি করে ফিরতে লাগল। আবার চিঠিটা তুলে নিল। পড়ল। চিন্তিত মুখে টেবিলের উপরে কয়েকটা টোকা মেরে বলে উঠল ঃ

চিঠিটা তো খারাপ নয় দেখছি! বেশ গাম্ভীর্য আছে। একটিও বাজে কথা নেই। তবে? হয়তো শীতে শক্ত হয়েই গড়ে উঠেছে। দারুণ শীত কিনা সেখানে? আসুক, দেখি একবার। বেশ অদ্ভুত মনে হচ্ছে। হাঁ—ছেলের রহস্য সম্পর্কে ডেভিডের স্তোত্রে আছে ঃ "হে আমার শত্রু! যখন তুমি ফিরে এসেছ......" তারপর যেন কি, ভুলে গেছি।—"অবশেষে আমার শত্রুর অস্ত্র ভোঁতা হয়ে এসেছে। আর গোলমালে লোপ পেয়েছে তার স্মৃতি।" হাঁ, গোলমাল না করে আলোচনা করা যাবেখন।

ঘৃণার হাসি হেসে শান্তকণ্ঠেই বৃদ্ধ বলতে চাইছিল কথা। কিন্তু সে হাসি আর তার মুখে ফুটে উঠল না।—আবার লিখে দে লিউবভকা! লিখে দে—চলে এসো, ভয় নেই।

আবার চিঠি লিখল লিউবা তারাসকে। কিন্তু এবার আয়তন ছোট, গম্ভীর: তারপর থেকে প্রত্যেক দিনই আশা করছে প্রত্যুত্তরের । আর ভাবছে তার ঐ রহস্যময় দাদাটি না-জানি কেমন হবে! আগে আগে ব্যথাভরা অন্তরে ভাবত দাদার কথা—শহিদের প্রতি আস্তিকের সুগভীর শ্রদ্ধাভরা অন্তরে। কিন্তু এখন তার সম্পর্কে ওর অন্তরে জেগে উঠছে ভয়। কারণ, তার অশেষ লাঞ্ছনা ও দুঃখবরণের ভিতর দিয়ে, অমূল্য যৌবনের বিনিময়ে—যা নাকি ধ্বংস হয়ে গেছে নির্বাসনে—অর্জন করেছে সে মানুষকে, জীবনকে বিচার করবার অধিকার। এসে হয়তো জিগ্‌গেস করবে,—"বিয়ে করছ তোমার স্বাধীন ইচ্ছেয়, ভালোবেসে, তাই না?" তখন কী জবাব দেবে লিউবা। সে কি ওর হৃদয়ের এই দুর্বলতা ক্ষমা করবে? তাছাড়া কেনই বা বিয়ে করছে? এ কি সম্ভব যে সে ওর জীবনের ধারাকে পরিবর্তন করতে পারে?

একটার পর একটা বিষাদময় চিন্তা ভিড় করে আসতে লাগল ওর অন্তরে আর ওকে সংশয়াচ্ছন্ন করে তুলতে লাগল। ঘাত-প্রতিঘাতে বিকল হয়ে উঠতে লাগল অন্তর। কিন্তু তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনো কিছু—এ সব কিছুকে পরাভূত করার একটা অদম্য ইচ্ছাকে পারছে না প্রতিষ্ঠিত করতে। নিদারুণ দুশ্চিন্তায় অন্তর ক্ষতবিক্ষত। পারছে না চোখের জল রোধ করতে। হতাশায় ভেঙে পড়ছে মন। তবুও লিউবা বাবার নির্দেশ মতো—প্রায় যান্ত্রিক অচেতনতায় সব কিছুই করে যেতে লাগল নিখুঁতভাবে। পুরানো দিনের রুপোর বাসনপত্রে সাজিয়ে তুলল টেবিল। পরল ইস্পাত রঙের সিল্কের পোশাক। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কানে পরল বিরাট দুটো পান্না—কাউন্ট গ্রুবিন্স্কির পারিবারিক জড়োয়া গয়না, অন্যান্য অনেক দুষ্প্রাপ্য জিনিসের সঙ্গে যা নাকি এসে পড়েছে মায়াকিনের হাতে বন্ধকী হিসেবে। আয়নার সামনে তুলে ধরল উত্তেজিত মুখখানা। পরিপূর্ণ রক্তিম দুটো ঠোঁট গালের উপরে ফুটে ওঠা রক্তোচ্ছাসে আরো লাল হয়ে উঠেছে। সিল্কের

পোশাকে ঢাকা পরিপূর্ণ সুডোল স্তন দুটির দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনুভব করল লিউবা যে সে সুন্দরী। যে-কোনো পুরুষকে পারে সে আকর্ষণ করতে। সে যেই হোক না কেন। দ্যুতি বিকিরণ করে ওর দু কানে ঝলমল করে উঠল সবুজ রঙের পাথর দুটো। অন্তর দমে গেল। মনে হল, ওদুটো অপ্রয়োজনীয়। পান্না দুটো খুলে ফেলল লিউবা। পরিবর্তে দুটো রুবি পরল কানে। আর সংগে সংগে ভাবতে লাগল স্মলিনের কথা।—কেমন লোক স্মলিন? কেমন তার স্বভাব? কেমন রুচি? সে কি বই পড়ে? পরক্ষণেই ওর দৃষ্টি পড়ল চোখের কোলের কালো রেখার দিকে। দৃষ্টি পড়তেই মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠল। পরম যত্নে পাউডার ঘসে দিতে লাগল। আর প্রতিমুহূর্তেই ভাবতে লাগল নারী-জীবনের দুর্ভোগের কথা। ভাবতে লাগল তার নিজের অন্তরের শক্তিহীনতা—ইচ্ছাশক্তির অভাবের কথা। যখন পাউডারের পুরু আস্তরণের নিচে অন্তর্হিত হয়ে গেল চোখের কোলের সেই রেখা, লিউবার মনে হল ওর চোখদুটি হারিয়ে ফেলেছে তার অপূর্ব চমৎকার ঔজ্জ্বল্য। সংগে সংগেই ঘসে তুলে ফেলল সেই পাউডারের প্রলেপ। শেষবারের মতো নিজেকে দেখে ওর দৃঢ় ধারণা হল যে ও সুন্দরী। পাইন গাছের মতো ওর রূপ পরিপূর্ণ, দীর্ঘস্থায়ী। এই অনুভূতি শান্ত করে তুলল ওর অন্তরের অশান্ত উত্তেজনা। এতক্ষণে কুমারী কনের দৃঢ় পদক্ষেপে ড্রইংরুমের দিকে পা বাড়াল লিউবা।

ইতিমধ্যেই ওর বাবা আর স্মলিন এসে পৌঁছেছে। দোরের কাছে এসে মনমাতানো চোখের চাউনি হেনে, সগর্বে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে একটু দাঁড়াল লিউবা। স্মলিন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দুপা সামনের দিকে এগিয়ে এসে ওকে জানাল সশ্রদ্ধ অভিবাদন। ঐ বিনম্র অভিবাদনে মনে মনে খুশি হয়ে উঠল লিউবা। আরো খুশি হয়ে উঠল স্মলিনের সুঠাম দেহে দামী ফ্রক কোটটার দিকে দৃষ্টি পড়ে। কোটটা চমৎকার মানিয়েছে ওর কমনীয় দেহে। খুব সামান্যই পরিবর্তন হয়েছে স্মলিনের। মাথায় তেমনি কটাচুল খাটো করে কাটা। মুখময় তিলের মতো ছোট ছোট দাগ। শুধু ওর গোঁফজোড়া অনেকটা লম্বা হয়েছে। আর চোখদুটোও মনে হচ্ছে যেন একটু বড়ো হয়েছে।

অনেকটা বদলে গেছে, কি বলিস?—মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল মায়াকিন বরকে দেখিয়ে।

স্মিত মুখে লিউবার করমর্দন করতে করতে রিন রিনে কণ্ঠে বল্‌ল স্মলিন : আশা করতে পারি বোধহয় যে, পুরানো বন্ধুকে ভুলে যাননি।

ঠিক আছে। তোমরা পরে কথা বলো।—মেয়ের মুখের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে লক্ষ্য করতে করতে বলল মায়াকিন।—এদিকটা গুছিয়ে নে লিউবভকা ততক্ষণে আমরা কথাটা শেষ করে ফেলি। তারপর আফ্রিকান মিত্রিচ, বলো তোমার কথা।

মাপ করবেন লিউবভ ইয়াকভ্‌লেভ্‌না, করবেন না?—মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল স্মলিন।

আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু করবেন না দয়া করে—বলল লিউবা।

লোকটি বিনয়ী—ভাবল লিউবা টেবিলের কাছ থেকে সরে যেতে যেতে। তারপর মন দিয়ে শুনতে লাগল স্মলিনের কথা। আত্মপ্রত্যয়ভরা দৃঢ় অথচ সহজ, সরল, শ্রদ্ধাভরা বিনম্রকণ্ঠে বলতে লাগল স্মলিন :

হ্যাঁ, তারপর। চার বছর ধরে বিদেশের বাজারে রুশ-চামড়ার অবস্থা খুব ভালো করেই লক্ষ্য করলাম। অবস্থা খুবই দুঃখজনক। ভীষণ অবস্থা। ত্রিশ বছর

আগেও আমাদের দেশের চামড়া বিদেশের বাজারে প্রথম শ্রেণীর চামড়া হিসেবে স্থান পেত। কিন্তু ক্রমেই এখন কমে আসছে চাহিদা। দামও পড়ে যাচ্ছে। অবশ্য সেটা স্বাভাবিক। মূলধনের অভাব আর অজ্ঞতার ফলে আমাদের দেশের এই সব ছোট ছোট উৎপাদকেরা প্রথম শ্রেণীর মাল উৎপাদন করতে পারে না। তাদের মাল একে তো দারুণ খারাপ, তার দাম বেশি। ওরাই বিদেশের বাজারে সর্বোৎকৃষ্ট রুশ চামড়ার সুনাম নষ্ট করার জন্যে দায়ী। এক কথায় ওরা ওদের যন্ত্রপাতির জ্ঞানের অভাব আর মূলধনের শীর্ণতার জন্যে এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে যন্ত্রের আধুনিক উন্নতির সংগে তাল রেখে তাদের উৎপাদনের উন্নতিসাধন করতে পারছে না। এরা হচ্ছে দেশের দুর্ভাগ্য—ব্যবসাক্ষেত্রে পরগাছা।

হুঁ!—এক চোখ অতিথির দিকে আর এক চোখ কন্যার মুখের দিকে রেখে বলে উঠল বৃদ্ধ মায়াকিন: তাহলে এখন তোমার মতলব হচ্ছে, এমন একটা বিরাট কারখানা গড়ে তোলা যাতে, অন্যেরা জাহান্নামের দরজায় গিয়ে পৌঁছয়। না?

না না—যেন দুহাতে বৃদ্ধের কথাগুলোকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে এমন একটা ভঙ্গি করে বলে উঠল স্মলিন,—কেন অন্যের ক্ষতি করব? কী অধিকার আছে আমার? আমার লক্ষ্য হচ্ছে বিদেশের বাজারে রুশ-চামড়ার প্রাধান্য ও মূল্য বাড়ানো। আমি একটা আদর্শ কারখানা স্থাপন করছি আর উন্নতধরনের উৎপাদনে বাজার ভরে দিচ্ছি। বাড়িয়ে তুলছি দেশের ব্যবসাগত সম্মান।

এতে কি অনেক বেশি মূলধনের দরকার?—চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করল মায়াকিন।

নিশ্চয়ই এত টাকা যৌতুক দিতে রাজী হবেন না বাবা।—ভাবল লিউবা।

আরো চামড়ার জিনিস তৈরি হবে আমার কারখানায়। যেমন, ট্রাঙ্ক, জুতা, লাগাম, জিন ইত্যাদি।

শতকরা কত ভাগ লাভ আশা করছ?

আশা কিছু করছি না আমি। যতদূর সম্ভব সঠিক হিসেব করেছি রুশিয়ার বর্তমান অবস্থা বিচার করে।—দৃঢ়কণ্ঠে বলল স্মলিন। ম্যানুফ্যাক্চারার যে হবে, তাকে যে কারিগর যন্ত্র তৈরি করে তার মতোই নির্ভুল বাস্তববাদী হতে হবে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটা স্ক্রুর হিসেবও তাকে করতে হবে, যদি সত্যি সত্যিই চায় সে কোনো বড়ো কাজ করতে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি একটা ছোট্ট হিসেব তৈরি করেছি। আপনি পড়ে দেখতে পারেন সেটা। কী পরিমাণ পশুপ্রজনন ও মাংসের দরকার হয় রুশিয়ার তারই উপরে ভিত্তি করে।

সেটা কি রকম?—হেসে উঠল মায়াকিন—দেখি, সেই নোটটা এনো তো! খুবই অদ্ভুত মনে হচ্ছে। দেখছি পশ্চিম ইওরোপে বৃথাই তুমি সময় নষ্ট করোনি। এসো এখন কিছু খাওয়া দাওয়া করা যাক, রুশ প্রথায়।

কেমন করে সময় কাটাচ্ছেন লিউবভ ইয়াকভ্লেভনা?—ছুরি-কাঁটা হাতে তুলে নিয়ে প্রশ্ন করল স্মলিন।

এখানে ওর সঙ্গী সাথী কেউ নেই।—মেয়ের হয়ে জবাব দিল মায়াকিন,—আমার ঘরের সবকিছু ও-ই দেখাশুনা করে। ওরই কাঁধে সংসারের যাবতীয় কাজ। তাই আর একটুও ফুরসত পায় না যে একটু আমোদ স্ফূর্তি করে।

তাছাড়া জায়গাও নেই, সে কথাও বলো।—বলল লিউবা,—ব্যবসায়ীদের বলনাচ বা অন্য সব আমোদপ্রমোদে আমার রুচি নেই।

থিয়েটার?—প্রশ্ন করল স্মলিন।

খুবই কম যাই। কোনো সঙ্গীসাথীতো নেই যে সঙ্গে যায়।

থিয়েটার!—উৎসাহভরা কণ্ঠে বলে উঠল মায়াকিন,—আচ্ছা বলো দেখি আমাকে, এটা কী একটা ফ্যাশান হয়েছে আজকাল ব্যবসায়ীদের মূর্খ, বর্বর হিসেবে দেখানো? খুব মজার বটে, কিন্তু অদ্ভুত—সবই মিথ্যা। আমি কি মূর্খ? যদি আমি শহরের লোকসভার প্রধান কর্তা হই, যদি ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিক হই আর ঐ থিয়েটারেরও মালিক হই? মঞ্চে ব্যবসায়ীদের ভূমিকা দেখো, দেখবে সেটা আদৌ বাস্তব চিত্র নয়। অবশ্য যখন ওরা ঐতিহাসিক নাটক করে—যেমন নাচ-গানসমেত 'জারের জীবনী' কিংবা হ্যামলেট, সোরসারেস কি ভাসিলিসা—সেখানে হুবহু সত্য ঘটনা উপস্থিত করার প্রশ্ন আসে না। কারণ সে সব অতীতের ঘটনা। আমাদের আসে যায় না কিছুই। সত্য কি সত্য নয় তাতে কোনো ক্ষতি নেই যদি নাটক আর অভিনয় ভালো হয়। কিন্তু যখন তোমরা বর্তমানকে চিত্রিত করবে তখন মিথ্যার আশ্রয় নিও না। যেমন আছে তেমনি দেখাও।

হাসিমাখা স্মিতমুখে স্মলিন শুনে যাচ্ছিল বৃদ্ধের কথা। থেকে থেকে এমন-ভাবে তাকাচ্ছিল লিউবার মুখের দিকে, যেন সে ওর বাবার কথার প্রতিবাদ করার জন্যে ওকে করছিল উৎসাহিত। কেমন যেন একটু বিব্রত হয়েই বলে উঠল লিউবভ: কিন্তু বাবা, বেশির ভাগ ব্যবসায়ীরাই তো অশিক্ষিত, বর্বর।

তা অবশ্য ঠিক।—দুঃখের সঙ্গে মন্তব্য করল স্মলিন,—কথাটা সত্যি।

ধরো, যেমন ফোমা—বলল তরুণী।

আঃ!—প্রত্যুত্তরে বলল মায়াকিন,—তোমরা তরুণ, তোমরা পারো বই হাতে নিয়ে ঘুরতে।

সমাজের কোনো কিছুতেই কি আপনার কোনো আকর্ষণ নেই?—লিউবাকে প্রশ্ন করল স্মলিন,—কত বিভিন্ন রকমের প্রতিষ্ঠান রয়েছে—

হ্যাঁ, কিন্তু আমি সবকিছুরই বাইরে থাকি।

ঘর-সংসার দেখাশোনা—বাধা দিয়ে বলে উঠল মায়াকিন—এত সব বিভিন্ন জিনিসপত্র রয়েছে আমাদের, সবকিছু ঝেড়ে-পুঁছে পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখতে হয় হিসেব করে।

স্মলিনের ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল একটু বিদ্রুপের ক্ষীণ হাসির রেখা। পরক্ষণেই সে তাকাল লিউবার মুখের দিকে। ওর সে দৃষ্টির ভিতরে লিউবা দেখতে পেল সহানুভূতিভরা বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি। একটা হালকা রক্তোচ্ছ্বাসে গালদুটো লাল হয়ে উঠল। ভীরু আনন্দে মনে মনেই বলে উঠল:

হে ঈশ্বর! ধন্যবাদ।

ভারি ব্রোঞ্জের দীপাধার থেকে বিচ্ছুরিত আলো বুঝিবা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পড়েছে এসে কাচের ফুলদানির উপরে। আরো বেশি উজ্জ্বল হয়ে প্রতিফলিত হল ঘরখানাকে আলোকিত করে।

আমাদের এই পুরানো শহরটাকেই আমি সবচাইতে বেশি পছন্দ করি।—তরুণীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল স্মলিন।—এমন সুন্দর এমন সজীব প্রাণবন্ত! যে-কেউই এখানে পাবে কর্মোন্মাদনাভরা জীবন। পাবে ঢের বেশি কাজ করার সত্যিকারের প্রেরণা। তাছাড়া এটা হচ্ছে বুদ্ধিজীবীদের শহর। দেখুন কী চমৎকার সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে এখানে। ভালো কথা, আমরা কাগজটা কিনে নিচ্ছি।

আমরা? আর কার কথা বলছ তুমি?—প্রশ্ন করল মায়াকিন।

আমি, উরভান্তসভ্ আর সুশকিন।

প্রশংসনীয় কাজ।—উৎসাহের আতিশয্যে টেবিলের উপরে একটা চাপড় মেরে

বলে উঠল মায়াকিন,—ওটা একটা কাজের মতো কাজ। এখন বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে ওদের মুখ বন্ধ করা। বিশেষ করে ঐ ইয়ঝভের। ও হচ্ছে একটা ধারাল দাঁতের করাত। ওকে বেশ করে একটু টাইট দিয়ে দিও। আচ্ছা করে।

হাসিভরা মুখে স্মলিন লিউবার মুখের দিকে তাকাল। লিউবা রক্তিম মুখে বলল তার বাবাকে। যদিও কথাটা বলল স্মলিনকে লক্ষ্য করেই ঃ

আমি যেমন বুঝি, আফ্রিকান দিমিত্রিচ কাগজটা কিনতে চাইছেন ওটার মুখ বন্ধ করার জন্যেই নয় যেমন নাকি তুমি বলছ।

তা নইলে ওটা কিনে আর কী হবে?—কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠল বৃদ্ধ,—কেবল শূন্যগর্ভ কথা আর আন্দোলন করাই ওটার কাজ। অবশ্য যদি কাজের মানুষ যারা—ব্যবসায়ীরা লেখার ভার নেয় তবে—

সংবাদপত্র প্রকাশ করা—বৃদ্ধের কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠল স্মলিন,—যদি নিছক ব্যবসার দিক থেকেও দেখা যায় তবে ওটা খুবই লাভজনক ব্যবসা। কিন্তু তাছাড়াও খবরের কাগজের আরো একটা গুরুত্ব আছে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত অধিকার আর শিল্পের স্বার্থ-সংরক্ষণ করা।

আমিও তো বলছি ঐ কথাই। যদি ব্যবসায়ীরা খবরের কাগজ পরিচালনার ভার নেয় তবেই ওটা একটা প্রয়োজনীয় জিনিস হিসাবে গড়ে উঠবে।

মাপ করো বাবা!—বলল লিউবা। স্মলিনের সামনে নিজেকে প্রকাশ করবার তাগিদ অনুভব করছে লিউবা মনে মনে। ও চাইছে তাকে বুঝিয়ে দেয় যে ওর কথার তাৎপর্য বুঝতে পেরেছে। ও কেবলমাত্র একটি ব্যবসায়ীর কন্যাই নয় যাদের ধ্যানজ্ঞান পোশাক-পরিচ্ছদের ভিতরেই সীমাবদ্ধ। স্মলিনকে দেখে খুশি হয়েছে লিউবা। এই প্রথম দেখল একজন ব্যবসায়ী যে নাকি দীর্ঘকাল কাটিয়ে এসেছে বিদেশে। যার যুক্তির ভিতরে রয়েছে জোর। নিজের প্রতি যার রয়েছে অবিচল বিশ্বাস। পোশাক-পরিচ্ছদ রুচি-সম্মত। তাছাড়া যে নাকি ওর বাবার সঙ্গে—শহরের সেরা বুদ্ধিমান মানুষটির সঙ্গে এমনভাবে আলোচনা করছে যেমন করে বয়স্কেরা করে নাবালকের সঙ্গে।

বিয়ের পরে ওকে রাজী করাব আমাকে বিদেশে নিয়ে যেতে।—হঠাৎ ভাবল লিউবা। কিন্তু পরক্ষণেই ঐ চিন্তায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। গুলিয়ে ফেলল বলতে চাইছিল কী কথা। মুখময় জেগে উঠল গভীর রক্তোচ্ছ্বাস। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ভয় হল, পাছে ঐ নীরবতা স্মলিন এমনভাবে গ্রহণ করে যা নাকি আদৌ সুখকর নয় ওর কাছে।

কথায় কথায় ভুলেই গেছি অতিথিকে একটু মদ দেবার কথা।—কয়েক মুহূর্তের ব্যথাভরা নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠল লিউবা।

সেটা তোমার কাজ। তুমি হলে গিয়ে হোস্টেস।—প্রত্যুত্তরে বলল বৃদ্ধ।

ব্যস্ত হবেন না—প্রদীপ্ত মুখে বলে উঠল স্মলিন,—মদ প্রায় আমি খাই-ই না বললেই চলে।

সত্যি?—প্রশ্ন করল মায়াকিন।

বিশ্বাস করুন। শরীর খারাপ হলে, বা অত্যন্ত ক্লান্ত হলে পরে দু'এক গ্লাস খাই কখনো কখনো। কিন্তু স্ফূর্তির জন্য মদ খাওয়া আমার কাছে একটা অভাবনীয় ব্যাপার। একজন শিক্ষিত লোকের কাছে মদের চাইতে আরো অনেক মূল্যবান আনন্দের বস্তু আছে।

অর্থাৎ বলতে চাও, মেয়েমানুষ?—চোখ মটকে প্রশ্ন করল মায়াকিন।

স্মলিনের মুখখানা লাল হয়ে উঠল। ভয়ে সমস্ত রক্ত যেন লাফিয়ে উঠে এসেছে। মার্জনা ভিক্ষার করুণ দৃষ্টিতে লিউবার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল তার বাবাকে ঃ আমি বলছিলাম, অভিনয়, পড়াশুনা, গান বাজনার কথা।

অ্যাঁ! জীবন তাহলে এগিয়ে চলেছে! আগে কুকুরগুলো এ'টো কাঁটা পেলেই খেত খুশি হয়ে। এখন ক্ষুদে কুকুরগুলোও মাখনও তরল দেখতে শুরু করেছে দেখছি! রূঢ় মন্তব্যের জন্যে মাপ করো। কথাটা তোমাকে লক্ষ্য করে বলিনি।

লিউবার মুখখানা পাংশু হয়ে উঠল। ভীত সংকুচিত দৃষ্টি মেলে তাকাল স্মলিনের মুখের দিকে। শান্ত মুখে এনামেলকরা একটা লবণাধার দেখছে নিবিষ্ট মনে। গোঁফে চাড়া দিতে দিতে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন বৃদ্ধের কথা ওর কানে ঢোকেনি। কিন্তু চোখদুটো ক্রমেই উঠছে লাল হয়ে। ঠোঁটদুটো দৃঢ়সংলগ্ন। মসৃণ করে কামানো থুতনিটা ঝুলে পড়েছে সামনের দিকে।

তারপর, ভবিষ্য ম্যানুফ্যাকচারার?—যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে বলে উঠল মায়াকিন,—তিন লক্ষ টাকা হলেই তোমার ব্যবসা জে'কে উঠবে বলছ?

আর দেড় বছরের ভিতরেই আমি প্রথম চালান মাল বাইরে পাঠাতে পারব, যা নাকি সবাই লুফে নেবে।—দৃঢ়কণ্ঠে সহজভাবেই জবাব দিল স্মলিন। তারপর উত্তাপহীন কঠিন দৃষ্টি মেলে বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তবে তাই হোক,—স্মলিন আর মায়াকিনের কারখানা। কেমন? বেশ তাই-ই। তবে কথা হচ্ছে, নতুন ব্যবসায় হাত দেওয়া আমার পক্ষে এখন—বড্ডো দেরি হয়েগেছে, এই যা। তাই না? আমার কবর তৈরি হয়ে গেছে অনেক দিন আগেই। কী বলো?

জবাবের বদলে স্মলিন একটা ঠাণ্ডা নিস্পৃহ হাসি হেসে উঠল। তারপর বলল ঃ ও কথা বলবেন না।

ওর উচ্চ হাসির শব্দে বৃদ্ধের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। চমকে উঠে মৃদু অঙ্গভঙ্গি করে পিছনের দিকে একটু হেলে গেল। সবাই নির্বাক।

হ্যাঁ,—মাথা তুলে বলল মায়াকিন,—সেটা ভেবে দেখা দরকার। ভেবে দেখতে হবে আমাকে।—তারপর মুখ তুলে নেয়ে ও স্মলিনের মুখের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে কী যেন লক্ষ্য করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি বলল ঃ আমি কিছুক্ষণের জন্যে আমার ঘরে যাচ্ছি। আমার অনুপস্থিতিতে নিশ্চয়ই তোমরা নিঃসঙ্গ মনে করবে না।

ভারি পায়ে কুঁজো হয়ে মাথা নিচু করে চলে গেল মায়াকিন।

দুটি তরুণ-তরুণী একা বসে। দু'একটি আজেবাজে কথার পর উভয়ের মনে হল যেন ওরা আরো দূরে সরে যাচ্ছে পরস্পরের কাছ থেকে। একটা কষ্টকর প্রত্যাশার নীরবতা এসে জুড়ে বসেছে দু'জনার মাঝখানে। একটা কমলা লেবু তুলে নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে লিউবা খোসা ছাড়াতে শুরু করেছে। আর স্মলিন গোঁফ টেনে দেখছে—যেটা নাকি এতক্ষণ ধরে সযত্নে তা' দিচ্ছিল। একটা ছড়ি তুলে নিয়ে অকারণেই নাচাতে শুরু করে দিল স্মলিন। হঠাৎ মৃদুকণ্ঠে তরুণীর উদ্দেশ্যে বলে উঠল ঃ

আমাকে মাপ করবেন ভুল হলে। লিউবভ ইয়াকভ্‌লেভনা, মনে হচ্ছে আপনার পক্ষে থাবার সঙ্গে বাস করাটা খুবই কষ্টকর। উনি সেকেলে ভাবধারার মানুষ। তাছাড়া মাপ করবেন, ওঁর হৃদয়টা বড্ডো কঠিন।

লিউবার সর্বাঙ্গ কম্পিত হয়ে উঠল। সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি মেলে তাকাল কটাচুল লোকটির মুখের দিকে।

তারপর বলল ঃ

খুব সহজসাধ্য নয়, কিন্তু আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। তাছাড়া ওঁর অনেক ভালো দিকও আছে।

নিশ্চয়! নিশ্চয়! কিন্তু আপনার মতো এমন সুন্দরী শিক্ষিতা বিদুষী তরুণীর পক্ষে—যার মতবাদ এমন, তার পক্ষে......। দেখুন আপনার সম্পর্কে কিছু কিছু শুনেছি আমি।—বলেই এমন সহৃদয় সহানুভূতিমাখা হাসি হাসল আর ওর কণ্ঠে বেজে উঠল এমন কোমল সুর যে, এক অপূর্ব মনমাতানো খুশির নিঃশ্বাসে ভরপুর হয়ে উঠল সমস্ত ঘরখানা। আর ঐ তরুণীর অন্তরের সুখ, শান্তি, নিঃসঙ্গতার কঠিন বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার ভীরু আশা আরো উজ্জ্বল, আরো প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

১২

ধূসর ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেছে নদীর বুক। থেকে থেকে বাঁশি বাজিয়ে মন্থর-গমনে উজান বেয়ে এগিয়ে-চলা জাহাজখানাও গেছে ঢেকে। সমস্ত শব্দ সমস্ত কোলাহল ডুবিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা, ভিজা বিবর্ণ মেঘরাশি চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে জাহাজটাকে। চাপা গোঙানির মতো সিগনালের সুস্পষ্ট গর্জন জাহাজের বাঁশির মুখে ক্ষণস্থায়ী শব্দে উঠছে জেগে। যেন ঐ শব্দ বাতাসে আশ্রয় খুঁজে না পেয়ে রুদ্ধশ্বাসে ঝরে পড়ছে নিচে। চাকার শব্দ এমন অদ্ভুত অস্পষ্ট মনে হয় যেন বেরিয়ে আসছে না জাহাজের পাশ থেকে, আসছে নদীর সুগভীর কালো তলদেশ থেকে। জাহাজ থেকে তীর জল আকাশ কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কেমন যেন একটা সীসের মতো ধূসর বিষণ্ণতা সমস্ত দিক থেকে জাহাজটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। সেই ছায়াহীন ব্যথাভরা একঘেয়ে বিষণ্ণতা নীরব নিথর। যেন এক অসহনীয় নিদারুণ বোঝার মতো চেপে বসেছে জাহাজটার উপরে। মন্থর করে দিচ্ছে গতিবেগ। আর যেমন করে গিলে ফেলেছে যাবতীয় শব্দ, তেমনি করেই চাইছে গোটা জাহাজটাকে গ্রাস করতে। চাকার অস্পষ্ট শব্দ আর কাঁপুনি সত্ত্বেও মনে হয় যেন স্টিমারটা একই জায়গায় রয়েছে দাঁড়িয়ে। অতি কষ্টে যুঝে চলেছে। রুদ্ধ ব্যথায় নিঃশ্বাস আসছে বন্ধ হয়ে। রূপকথার দৈত্যের মৃত্যু-যাতনাভরা অন্তিম নিঃশ্বাসের মতো গুমরে গুমরে উঠছে।

জাহাজের বাতিগুলোও যেন নিষ্প্রাণ। মাস্তুলের উপরের আলোর চারদিক ঘিরে জেগে উঠেছে হল্‌দে ম্লান রেখা। দ্যুতিবিহীন সে আলো যেন কুয়াশার ভিতরে রয়েছে ঝুলে। আর শুধু ঐ ধূসর কুয়াশা ছাড়া আর কিছুই আলোকিত করে তুলছে না।

জাহাজের দক্ষিণপাশের লাল আলোটা যেন কোনো নির্দয় নিষ্ঠুর হাতের নির্মম আঘাতে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা একটা চোখ। ঝরছে রক্ত আর গেছে অন্ধ হয়ে। জানলার পথে শীর্ণ, ম্লান আলোর রেখা এসে পড়ছে ঐ ঘন কুয়াশার ভিতরে। চারদিক থেকে চেপে ধরা ঐ নিথর ঘন কুয়াশার নিরানন্দ, বিষাদময় ঘন আস্তরণকে তুলেছে রঞ্জিত করে। কুয়াশার রেণুর সঙ্গে মিশে ফানেলের ধোঁয়া পাটাতনের ফাটল পথে এল নিচে নেমে, যেখানে তৃতীয়শ্রেণীর যাত্রীরা তাদের ছেঁড়া কম্বলের তলায় ভেড়ার মতো রয়েছে দলে দলে কুণ্ডলী পাকিয়ে। কলকব্জা থেকে জেগে উঠছে গভীর গোঙানির শব্দ, ঘণ্টার ঠুন ঠুন আওয়াজ, নির্দেশের অস্পষ্ট ভাষা আর বলে ওঠা মিস্ত্রির কণ্ঠ : হাঁ! হাঁ, গতি অর্ধেক!

জাহাজের গলুইয়ের দিকে এক কোণে জড়ো করা নোনা মাছের পিপে। একদল লোক সেখানে বসে জটলা করছে। ছোট্ট একটি ইলেকট্রিক ল্যাম্পের আলো পড়েছে তাদের উপরে। পরিচ্ছন্ন গরম পোশাক পরা একদল চাষী। উবু হয়ে শুয়ে রয়েছে

একজন। আর একজন বসেছে তার পায়ের কাছে। পিপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একজন। আর দুজন মেঝের উপরে বসা। সবারই চোখেমুখে গভীর চিন্তার ছায়া। একান্ত মনোযোগের সঙ্গে ওরা তাকিয়ে আছে হলদে হয়ে ওঠা হুস্ব জামা পরা একটি বৃষস্কন্ধ লোকের দিকে। লোকটির মাথায় ছেঁড়া পশমী টুপি। পিঠ বাঁকিয়ে বসেছে একটা বাক্সের উপরে। দৃষ্টি পায়ের দিকে নিবদ্ধ। মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলে চলেছে কথা :

একদিন আসবে যেদিন প্রভুর এই সুদীর্ঘ ধৈর্যের বাঁধ পড়বে ভেঙে, আর নেমে আসবে মানুষের উপরে তাঁর ক্রোধাগ্নি-শিখা। আমরা কীটানুকীট। কেমন করে তাঁর সেই প্রচণ্ড ক্রোধাগ্নির হাত থেকে রেহাই পাবো? কোন কাতর প্রার্থনায় ভিক্ষা করব তাঁর কৃপাকণা?

বিমর্ষ ফোমা তার কেবিন ছেড়ে নেমে এল নিচে—ডেকের উপরে। কিছুক্ষণ কতগুলো ত্রিপল-ঢাকা মালের আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে শুনছিল ঐ প্রচারকটির শান্ত কণ্ঠের অনুযোগভরা কথা। তারপর পায়চারি করতে করতে হঠাৎ এসে পড়ল ঐ দলটির কাছে। পরিব্রাজকের চেহারায় আকৃষ্ট হয়ে রইল দাঁড়িয়ে। তাঁর সবল দেহ, রুক্ষ ঘোর রঙের মুখ, আয়ত শান্ত দুটি চোখ কেমন যেন পরিচিত মনে হল ফোমার। চাঁদি-ঢাকা টুপির তলা থেকে নেমে আসা কোঁকড়া ধূসর চুল গোছায় গোছায় বিভক্ত। আছাঁটা বিরাট চাপদাড়ি, লম্বা বাঁকানো নাক, ছুঁচলো কান, পুরু ঠোঁট,—ইতিপূর্বে কোথায় যেন দেখেছে ফোমা। 'কিন্তু কোথায় কখন দেখেছে কিছুতেই পারছে না মনে করতে।

হ্যাঁ অনেক ঋণ জমা হয়ে আছে আমাদের প্রভুর কাছে।—একটা গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে উঠল একটি চাষী।

আমরা প্রার্থনা করব।—শোনা যায় না এমন অস্পষ্ট মৃদু কণ্ঠে বলে উঠল শুয়ে থাকা লোকটি।

শুধু প্রার্থনার দ্বারাই কি তুমি আত্মার গা থেকে পাপ চেঁছে তুলে ফেলতে পারো?—হতাশাভরা কণ্ঠে বলে উঠল আর একজন।

পরিব্রাজককে ঘিরে যারা দাঁড়িয়েছিল, কেউই তারা ফোমার দিকে ফিরে তাকাল না। শুধু ওদের মাথাগুলো আরো ঝুঁকে পড়ল বুকের উপরে। আর বহুক্ষণ ধরে নীরব নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল। নীল চোখের চিন্তিত গম্ভীর দৃষ্টি মেলে পরিব্রাজক তাকাল শ্রোতাদের মুখের দিকে। তারপর কোমল কণ্ঠে বলল : সিরিয়া-বাসী এফ্রাইম বলেছেন,—"আত্মাকে চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু করো আর মনকে শক্তিশালী করে তোলো পাপ থেকে মুক্ত থাকার ইচ্ছের।"—বলেই আবার মাথা নিচু করে জপের মালা ঘুরোতে শুরু করে দিল।

তার মানে, আমাদের চিন্তা করতে হবে।—বলল একটি চাষী,—কিন্তু সংসারে বেঁচে থাকতে চিন্তা করার অবকাশ কোথায়?

আমাদের চতুর্দিকে ঘিরে রয়েছে সংশয়।

তাহলে মরুভূমিতে পালিয়ে যেতে হয়।—শুয়ে থাকা লোকটি বলল—কিন্তু সবাই তো আর তা পারে না!—বলেই চাষীটি নীরব হয়ে গেল। জেগে উঠল জাহাজের বাঁশির তীক্ষ্ম শব্দ। মেশিনের পাশের একটা ছোট ঘণ্টা উঠল বেজে। কার যেন উচ্চ কণ্ঠ শোনা গেল :

এ-ই কে ওখানে? জল মাপার লগির কাছে যাও!

হে প্রভু! হে স্বর্গের রানী!—শোনা গেল একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ।

পরক্ষণেই একটা অনুচ্চ চাপা কণ্ঠ জেগে উঠল ঃ নয়! নয়!

কুয়াশার রেণু ডেকের ভিতরে ঢুকে এসে ধূসর ধোঁয়ার মতো ভেসে বেড়াতে লাগল।

সহৃদয় ভদ্রমহোদয়গণ! দয়া করে একবার রাজা ডেভিডের বাণী শুনুন!—বলে উঠল পরিব্রাজক। তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলতে লাগল ঃ হে ঈশ্বর! আমার শত্রুদের জন্যেই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করো। আমার সামনে তোমার পথ খুলে দাও। ওদের মুখে নেই চিন্তার চিহ্ন। ওদের অন্তর দুষ্টামিভরা। খোলা কবরের মধ্যে ওদের গলা। ওদের জিহবা কেবলমাত্র চাটুবাক্য বলার জন্যে। ওদের ধ্বংস করো! নিজের বুদ্ধির দোষেই যেন ওদের পতন ঘটে।

আট! আট! সাত!—গোঙানির মতো দূর থেকে ভেসে আসছে ঐ ঝঙ্কার। জাহাজটা যেন রুদ্ধ কণ্ঠে ফোঁস ফোঁস করে গর্জন করতে লাগল। মন্থর হয়ে এল গতির দ্রুততা। বাষ্পের ভোস্ ভোস্ শব্দে ডুবে গেল পরিব্রাজকের কণ্ঠ। ফোমা কেবলমাত্র দেখতে পাচ্ছে, তাঁর ঠোঁট দুটি নড়ে চলেছে।

সরে যা!—রুদ্ধ কণ্ঠে কে যেন চিৎকার করে উঠল,—এটা আমার জায়গা।

তোর?

তোর জায়গা এখানে।

এক ঘুসোয় চোয়াল ফাটিয়ে দেবো। তখন নিজের জায়গা দেখতে পাবি'খন। কী লবাব!

সরে যা বলছি!

জেগে উঠল একটা গোলমালের শব্দ। চাষীরা যারা শুনছিল পরিব্রাজকের কথা, তারা মুখ ফিরিয়ে তাকাল। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে পরিব্রাজক চুপ করে গেল। কিন্তু আগুনে শুকনো ডাল ফেলে দিলে যেমন আবার দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, মেশিন ঘরের সামনে তেমনি একটা উচ্চকণ্ঠের গোলমালের শব্দ জেগে উঠল।

দাঁড়া, দুটোকেই শায়েস্তা করছি। সরে যা এখান থেকে—দুজনেই সরে যা!

দুটোকেই ক্যাপটেনের কাছে ধরে নিয়ে যাও।

হাঁ, ঐ হচ্ছে সব চাইতে ভালো ব্যবস্থা। নিষ্পত্তি।

খুব জব্বর একখানা ঝেড়েছে ঘাড়ের উপর! ভারি শয়তান খালাসীগুলো।

আট, নয়—লগি হাতে চিৎকার করে হেঁকে উঠল সুখানি।

হাঁ, গতি বাড়াও!—ভেসে এল ইঞ্জিনীয়ারের কণ্ঠ।

চলন্ত জাহাজের গতির তালে দুলতে দুলতে ফোমা ত্রিপলের গায়ে হেলান দিয়ে শুনে যাচ্ছে আশপাশের যত শব্দ, যত কথা। সব কিছু যেন তালগোল পাকিয়ে একটি পরিচিত ছবি ভেসে উঠেছে ওর সামনে। সর্বগ্রাসী কুয়াশা আর অনিশ্চয়তার দুর্ভেদ্য বিষণ্ণতার আবরণের ভিতর দিয়ে মানুষ ধীর মন্থরগমনে কোথায় যেন চলেছে এগিয়ে। মানুষ তার পাপের জন্যে করে অনুতাপ, ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস তারপর আবার সুখকর উষ্ণ স্থানের জন্য পরস্পর করে মারপিট। আর সে স্থান অধিকার করার জন্যে পরস্পর করে ঝগড়া বচসা। সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাছ থেকে পায় আঘাত, যারা চায় জীবনে শৃঙ্খলা আনতে। ভয়ে ভয়ে ওরা খুঁজে ফেরে মুক্ত পথ, তাদের লক্ষ্যপথে পোঁছতে।

নয়! আট!

একটা করুণ আর্তনাদ গুমরে ফিরছে জাহাজের ভিতরে। জীবনের কল-

কোলাহলে ডুবে যায় সন্ন্যাসীর পবিত্র প্রার্থনা। কিন্তু দুঃখের হাত থেকে শান্তি নেই, সেই আনন্দ তার জীবনে যে অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দেয় নিজেকে।

ঐ সন্ন্যাসী যার কথার ভিতর থেকে ফুটে উঠছে ঈশ্বরের প্রতি আকুল ঐকান্তিকতা, ভয়, তার সঙ্গে আলাপ করার প্রবল ইচ্ছে হল ফোমার। সন্ন্যাসীর করুণ কোমল কণ্ঠে কেমন যেন রয়েছে এক অদ্ভুত শক্তি যা নাকি আকৃষ্ট করছে ফোমাকে—বাধ্য করছে তাঁর গম্ভীর কণ্ঠের কথা শুনতে।

জিগ্‌গেস করব, উনি কোথায় থাকেন?—ঐ নুয়ে-পড়া বিরাট-দেহ লোকটির দিকে তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবল ফোমা।—কিন্তু কোথায় যেন দেখেছি ওঁকে? না, কোনো পরিচিত লোকের চেহারার সঙ্গে মিল আছে ওঁর?

হঠাৎ কেমন করে যেন মনে হল ফোমার যে, ওর সামনে ঐ যে পরিব্রাজক সে আর কেউ নয় বুড়ো আনানি শ্চুরভের ছেলে। এই আবিষ্কারে বিমূঢ় হয়ে এগিয়ে গেল ফোমা পরিব্রাজকের কাছে। তারপর তার পাশে বসে সহজ কণ্ঠে প্রশ্ন করল ঃ

আপনি কি ইরগিজ্ থেকে আসছেন ফাদার?

সন্ন্যাসী মুখ তুলে ফোমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে ফোমাকে দেখতে দেখতে মৃদু শান্তকণ্ঠে বলল ঃ হাঁ আমি ইরগিজে ছিলাম।

আপনি কি ওখানকারই বাসিন্দা?

না।

এখন সেখান থেকেই আসছেন?

না, আসছি সেন্ট স্তেপান থেকে।

কথা বন্ধ হয়ে গেল। সাহস হচ্ছে না ফোমার যে জিগ্‌গেস করে সন্ন্যাসীকে, সে শ্চুরভ কিনা।

কুয়াশার জন্যে পৌঁছতে দেরি হবে আমাদের।—কে যেন বলে উঠল।

দেরি না হয়ে আর উপায় কি?

সবাই নীরবে তাকিয়ে আছে ফোমার দিকে। তরুণ সুন্দর চেহারা, মূল্যবান ঝক্‌ঝকে পোশাক-পরিচ্ছদে ভূষিত লোকটিকে হঠাৎ ওদের ভিতরে দেখে সবারই মনে জেগে উঠল কৌতূহল। ওদের কৌতূহল সম্পর্কে ফোমা সচেতন। বুঝল, সবাই ওর কথা শুনতে উৎসুক। কারণ ওরা বুঝতে চায় কেন এসেছে সে এখানে। কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়ল ফোমা—রাগ হল।

আগে কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে ফাদার!—অবশেষে বলল ফোমা।

হয়তো দেখে থাকবে।—প্রত্যুত্তরে ওর দিকে না তাকিয়েই বলল সন্ন্যাসী।

আপনার সঙ্গে দু-চারটে কথা বলতে চাই।—ভয়ে ভয়ে বলল ফোমা।

বেশ, বলো।

চলুন আমার সঙ্গে।

কোথায়?

আমার কেবিনে।

সন্ন্যাসী ফোমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—চলো।

যাবার সময়ে ফোমা অনুভব করল যে চাষীদের দৃষ্টি ওর দিকে পিঠের উপরে বিদ্ধ হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে খুশি হয়ে উঠল এই ভেবে যে তারা আকৃষ্ট হয়েছে ওর দিকে।

কেবিনের ভিতরে এসে বিস্মিত কণ্ঠে ফোমা প্রশ্ন করল : কিছু খাবেন কি? বলুন, আনতে বলে দিচ্ছি।

ঈশ্বর রক্ষে করুন। কী চাও তুমি?

পরিব্রাজকের পরনে নোংরা জীর্ণ পরিচ্ছদ—এত পুরানো যে লাল হয়ে উঠেছে রঙ। স্থানে স্থানে তালিমারা। সন্ন্যাসী ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে কেবিনের ভিতরে তাকিয়ে দেখতে লাগল। তারপর যখন কাপড়-মোড়া কোচের উপরে এসে বসল, তখন এমনভাবে তার পোশাক তুলে ধরে বসল যেন তার ভয় হচ্ছে ঐ কোচের কোমল দামী কাপড়ের ছোঁয়ায় তার পোশাকটা অপবিত্র হয়ে যাবে।

আপনার নামটি কী, ফাদার?—প্রশ্ন করল ফোমা। দেখল, পরিব্রাজকের মুখের উপরে ফুটে উঠেছে ঘৃণার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি।

মিরন।

মিখাইল নয় কি?

কেন? মিখাইল হতে যাবে কেন?—প্রশ্ন করলেন সন্ন্যাসী?

আমাদের শহরের শ্চুরভ নামে একজন ব্যবসায়ীর ছেলে চলে গেছে ইরগিজে। তার নাম মিখাইল।—ফাদার মিরনের মুখের দিকে তাকিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করল ফোমা। কিন্তু তাঁর মুখের ভাব শান্ত—যেন কালা বোবা।

এরকম কোনো লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। না, মনে পড়ছে না আমার। কখনো দেখা হয়নি। তাহলে তুমি তার সম্পর্কেই খোঁজ-খবর করছ?

হাঁ।

না, মিখাইল শ্চুরভ বলে কারুর সঙ্গে দেখা হয়নি কখনো। আচ্ছা খ্রীষ্টের নামে মাপ করো!—বলতে বলতে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর ফোমাকে নমস্কার করে দোরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

কিন্তু, একটু দাঁড়ান। বসুন আর খানিকক্ষণ। একটু কথাবার্তা বলি আসুন। —বলতে বলতে অপ্রসন্ন মুখে ফোমা দ্রুত দোরের কাছে এগিয়ে এল। সন্ধানী দৃষ্টি মেলে সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ ফোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার সোফার উপরে এসে বসলেন।

দূর থেকে একঘেয়ে একটা গোঙানির মতো আওয়াজ ভেসে আসছে। পরক্ষণেই যেন ভয়ার্ত সুরে বেজে উঠল জাহাজের সাংকেতিক বাঁশি একটানা গভীর সুরে। ক্ষীণ প্রত্যুত্তর ভেসে এল বহু দূর থেকে। পরক্ষণেই আচমকা ভীত সুরে মাথার উপরে বেজে উঠল বাঁশি। ফোমা জানলা খুলে দিল। জাহাজের অনতিদূরে কী যেন নড়ছে শব্দ করে। জেগে উঠল আলোর ক্ষীণরেখা। বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল ঘন কুহেলিকা। কিন্তু পরক্ষণেই নিথর নিস্তব্ধতায় স্থির হয়ে গেল।

কী ভীষণ!—জানলা বন্ধ করে দিতে দিতে বলল ফোমা।

ভয় পাবার কী আছে?—বলল সন্ন্যাসী।

দেখুন, এখন দিনও নয়, রাতও নয়। অন্ধকারও নয়, আলোও নয়। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আমরা। কোথায় চলেছি তাও জানি না। নদীর বুকে চলেছি ভেসে।

অন্তরের আলো জ্বালিয়ে তোল—আত্মাকে আলোকিত করে তোল, দেখবে সব কিছুই দেখতে পাচ্ছ।—শুকনো কণ্ঠে উপদেশের সুরে বলল সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসীর নিস্পৃহ কণ্ঠের সুরে মনে মনে দারুণ আহত হয়ে উঠল ফোমা। প্রশ্ন-ভরা দৃষ্টি মেলে তাঁর মুখের দিকে তাকাল। নীরব নিশ্চল হয়ে বসে রয়েছে সন্ন্যাসী

মাথা নিচু করে। যেন ডুবে গেছে প্রার্থনায়—প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে গভীর চিন্তায়। হাতের ভিতরে ঘুরে চলছে জপের মালা।

সন্ন্যাসীর ভাবভঙ্গি ফোমার অন্তরে জাগিয়ে তুলল সাহস। বলল ঃ

বলুন ফাদার মিরন! আপনার মতো কর্মহীন, আত্মীয়-স্বজনহীন হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো কি ভালো?

ফাদার মিরন মুখ তুললেন। তারপর শিশুর মতো সরল হাসি হেসে উঠলেন। তাঁর রোদে-পোড়া তামাটে মুখখানা কী এক আভ্যন্তরীণ আনন্দের আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। একটা হাত ফোমার হাঁটুর উপরে রেখে একান্ত সহজ অকপট কণ্ঠে বলে উঠলেন ঃ

সংসারের যা-কিছু দূরে ঠেলে দাও। কোনো মাধুর্য নেই ওর ভিতরে। তোমাকে সত্য কথাই বলছি—মুখ ফিরিয়ে নাও সমস্ত কিছু মন্দ থেকে। মনে পড়ে সেই কথা ঃ সেই মানুষই পায় ঈশ্বরের আশীর্বাদ যে অনৈশ্বরিক বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয় না। কিংবা দাঁড়ায় না পাপের পথে। সরে দাঁড়াও। নির্জনতায় তোমার আত্মাকে সজীব করে তোল। অন্তর ভরে তোল ঈশ্বরের চিন্তায়।

সে-কথা নয়।—বলল ফোমা।—মুক্তির জন্যে কিছু করার প্রয়োজন নেই আমার। এতই কি পাপ করেছি? অন্য সবার দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমি যা চাই তা হচ্ছে —সব কিছু বুঝতে চাই।

যদি সংসার থেকে দূরে সরে দাঁড়াও তবেই সব কিছু বুঝতে পারবে। চলতে থাক মুক্ত পথ ধরে—মাঠে, বাটে, পাহাড়ে, সমতলভূমিতে। চলে যাও। তারপর দূর থেকে তাকাও সংসারের দিকে। সেই মুক্ত দৃষ্টিতে দেখো তাকিয়ে।

ঠিক কথা।—চিৎকার করে বলে উঠল ফোমা।—আমিও ঠিক ঐ কথাই ভাবি। পাশে সরে গিয়েই মানুষ দেখতে পারে ভালো করে।

কিন্তু মিরন ওর কথায় কান না দিয়ে কোমল মৃদু কণ্ঠে বলে চলল। যেন এক বিরাট রহস্য যা নাকি তার একারই জানা।

তোমাকে ঘিরে ঘুমন্ত নিঝুম বন শুরু করবে সুমধুর মর্মরধ্বনি। বলবে তাঁরই জ্ঞানের কথা। ঈশ্বরের সৃষ্ট ছোট ছোট পাখিরা গাইবে তোমার কাছে তাঁরই পবিত্র মহিমার গাথা। স্তেপভূমির তৃণ জ্বালাবে পবিত্র কুমারী মাতার আলোর দীপশিখা। —প্রবল আবেগে কাঁপছে সন্ন্যাসীর কণ্ঠ। মনে হয় তাঁর বয়স যেন আরো কমে গেছে। চোখে বিশ্বাসের উজ্জ্বল আলোর দ্যুতি চক্চক করছে। সমস্ত মুখখানা উঠেছে উদ্ভাসিত হয়ে এক অলৌকিক আনন্দের বিমল হাসির আভায়। যেমন করে মানুষ তার অন্তরের জেগে-ওঠা আনন্দের অভিব্যক্তি দিতে পেরে ওঠে আরো আনন্দিত হয়ে। আর সেই স্বতঃউৎসারিত আনন্দ বাণীরূপে ঢেলে দিয়ে পায় অপার আনন্দ।

ঘাসের প্রতিটি পাতার কম্পনে জেগে ওঠে তাঁরই হৃদয়স্পন্দন। প্রতিটি কীট-পতঙ্গের বুকে বয় তাঁরই পবিত্র নিঃশ্বাস। ঈশ্বর—প্রভু, যীশু খৃষ্ট রয়েছেন সর্বত্র। মাটির বুকে, বনে কী অপূর্ব সৌন্দর্য! কখনো গেছ তুমি কেরঝেন্‌জ-এ? সেখান-কার গাছ, সেখানকার তৃণের বুকে বিরাজ করছে কী অতুলনীয় নীরবতা! যেন স্বর্গ।

ফোমা শুনল তাঁর কল্পনার বাণী। সম্পূর্ণ মুগ্ধ হয়ে গেল তাঁর বর্ণনায়। চোখের সামনে ভেসে উঠল সুদূরপ্রসারী মাঠ, সুগভীর বনানী আর অন্তর ভরে-তোলা সুমধুর নির্জনতা।

কোনো একটা ঝোপের নিচে বিশ্রাম করতে করতে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো, দেখবে আকাশ যেন মাটির আলিঙ্গন-তৃষ্ণায় আকুল হয়ে নেমে আসছে নিচে।

অন্তর উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। ভরে উঠবে বিরল শান্তি আর অপার আনন্দে। কিছুই আর তোমার থাকবে না চাইবার, থাকবে না কোনো হিংসা-দ্বেষ-ঈর্ষা। সত্যি সত্যিই তখন মনে হবে এ দুনিয়ায় আর কেউ কোথাও নেই—কেবল তুমি আর ঈশ্বর।

সন্ন্যাসী বলতে লাগলেন। সংগীত-ঝরা তাঁর কণ্ঠের সুরে মনে পড়ল ফোমার আনফিসা পিসির মুখে শোনা সেই অপূর্ব রূপকথার কাহিনী। মনে হল যেন নিদাঘ-তপ্ত দিনে দীর্ঘ পথ ভ্রমণের পরে এক বনের ঘাস আর ফুলের গন্ধমাখা ঝর্নার স্বচ্ছ শীতল জল পান করছে। ক্রমেই বিস্তৃত হয়ে উঠছে সেই ছবি যতই মেলে ধরছে ওর চোখের সামনে। সেই ঘুমন্ত বনের বুক চিরে জেগে উঠছে পথরেখা। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে সূর্যালোকের চূর্ণ আলো-রেণু বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে লুটিয়ে পড়ছে পথিকের পায়ের তলায়। ফুলের সমধুর গন্ধ পাইনের উগ্র গন্ধের সংগে মিশে পাঁজর ভেদ করে বুকের ভিতরটা প্লাবিত করে দিয়ে চলেছে বয়ে। সব কিছু ঘিরে বিরাজ করছে এক অখণ্ড নীরবতা। কেবল জেগে উঠছে পাখির কল-কাকলি। কিন্তু সেই নীরবতা এত গভীর, এত অপূর্ব যে মনে হবে যেন সে কাকলি, সে সংগীত, জেগে উঠছে তোমার বুকের ভিতর থেকে। তুমি চলেছ ধীরে। নেই কোনো চঞ্চলতা, নেই ব্যস্ততা। স্বপ্নের মতো বয়ে চলেছে জীবন। কিন্তু এখানে সব কিছু ঘিরে এক ধূসর মরা কুয়াশা। আর নির্বোধের মতো আমরা তারই ভিতর দিয়ে আছাড়ি-পিছাড়ি করে মরছি মুক্তি আর আলোর সন্ধানে।

নিচে থেকে জেগে উঠল অশ্রুতপ্রায় এক সংগীতের মূর্ছনা—আধা গান, আধা প্রার্থনা। পরক্ষণেই কে যেন চিৎকার করে গাল পাড়তে শুরু করল। কিন্তু তবুও ওরা খুঁজে ফিরছে পথ।

সাড়ে সাত, সাত!

কিন্তু তোমার নেই কোনো ভাবনা, নেই চিন্তা,—বললেন সন্ন্যাসী। জেগে উঠল ঝর্নার স্রোতের গীতিময় মর্মর ধ্বনির মতো সুমধুর কণ্ঠ,—যে কেউই দেবে তোমাকে এক টুকরো রুটি। মুক্তির পথে আর কিসের প্রয়োজন আছে তোমার? এই সংসার-শিকলের দৃঢ় বাঁধনের মতোই ভাবনা-চিন্তা আত্মাকে শৃংখলিত করে তোলে।

খুব সুন্দর করে বলেন আপনি।—ফোমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল।

ভাই!—আবেগভরে ওর কাছে আর-একটু সরে এসে কোমল কণ্ঠে বলতে লাগলেন সন্ন্যাসী,—মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় অন্তর যখন উঠেছে আকুল হয়ে, জোর করে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখো না। শোনো অন্তরের কথা। আকর্ষণভরা এই সংসারের নেই কোনো সৌন্দর্য, নেই পবিত্রতা। কেন তবে চলবে তার নিয়ম মেনে? সুতরাং—

জেগে উঠল একটা দীর্ঘ একটানা বাঁশির কর্কশ সুর। আর তারই শব্দে ডুবে গেল সন্ন্যাসীর কণ্ঠ। কান পেতে কিছুক্ষণ ঐ শব্দ শুনে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সন্ন্যাসী।

চললাম। নমস্কার ভাই! বিদায়। ঈশ্বর তোমাকে আত্মার নির্দেশ মেনে চলার শক্তি ও দৃঢ়তা দিন! নমস্কার বৎস!

ফোমার উদ্দেশ্যে একটি মৃদু নমস্কার করল সন্ন্যাসী। তাঁর বিদায়কালীন কথা ও নমস্কারের ভিতরে রয়েছে কেমন যেন নারীসুলভ কোমল উষ্ণপরশ। ফোমাও প্রতিনমস্কার করল। তারপর মাথা নিচু করে টেবিলের উপরে হাত রেখে কেমন যেন পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

শহরে এলে আমার সংগে দেখা করবেন।—সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে বলল ফোমা। ততক্ষণে ক্ষিপ্রহাতে দোরের হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে ফেলেছেন সন্ন্যাসী।

আসব। আসব তোমার কাছে। খৃীষ্ট তোমার সহায় হোন!

জাহাজ জেটিতে ভিড়লে ডেকের উপরে বেরিয়ে এসে কুয়াশার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল ফোমা। তক্তা বেয়ে যাত্রীরা নেমে যাচ্ছে। কিন্তু ঘন অন্ধ কুয়াশায় আচ্ছন্ন কালো অস্পষ্ট মূর্তিগুলোর ভিতরে সন্ন্যাসীকে চিনে উঠতে পারল না।

জাহাজ চলতে শুরু করল। সন্ন্যাসী, জাহাজঘাটা, মানুষের কোলাহল, সব কিছুই যেন মুহূর্তে স্বপ্নের মতো বিলীন হয়ে গেল। কেবল রয়ে গেল সেই অন্ধ ঘন কুয়াশা আর তারই ভিতর দিয়ে স্টিমারটা এগিয়ে চলেছে মন্থর গমনে। সামনের ঐ মৃত কুয়াশার ঘন কুহেলিকার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবছিল ফোমা মেঘমুক্ত আকাশের উত্তাপভরা আলিঙ্গনের কথা। কিন্তু কোথায় তা?—

পরদিন দুপুরে ইয়ঝভের ঘরে বসে ফোমা বন্ধুর মুখে শুনছিল স্থানীয় সংবাদ। খবরের কাগজ বোঝাই টেবিলের উপরে বসে পা দোলাতে দোলাতে বলে চলেছে ইয়ঝভ ঃ

নির্বাচনী প্রচার শুরু হয়ে গেছে। ব্যবসায়ীরা মিলে দাঁড় করাচ্ছে তোমার ধর্মবাপকে। বুড়ো শয়তান! শয়তানের মতোই বুড়োটার পরমায়ু। অমর। যদিও ইতিমধ্যেই শ' দেড়েক বছর বয়স হয়ে গেছে। স্মলিনের সঙ্গে সে তার মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে। মনে নেই? সেই যে কটাচুল! সবাই বলে সে নাকি খুব ভদ্র। কিন্তু আজকাল যে কোনো চালাক বদমাইশকেও লোকে ভদ্র বলে। কারণ মানুষ বলতে তো আর নেই! আফ্রিকানস্কা বিশ্বান বলে পরিচিত। ইতিমধ্যেই বুদ্ধিমানদের দলে আসর জমিয়ে তুলেছে। কোনো প্রতিষ্ঠানে কিছু চাঁদা দিচ্ছে আর অমনি এসে পৌঁছচ্ছে সামনের সারিতে। মুখ দেখলে তো মনে হয় একটা পয়লা নম্বরের চোর। কিন্তু দেখে নিও, কালে ও একটা কেউকেটা হয়ে উঠবে। কেমন করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় ও তা জানে। তোমার বন্ধু আফ্রিকানস্কা হচ্ছে লিবারাল—উদারপন্থী। উদারপন্থী ব্যবসায়ী—নেকড়ে, শুয়োর আর তার সঙ্গে সাপ আর ব্যাঙ মিশালে যা হয় তাই।

জাহান্নামে যাক!—নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল ফোমা—ওদের কথায় দরকার কি আমার? তোমার নিজের সংবাদ কি? এখনো তেমনি মদ খাচ্ছো?

অর্ধ-নগ্ন উস্কোখুস্কো ইয়ঝভকে মনে হচ্ছে লড়াইয়ের মোরগ। এখনো লড়াইয়ের উত্তেজনা থেকে শান্ত হয়ে ওঠেনি।

সময় সময়ে মদ খাই। ক্ষতবিক্ষত হৃদপিণ্ডটাকে ঠাণ্ডা করতে হয় আমাকে। কিন্তু তুমি—ভিজে গাছের গুঁড়ি, তুমি তো গুমরে গুমরে পুড়ে মরছ ধীরে ধীরে।

বুড়োটার কাছে যেতে হচ্ছে একবার।—মুখ কুঁচকে বলল ফোমা।

চেষ্টা করে দেখো।

কিন্তু যেতেও মন চাইছে না। গেলেই ধরে লেকচার দিতে শুরু করবে।

তবে যেও না।

কিন্তু যেতেই হবে।

তবে যাও।

সব কথায় ভাঁড়ামো করো না।—অসন্তুষ্ট ফোমা খেঁকিয়ে উঠল,—যেন মজা লাগছে, না?

দোহাই ঈশ্বরের, ভারি স্ফূর্তি হচ্ছে আমার।—টেবিলের উপর থেকে লাফিয়ে

নেমে দাঁড়িয়ে বলল ইয়ঝভ।—কালকের কাগজে এক ভদ্রলোককে যা এক হাত নিয়েছি! তারপর শুনলাম এক উপাখ্যান ঃ একদল লোক সমুদ্রের তীরে বসে খুব দার্শনিক তত্ত্ব আওড়াচ্ছিল জীবন সম্পর্কে। তখন একটা ইহুদী ওদের বলল ঃ আপনারা অত উল্টা সিধা কথা বলছেন কেন? আমি এক কথায় বলে দিচ্ছি সব ঃ আমাদের জীবনের মূল্য এক কানা কড়িও না। বরং ঐ ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতোই।

আঃ! জাহান্নামে যাও তুমি!—বলল ফোমা,—চললাম। বিদায়!

যাও। আজ আমি খুব খোসমেজাজে আছি। তোমার সঙ্গে গিয়ে এখন হাহুতাশ করতে পারব না। তাছাড়া তুমি তো আর বিলাপ করো না! করো শুয়োরের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ।

ফোমা চলে গেল। পরক্ষণেই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে গান ধরল ইয়ঝভ।

বাজাও ডঙ্কা! করো না ভয়।

ডঙ্কা? তুমি নিজেই একটা জয়ঢাক।—রাস্তায় নেমে আসতে আসতে নিতান্ত বিরক্তির সঙ্গে ভাবল ফোমা।

মায়াকিনের বাড়ি এসে ফোমার প্রথম দেখা লিউবার সঙ্গে। প্রবল উত্তেজনায় রক্তিম মুখে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল ঃ তুমি? হা আমার ঈশ্বর! কী হলদে হয়ে গেছ! কী ভীষণ রোগা হয়ে গেছ তুমি! মনে হচ্ছে খুব চমৎকার জীবন-যাপন করছ।

পরক্ষণেই লিউবার মুখ চোখ বিকৃত হয়ে উঠল। প্রায় ফিস্ ফিস্ করেই বলতে লাগল ঃ আঃ! ফোমা, জানো তুমি? শুনেছ? কে যেন ঘণ্টা টিপল। বোধহয় সে।—বলতে বলতেই ফোমাকে পিছনে রেখে সিল্কের পোশাকে খসখস্ শব্দ তুলতে তুলতে ছুটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল লিউবা। ওর বাবা বাড়ি আছেন কিনা সেটা জিগ্গেস করার অবকাশটুকুও মিলল না ফোমার।

বাড়িতেই ছিল মায়াকিন। ছুটির দিনের পোশাক পরে—লম্বা ঝুলের ফ্রক-কোটের বুকে পদক ঝুলিয়ে দরজার থাম ধরে ছিল দাঁড়িয়ে। কুতকুতে সবুজ চোখের তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ফোমাকে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল। তার দৃষ্টি ওর দিকে নিবদ্ধ অনুভব করে ফোমা চোখ তুলতেই উভয়ের দৃষ্টি মিলে গেল।

কেমন আছেন ভদ্রলোক?—ভর্ৎসনাভরা কণ্ঠে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল বৃদ্ধ,—কোত্থেকে আগমন হয়েছে জিগ্গেস করতে পারি? কে আপনার দেহের চর্বিটুকু শুষে খেয়েছে শুনি? একথাটা কি সত্য যে শুয়োরে খোঁজে গেঁড়ে আর ফোমা খোঁজে—তার চাইতেও খারাপ জায়গা?

আপনার কি বলবার মতো আর কোনো কথা নেই?—বৃদ্ধের চোখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল ফোমা। হঠাৎ ফোমা দেখল ওর ধর্মবাবার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। পাদুটো কাঁপছে থর থর করে। চোখ ঘন ঘন পিট্পিট্ করছে, শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরেছে থামটা। অসুস্থ মনে করে এগিয়ে গেল ফোমা বৃদ্ধের কাছে। কিন্তু রূক্ষ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল ইয়াকভ তারাশভিচ ঃ

সরে দাঁড়া! পথ ছেড়ে দে!—পরক্ষণেই তার মুখখানা স্বাভাবিক হয়ে এল। পিছনের দিকে তাকাতেই ফোমা দেখল একটি বেঁটে মোটা লোক নমস্কার করছে মায়াকিনকে।

কেমন আছো বাবা?—মোটা গলায় প্রশ্ন করল আগন্তুক।

তুমি কেমন আছো তারাস ইয়াকভলিচ?—প্রত্যুত্তরে হাসিমুখে প্রশ্ন করল

মায়াকিন। তখনো শক্ত মুঠোয় ধরে রয়েছে থামটা।

বিব্রত ফোমা পাশে সরে গিয়ে একটা চেয়ারে বসল। তারপর বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে দেখতে লাগল পিতাপুত্রের মিলনদৃশ্য।

দোরের পাশের থামের উপরে তেমনি হাত রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে মায়াকিন। ক্ষীণ দেহ দুলছে। মাথাটা কাত হয়ে হেলে পড়েছে একপাশে। আধখোলা চোখে নির্বাক দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তিন পা দূরে দাঁড়িয়ে পুত্র। মাথার চুল ইতিমধ্যেই শাদা হয়ে এসেছে। ভ্রূ কুঁচকে, বড়ো বড়ো চোখে বাপের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার ছোট্ট কালো ছুঁচলো দাড়ি আর গোঁফ শীর্ণ মুখের উপরে নড়ছে। হাতের টুপিটাও নড়ছে। ওর কাঁধে উপর দিয়ে দৃষ্টি মেলে ফোমা দেখল লিউবার ভীত পাংশু খুশিভরা মুখ. মিনতিভরা দৃষ্টি মেলে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে যেন এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে। কয়েকটি নীরব মুহূর্ত। ভাবাবেগের আতিশয্যে সবাই যেন গেছে গুঁড়িয়ে। সেই নিথর নীরবতা ভঙ্গ করে জেগে উঠল তারাশভিচের কম্পিত মৃদু কণ্ঠ ঃ

বুড়ো হযে গেছ তারাস!

নীরবে পুত্র একটু হাসল আর সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত চোখ বুলিয়ে বৃদ্ধের আপাদ-মস্তক দেখে নিল।

দোরের কাছের থামটা ছেড়ে দিয়ে বৃদ্ধ ছেলের দিকে এক পা এগিয়ে এল। কিন্তু হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ততক্ষণে তারাস ভাবি পদক্ষেপে বাবার সামনে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

এসো চুম্বন করি,—মৃদু কণ্ঠে বলল মায়াকিন।

দুই বৃদ্ধ পরস্পব পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে উষ্ণ চুম্বন বিনিময় করল, তারপর সরে দাঁড়াল। বৃদ্ধ মায়াকিনের মুখের বলিরেখাগুলো কাঁপছে থর থর করে। কিন্তু পুত্রের শীর্ণ মুখখানা অনড়। বুঝি বা কঠিন হয়ে উঠেছে। চুম্বন বিনিময়ে বাহ্যিক দিক থেকে কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। কেবল লিউবা আনন্দের আতিশয্যে কেঁদে ফেলল। আর বিমূঢ় ফোমা চেয়ারের ভিতরে নড়েচড়ে বসল। ওর মনে হল যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

আঃ! ছেলেমেয়েরা—আদৌ তোরা হৃদয়ের আনন্দ নোস, তোরা হৃদয়ের ক্ষত!—অভিযোগভরা শীর্ণ কণ্ঠে বলল মায়াকিন। ঐ কথাক'টির ভিতর দিয়ে সে নিজেকে অনেকখানি প্রকাশ করে ফেলল। কেননা কথাক'টি বলেই বৃদ্ধ উদ্দীপ্ত হযে উঠল। ফিরে এল তার সাহস। পরক্ষণেই মেয়ের উদ্দেশ্যে বলে উঠল ঃ কি রে, আহ্লাদে গলে গেছিস নাকি একেবারে? যা, গিয়ে আমাদের জন্যে কিছু খাবারের ব্যবস্থা কর। চা-টা কিছু। অপচয়ী পুত্র ফিরে এসেছে। একটু কিছু খেতে দে তাকে। তোমার বাবা কেমন লোক বোধহয় ভুলে গেছ সেকথা?

আয়ত চোখের চিন্তিত দৃষ্টি মেলে তারাস মায়াকিন লক্ষ্য করছিল তার বাবার প্রতিটি হাবভাব। নীরবে একটু হাসল। ওর পরনের কালো পোশাকের জন্যে মাথার পাকা চুল ও পাকা দাড়িগুলো আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বেশ, বসো। বলো তো, কেমন করে কাটালে এতদিন? কী করলে? দেখছ কি তাকিয়ে তাকিয়ে? ও হল আমার ধর্মছেলে—ইগনাত গরদিয়েফের ছেলে ফোমা। মনে আছে তোমার ইগনাতকে?

সব কিছুই মনে আছে আমার।—প্রত্যুত্তরে বলল তারাস।

আঃ! তা বেশ। অবশ্য যদি না মিথ্যা গর্ব করে থাকো। ভালো কথা, বিয়ে

করেছ?

আমি বিপত্নীক।

ছেলেপুলে আছে?

ছিল দুটি, মারা গেছে।

খুবই দুঃখের কথা। নাতির মুখ দেখতে পেতাম।

একটু ধূমপান করতে পারি?—অনুমতি চাইল তারাশ।

চালাও। অ্যাঁ, অ্যাঁ, তুমি সিগার খাচ্ছ?

কেন পছন্দ করো না তুমি?

আমি? আমার কাছে সবই সমান। সিগারটা আমার মতে বরং একটু অভিজাত বলেই মনে হয়।

কিন্তু, কেন আমরা নিজেদের অভিজাতদের চাইতে নিচু মনে করব?—একটু হেসে বলল তারাস।

নিজেদের কি আমি নিচু মনে করি নাকি?—উৎসাহভরে বলে উঠল মাযাকিন,—বললাম এই ভেবে যে, আমার যেন ওটা কেমন কেমন লাগে। এমন একটা বয়স্ক লোক, বিদেশী ছাঁদে দাড়ি ছাঁটা, মুখে সিগার—কে লোকটা? আমার ছেলে, হি হি!—তারাসেব কাঁধে উপরে আঙুল দিয়ে একটা খোঁচা দিল বৃদ্ধ। কিন্তু পরমুহূর্তেই ছিটকে ওর কাছ থেকে দূরে সরে এল। যেন ভয় পেয়েছে, পাছে বড্ড বেশি আনন্দ প্রকাশ করে ফেলে। তাছাড়া অমন একটা আধবুড়ো লোকের সঙ্গে ঐ ধরনের আচরণে শোভনও না হতে পারে। অনুসন্ধানী তীক্ষ্ম দৃষ্টি মেলে বৃদ্ধ ছেলের মুখের দিকে তাকাল।

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তাপভরা মৃদু হাসি হেসে চিন্তিত কণ্ঠে বলল তারাস: এই রকমেরই মনে পড়ত তোমাকে—সদাপ্রফুল্ল, সজীব, প্রাণবন্ত। মনে হয় এই দীর্ঘদিনের ভিতরে এতটুকুও বদলাওনি তুমি।

সগর্বে বৃদ্ধ টান হয়ে দাঁড়াল। তারপর নিজের বুক ঠুকে বলল:

কোনোদিনই বদলাব না আমি। যে-লোক তার নিজের মূল্য, নিজের মর্যাদা বোঝে, জীবন এতটুকুও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না তার উপরে। তাই নয় কি?

উঃ! কী অহঙ্কারী তুমি?

ওটা শিখেছি আমি আমার ছেলের কাছ থেকে।—প্রত্যুত্তরে ধূর্ত মুখভঙ্গি করে বলে উঠল বৃদ্ধ।—জানো, ঐ অহঙ্কারের জন্যে দীর্ঘ সতেরোটি বছর ছেলে আমার নীরব ছিল?

তার কারণ, তার বাবাও শুনতে চায়নি তার কথা।—স্মরণ করিয়ে দিল তারাস।

যাক গে, যাক। অতীতের কথা তুলে কোনো লাভ নেই। ভগবানই জানেন কার দোষ। তিনি ন্যায়ের প্রতিমূর্তি। তিনিই বলবেন তোমাকে—অপেক্ষা করো।

আমি আর বলব না কিছুই। ওসব আলোচনা করার সময় এটা নয়। তার চাইতে বরং বলো, এত বছর ধরে কী করেছ তুমি? কেমন করে এসে জুটলে সোডার কারখানায়? কেমন করে উন্নতি করলে?

সে অনেক কথা।—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললে তারাস। তারপর মুখ থেকে বড়ো একগাল ধোঁয়া ছেড়ে ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করল:

যখন স্বাধীনভাবে বসবাস করার সম্ভাবনা এল, আমি রিমেঝভের সোনার খনির সুপারিনটেন্ডেন্টের অফিসে ঢুকে পড়লাম।

চিনি আমি তাদের। ওরা তিন ভাই। একটা পঙ্গু, একটা মূর্খ, আর একটা

কিপটে। তারপর বলে যাও!

তার অধীনে দু বছর চাকরি করলাম। তারপর বিয়ে করলাম তার মেয়েকে। —গম্ভীর কণ্ঠে বলতে লাগল তারাস।

সুপারের মেয়েকে? তা সেটা তো মোটেই নির্বুদ্ধিতার কাজ করোনি দেখছি!

কি ভেবে তারাস কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ছেলের বিষাদক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ অনুভব করল তার অন্তরের ব্যথা।

তা স্ত্রীর সঙ্গে খুব সুখেই ঘরকন্না করেছিলে বোধহয়?—বলল মায়াকিন!—বেশ, বেশ, তাছাড়া কিই বা আর করতে পারো? স্বর্গ মৃতের কাছে, কিন্তু যারা বেঁচে থাকে তারা জীবন-যাপন করবেই। এখনো তেমন বয়স হয়নি। স্ত্রী মারা গেছে কি অনেক দিন?

এই তিন বছর।

বটে? তা সোডার কারখানায় এলে কেমন করে?

ওটা আমার শ্বশুরের।

আঃ! তোমার মাইনে কত?

প্রায় হাজার পাঁচেক।

হুঁ! নেহাত খুদকুড়ো তো নয়! একটা যাবজ্জীবনের কয়েদীর প..ক্ষ!

তীব্র দৃষ্টিতে তারাস বাবার মুখের দিকে তাকাল। তারপর রুক্ষ কণ্ঠে বলল :

ভালো কথা, কী থেকে তোমার ধারণা হল যে আমি একটা কয়েদী?

বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে বৃদ্ধ ছেলের মুখের দিকে তাকাল। পরক্ষণেই তার চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

অ্যাঁ? কী তবে? কয়েদী ছিলে না? জাহান্নামে যাক ব্যাটারা! তাহলে—কী সেটা? রাগ করো না। কেমন করে জানব আমি? লোকে বলে তুমি সাইবেরিয়ায় ছিলে। সেখানে তো কয়েদীরাই থাকে।

এসব কথা এখানেই শেষ হয়ে যাক।—গম্ভীর কণ্ঠে বলল তারাস, দু হাতে হাঁটুদুটো চেপে ধরেণ—বলছি, কেমন করে রটল। ছ' বছরের জন্যে নির্বাসিত হয়েছিলাম আমি সাইবেরিয়ায়। কিন্তু নির্বাসনের ক'বছর ছিলাম লেনার খনি-অঞ্চলে। মস্কোতে মাস কয়েক জেল খেটেছিলাম। ব্যাস।

বটে! তার মানে কী?—আনন্দ ও সংশয় ভারাক্রান্ত মনে ভাবল মায়াকিন।

আর এখানে লোকে কিনা ঐ সব অদ্ভুত অসম্ভব গুজব রটিয়েছে।

ঠিক, অদ্ভুত গুজবই বটে।—বিব্রত মুখে বলে উঠল বৃদ্ধ। আর তার ফলে একটা ব্যাপারে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে আমাকে।

বটে? তাই নাকি?

হাঁ। আমি নিজে ব্যবসা শুরু করেছিলাম। কিন্তু ঐ জন্যেই আমার সুনাম নষ্ট হয়ে গেল।

ছিঃ!—বলেই নিদারুণ ক্রোধে থুথু ফেলল বৃদ্ধ,—আ শয়তান! থামো! থামো! এও কি সম্ভব?

এক কোণে বসে ফোমা এতক্ষণ ধরে শুনছিল পিতাপুত্রের কথা। নিদারুণ বিরক্তিতে চোখ পিট্ পিট্ করতে করতে দেখছিল আগন্তুককে। ভাইয়ের প্রতি লিউবার মনোভাব আর তারাস সম্পর্কে তার গল্প শুনে শুনে খানিকটা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিল ফোমা। তাই সে আশা করেছিল তারাসের ভিতরে দেখবে সাধারণ মানুষের চাইতে কিছুটা ব্যতিক্রম। ভেবেছিল তারাস কথা বলবে বিশেষ একটা সুরে

পোশাক-পরিচ্ছদে থাকবে বৈশিষ্ট্য। এককথায় সাধারণ মানুষের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু ওর সামনে বসে রয়েছে ধীর-স্থির মোটা-সোটা একটি লোক—নিখুঁত পোশাকে ভূষিত। মুখখানা প্রায় হুবহু ওর বাবার মুখের মতো। পার্থক্যের মধ্যে ওর মুখে সিগার আর দাড়িগুলো কাঁচা। কথা বলছে সংক্ষেপে ব্যবসায়ীঢঙে। তবে কোথায় তার বৈশিষ্ট্য? বললে সে সোডার কারখানার মুনাফার কথা। ছিল না কয়েদী—মিথ্যা কথা বলেছে লিউবা। দাদার সম্পর্কে লিউবার সঙ্গে কিভাবে কথা বলবে ভেবে নিয়ে নিজের মনেই খুশি হয়ে উঠল ফোমা।

বাবা আর দাদার ভিতরে আলোচনা চলার ফাঁকে ফাঁকে লিউবা এসে দাঁড়াচ্ছিল দোরের কাছে। খুশিতে জ্বল জ্বল করছে মুখ। চোখদুটো চক্ চক্ করে উঠছে যখন তাকাচ্ছে তারাসের দিকে। পা টিপে টিপে আনাগোনা করছে আর গলা বাড়িয়ে দেখছে ভাইয়ের দিকে। প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে ফোমা লিউবার দিকে তাকাল। কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি নেই লিউবার। প্লেট বোতল ইত্যাদি নিয়ে দোরের পথে ক্রমাগত করছে ছোটাছুটি। এমন হল যে, যখন ওর ভাই বাবার কাছে বলছিল জেলের কথা ঠিক সেই মুহূর্তে ট্রে হাতে এসে ঢুকল লিউবা। তারপর যেন পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল ভাইয়ের কথা, কেমন করে তার হয়েছিল সাজা। শোনার পর ফোমার বিদ্রূপভরা বিস্মিত দৃষ্টির দিকে না তাকিয়েই ধীর-পদক্ষেপে চলে গেল।

তারাসের কথা ভাবতে ভাবতে এতটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল ফোমা যে হঠাৎ কে যেন ওর পিঠের উপরে হাত রেখেছে অনুভব করতেই এমনভাবে চমকে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল যে আর একটু হলে ফেলেই দিত ওর ধর্মবাপকে। উত্তেজনাভরা বিস্মিত মুখে ওর সামনে দাঁড়িয়ে মায়াকিন।

এই দেখ, একেই বলে মানুষ। ঐ হচ্ছে মায়াকিন বংশের মানুষ। সাতবার ক্ষারের জলে ওকে সিদ্ধ করেছে। সবটুকু তেল নিংড়ে বের করে নিয়েছে তবুও সে বেঁচে আছে, বাঁচছে। বুঝতে পেরেছ? কারুর সাহায্য ছাড়া একাই সে তার পথ করে নিয়েছে। খুঁজে নিয়েছে নিজের স্থান। আর সেজন্য আমি গর্বিত। তার অর্থ—মায়াকিন! মায়াকিন মানে হল যে নিজের হাতে তার ভাগ্য গড়ে তোলে। বুঝেছ? শেখো ওর কাছ থেকে। চেয়ে দেখো ওর দিকে। একশর ভিতরে একটাও খুঁজে পাবে না। হাজারে একটা মেলে কিনা সন্দেহ। কেমন? শয়তান বা দেবদূত কারুর ভিতর থেকেই একজন মায়াকিন গড়ে তুলতে পারবে না।

কথার ঝড়ে বিমূঢ় ফোমা বুঝে উঠতে পারল না ঐ প্রশংসা ঐ উচ্ছ্বাসের প্রত্যুত্তরে কী বলবে। দেখল, বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে নীরবে তারাস সিগার টেনে চলেছে। ওর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছে মৌন হাসির বাঁকা রেখা। মুখময় জেগে উঠেছে আত্ম-সন্তুষ্টির ভাব। আর সর্বাঙ্গে আভিজাত্যের ঔদ্ধত্য। বৃদ্ধের আনন্দ খুশিমনে করছে উপভোগ।

মায়াকিন আঙুলের ডগা দিয়ে ফোমার বুকে একটা খোঁচা দিয়ে বলল :

আমার নিজের ছেলে। তবুও আমি ওকে চিনি না। ওর অন্তরের কথা খুলে বলেনি আমার কাছে। হয়তো আমাদের দুজনার ভিতরে ব্যবধানের এমন একটা প্রাচীর গড়ে উঠেছে ঈগল কেন শয়তান নিজেও তা লঙ্ঘন করতে পারবে না। হয়তো ওর রক্ত একটু বেশিই ফুটেছে। বাপের রক্তের গন্ধটুকুও হয়তো আর নেই। কিন্তু তবুও মায়াকিন মায়াকিন। আমি সঙ্গে সঙ্গেই সেটা অনুভব করতে পারছি। অনুভব করছি আর বলি : হে প্রভু! আজ তুমি তোমার ভৃত্যকে ক্ষমা করো!—দারুণ

আনন্দে উত্তেজনায় বুড়ো কাঁপছে থর থর করে। প্রায় লাফাতে শুরু করে দিয়েছে ফোমার সামনে দাঁড়িয়ে।

স্থির হও, বাবা, শান্ত হও।—ধীরে চেয়ার ছেড়ে বাবার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল তারাস,—ছেলেটিকে অমন বিব্রত করে তুলছ কেন, বলো তো?—ফোমার মুখের দিকে তাকিয়ে চকিতে তারাস একটু মৃদু হাসল। তারপর বাপের হাত ধরে খাবার টেবিলের দিকে নিয়ে গেল।

আমি রক্তে বিশ্বাস করি।—বলল মায়াকিন,—বংশের রক্তে। ওরই ভিতরে রয়েছে সমস্ত শক্তি। মনে আছে, বাবা বলতেন, ইয়াশ্‌কা তোর ভিতরে রয়েছে আমার খাঁটি রক্ত। মায়াকিন বংশের রক্ত খুবই গাঢ়। কোনো নারীর ক্ষমতা নেই সে রক্ত দুর্বল করে। এসো একটু শ্যাম্পেন খাওয়া যাক। কি বলো? ভালো কথা, আরো বলো—তোমার নিজের কথা, শুনি। কেমন কাটালে সাইবেরিয়ায়?

আবার কি এক চিন্তায় ভীত হয়ে পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে, তীক্ষ্ম দৃষ্টি মেলে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে পুত্রের সংক্ষিপ্ত জবাব পাওয়ার পরে আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল বুড়ো। নীরবে ফোমা তার সেই কোণটিতে বসে শুনতে শুনতে তাকিয়ে দেখছিল।

সোনার খনির ব্যবসা অবশ্য একটা দারুণ লাভজনক ব্যবসা। কিন্তু বড়ো বিপজ্জনক। তাছাড়া খুব বেশি মূলধনের দরকার। মাটির গর্ভে কী আছে তা তো আর বলে দেয় না? বিদেশীদের সঙ্গে ব্যবসা লাভজনক। লোকসানের ভয় থাকে না এতটুকুও। কিন্তু পরিশ্রম ভীষণ। বুদ্ধির এতটুকুও দরকার হয় না। অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কোনো স্থান নেই। যাদের গড়ে তোলার শক্তি আছে তাদের উন্নতির কোনো পথ নেই।

লিউবভ এসে সবাইকে ডাকল খাবার ঘরে। মায়াকিনেরা চলে যেতেই লিউবার জামার হাতা ধরে মৃদু একটা টান দিল ফোমা। একটু দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল লিউবা :

কী ব্যাপার?

কিছু না।—মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল ফোমা,—জিগ্‌গেস করছিলাম খুশি হয়েছ কিনা?

নিশ্চয়ই।—আনন্দোচ্ছ্বল কণ্ঠে জবাব দিল লিউবা।

কিসের জন্যে?

মানে? কী বলতে চাও তুমি?—বিস্মিত লিউবা ফোমার মুখের দিকে তাকাল।

কিছু না, এমনি। কিসের জন্যে খুশি হয়েছে?

তুমি একটি অদ্ভুত মানুষ।—দেখতে পাচ্ছ না কিসের জন্যে?

কী?—বিদ্রূপভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করল ফোমা।

কি হল তোমার?—অস্বস্তিভরা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল লিউবা।

এঃ! লিউবা!—ঘৃণাভরা কণ্ঠে টেনে টেনে বলল ফোমা,—তোমার বাবা—ঐ ব্যবসায়ী শ্রেণী কি ভালো কিছু জন্ম দিতে পারে? মুলো কখনো কালোজাম ফলাতে পারে আশা করো? আর তুমি কিনা মিথ্যে কথা বলতে আমার কাছে। তারাস হেনো, তারাস তেনো। কী আছে ওর ভিতরে? একটা ব্যবসায়ী। যে-কোনো একটা সাধারণ ব্যবসায়ীর মতোই। চেহারাটাও তেমনি—বেঁটে, মোটা। হি হি! —ওর কথায় সংশয় কুণ্ঠিত তরুণী দাঁত দিয়ে জোরে জোরে ঠোঁট কামড়াচ্ছে দেখে খুশি হয়ে উঠল ফোমা। লিউবা কখনো উঠছে লাল হয়ে, কখনো পাংশু হয়ে উঠছে ওর মুখ।

তুমি—তুমি—চাপাগলায় বলতে শুরু করল লিউবা। কিন্তু পরক্ষণেই মেঝের উপরে পা আছড়ে চিৎকার করে উঠল : এত বড়ো সাহস তোমার অমন কথা বলো।—বলতে বলতে দোরের কাছ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে ক্রুদ্ধ রক্তাক্ত মুখখানা ফিরিয়ে উষ্মা-ভরা নিচু কণ্ঠে জোর দিয়ে বলে উঠল : তুমি একটা হিংসুটে।

হো হো করে হেসে উঠল ফোমা। খাবারের টেবিলে—যেখানে তিনটি মানুষ খুশি মনে করছে আলাপ-আলোচনা, সেখানে গিয়ে বসার এতটুকুও ইচ্ছে হল না ফোমার। শুনতে পাচ্ছে ফোমা ওদের উচ্চকণ্ঠ, পরিতৃপ্ত হাসির আওয়াজ, পেয়ালা পিরিচের ঠুন ঠুন শব্দ। আর বুঝল, ফোমার স্থান নেই ওখানে—ওদের পাশে। নেই কোথাও,—কোনোখানে। যদি দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ওকে করত ঘৃণা—যেমন করে এই মাত্র ঘৃণা প্রকাশ করে গেল লিউবা, বুঝিবা হালকা হয়ে উঠত অন্তর।—ভাবল ফোমা। হয়তো তখন বুঝতে পারত কেমন ব্যবহার করা উচিত ওদের সঙ্গে। পারত তখন কিছু বলতে। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভাবতে ভাবতে নিজের অজ্ঞাতেই স্থির করল ফোমা, এক্ষুনি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। চলে যাবে সেখান থেকে দূরে যেখানে মানুষ করছে আনন্দ—যেখানে ওর উপস্থিতি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

রাস্তায় নেমে এসে মায়াকিনদের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল ওর অন্তর। দারুণ আহত হয়েছে মনে মনে। যাই হোক না কেন, দুনিয়ায় ওরাই ওর একমাত্র নিকট আত্মীয়। ফোমার চোখের সামনে ভেসে উঠল তার ধর্মবাবার মুখ। প্রবল উত্তেজনায় বলিরেখাগুলো কাঁপছে। আনন্দে জ্বলে জ্বলে উঠছে সবুজ চোখ ফস্‌ফরাসের দীপ্ত আলো বিকিরণ করে।

একটা পচা গাছের গুঁড়িও অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে!—ক্রুদ্ধ ফোমা ভাবল মনে মনে পরক্ষণেই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল তারাসের শান্ত গম্ভীর মুখ। আর তারই পাশে পরম শ্রদ্ধায় বিগলিত লিউবার অভিবাদনে নত তনু-শ্রী। ওর অন্তর আচ্ছন্ন করে জেগে উঠল এক ঈর্ষা-মেশানো ব্যথা।

কে আছে আমার অমন করে তাকাবে আমার মুখের দিকে? কেউ নেই। একটি প্রাণীও নেই আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাবার।

ভাবতে ভাবতে যখন নদীর তীরে এসে পৌঁছল তখন জাহাজঘাটার কর্ম-কোলাহলে ফিরে এল ওর সম্বিত। সব রকমের জিনিসপত্র বোঝাই হচ্ছে গাড়িতে। চলে যাচ্ছে বিভিন্ন দিকে। দ্রুত চলা-ফেরা করছে লোকজন। চিন্তাক্লিষ্ট। উত্তেজিত হয়ে কেউ ঘোড়ার পেটে মারছে রেকাবের ঘা। পরস্পরের প্রতি গাল পাড়ছে চিৎকার করে। এক দুর্বোধ্য কানে-তালা-লাগা কোলাহলে ভরিয়ে তুলেছে সমস্ত রাস্তা। এক ফালি সঙ্কীর্ণ জায়গায় বহু লোক মিলে করছে কাজ। পাথরের পরে পাথর গেঁথে চলেছে। একপাশে গড়ে তুলছে উঁচু ইমারত। অন্য পাশ—নদীর দিকের পাশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে খাড়া খাদে। ঐ বিক্ষুব্ধ কোলাহলে ফোমার মনে হল যেন সবাই ঐ নোংরা নীচতা, ঐ কোলাহল থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। আর তারই জন্যে দারুণ ব্যস্ততায় হাতের অসমাপ্ত কাজ শেষ করে চলেছে। যেন একাজ শেষ না হলে ওদের নেই মুক্তি। বিরাট জাহাজ উপকূলে দাঁড়িয়ে চিমনির মুখে চলেছে ধূম উদ্‌গিরণ করে। নদীর বিক্ষুব্ধ জলরাশি ঐ জাহাজের গায়ে বাধা পেয়ে মৃদু শব্দে আছড়ে পড়ছে তীরে। যেন মুহূর্তের জন্যে বিশ্রাম আর ঘুমিয়ে নেবার জন্যে করছে করুণ আবেদন।

হুজুর!—ফোমার কানের কাছে বেজে উঠল একটা কর্কশ কণ্ঠ,—ঐ বাড়িগুলোর সম্মানে খানিকটা ব্রাণ্ডি দান করুন!

নিস্পৃহ দৃষ্টি মেলে ফোমা আবেদনকারীর দিকে তাকাল। লোকটার দাড়ি-গোঁফে সমাচ্ছন্ন মুখ, বিরাট দেহ, খালি পা, ছেঁড়া জামা আর মুখময় ফুলে ওঠা আঘাতের কালশিরাপড়া চিহ্ন।

দূর হ!—বলেই মুখ ফিরিয়ে নিল ফোমা।

মহাজন! মরার সময়ে তো টাকার থলেগুলো আর সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না! এক পাত্তর মদের দামটা দান করুন! না কি পকেটে হাত দিতেও আলস্যি লাগছে?

প্রার্থীর মুখের দিকে তাকাল ফোমা। লোকটা ওর সামনে দাঁড়িয়ে। গায়ে পোশাকের চাইতে কাদাই বেশি। নেশায় টলছে। রক্তাক্ত ফোলা-ফোলা চোখে নাছোড়বান্দার মতো ফোমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অমন করে চাইতে হয় নাকি?—বলল ফোমা।

তবে কিভাবে চাইব? দু আনা পয়সার জন্যে হাঁটু গেড়ে ভিক্ষা চাইতে বলেন নাকি?—নির্ভীক কণ্ঠে বলল লোকটি।

বটে?—ফোমা ওর হাতে একটা সিকি দিল।

ধন্যবাদ! এক সিকি—ষোলো পয়সা! ধন্যবাদ! যদি আর ষোলোটি পয়সা দেন তবে চার হাতপায়ে হেঁটে শুঁড়িখানা পর্যন্ত যেতে পারি।

যা, যা, বিরক্ত করিস নে।—হাতনেড়ে বলল ফোমা।

থাকতে যে দান করে না, যখন দেয়ার ইচ্ছে হবে তখন আর থাকবে না।—বলেই লোকটা একপাশে সরে গেল।

উচ্ছন্নে গেছে, তবুও কী সাহস!—ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে আপন মনেই বলে উঠল ফোমা।—ভিক্ষে চাইছে না যেন মহাজনের মতো ঋণের টাকা দাবি করছে। এরা কোত্থেকে এত সাহস পায়?—তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে নিজেই নিজের কথার জবাব দিল: পায় স্বাধীনতা থেকে। ও তো আর লোহার শেকলে বাঁধা নয়! কিসের ভয় ওর?

এই দুটো প্রশ্ন ওর মনে জেগে উঠে এক বেদনাভরা বিহ্বলতায় অন্তর ভারাক্রান্ত করে তুলল। কর্মরত লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল:

কিসের জন্যে করবে অনুশোচনা? কাকে করবে ভয়?

একা—কেবলমাত্র নিজের শক্তিতে পারব না বেরিয়ে আসতে। নির্বোধের মতো মানুষের ভিড়ের ভিতরে ঘুরে ঘুরে মরব। সবার কাছ থেকে পাবো উপহাস। সবাই করবে আঘাত। যদি ওরা আমাকে ধাক্কা দিয়ে একপাশে ফেলে দিত, যদি ঘৃণা করত তবেই—তবেই আমি বিশাল দুনিয়ার ভিতরে চলে যেতে পারতাম। চাই বা না চাই যেতেই হত আমাকে।

জেটির উপর থেকে ভেসে আসছে দুবিনুশ্কার আনন্দোচ্ছল সুর। বাহকরা কী যেন একটা কাজ করছিল যাতে প্রয়োজন ছিল দ্রুততার। তাই গাইছিল সেই গান:

"সরাইখানা জুড়ে বসে মহাজনবাবুরো
বাবুর কড়া মদেও মন ওঠে না,"

বলিষ্ঠ কণ্ঠে দলপতি আবৃত্তি করে চলেছে আর সবাই একসঙ্গে ধরছে ধুয়া:

"ও দুবিনুশ্কা! হেইয়ো হো!"

পরক্ষণেই গম্ভীর কণ্ঠের সুর বাতাস বিক্ষুব্ধ করে তুলল:

"চলে—চলে, চলে—চলে।"

গান শুনতে শুনতে ফোমা জেটির দিকে পা বাড়াল। দেখল বাহকেরা দুই সারিতে ভাগ হয়ে জাহাজের খোল থেকে বিরাট বিরাট শুটকি মাছের পিণ্ডগুলোকে গড়িয়ে আনছে। ময়লা লাল জামা গায়ে, গলার বোতাম খোলা, হাতে দস্তানা, খোলের উপরে দাঁড়িয়ে শ্রমদীপ্ত উজ্জ্বল মুখে পরস্পর করছে রহস্যালাপ। গানের তালে তালে টানছে দড়ি। আর খোলের ভিতর থেকে ভেসে আসছে অদৃশ্য দলপতির কণ্ঠের উচ্চ স্বর :

"আর চাষাভুসোয় গলা ভেজাই করি সাফসুতরো
এমন তাড়ি জোটে না"

সঙ্গে সঙ্গে একজোড়া বিরাট ফুসফুসের মতো একই সঙ্গে গলা ছেড়ে সবাই ধুয়া ধরল :

ও দুবিনুশ্‌কা, হেইয়ো-হো!

সঙ্গীতের মতো ধ্বনিময় ঐ কাজের দিকে তাকিয়ে ফোমার মনে জেগে উঠল যুগপৎ আনন্দ ও ঈর্ষার ভাব। বাহকদের অপরিচ্ছন্ন মুখগুলি হাসির আভায় উদ্ভাসিত। কাজ হয়ে উঠেছে সহজ। এগিয়ে চলেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। মূল গায়কের মেজাজ খুশি। বেশ হত, অমনি করে যদি সবার সঙ্গে মিলে কাজ করা যেত,—ভাবল ফোমা,—অমন চমৎকার সব সাথীদের সঙ্গে মিশে অমনি সুমধুর গানের তালে তালে। তারপর শ্রান্ত হয়ে এক পাত্র ভদ্‌কা আর বাঁধা-কপির ঝোল। দলের ঐ মেট্রনটির হাতে তৈরি।

জলদী! জলদী!—ফোমার কানের কাছে বেজে উঠল কার যেন বিশ্রী মোটা গলার কর্কশ সুর। ঘুরে দাঁড়াল ফোমা। বিরাট থাবা একটা মোটাসোটা লোক হাতের বেতের ছড়িটা সিঁড়ির তক্তার উপরে ঠুকতে ঠুকতে কুতকুতে চোখের দৃষ্টি মেলে কর্মরত লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে হেঁকে উঠল : ওরে একটু কম চেঁচিয়ে কাজ কর জলদী জলদী! লোকটার মুখ ও ঘাড় বেয়ে নেমে আসছে ঘাম। থেকে থেকে মুছে ফেলছে বাঁ হাতে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানছে—যেন উঠছে পাহাড় বেয়ে। বিদ্বেষভরা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে ফোমা ওর দিকে তাকিয়ে ভাবল : অন্যেরা কাজ করছে আর ও ঘামছে। কিন্তু ওর চাইতেও নিকৃষ্ট আমি। যেন দাঁড়কাকের মতো বসে আছি বেড়ার উপরে—নিষ্কর্মা অপদার্থ।

প্রত্যেকটি ভাব সঙ্গে সঙ্গেই ওর মনে পরম বেদনার সঙ্গে জাগিয়ে তুলছে সংসারে ওর নিজের অনুপযুক্ততার কথা। যেদিকেই তাকাচ্ছে, সেদিকেই যেন রয়েছে এমন একটা কিছু যা ওকে আহত করে—পাথরের মতো এসে আঘাত করে ওর বুকে। ওর পাশে দাঁড়িপাল্লার কাছে দাঁড়িয়ে দুজন নাবিক। একজনার গড়ন মজবুত, মুখখানা লাল। সে তার সঙ্গীর উদ্দেশ্যে বলল : বুঝলে ভায়া! ওরা যখন আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি একা আর ওরা চারজন। কিন্তু তা বলে হার স্বীকার করিনি! যদিও বুঝতে পেরেছিলাম যে মারতে মারতে ওরা মেরেই ফেলবে আমাকে। কেমন করে ওদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম জানো? ছিট্‌কে পড়ে ও চারদিকে গড়াতে শুরু করল!

কিন্তু তোমাকেও তো খুব ঠুকে দিয়েছে, না?—বলল ওর সঙ্গী।

নিশ্চয়ই। আমিও খেয়েছি। প্রায় পাঁচ-পাঁটা ঘুসি হজম করেছি। কিন্তু কী এল-গেল তাতে? আমাকে ওরা মেরে তো আর ফেলতে পারেনি? যাকগে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!

নিশ্চয়ই।

এই গলুইয়ের দিকে শয়তানগুলো, গলুইয়ের দিকে বলছি!—ঘর্মাক্ত দেহ মোটা লোকটি হিংস্র কণ্ঠে গর্জন করে উঠল দুটি নাবিকের উদ্দেশ্যে। ওরা ডেকের উপর দিয়ে নোনা মাছের দুটো বড়ো পিপে গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

অমন ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছ কেন?—লোকটার দিকে তাকিয়ে তীব্রকণ্ঠে গর্জে উঠল ফোমা।

তাতে তোমার কাজ কিহে বাপু!—ফোমার মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল লোকটা।

নিশ্চয়ই আমার কাজ আছে। লোকগুলো কাজ করছে আর তোমার চর্বি গলে পড়ছে। তাই ভাবছ ওদের গাল পাড়বে?—লোকটার সামনে এগিয়ে এসে শাসানির সুরে বলল ফোমা।

তুমি—খবরদার! মেজাজ সামলে!—ঘর্মাক্ত লোকটা ছুটে তার অফিসের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। ওর গমনপথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ফোমাও জেটি ছেড়ে চলে গেল। কাউকে গাল পাড়ার জন্যে, কিছু একটা করার জন্যে দারুণ ইচ্ছে জেগে উঠল ফোমার। যাতে খানিকক্ষণের জন্যেও নিজের চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু কিছুতেই মুক্তি পাচ্ছে না নিজের মনের চিন্তার হাত থেকে। পারছে না ঐ নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে।

ঐ নাবিকটি মুক্ত করে নিল নিজেকে। এখন সে বিপদমুক্ত। হাঁ, কিন্তু আমি—

সন্ধ্যেয় আবার গেল ফোমা মায়াকিনের কাছে। বৃদ্ধ তখন বাড়ি ছিল না। খাবার ঘরে লিউবা তার দাদার সঙ্গে বসে চা খাচ্ছিল। দোরের কাছে আসতেই ফোমা শুনতে পেল তারাসের মোটা গলার স্বর ঃ

ওকে নিয়ে বাবার অত মাথাব্যথা কেন?—পরক্ষণেই ফোমাকে দেখতে পেয়ে চুপ করে গেল। তারপর তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি মেলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। লিউবার মুখের উপরে একটা উত্তেজনার ছাপ। বিরক্তিভরা অথচ নম্রকণ্ঠে বলল ঃ

ওঃ! তুমি, তাই বলো!

আমার সম্পর্কেই আলোচনা করছিল ওরা—টেবিলের পাশের একটা চেয়ারে বসতে বসতে ভাবল ফোমা। ওর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চেয়ারের ভিতরে ডুবে গেল তারাস। একটা বিশ্রী নীরবতা এসেছে নেমে। এতে মনে মনে খুশি হয়ে উঠল ফোমা।

যাচ্ছো নাকি ভোজসভায়?

কোথায় ভোজসভা?

জানো না? কনোনভ তার নতুন জাহাজ ভাসাচ্ছে। প্রার্থনা হবে। তারপর সবাই মিলে যাবে ভলগা পর্যন্ত।

আমাকে তো নিমন্ত্রণ করেনি কেউ?—বলল ফোমা।

নিমন্ত্রণ কাউকেই করেনি। এক্সচেঞ্জে এসে ঘোষণা করেছে—"যিনি আসতে চান তাঁকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।"

আমার দরকার নেই।

বটে? কিন্তু বিরাট ব্যবস্থা হয়েছে পানোৎসবের।—ফোমার দিকে কৌতূহলভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল লিউবা।

ইচ্ছে করলে নিজের পয়সায়ই মদ খেতে পারি।

তা জানি।—মাথা নেড়ে বলল লিউবা।

চায়ের চামচটা দু আঙুলে ধরে লোফালুফি করছিল তারাস। এতক্ষণে প্রশ্ন-ভরা দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাল।

কিন্তু ধর্মবাবা কোথায় গেলেন?—জিগ্‌গেস করল ফোমা।

তিনি গেছেন ব্যাঙ্কে। আজ ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিং আছে কিনা। কার্যকরী সভার সভ্য নির্বাচন হবে।

ওঁকেই আবার নির্বাচন করবে বোধহয়।

নিশ্চয়ই।

আবার নেমে এল নিস্তব্ধতা। ভাই-বোনের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল ফোমা। হাতের চামচটা নামিয়ে রেখে লম্বা চুমুকে চা খেতে লাগল তারাস। তারপর নীরবে গ্লাসটা বোনের দিকে সরিয়ে দিয়ে একটু মৃদু হাসল। লিউবাও একটু খুশির হাসি হেসে গ্লাসটা হাতে করে ধুতে আরম্ভ করল। পরক্ষণেই ওর মুখের ভাব দৃঢ় হয়ে উঠল। কিসের জন্যে যেন প্রস্তুত হয়ে উঠছে মনে মনে। তারপর শ্রদ্ধাভরা মৃদুকণ্ঠে দাদার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল ঃ

তাহলে আমাদের আগের আলোচনায় ফিরে যাওয়া যাক, কি বলো?

বেশ তো, তোমার ইচ্ছে হলে শুরু করো।

বুঝতে পারলাম না তোমার কথা। বিষয়টা কী? তুমি যেমন বলছ,—এ সব কিছুই যদি কাল্পনিক হয়ে থাকে, এ সমস্তই যদি অসম্ভব, সমস্ত কিছুই স্বপ্ন, তবে যে-লোক বর্তমান এই জীবনে সন্তুষ্ট নয়, সে কী করবে?—দেহটা ঝুঁকিয়ে দিয়ে উদ্বেগভরা দৃষ্টিতে তরুণী ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ক্লান্ত দৃষ্টিতে তারাস বোনের মুখের দিকে তাকাল। তারপর চেয়ারের ভিতরে একটু নড়েচড়ে বসে মাথা নিচু করে ধীর কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করল ঃ

জীবনের উপরে এই যে বীতশ্রদ্ধা তার উৎস কোথায় সেটাই আমাদের আগে খুঁজে দেখা দরকার। আমার মনে হয় এটা আসে প্রথমত কাজ করার অক্ষমতা থেকে। কর্মের উপরে শ্রদ্ধাহীন হলে পরে। দ্বিতীয়ত আসে নিজের শক্তি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা থেকে। বেশির ভাগ লোকের জীবনে দুর্ভাগ্য আসে এই জন্যেই যে, তারা তাদের প্রকৃত সামর্থ্যের চাইতে বেশি করতে পারে বলে ধারণা করে। অবশ্য, মানুষের পক্ষে প্রয়োজন খুব সামান্য কিছুরই। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী একটা কাজ বেছে নেয়া, আর সেই কাজ সম্পর্কে যতদূর সম্ভব নিজেকে পারদর্শী করে তোলা। যে কাজ করছ, তার উপরে তোমার ভালোবাসা থাকা দরকার। তারপর করো শ্রম। যতই কঠিন হোক তাতেই তোমার সৃজন-শক্তিকে উন্নত করবে। একটা চেয়ারও যদি তৈরি করো মনপ্রাণ ঢেলে, তবে সেটাই হবে সবচাইতে ভালো, সবচাইতে সুন্দর, সবচাইতে মজবুত। সব কাজেই তাই। স্মাইলস্‌ পড়ো। পড়েছ ওর বই? খুবই জ্ঞানগর্ভ। খাঁটি বই। লাবক্‌ পড়ো। সাধারণত ইংরেজেরা শ্রমশীল জাত হিসেবে গড়ে উঠেছে। তারই জন্যে শিল্পে, বাণিজ্যে তাদের সাফল্য বিস্ময়কর। তাদের কাছে শ্রম হল একটা সাধনা। শ্রম-নিষ্ঠার উপরেই নির্ভর করে সাংস্কৃতিক মানের উচ্চতা। শিক্ষা-সংস্কৃতি যতই উন্নত হয়, মানুষের প্রয়োজন মিটবার পথের বাধাবিঘ্ন ততই দূর হয়ে পথ সুগম হয়ে ওঠে। সুখ, সম্ভবত মানুষের অভাবের নিবৃত্তির ভিতর দিয়েই আসে সুখ। খাঁটি কথা। অন্য দিক দিয়ে দেখো, কাজের উপরেই মানুষের সুখ-শান্তি নির্ভরশীল।—ধীরে ধীরে অতিকষ্টে বলে চলেছে তারাস। যেন কথা বলা তার পক্ষে নিদারুণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। একান্ত ঔৎসুক্য-

ভরা দৃষ্টি মেলে লিউবভ শুনে চলেছে ওর কথা। সব কিছুই নির্বিচারে করছে গ্রহণ—যেন শুষে নিচ্ছে তার অন্তরের অন্তস্তলে।

বেশ, কিন্তু যদি ধরুন কারুর কাছে সবকিছুই বিশ্রী লাগে?—তারাসের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল ফোমা।

কিন্তু কী? কোন্ জিনিসটা বিশ্রী লাগে তার?—ফোমার দিকে না তাকিয়েই শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করল তারাস।

টেবিলের উপরে ঝুঁকে ষাঁড়ের মতো ঘাড় নিচু করে বলতে লাগল ফোমা ঃ

কোনো কিছুতেই তার মনে শান্তি আসে না—কাজকর্ম, ব্যবসা, লোকজন, তাদের কাজ। ধরুন, সব কিছুর ভিতরেই আমি দেখতে পাই প্রতারণা। ব্যবসা—ব্যবসা নয়। ওটা কেবল আমাদের অন্তরের শূন্যতাকে আটকে রাখার একটা ছিপি বিশেষ। যেমন ধরুন, কেউ কাজ করে আর কেউ হুকুম ঝাড়ে আর ঘামে। কিন্তু সে-ই পায় বেশি। কেন এটা? বলুন?

তোমার কথা বুঝতে পারছি না আমি।

ঘৃণাভরা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে লিউবভ ওর দিকে তাকিয়ে আছে অনুভব করে মৃদু হেসে তারাসের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল ঃ বুঝতে পারছেন না? আচ্ছা বিষয়টা বলছি এ ভাবে,—একটা লোক নৌকা করে যাচ্ছে নদীর উপর দিয়ে। নৌকাটা ভালো হতে পারে। কিন্তু নিচে গভীর জল। নৌকাটাও মজবুত। কিন্তু যদি লোকটা যদি না তার নিচের ঐ অন্ধ গভীরতা অনুভব করতে পারে, যতই মজবুত হোক সে নৌকা তাকে রক্ষা করতে পারে না।

নিস্পৃহ স্থির দৃষ্টি মেলে তারাস ফোমার মুখের দিকে তাকাল। মৃদু সঙ্গীতের সুরে ঘড়ির পেন্ডুলাম ঘোষণা করে চলেছে প্রতিটি মুহূর্ত। মন্থর গতিতে চলেছে ফোমার ব্যথাভরা হৃৎপিণ্ড। যেন অনুভব করছে তার অন্তরের ঐ ব্যথা, ঐ সংশয়াকুলতায় কেউ নেই যে শোনাবে দুটো স্নেহভরা, উত্তাপভরা, সান্ত্বনার বাণী।

কাজই মানুষের সব কিছু নয়,—আপন মনেই বলে চলেছে ফোমা। যেন বলছে সেই লোকগুলোকেই উদ্দেশ্য করে যাদের আদৌ বিশ্বাস নেই ওর আন্তরিকতায়,—কাজের ভিতরেই রয়েছে মানব জীবনের চরম সার্থকতা, একথা ঠিক নয়। এমন অনেক লোক আছে জীবনে যারা কাজ করে না। অথচ যারা কাজ করে তাদের তুলনায় ঢের সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করে। কী এর মানে? কিন্তু যারা শ্রমিক, তারা নেহাতই হতভাগ্য। ঘোড়ার মতো অন্যে তাদের পিঠে চড়ে আর তারা দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু তবুও ঈশ্বরের কাছে কৈফিয়ত আছে তাদের। যখন তাদের জিগ্গেস করবে ঃ "কী উদ্দেশ্যে জীবনধারণ করেছিলে?" তারা বলবে জবাবে ঃ "সে-কথা ভাববার অবকাশ ছিল না আমাদের। জীবনভোর কাজ করেই গেছি।" কিন্তু আমি? কী কৈফিয়ত আছে আমার? আর যারা জীবনে কেবল হুকুমই চালায় কী কৈফিয়তই বা দেবে তারা তাদের কাজের? কী উদ্দেশ্য তাদের জীবনে? আমার ধারণা, প্রত্যেকটি মানুষেরই জানা দরকার, দৃঢ়ভাবে বোঝা দরকার—কেন, কিসের জন্যে তার বেঁচে থাকা।—বলতে বলতে চুপ করে গেল ফোমা। খানিক পরেই মাথা তুলে গম্ভীর কণ্ঠে আবার বলতে লাগল ঃ এ কি সম্ভব যে মানুষ জন্মায় কেবলমাত্র কাজ করার জন্যে—টাকা রোজগার করার জন্যে। বাড়ি তৈরি আর সন্তানের জন্ম দেবার জন্যে? তারপর মরে যেতে? না, জীবনের তাৎপর্য অন্য কিছু। মানুষ জন্মাল, বেঁচে থাকল তারপর একদিন মরে গেল। কিসের জন্যে? আমাদের

মানেই নেই। আদৌ কোনো মানে নেই। তবুও সব ক্ষেত্রে যে এটা সমান নয় তা বুঝতে কষ্ট হয় না। কেউ ধনী—এত টাকা আছে যে হাজার লোকের পক্ষেও তা অঢেল। কিন্তু তারা যাপন করে অলস জীবন। অন্যে জীবনভোর পিঠ বাঁকিয়ে খেটে মরে কিন্তু নেই তাদের কপর্দক। কিন্তু মানুষের ভিতরে এ প্রভেদও অকিঞ্চিৎকর। এমন লোকও আছে পরনে যাদের কাপড় জোটে না কিন্তু বচন ঝাড়ে যেন পরে আছে রেশমী পোশাক।

নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে হয়তো অনেক কিছুই বলতে যাচ্ছিল ফোমা, কিন্তু হঠাৎ চেয়ারটা সরিয়ে উঠে দাঁড়াল তারাস। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে কোমল মৃদু কণ্ঠে বলল ঃ ধন্যবাদ! থাক আর না।

মুহূর্তে কথা বন্ধ করে কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মৃদু হেসে ফোমা লিউবার মুখের দিকে তাকাল।

কোথা থেকে সংগ্রহ করলে এ দর্শন?—শুকনো সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করল লিউবভ।

এ দর্শন নয়, পীড়ন।—মৃদু হেসে বলল ফোমা,—চোখ মেলে তাকাও, তখন তুমি নিজেও এমনি করেই ভাবতে শুরু করবে।

ভালো কথা লিউবভ,—টেবিলের দিকে পিছন ফিরে বলতে শুরু করল তারাস—দুঃখবাদ অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির কাছে দুর্বোধ্য—বিদেশী কথা। সুইফ্‌ট আর বায়রনের ভিতরে যে দুঃখবাদ তা নিছক একটা জ্বালা—মানবজীবনের অপূর্ণতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। সেই মাপা-জোখা ঠাণ্ডা দুঃখবাদের অস্তিত্বটুকুও খুঁজে পাবে না ওদের ভিতরে।—পরক্ষণেই যেন তার মনে পড়ল ফোমার কথা। ওর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে পা নাচাতে নাচাতে বলল ঃ

খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছ তুমি। যদি সত্যিই বিষয়টা সম্পর্কে তোমার আগ্রহ থেকে থাকে তবে তোমাকে পড়তে হবে। জীবনের মূল্য সম্পর্কে বইতে অনেক কিছু মূল্যবান মতামত পাবে। কি করো? বই-টই পড়ো?

না।—সংক্ষেপে জবাব দিল ফোমা।

অ্যাঁ!

আমি বই পড়ি না।

অ্যাঁ! কিন্তু তবুও ওগুলো তোমাকে সাহায্য করতে পারে।—বলল তারাস। ত'র ঠোঁটের কোণে ছড়িয়ে পড়ল মৃদু হাসির ক্ষীণ রেখা।

বই? মানুষই যখন পারে না আমার চিন্তায় সাহায্য করতে, তখন বই নিশ্চয়ই কিছু করতে পারবে না।—ব্যথাভরা কণ্ঠে বলে উঠল ফোমা। ঐ নিস্পৃহ লোকটি সম্পর্কে ওর মনে বিশ্রী ধারণা হতে লাগল। ওকে মনে হল খুবই ক্লান্তিকর। ইচ্ছে হল চলে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, ভাই সম্পর্কে দু'কথা শুনিয়ে যায় লিউবাকে। তাই তারাস চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ফোমা। থালা ধুচ্ছে লিউবা। ওর মুখখানা কঠিন, চিন্তিত। হাতদুটো অলস মন্থর গতিতে কাজ করে চলেছে। ঘরময় পায়চারি করে ফিরছে তারাস। থেকে থেকে দাঁড়িয়ে পড়ছে রুপোর বাসনভরা আলমারিটার সামনে। কাঁচের উপরে দিচ্ছে আঙুলের খোঁচা। কখনো বা আধবোজা চোখে পরীক্ষা করছে জিনিসপত্র। কাঁচের জানলার ভিতর থেকে ঘড়ির পেন্ডুলামটা চমকে চমকে উঠছে। যেন একটা বিরাট বিকৃত মুখ একঘেয়ে টক্ টক্ শব্দে ঘোষণা করে চলেছে মুহূর্ত। ফোমা দেখল প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে লিউবভ বার বার তাকাচ্ছে ওর দিকে। অনুভব করল ওর উপস্থিতি অবাঞ্ছনীয়।

লিউবা চায় ফোমা চলে যাক।

রাতটা এখানেই থাকছি।—মৃদু হেসে বলল ফোমা। ধর্মবাবার সঙ্গে কিছু আলোচনা করবার আছে। তাছাড়া বাড়িতে বড়ো ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

তবে মারফুসাকে বলে দাও, পাশের ঘরে বিছানা করে দিক।—তাড়াতাড়ি বলে উঠল লিউবা।

যাচ্ছি।—ফোমা উঠে দাঁড়াল। তারপর খাবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু পরক্ষণেই শুনতে পেল তারাস ফিস্ ফিস্ করে কী যেন বলছে বোনের কাছে। আমরা কথাই বলছে—ভাবল ফোমা।—শোনাই যাক না কী বলছে বিজ্ঞ লোকটা। নীরবে একটু হাসল ফোমা। ওর মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল। পা টিপে টিপে পাশের ঘরে চলে গেল। ঘরে আলো নেই। নিঃশব্দে একটু বিষের হাসি হেসে দোরের কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

একটা বিশ্রী অপদার্থ লোক।—বলল তারাস। পরক্ষণেই জেগে উঠল লিউবার কণ্ঠ। দুত মদু ঃ সব সময়েই মদ খায়। সাংঘাতিক জীবনযাপন করছে। এসব শুরু হয়েছে হঠাৎ। প্রথমে সহকারী প্রদেশপালের জামাইকে ধরে ঠেঙাল ক্লাবে। সেটা চাপা দিতে খুবই বেগ পেতে হয়েছে বাবাকে। অবশ্য জামাইয়ের বদনামও ছিল কিনা খুব! এক নম্বরের জোচ্চোর লোকটা—রহস্যজনক চরিত্রের মানুষ। তবুও দুহাজার টাকা খসাতে হয়েছে বাবাকে। বাবা যখন ওটা চাপা দিতে ব্যস্ত তখন একটা গোটাদল মানুষকে আর একটু হলে ডুবিয়ে দিয়েছিল আর কি ভলগার জলে!

হা হা হা! কী সাংঘাতিক! সেই মানুষই কিনা আবার জীবনের সন্ধান খুঁজে ফিরছে!

আর একবার ওরই মতো একদল লোক নিয়ে পানোৎসব করছিল স্টিমারে। হঠাৎ ফোমা বলে উঠল ঃ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে নাও, তোমাদের সবকটাকে আমি জলে ফেলে দেবো। ওর গায়ে ভীষণ জোর। তারা তো চিৎকার করতে শুরু করল। তাতে ও কী বললে জানো? বললে, আমি দেশের সেবা করতে চাই। তোমাদের মতো নোংরা জীবের ভার থেকে মুক্ত করতে চাই পৃথিবীকে।

সত্যি ভারি ধূর্ত!

সাংঘাতিক লোক। এই ক'বছরে এমন কত যে বন্য খেয়াল চেপেছে ওর মাথায় তার সীমাসংখ্যা নেই। কত টাকা যে উড়িয়েছে!

বলো তো, কি শর্তে বাবা ওর বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা করেন? জানো?

না, তা আমি জানি না। তবে পুরোপুরি আমমোক্তারনামা রয়েছে বাবার নামে। একথা কেন জিগ্‌গেস করছ?

এমনি। ব্যবসাটা খুব চমৎকার, জোরালো ব্যবসা। যদিও চালানো হচ্ছে খাঁটি রুশ ধরনে। কিন্তু তবুও খুবই ভালো ব্যবসা। ঠিকভাবে চালালে ওটা একটা লাভের সোনার খনি।

কিছুই করে না ফোমা। সবই বাবার হাতে।

বটে? তবে তো চমৎকার!

জানো, সময় সময় আমার মনে হয়, ওর ঐ ভাবুক মন, ঐ কথাবার্তা খুবই আন্তরিক। খুবই ভালো হয়ে উঠতে পারে ও। কিন্তু কিছুতেই আমি ওর ঐ নোংরা জীবনের ধারা বরদাস্ত করতে পারি না। না, কোনো মতেই না।

যাক গে, ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। ছোকরা কুঁড়ের বাদশা। কুঁড়েমির

সমর্থন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

না, সময়ে সময়ে শিশুর মতো সরল হয়ে ওঠে। আগেও তেমনি ছিল।

তার মানে, একটু আগে যা বললাম। নেহাত ছেলেমানুষ। ছোকরা একটু বর্বর, আহাম্মক। আর থাকতেও চায় আহাম্মক হয়েই। সেটা লুকোবারও চেষ্টা করে না। লাভ কি তার সম্পর্কে আলোচনা করে? ওর যুক্তি হচ্ছে সেই গল্পের ভল্লুকের বল্লম বাঁকানোর মতো।

তুমি বড্ডো দুর্মুখ।

হাঁ, আমি একটু দুর্মুখই বটে। ওটা দরকার মানুষেরই জন্যে। আমরা রুশেরা দারুণ উচ্ছৃঙ্খল। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, জীবন এমনই যে আমাদের ইচ্ছে থাকুক আর না-ই থাকুক, আমরা শক্ত হয়ে উঠি। স্বপ্ন দেখা অল্পবয়সী ছেলেমেয়ের ব্যাপার। কিন্তু কাজের মানুষের জন্যে রয়েছে কাজ।

মাঝে মাঝে ভারি দুঃখ হয় ফোমার জন্যে। কী হবে ওর ভবিষ্যত?

যাই হোক না কেন আমাদের কী? কিছুই যায় আসে না। আমার মনে হয় তেমন বিশেষ কিছুই হবে না। ভালোও না, মন্দও না। আহাম্মকটা সব টাকা-কড়ি উড়িয়ে দেবে। গোল্লায় যাবে। কী হবে আর তাছাড়া? জাহান্নামে যাক। এরকমের মানুষ দুনিয়ায় আজকাল খুব কমই আছে। ব্যবসায়ীরা ক্রমে শিক্ষার কদর বুঝতে শিখেছে—জানতে পেরেছে তার শক্তি। কিন্তু তোমার ধর্মভাইটি—দেখে নিও একদিন সব খুইয়ে পথে দাঁড়াবে।

কথাটা ঠিকই বলেছেন মশাই!—হঠাৎ দরজা খুলে দোরের পথে এসে দাঁড়াল ফোমা। মুখখানা পাংশু। ঠোঁটদুটো কাঁপছে থর থর করে। ভ্রু কুঁচকে উঠেছে। সোজা তারাসের দিকে তাকিয়ে নিরস কণ্ঠে বলে উঠল : ঠিক। আমি নিঃস্ব হয়ে যাবো, ধ্বংস হয়ে যাবো! আমেন! আর সেটা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল।

নিদারুণ ভয়ে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লিউবা। তারপর দ্রুত তারাসের কাছে এগিয়ে গেল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারাস। হাতদুটো পকেটে ঢোকানো।

ফোমা! ওঃ! কী লজ্জার কথা! ধিক্ তোমাকে। তুমি আড়ি পেতে শুনছিলে? উঃ! ফোমা!—বিব্রত মুখে বলল লিউবা।

চুপ্ ভেড়ী!

হাঁ আড়ি পেতে শোনাটা অন্যায়।—ফোমার মুখের উপর থেকে ঘৃণাভরা দৃষ্টি না সরিয়েই বলে উঠল তারাস।

হোক অন্যায়। সত্যি কথা জানা যায় শুধু আড়ি পেতে। এটা কি আমার দোষ?

চলে যাও তুমি এখান থেকে ফোমা! চলে যাও!—ভাইয়ের কাছে আরো একটু সরে এসে বলল লিউবা।

বোধহয় আমাকে কিছু বলবে?—স্থির শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করল তারাস।

আমি? কি আর বলব? কিছুই বলবার নেই আমার।

তাহলে কিছুই আলোচনা করবার নেই আমার সঙ্গে?—আবার জিগ্গেস করল তারাস।

না।

খুশি হলাম।—ফোমার দিক থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল লিউবাকে,—কি মনে হয়, বাবা কি আসবেন খুব শিগ্গির?

ফোমা ওর দিকে তাকাল। লোকটার প্রতি কেমন যেন একটা শ্রদ্ধার মতো ভাব

জেগে উঠল ওর মনে। পরক্ষণেই এ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। ওর সেই বিরাট শূন্য বাড়ি, যেখানে প্রতিটি পদধ্বনি কেবলমাত্র জাগিয়ে তুলবে প্রতিধ্বনি—সেখানে ফিরে যেতে এতটুকুও ইচ্ছে নেই ফোমার। শরত শেষের ধূসরবিষণ্ণ সন্ধ্যের ঘিরে আসা পথ বেয়ে হাঁটতে লাগল ফোমা। মনে মনে ভাবতে লাগল তারাস মায়াকিনের কথা : —কী ভীষণ লোকটা! ঠিক বাপের মতো। প্রভেদের মধ্যে এই, এ তার মতো অস্থির নয়। কিন্তু তেমনি ধূর্ত, তেমনি পাজী। লিউবভকা ভাবত একে দেবতা। মেয়েটা বোকা। কী ধর্মকথাটাই না ঝাড়ত আমার কাছে! বিচারক! কিন্তু তবুও সে—সে আমাকে...আমার প্রতি তার ব্যবহার ছিল প্রীতিভরা।

কিন্তু এসব চিন্তা ওর ভিতরে জাগিয়ে তুলল না কোনো অনুভূতি। না তারাসের প্রতি ঘৃণা, না লিউবার প্রতি সহানুভূতি। শুধু বুকটা কেমন যেন এক দুর্বোধ্য, অজ্ঞাত বেদনায় ভারি হয়ে উঠেছে। ক্রমেই বেড়ে চলেছে তার তীব্রতা। মনে হচ্ছে যেন অন্তর ফোঁড়ার মতো ফুলে উঠেছে। টন্ টন করে উঠছে বিষাক্ত বেদনায়। সেই অসহনীয় বেদনা প্রতি মুহূর্তেই তীব্রতর হয়ে উঠছে। কিন্তু জানে না কী করে করবে প্রশমিত। তাই শেষ ফলাফলের অপেক্ষায় চুপ করে রইল।

এতক্ষণে ওর ধর্মবাবা চলে গেলেন ওর পাশ দিয়ে। ফোমা দেখল গাড়ির ভিতরে মায়াকিনের ছোট্ট শীর্ণ দেহ। কিন্তু ওর অন্তরে জেগে উঠল না কোনো ভাব। একটা বাতিওয়ালা পাশ কেটে চলে গেল। তারপর মইটা ল্যাম্প-পোস্টের গায়ে লাগিয়ে উঠে গেল উপরে। হঠাৎ মইটা পিছলে গেল ওর ভারে। দু হাতে পোস্টটা জড়িয়ে ধরে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গাল পেড়ে উঠল লোকটা। একটি মেয়ে হাতের মোড়ক দিয়ে ওর গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলে উঠল : মাপ করুন! মেয়েটির দিকে তাকাল ফোমা। কিন্তু বলল না কিছুই।

গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ধুলোর সঙ্গে অদৃশ্যপ্রায় জলকণা দোকানের জানালার সার্সি ও আলোর কাচের উপরে পড়ে ঢেকে ফেলেছে। ধুলোর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ফোমার।

ইয়ঝভের ওখানে রাতটা কাটিয়ে আসব? ওর সঙ্গে বসে মদও খাওয়া যাবে খন।—ভাবল ফোমা। তারপর চলে গেল তার ঘরে।

ইয়ঝভের ঘরে গিয়ে দেখল একটি লোক। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। বসে রয়েছে সোফার উপরে। মুখটা কালো। ধোঁয়াচ্ছন্ন। চোখদুটো বড়ো, স্থির। দৃষ্টি উগ্র। উপরের ঠোঁটে সৈনিকসুলভ গোঁফ। পরনে ধূসর রঙের ট্রাউজার আর ব্লাউজ। হাঁটুর উপরে মুখ রেখে বসে রয়েছে লোকটা। এক পাশে চেয়ারের হাতলের উপরে পা ঝুলিয়ে বসে ইয়ঝভ। টেবিলে বই আর খবরের কাগজের সঙ্গে রয়েছে এক বোতল ভদ্‌কা। ঘরময় কেমন যেন একটা নোনা গন্ধ।

ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?—প্রশ্ন করল ইয়ঝভ। তারপর বসা লোকটির উদ্দেশ্যে বলল : গর্দিয়েফ্।

লোকটি ফোমার দিকে তাকিয়ে শিরশিরে কর্কশ কণ্ঠে বলল : ক্রাসনোশ্চকভ।

সোফার এক কোণে এসে বসল ফোমা। তারপর ইয়ঝভকে লক্ষ্য করে বলল : রাতটা এখানেই কাটাব।

অ্যাঁ! আচ্ছা। বেশ বলে যাও ভাসিলি।

লোকটি প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে ফোমার দিকে তাকাল, তারপর খন্‌খনে গলায় বলতে আরম্ভ করল : আমার মতে, অযথা তুমি মূর্খ লোকগুলোকে আক্রমণ করছ। মাসানিয়েলো একটা নেহাত মূর্খ। কিন্তু তার সম্পর্কে যা করবার ছিল খুব ভালো

করেই তা করা হয়েছে। আর ঐ ভিস্কেলারিভ লোকটাও একটা আহাম্মক। এদের মতো আরো অনেক বেকুব লোক কি নেই? কিন্তু তবুও তারা বীর। আর চালাক চতুর লোকগুলো হল কাপুরুষ। বাধার বিরুদ্ধে যেখানে সবটুকু শক্তি দিয়ে আঘাত হানতে হবে, সেখানে ওরা ভাবতে বসে ঃ "কী ফল হবে? হয়তো বৃথাই ধ্বংস হয়ে যাবো।" তারা থামের মতো অনড় হয়ে থাকে যত দিনে না মরে যায়। কিন্তু মূর্খেরাই সাহসী। তারা ঘাড় গুঁজে দেয়ালের উপরে আছড়ে পড়ে। যদি মাথার খুলি ভেঙে যায়, যাক না। কী এসে যায় তাতে? বাছুরের মাথা তেমন কিছু আর মহার্ঘ বস্তু নয়! আর যদি ওরা দেয়ালে ফাটল ধরাতে পারে তখন ঐ বুদ্ধিমানেরা দরজা তৈরি করে বেরিয়ে আসে। তারপর নিজেরা সম্মানটুকু আত্মসাৎ করে। না হে, নিকোলাই মাত্‌ভিয়েইচ! সাহসিকতা ভালো জিনিস—যদি তার ভিতরে যুক্তি না-ও থাকে।

দেখো, ভাসিলি, বাজে কথা বলছ তুমি।—ওর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল ইয়ঝভ।

তা তো বটেই! কিন্তু তবুও আমি অন্ধ নই। দেখতে পাই। অনেক বুদ্ধিমান আছে, ভালো কিছু করতে পারে না তারা। চালাক লোকেরা যতক্ষণ বসে ভাবে, চিন্তা করে,—কেমন করে সবচাইতে বুদ্ধিমানের মতো কাজটা হাসিল করা যায়—বোকারা ততক্ষণে লেগে যায় কাজে। ব্যস!

আর একটু অপেক্ষা করো।—বলল ইয়ঝভ।

পারছি না। ডিউটি আছে। এমনিই দেরি হয়ে গেছে। কাল বরং আসব।

এসো। এর জবাব কাল দেবো। দেখিয়ে দেবো একহাত।

তোমার কাজই তো হল তাই।

ধীরে জামা কাপড় ঠিক করে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ভাসিলি। তারপর ইয়ঝভের হলদে শীর্ণ হাতটা হাতের ভিতরে নিয়ে একটু চাপ দিল।—আসি তবে।—তারপর ফোমার দিকে তাকিয়ে একটা নমস্কার করে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

দেখলে,—ফোমাকে প্রশ্ন করল ইয়ঝভ। দোরের ওপাশে তখনো শোনা যাচ্ছে ওর ভারি পায়ের শব্দ।

কী করে লোকটা?

সহকারী মেকানিস্ট। ভাস্‌কা ক্রাস্‌নোশ্‌চকভ। ওকেই দেখো না; পনেরো বছর বয়সে পড়তে আরম্ভ করে। একুশ বছর বয়সের মধ্যে কত যে পড়েছে তার সীমা নেই। দু' দুটো ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে। এখন চলেছে বিদেশে।

কিসের জন্যে?—প্রশ্ন করল ফোমা।

পড়তে। আর দেখতে সেখানকার লোকেরা কেমন করে জীবনযাপন করে। আর তুমি কি না ভ্যারেণ্ডা ভাজছ এখানে বসে! কিসের জন্যে?

বেশ যুক্তিপূর্ণ কথাই বলেছে বোকা লোকদের সম্পর্কে। —একটু ভেবে বলল ফোমা। জানি না। কারণ আমি নিজে বোকা নই।

বেশ বলেছে। বোকা লোকেরা সঙ্গে সঙ্গেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছুটে যায়। তারপর উল্‌টে পড়ে।

এইরে ভাঙল বুঝি আগল!—বলল ইয়ঝভ,—তার চাইতে বলো দেখি কথাটা কি সত্যি যে মায়াকিনের ছেলে ফিরে এসেছে?

হাঁ।

বটে? বটে?

কেন সেকথা জিগ্‌গেস করছ?

কিছু না। এমনি।

উঁহু! তোমার মুখ দেখে বলতে পারি। কী যেন একটা আছে।

ওর ছেলের সম্পর্কে সব কিছুই জানি আমরা। সব কিছুই শুনেছি।

কিন্তু আমি তাকে দেখেছি।

বাপের মতোই নাকি?

তার চাইতে মোটা। গোলগাল চেহারা। ও আরো গম্ভীর, ঠাণ্ডা।

তার মানে, ইয়াশকার চাইতেও খারাপ লোক হবে। ভালো কথা, এবার একটু হুশিয়ার থেকো বন্ধু! নইলে তোমাকে চুষে শেষ করে ফেলবে।

করুক গে!

সর্বস্ব লুটে-পুটে নেবে। পথের ভিখিরি করে ছাড়বে। ঐ তারাস দারুণ চালাকি করে তার শ্বশুরকে সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছে।

করুক না আমাকেও সর্বস্বান্ত, ওদের যদি ইচ্ছে হয়। একটি কথাও বলব না। বরং বলব,—ধন্যবাদ!

সেই পুরানো গানই গাইছ এখনো?

হাঁ।

মুক্তি চাও?

হাঁ।

ওসব খেয়াল ছেড়ে দাও। কিসের জন্যে চাও মুক্তি? কী করবে মুক্তি দিয়ে? নিজে বোঝো না যে, দুনিয়ায় কোনো কাজেরই যোগ্যতা নেই তোমার! তুমি অশিক্ষিত—একটা কাঠ চেরার যোগ্যতাও তোমার নেই নিশ্চয়ই? ধরো, আমি যদি মদ আর রুটির প্রয়োজনীয়তা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারতাম!—হঠাৎ ইয়ঝভ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে নিচে নেমে দাঁড়াল। তারপর ফোমার সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করল যেন সে বক্তৃতা দিচ্ছে।

আমার ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের বাকি শক্তিটুকু এক করে তাতে বুকের রক্ত মিশিয়ে থুথু ছিটিয়ে দেবো বুদ্ধিজীবী সমাজের মুখে। জাহান্নামে যাক ঐ শয়তানের দল! ওদের বলব : ওরে কীটাধম! তোদের অস্তিত্ব রুশবাসীর বহুপুরুষের বুকের রক্ত আর চোখের জলের দামে কেনা। দেশকে কী ভীষণ মূল্যই না দিতে হয়েছে তোদের জন্যে? কিন্তু তার বদলে কী করেছিস তোরা দেশের জন্যে? পেরেছিস তোরা অতীতের সেই চোখের জলকে মুক্তোয় পরিণত করতে? কী অবদান তোদের জীবনে? কী করেছিস? পরাজিত হতে দিয়েছিস নিজেদের। নিজেদের উপহাসের পাত্র করে তুলেছিস।—রাগে পা আছড়াতে আছড়াতে দাঁত কিড়িমিড় করে ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মতো জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে তাকাল ফোমার দিকে।

ওদের বলব,—তোরা অনেক যুক্তি দেখাস কিন্তু আদৌ বুদ্ধিমান নোস। এতটুকু ক্ষমতা নেই তোদের, ভীরুর দল তোরা! নৈতিকতা আর মহৎ ইচ্ছেয় তোদের অন্তর পরিপূর্ণ। কিন্তু তা পালকের বিছানার মতোই নরম—পালকের বিছানার মতোই গরম। সেখানে সৃজন-শক্তি রয়েছে অঘোর ঘুমে অচেতন। কিন্তু তোদের হৃদয় স্পন্দিত হয় না—কেবলমাত্র শিশুর দোলনার মতো দোলে ধীরে ধীরে। আমার হৃদয়রক্তে আঙুল ডুবিয়ে তোদের কপালে এ'কে দেবো তীব্র ভর্ৎসনা। আর ওরা—অন্তরের দিক থেকে নিঃস্ব, রিক্ত, আত্মসন্তুষ্ট—ওরা মরবে জ্বলেপুড়ে। কী ভীষণ দুর্ভোগ-ই না ভুগবে। আমার চাবুক ধারালো আর হাত শক্তিশালী। তাছাড়া আমি গভীরভাবে ভালোবাসি অনুকম্পা প্রকাশ করতে। জ্বলেপুড়ে মরবে ওরা।

কিন্তু এখন ওরা কষ্ট অনুভব করছে না। কারণ নিজেদের দুঃখ-কষ্টের কথা ঘোষণা করছে তারস্বরে। মিথ্যা কথা বলছে। সত্যিকারের দুঃখ বোবা—ভাষা-হীন। আর প্রকৃত 'প্যাশান' বাধাবন্ধনহীন। প্যাশান! প্যাশান!—কবে মানুষের অন্তরে জেগে উঠবে সেই দুর্বার কামনা? আমরা অভাগা—কারণ, আমাদের অন্তর অসাড়, চেতনাহীন।

বলতে বলতে দম ফুরিয়ে গিয়ে প্রবল কাশির ধমকে ভেঙে পড়ল ইয়ঝভ। বহুক্ষণ ধরে কাশল। পাগলের মতো লাফালাফি করল এদিক-ওদিক। হাত ছুঁড়ল। অবশেষে রক্তাক্ত চোখ আর শীর্ণ পাণ্ডুর মুখে ফোমার সামনে এসে দাঁড়াল। দ্রুত বইছে নিঃশ্বাস, ঠোঁটদুটো কাঁপছে। খুদে খুদে দাঁতগুলো পড়েছে বেরিয়ে: অবিন্যস্ত এলোমেলো চেহারা, ছোট ছোট করে কাটা চুল। দেখাচ্ছে যেন ডাঙায় তুলে আনা মাছ। এই প্রথম নয়, বহুবার এমনিভাবে দেখেছে ওকে ফোমা। দেখেছে এমনি উত্তেজিত হয়ে উঠতে। অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার এতটুকুও চেষ্টা না করে নীরবে শুনল ফোমা ঐ খুদে লোকটির অগ্নিগর্ভ কথা। এতটুকুও ইচ্ছে নেই ওর যে জানতে চায় কার বিরুদ্ধে তার এই বিষোদ্গার। ফুটন্ত জলের মতো টগবগ করছে ওর কথা। আর অন্তর উত্তপ্ত করে তুলেছে।

বলব আমি ওদের—ঐ হতভাগ্য কুঁড়ের বাদশাদের,—'চেয়ে দেখ জীবনপ্রবাহ এগিয়ে চলেছে তোদের পিছনে ফেলে।

বাঃ! চমৎকার!—উল্লসিত হয়ে বলে উঠল ফোমা। তারপর সোফার ভিতরে একটু নড়েচড়ে বসল।

সত্যি তুমি একটা বীরপুরুষ নিকোলাই। আঃ এগিয়ে যাও! ছুঁড়ে দাও ওদের মুখের উপরে! ছুঁড়ে দাও!

কিন্তু প্রয়োজন নেই ইয়ঝভের ওর কাছ থেকে উৎসাহিত হবার। নিজের মনেই বলে চলল: আমি জানি আমার সামর্থ্য কতটুকু। চুপ করে থাকো!—বলবে ওরা আমাকে—চুপ করে থাকো। বলবে বিজ্ঞের মতো, শান্ত কণ্ঠে আমাকে উপহাস করে। বলবে তাদের উচ্চ আসনে সমাসীন থেকে। জানি আমি নেহাত একটা ক্ষুদ্র পাখি—নাইটিঙ্গেল নই। নেহাতই অজ্ঞ আমি ওদের তুলনায়। একটা প্রবন্ধ লেখক মাত্র। যাদের পেশা জনসাধারণকে খুশি করা। না হয় আমার মুখের উপরে পড়বে একটা ঘুসি। কিন্তু তবুও আমার হৃদয় স্পন্দিত হতে থাকবে। আরো বলব: হ্যাঁ, আমি অজ্ঞ বটে, কিন্তু কোনো কেতাবী সত্যই মানুষের চাইতে বেশি প্রিয় নয় আমার কাছে। মানুষই হচ্ছে বিশ্বজগত। চিরজীবী হোক মানুষ, যাদের ভিতরে রয়েছে এই বিশ্বজগত।

আর তোরা—একটা কথার জন্যে, যে-কথা নাকি সব সময়ে এমন কোনো অর্থ প্রকাশ করে না যা তোদের বোধগম্য—সেই একটি কথার জন্যে তোরা পরস্পর করিস মারামারি। আঘাত করিস, ক্ষতবিক্ষত করে তুলিস। একটা কথার জন্যে পরস্পর পরস্পরের পিত্তি নিঙড়ে বের করিস। আত্মাকে করিস অপমান। এরই জন্যে—বিশ্বাস করো আমার কথা—জীবন একদিন তীব্রভাবে হিসেব-নিকেশ করবে। জেগে উঠবে প্রবল ঝঞ্ঝা। আর দুনিয়ার বুক থেকে তোদের ধুয়ে-মুছে নিঃশেষ করে দেবে, যেমন করে ঝড়বৃষ্টি গাছের পাতার উপরের ধূলিকণা ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে দেয়। মানুষের ভাষায় মাত্র একটি কথাই আছে—যার অর্থ সবার কাছে পরিষ্কার। যেকথাটি সবার কাছে প্রিয়। আর যখন সেকথাটি উচ্চারিত হয় সেটা শোনায়—মুক্তি।

ভাঙো! চূর্ণ করে দাও!—সোফার উপর থেকে লাফিয়ে নেমে এসে চিৎকার করে বলে উঠল ফোমা ইয়ঝভের কাঁধটা দুহাতে চেপে ধরে। তারপর ঝুঁকে জ্বলন্ত চোখদুটো ইয়ঝভের চোখের উপরে রেখে যেন নিদারুণ বেদনায় আর্তনাদ করে উঠল ঃ ওঃ! নিকোলাই! প্রিয় বন্ধু আমার! দারুণ দুঃখ হচ্ছে আমার তোমার জন্যে। এত দুঃখ হচ্ছে যে ভাবায় তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

কী ব্যাপার? কী হল তোমার?—ওর ঐ অদ্ভুত আচরণে বিস্মিত ইয়ঝভ ওকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে নিজেও সরে দাঁড়াল।

ভাই!—নিচু কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করল ফোমা। ওর কণ্ঠ আরো গম্ভীর আরো ভাবালু হয়ে উঠেছে,—জীবন্ত আত্মা! কেন তুমি নিজেকে ধ্বংসের ভিতরে ডুবিয়ে দিচ্ছ?

কে? আমি? আমি ডুবে যাচ্ছি? মিথ্যাকথা!

বন্ধু! কারুর কাছে কিছু বলো না। কেউ নেই, যার সঙ্গে কথা বলতে পারো। কে শুনবে তোমার কথা? শুধু আমি আছি।

জাহান্নামে যাও!—ক্রুদ্ধকণ্ঠে চিৎকার করে উঠে লাফিয়ে সরে গেল ইয়ঝভ যেন ওর গায়ে আগুনের ছ্যাঁকা লেগেছে। কিন্তু ফোমা ওর কাছে এগিয়ে এসে তীব্র বেদনা-ঝরা কণ্ঠে বলতে লাগল ঃ বলো, আমার কাছে বলো। তোমার কথা আমি ঠিক জায়গায় নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেবো। আঃ! কেমন করে আমি ওদের পুড়িয়ে মারব! দাঁড়াও সবুর করো! আসুক আমার সুযোগ।

দূর হও!—ফোমার হাতের চাপে দেয়ালের গায়ে লেপ্টে গিয়ে পাগলের মতো চিৎকার করে বলে উঠল ইয়ঝভ। ক্রুদ্ধ বিব্রত ইয়ঝভ দুহাতে ফোমার হাতটাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করতে লাগল। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খুলে গেল। দোরের পথে কালো পোশাকপরা একটি মহিলা এসে দাঁড়ালেন। রাগে, উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে মুখ। গালদুটো রুমালে ঢাকা। মাথাটা পিছনের দিকে হেলিয়ে ইয়ঝভের দিকে হাত বাড়িয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলেন ঃ মাত্‌ভিয়েইচ! মাপ করুন! কিন্তু না, এ অসম্ভব! জানোয়ারের মতো এমন চিৎকার, হৈহল্লা। রোজই অতিথি। না এ আমি আর সহ্য করতে পারব না। পুলিস আসছে। আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে। ভুগছি স্নায়ুর দুর্বলতায়। কালই আপনি ঘর খালি করে দেবেন। মরুভূমিতে বাস করছেন না—আশপাশে আরো লোকজন আছে। উনি নাকি আবার শিক্ষিত! একজন সাহিত্যিক! সমস্ত মানুষেরই একটু বিশ্রাম করার দরকার। আমার দাঁতের ব্যথা। অনুরোধ করছি কাল আপনি অন্য কোথাও উঠে যান। নোটিশ ঝুলিয়ে দিচ্ছি। খবর দিচ্ছি পুলিসে।

খুব তাড়াতাড়ি বলতে গিয়ে বেশির ভাগ কথাই ফিস্ ফিসে বাঁশির মতো কণ্ঠ-স্বরের তলায় চাপা পড়ে গেল। শুধু যেগুলো ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলছিল চিৎকার করে, তাই স্পষ্ট শোনা গেল। রুমালের কোণদুটো শিং-এর মতো যেন মাথা ফুঁড়ে বেরিয়ে রয়েছে। চোয়ালের সঙ্গে সঙ্গে সেদুটো নড়ছে। তার ঐ ক্রুদ্ধ হাস্যোদ্দীপক মূর্তির দিকে তাকিয়ে সোফার কাছে সরে এল ফোমা। কিন্তু কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ইয়ঝভ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে আর শুনছে কথা।

মনে থাকে যেন একথা!—তারপর দরজার ওপাশ থেকে আর একবার বলল,—কাল-ই।

শয়তানি!—দোরের দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বলে উঠল ইয়ঝভ।

ঠিক কথা। কী মেয়েমানুষ রে বাবা! ভীষণ কড়া!—বিস্মিত ইয়ঋভের দিকে তাকিয়ে বলল ফোমা।

মাথা তুলে ইয়ঋভ টেবিলের কাছে এগিয়ে এল। তারপর বোতল থেকে আধ গেলাস ভদ্‌কা ঢেলে এক চুমুকে নিঃশেষ করে মাথা নিচু করে আবার টেবিলের সামনে বসে পড়ল। খানিকক্ষণ কারুর মুখে কথা নেই। তারপর ফোমা ভয়ে ভয়ে নিচু কণ্ঠে বলল ঃ কেমন করে ঘটে গেল! চোখের পলক ফেলারও সময় পেলাম না আমরা। হঠাৎ কিনা এমন একটা ব্যাপার। আঃ!

তুমি—তেমনি নিচু গলায় মাথা নাড়তে নাড়তে ক্রুদ্ধ হিংস্র দৃষ্টিতে ফোমার দিকে তাকিয়ে বলল ইয়ঋভ ঃ

চুপ! জাহান্নামে যাও তুমি! শুয়ে পড়ে ঘুমোও দানব! উঃ!—হাত মুঠো করে শাসাল ইয়ঋভ ফোমাকে। তারপর আবার মদ ঢেলে খেয়ে ফেলল।

কিছুক্ষণ পরে, জামাকাপড় ছেড়ে আধশোয়া অবস্থায় সোফার উপরে শুয়ে ফোমা আধবোজা চোখে তাকিয়ে রয়েছে ইয়ঋভের দিকে। বিশ্রী বিদঘুটে ভঙ্গিতে ইয়ঋভ মাটির দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে চেয়ারে। অবাক হয়ে গেল ফোমা কেন সে অমন করে চটে উঠল ওর উপরে। কিছুতেই কোনো হদিশ খুঁজে পেল না। ওকে ঘর ছেড়ে দিতে বলেছে বলে নয়। কারণ চেঁচাচ্ছিল ও নিজেই।

শয়তান!—দাঁতে দাঁত চেপে ফিস্ ফিস্ করে উঠল ইয়ঋভ। নীরবে ফোমা বালিশের উপর থেকে মুখ তুলল। ইয়ঋভ একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। তারপর আবার মদের বোতলটার দিকে হাত বাড়াল। এতক্ষণে কোমল কণ্ঠে বলে উঠল ফোমা ঃ

চলো, হোটেলে যাই। এখনো তেমন রাত হয়নি।

ইয়ঋভ ওর দিকে তাকাল। তারপর মাথা চুলকোতে চুলকোতে অদ্ভুতভাবে হাসতে লাগল।

ওর দিকে তাকিয়ে ইয়ঋভ থুথু ফেলল, তারপর খনখনে গলায় হেসে উঠল।

ধীরেসুস্থে ফোমাকে সোফার ভিতরে নড়াচড়া করতে দেখে ধৈর্যহীন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল ঃ জলদী করো! মুর্খের ঢেঁকি!

গাল দিও না!—মৃদু হেসে বলল ফোমা,—মেয়েমানুষ গাল দিয়েছে বলে অতটা চটতে নেই।

ওর দিকে তাকিয়ে ইয়ঋভ থুথু ফেলল, তারপর রুক্ষ গলায় হেসে উঠল।

১৩

এসে গেছে সবাই?—নতুন স্টিমারের গলুইয়ের উপরে দাঁড়িয়ে সমবেত অতিথিদের দিকে খুশিভরা উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে বলল ইলিয়া ইয়েফিমভিচ কনোনভ।

মনে হয় এসে গেছে সবাই।

তবে চালাও পেত্রুখা!—আনন্দোজ্জ্বল রক্তিম ভারি মুখখানা উপরের দিকে তুলে ক্যাপটেনের উদ্দেশে চিৎকার করে বলে উঠল কনোনভ। ইতিমধ্যেই ক্যাপটেন এসে দাঁড়িয়ে ছিল তার নির্দিষ্ট স্থানে।

বহুত্ আচ্ছা হুজুর!

টাকভরা বিরাট মাথা থেকে টুপি খুলে ক্যাপটেন প্রথমে আকাশের দিকে তাকিয়ে ক্রুশ করল। কালো চাপদাড়িতে একবার হাত বুলাল। একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল। তারপর হুকুম দিল: পিছনে চল!

একান্ত মনোযোগের সঙ্গে অতিথিরা নীরবে দেখছিল ক্যাপটেনের কাজ। ওর দৃষ্টান্ত অনুসারে তাঁরাও ক্রুশ করলেন। একঝাঁক পাখির মতো তাঁদের মাথার টুপিও আন্দোলিত হল বাতাসে।

হে প্রভু! আশীর্বাদ করো আমাদের!—আবেগভরে বলে উঠল কনোনভ।

পিছন খুলে দাও! সামনে চলো!—ক্যাপটেন হুকুম দিল।

অতিকায় "ইলিয়া মুরোমেৎস্" একটা বিরাট দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে, ঘন শাদা বাষ্প উদ্গীরণ করে রাজ-হাঁসের মতো সাবলীল গতিতে জোয়ার ঠেলে এগিয়ে চলল।

কী চমৎকার চলল,—উৎসাহভরা কণ্ঠে বলে উঠল কমার্শিয়াল কাউন্সিলর লুপ গ্রিগরিয়েভ রেজনিকভ—দীর্ঘ ঋজু দেহ, সুপুরুষ।—একটুও ঝাঁকুনি দিল না! যেন নাচের আসরের মহিলা!

গতি অর্ধেক!

জাহাজ তো নয় যেন একটা অতিকায় সামুদ্রিক দৈত্য বিশেষ!—ভক্তসুলভ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বল্ল ত্রফিম জুবভ—গির্জার তত্ত্বাবধায়ক। ওর মুখময় বসন্তের দাগ, কুঁজো দেহ; শহরের ভিতরে প্রধান সুদের কারবারী।

মেঘলা দিন। শরতের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ছায়া পড়েছে নদীর বুকে। প্রতি-ফলিত হয়েছে কেমন যেন একটা সীসের মতো রঙ। টাটকা রঙের জলুস ছড়িয়ে বড়ো একটা উজ্জ্বল দাগের মতো ভেসে চলেছে স্টিমার নদীর বুকের বৈচিত্র্যহীন পটভূমিকায়। সজল মেঘের মতো কালো ধোঁয়ার নিঃশ্বাস ঝুলে রয়েছে আকাশের গায়ে। স্টিমারটার সর্বাঙ্গ শাদা। কেবল চাকার আবরণী আর হালের রঙ উজ্জ্বল লাল। সাবলীল গতিতে হাল দিয়ে ঠাণ্ডা জল কেটে কেটে চলেছে এগিয়ে। আর বিভক্ত জলরাশিকে ঠেলে দিচ্ছে তীরের দিকে। পাশের গোলাকার জানলার

শার্সি আর কেবিন চমৎকারভাবে চকচক করছে। যেন আত্ম সন্তুষ্টিভরা জয়ের হাসিতে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে মুখ।

সম্মানিত ভদ্রমহোদয়গণ।—মাথার টুপি খুলে, অতিথিদের উদ্দেশ্যে একটা ছোট্ট নমস্কার করে বলে উঠল কনোনভ, এইমাত্র আমরা ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করলাম, এখন দয়া করে বাদকদের অনুমতি দেবেন কি, সম্রাটের যা প্রাপ্য তা চুকিয়ে দিক?—বলেই অতিথিদের কাছ থেকে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করে, মুখের উপরে হাত তুলে চিৎকার করে বলে উঠল : বাদকদল! বাজাও, মহিমামণ্ডিত হোন!

ইঞ্জিনের পিছন থেকে সামরিক আর্কেস্ট্রা মেঘগর্জনে শুরু করল মার্চের বাজনা। আর সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টর মাকর বব্‌রভ তার বিরাট হাতের আঙুলের টোকায় তাল দিতে দিতে খুশিভরা সুন্দরকণ্ঠে গুনগুন করে সুর ভাঁজতে আরম্ভ করল :

' মহিমামণ্ডিত হোন আমাদের রাশিয়ার জার!

খাবার টেবিলে এসে বসতে আমি আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ভদ্রমহোদয়গণ। অনুগ্রহ করুন! এসে শাকান্ন গ্রহণ করুন আপনারা, হিঃ হিঃ! সানুনয় আহ্বান জানাচ্ছি!—অতিথিদের ভিড়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে বলল কনোনভ।

প্রায় ত্রিশজন ধীর, স্থির, গম্ভীর প্রকৃতির লোক—স্থানীয় বণিকদলের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা উপস্থিত। যারা বয়স্ক, তাদের কারুর মাথায় টাক, কারুর পাকা চুল। পরনে সাবেকী ধরনের ফ্রককোট, টুপি, আর উঁচু বুট। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কম। উঁচু সিল্‌কের টুপি, জুতা আর কেতাদুরস্ত কোট—এর সংখ্যাই বেশি। সবাই ভিড় করে রয়েছে গলুইয়ের দিকে। কনোনভের অনুরোধে ধীরে ধীরে ওরা পালের শক্ত কাপড় বোঝাই পাছ-গলুইয়ের কাছ থেকে নানা খাদ্যসম্ভার-ভরা টেবিলের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ইয়াকভ মায়াকিনের পাশে পাশে চলেছে লুপ রেজনিকভ। কানের কাছে ঝুঁকে কি যেন বলছে ফিস্‌ ফিস্‌ করে। শুনতে শুনতে মায়াকিনের মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসির রেখা। মায়াকিন নিয়ে এসেছে ফোমাকে অনেক অনুরোধ করে। কিন্তু এ দলের ভিতরে সে একটিও সঙ্গী খুঁজে পেল না। কাউকেই সে পছন্দ করে না। তাই গম্ভীর বিমর্ষ মুখে দূরে সরে রয়েছে। গত দুদিন ধরে দারুণ মদ টেনেছে ইয়ঝভের সঙ্গে। এখন অসহ্য মাথা ধরায় কষ্ট পাচ্ছে। এই গম্ভীর অথচ হাসিখুশি দলের ভিতর এসে পড়ে দারুণ অস্বস্তি লাগছে। সমবেত কণ্ঠের কোলাহল, সঙ্গীতের সুর, জাহাজের শব্দ, সবকিছুতেই যেন বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগল ফোমা। একান্ত প্রয়োজন ওর এখন একটু ঘুমোবার। কিন্তু কিছুতেই এ চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে না যে, কেন হঠাৎ ওর ধর্মবাবা আজ এত সদয় হয়ে উঠলেন ওর উপরে? শহরের এই সব গণ্যমান্য বণিকদলের ভিতরে কেন এলেন নিয়ে? কেন-ই-বা কনোনভের প্রার্থনা ও ভোজসভায় উপস্থিত হতে ওকে অমন সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন?

বোকামো করো না!—ফোমার মনে পড়ল ওর ধর্মবাবার একান্ত অনুরোধ।—কেন লোকজন দেখে অত লজ্জা পাও? স্বভাব থেকেই মানুষের চরিত্র গড়ে ওঠে। তাছাড়া ধনের দিক থেকে খুব কম লোকই আছে যাদের চাইতে তুমি ছোট। সবার সঙ্গে সমান হয়ে দাঁড়াবে। চলো।

কিন্তু কখন আমার সঙ্গের আলোচনাটা শেষ করবেন বাবা?—ধর্মবাবার চোখে মুখে ভাবের খেলা লক্ষ্য করতে করতে প্রশ্ন করল ফোমা।

মানে, তোমাকে ব্যবসার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেবার কথা বলছ? হা হা! সে হবে, হবে। কী অদ্ভুত ছেলে! ভালো কথা, ধনসম্পত্তি ছেড়েছুড়ে তুমি কি কোনো আশ্রমে ঢুকবে নাকি? সাধু সন্ন্যেসীর দৃষ্টান্তে? কি বলো?

সে পরে দেখা যাবে। প্রত্যুত্তরে বলল ফোমা।

বটে! তা বেশ, যতক্ষণ না অশ্রমে যাচ্ছ ততক্ষণ এসো তো আমার সঙ্গে! তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। ভিজে কিছু দিয়ে মুখটা মুছে ফেল। বড্ডো ফুলে আছে। যাও, তৈরি হয়ে নাও গে!

ওরা এসে যখন পেঁছিল তখন প্রার্থনা-সভার কাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। একপাশে বসে ফোমা দেখতে লাগল বণিকদের প্রার্থনা। নীরবে সবাই উঠে দাঁড়াল। সবার মুখেই ভক্তিগম্ভীর একাগ্রতার ছাপ। গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে আকাশের দিকে মুখ তুলে ওরা প্রার্থনা করছে। একবার এর মুখ, একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছে ফোমা কী কী জানে সে ওদের সম্পর্কে।

ঐ লুপ রেজনিকভ। গণিকালয় খুলে শুরু করে ব্যবসা, তারপর রাতারাতি ধনী হয়ে উঠল। জনশ্রুতি, এক ধনী সাইবেরিয়ানকে খুন করেছিল গলা টিপে। যৌবনে জুবভ-এর ব্যবসা ছিল চাষীদের কাছ থেকে সুতো কেনা। দু-দুবার তার ব্যবসা ফেল পড়ে। বছর কুড়ি আগে কনোনভ ঘর জ্বালানোর অপরাধে আদালতে অভিযুক্ত হয়েছিল। এমনকি এখনো একটি নাবালিকার উপরে বলাৎকার অভিযোগে আদালতে মামলা ঝুলছে। আর ওরই সঙ্গে এই দ্বিতীয়বার একই অভিযোগ জাথর কিরিলভ রবুস্তভকেও টেনে আনা হয়েছে আদালতে। রবুস্তভ বেঁটে, মোটা, গোলগাল মুখ সদা হাসিখুশি নীল চোখ। এদের মধ্যে খুব কম লোকই আছে যাদের কোনো না কোনো কলঙ্কের কথা জানা নেই ফোমার। তাছাড়া ও জানে, সবাই কনোনভের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত। বছরের পর বছর সে বাড়িয়েই চলেছে জাহাজ। অনেকে আছে যারা পরস্পর মরণশত্রু। ব্যবসার কুরুক্ষেত্রে বাগে পেলে কেউ কাউকে ছেড়ে দেবে না। সবাই জানে সবার শয়তানি, সবার অসাধুতার কথা। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে সবাই যেন ঘন হয়ে ঘিরে এসে দাঁড়িয়েছে কনোনভকে,—খুশি, বিজয়ী কনোনভকে। সবাই যেন একাকার হয়ে একটা ঘন কালো বস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে একটিমাত্র মানুষে পরিণত হয়ে উঠেছে। ঘন নীরব একইভাবে ছাড়ছে নিঃশ্বাস। কী এক অদৃশ্য অথচ দৃঢ় বস্তু যেন রয়েছে ওদের ঘিরে, যা ফোমাকে ওদের কাছ থেকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়েছে আর ওর অন্তরে জাগিয়ে তুলেছে ওদের সম্পর্কে এক নিদারুণ ভীতি।

ভণ্ড প্রতারকের দল!—মনে মনে ভাবল ফোমা। আর সঙ্গে সঙ্গেই ওর মনে ফিরে এল সাহস।

মৃদু শব্দে ওরা কাশছে, ছাড়ছে দীর্ঘশ্বাস, আঁকছে ক্রুশচিহ্ন, মাথা নুইয়ে প্রণাম করছে, আর একটা পুরু কালো দেয়ালের মতো পুরুতকে ঘিরে অচল অনড় এক বিরাট কালো পাহাড়ের মতো রয়েছে দাঁড়িয়ে।

ভণ্ডামি করছে!—আপন মনেই বলল ফোমা। ওর পাশে দাঁড়িয়ে কুঁজো কানা পাভলিন গুশ্চিন। মাত্র কিছুদিন আগে ওর আধপাগলা ভাইটার ছেলেপুলে-গুলোকে পথের ভিখারী করে তাড়িয়ে দিয়েছে। ওখানে সেও মেঘলা আকাশের দিকে এক চোখের গভীর দৃষ্টি মেলে অনুচ্চ কণ্ঠে আউড়ে চলেছেঃ হে প্রভু! তোমার ক্রোধ যেন আমাকে সাজা না দেয়, ভস্মীভূত না করে!

ফোমা অনুভব করল, ঈশ্বরের করুণা পাবার সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই ওরা করছে

প্রার্থনা।

হে প্রভু! পরম পিতা! তুমি আদেশ করেছিলে তোমার ভৃত্য নোয়াকে একখানা নৌকা তৈরি করে বিশ্বকে রক্ষা করতে।—ধীর গম্ভীর কণ্ঠে দুটো হাত আর মুখ আকাশের দিকে তুলে বলে চলেছে পুরুত,—এই জাহাজখানাকেও রক্ষা করো! একজন শুভ ও শান্তির দেবদূতকে পাঠাও রক্ষক হিসাবে! রক্ষা করো যারা হবে এই জাহাজের আরোহী।

একই সঙ্গে বণিকেরা ক্রুশ করল। সবার মুখেই ফুটে উঠেছে একটি ভাব, একটি ব্যঞ্জনা—প্রার্থনার শক্তির উপরে অবিচল বিশ্বাস। ফোমার অন্তরে গভীরভাবে দাগ কেটে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল এক নিদারুণ সংশয়,— এই লোকগুলো যাদের অন্তরে ঈশ্বরের করুণা লাভ করা সম্পর্কে এতখানি গভীর বিশ্বাস, মানুষের উপরে কেন তারা অতখানি নিষ্ঠুর? তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগল ফোমা ওদের জোচ্চুরি ধরে ফেলার জন্যে।

ওদের গাম্ভীর্যভরা অটল দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস, উল্লাসিত বিজয়ী চোখ মুখ, হাসি, উচ্চকণ্ঠ সবকিছু মিলে ফোমার অন্তরে জাগিয়ে তুলল ক্রোধ। ইতিমধ্যেই ওরা এসে বসেছে টেবিলে,—নানা খাদ্যসম্ভারে ভরা ভোজের টেবিল। লুব্ধ ক্ষুধার্ত দৃষ্টি মেলে তারিফ করছে উপরে সবজী ছড়ানো তিন গজ লম্বা বিরাট মাছটাকে। খুশিভরা আধবোজা চোখে ত্রফিম জুবভ গলায় তোয়ালে জড়াতে জড়াতে মাছটার দিকে তাকিয়ে পাশের ময়দা ব্যবসায়ী ইওনা ইউশ্‌কভকে বলল: ইওনা নিকিফরিচ্! দেখুন, একটা যেন খাঁটি তিমি মাছ। এত বড়ো যে অনায়াসে আপনি ওটার ভিতরে ঢুকে যেতে পারেন। কি বলেন? হাঃ হাঃ! জুতার ভিতরে পা গলাবার মতো করে গলে যেতে পারেন ভিতরে, তাই না? হাঃ হাঃ!

ছোটখাটো নাদুস-নুদুস চেহারা ইওনা টাটকা কেভিয়ারভরা রুপোর পাত্রটার দিকে হাত বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে পরম লুব্ধতায় সশব্দে ঠোঁট চাটতে চাটতে পরম লুব্ধতায় আড়চোখে তাকাল সামনের বোতলগুলোর দিকে, পাছে হাতের ধাক্কায় ওগুলো উল্‌টে পড়ে।

কনোনভের সামনে পোল্যান্ড থেকে আমদানি একটা পুরানো ভদকার জালা, একটা বিরাট রুপোর কাজ করা ঝিনুক, আর এক ধরনের গম্বুজাকৃতি বিচিত্র রঙবেরঙের কেক অন্যান্য খাদ্যবস্তুর উপরে মাথা তুলে রয়েছে।

ভদ্রমহোদয়গণ! আমি অনুরোধ করছি, যা আপনাদের অভিরুচি আহার করুন!—চিৎকার করে বলে উঠল কনোনভ,—সবকিছুই এখানে মজুদ রয়েছে, সবারই রুচির অনুরূপ। আমাদের দেশী রুশ খাদ্যও রয়েছে আর বিদেশী খাদ্যও রয়েছে একই সঙ্গে। কার কী চাই বলুন? শামুক কিম্বা কাঁকড়া চাই কারুর বলুন? বলেছে আমাকে যে এগুলো নাকি আনা হয়েছে হিন্দুস্তান থেকে।

আর জুবভ পাশের মায়াকিনের কাছে বলছে: 'জাহাজ ভাসানোর ব্যাপারে প্রার্থনাটি' প্রার্থনার অনুষ্ঠান মোটেই যুক্তিযুক্ত কাজ নয়। শুধু প্রার্থনা করলেই হয় না। নদীতে স্টিমার হল গিয়ে নাবিকদের ঘরবাড়ি। তাই একে বাড়ি হিসেবেই দেখা দরকার। সুতরাং বাড়ি তৈরির প্রার্থনাটাও করা দরকার। হ্যাঁ ভালো কথা, কী খাবেন?

আমি তেমন মদের ভক্ত নই। জীরের ভদকা ঢেলে দাও এক গ্লাস ব্যস!—প্রত্যুত্তরে বলল মায়াকিন।

কয়েকটি শান্তশিষ্ট অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে এক কোণে বসেছিল ফোমা।

থেকে থেকে অনুভব করছিল ওর ধর্মবাবার তীক্ষ্ম দৃষ্টি।

ওঁর ভয় হচ্ছে, আমি না কোনো কেলেঙ্কারি করে বসি।—ভাবল ফোমা।

ভাই সব!—হেঁড়ে গলায় গর্জন করে উঠল দৈত্যের মতো বিশাল দেহ ইয়াশুরভ। ওর ব্যবসা জহাজ তৈরির।—হেরিঙ ছাড়া আমার চলে না, তাই হেরিঙ দিয়েই শুরু করছি, ওটাই আমার স্বভাব।

"পার্সিয়ান মার্চ" বাজাও!

থামো। "কি মহিমামণ্ডিত" বাজাও!

ইঞ্জিনের গর্জন, চাকার শব্দ, বাজনার সুরের সংগে মিশে বাতাসে জেগে উঠছে তুষারঝঞ্ঝার শব্দ। বাঁশি, ক্ল্যারিওনেটের তীক্ষ্ম সুর, ছোট ছোট জয়ঢাকের গুড় গুড় শব্দ আর বড়ো ঢাকের উচ্চ বোল জাহাজের জলকাটার একঘেয়ে গম্ভীর শব্দের সংগে মিশে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে বাতাস। মানুষের কণ্ঠ দিচ্ছে ডুবিয়ে। আর ঝড়ের মতো ঝাপ্টা মেরে উচ্চকণ্ঠের চিৎকারে কথা বলতে বাধ্য করছে আরোহীদের।

কবরের তলায় গিয়েও ভুলো না যে তুমি আমার ডিস্কাউন্টের টাকা দিতে অস্বীকার করেছ।—তীব্রকণ্ঠে কে যেন চিৎকার করে উঠল।

ঢের হয়েছে, থামো! এটা কি হিসেবপত্র করার জায়গা?—জেগে উঠল বব্রভের শান্ত গম্ভীর কণ্ঠ।

ভাই সব, একটু বক্তৃতা হোক!

বাজনাদারেরা থামো!

একদিন ব্যাঙ্কে এসো, বুঝিয়ে দেবা, কেন ডিস্কাউন্ট দিইনি।

একটা ভাষণ হোক! চুপ!

বাদকেরা চুপ! বাজনা থামাও!

বাজাও "মাঠে মাঠে"......

মাদাম আঙ্গট!

না ইয়াকভ তারাশভিচ, অনুরোধ করছি আমরা।

ওকে বলে স্যাসবুর্গ পেস্ট্রি।

অনুরোধ করছি আপনাকে, অনুরোধ করছি!

পেস্ট্রি? পেস্ট্রির মতো তো দেখায় না! যাকগে চেখে দেখা যাবেখন।

শুরু করুন তারাশভিচ!

ভাই সব!

আর ঐ "লা বেল এলেন"-এ সে প্রায় নগ্ন দেহেই আসত, বুঝলে বন্ধু!—হঠাৎ রবুস্তভের তীক্ষ্ম আবেগভরা কণ্ঠ জেগে উঠল কোলাহল ছাপিয়ে।

আরে শোনো! জেকব ঠকিয়েছিল নাকি ইসাউকে? আঃ!

আমি পারব না। জিভখানা তো আর আমার হাতুড়ি নয়! তাছাড়া বয়সেও তরুণ নই।

ইয়াশা! মিনতি করছি আমরা!

আমাদের সম্মান রক্ষা করুন!

আমরা আপনাকে মেয়র নির্বাচিত করব।

খামখেয়ালিপনা করো না তারাশভিচ!

চুপ! চুপ! ভদ্রমহোদয়গণ! ইয়াকভ তারাশভিচ দুকথা বলবেন আপনাদের কাছে।

চুপ!

ঠিক সেই মুহূর্তে, গোলমাল থামতেই জেগে উঠল কার যেন উচ্চ কণ্ঠ : উঃ মহিলা কী ভীষণ চিমটি কেটেছে! কাঁকড়া!

প্রত্যুত্তরে গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল বব্রভ : মহিলাটি কোথায় চিমটি কাটলেন?

হো হো করে উচ্চ হাসির ধমকে ফেটে পড়ল সবাই। পরক্ষণেই আবার চুপ করে গেল। কারণ, ইয়াকভ মায়াকিন ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। গলা ঝেড়ে, টাকে হাত বুলোতে বুলোতে গম্ভীর মুখে বণিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে তাকাচ্ছে তাদের মুখের দিকে।

ভাই সব! শুনুন!—খুশিভরা সন্তুষ্টমনে বলল কনোনভ।

বণিক শ্রেণীর ভদ্র মহোদয়গণ!—মৃদু হেসে আরম্ভ করল মায়াকিন,—বুদ্ধিমান জ্ঞানী লোকদের ভাষায় একটা বিদেশী কথার আমদানি হয়েছে। সে কথাটা হচ্ছে,—সংস্কৃতি। ঐ কথাটা সম্পর্কে সরলভাবে আমি যা বুঝি তাই কিছু বলছি।

বটে! লক্ষ্যটা তাহলে ঐ দিকে!—খুশিভরা কণ্ঠে কে যেন বলে উঠল।

এই চুপ!

প্রিয় ভদ্রমহোদয়গণ!—গলা চড়িয়ে বলতে আরম্ভ করল মায়াকিন,—ওরা খবরের কাগজে আমাদের বণিক সম্প্রদায়ের সম্পর্কে লিখে থাকে যে, আমরা সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত নই। চাইও না পরিচিত হতে আর নাকি বুঝিও না। ওরা আমাদের বলে বর্বর, বলে অশিক্ষিত, সংস্কৃতি-বর্জিত। কিন্তু সংস্কৃতিটা কী? এসব কথা শুনে ব্যথা পাই। আমি বুড়ো মানুষ! তাই একদিন ঠিক করলাম, দেখাই যাক না, কথাটার প্রকৃত মানে কী?—বলতে বলতে মায়াকিন থেমে গিয়ে শ্রোতাদের মুখের দিকে তাকাল। তারপর বিজয় গর্বে আবার বলতে শুরু করল : আমার আবিষ্কারের ভিতর দিয়ে প্রমাণ হল যে, ঐ কথাটার মানে "সাধনা"। অর্থাৎ অনুরাগ—কাজ ও জীবনের শৃঙ্খলার প্রতি মহান অনুরাগ। ঠিক কথা, খাঁটি কথা। তার অর্থ—সেই লোকই সংস্কৃতিবান যে কাজ ও শৃঙ্খলার অনুরাগী। যে জীবনকে সুশৃঙ্খল করার অনুরাগী। যে বাঁচতে ভালোবাসে—জানে নিজের ও জীবনের মূল্য। ভালো কথা!—ইয়াকভ তারাশভিচ কাঁপছে; হাসিভরা চোখের আলোর রেখা যেমন করে ঠোঁটের উপরে কেঁপে কেঁপে উঠছে, তেমনি তার বলিরেখাগুলো কেঁপে কেঁপে সমস্ত মুখময় পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। টাকভরা মাথাটাকে মনে হচ্ছে যেন একটা ঘোর রঙের তারা।

নীরবে বণিকেরা একান্ত মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে। সবার মুখে চোখেই তীব্র মনঃসংযোগের অভিব্যক্তি। বুঝিবা লোকগুলো প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে এমন ভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছে মায়াকিনের বাগ্মিতায়।

যদি ঐ কথাটার অর্থ অন্য কোনোভাবে না ধরে এই ভাবে ধরা যায় তবে যারা আমাদের বলে থাকেন অশিক্ষিত, বর্বর, তারা মিথ্যা কুৎসা রটনা করে থাকেন আমাদের বিরুদ্ধে। কারণ তারা কেবল ঐ কথাটাকেই ভালোবাসেন। কিন্তু তার যা অর্থ তাকে ভালোবাসেন না। কিন্তু ঐ কথাটির গূঢ় তাৎপর্য যা আমরা তারই অনুরাগী। সেই সার পদার্থটিকেই ভালোবাসি আমরা—আমরা ভালোবাসি কাজ। আমাদের ভিতরে রয়েছে জীবন সম্পর্কে প্রকৃত শিক্ষা। অর্থাৎ আমরা জীবনের পূজারী। আমরা। ওরা নয়। ওরা ভালোবাসে কথা, আমরা ভালোবাসি কাজ। আর এখানেই —বণিকশ্রেণীর ভদ্র মহোদয়গণ—এখানেই রয়েছে তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ধরুন এই ভলগা! এখানেই রয়েছেন আমাদের স্নেহময়ী মা। মাত্র একশ বছর অতীত হয়েছে, আমাদের সম্রাট মহান পিটার এই ভল্গার বুকেই প্রথম ভাসিয়েছিলেন ডেকওয়ালা জলযান। আর আজ হাজার হাজার বাষ্পীয়পোত এই নদীর বুকে চলাচল করছে।

কারা তৈরি করেছে এসব? রুশ চাষীরা—সম্পূর্ণ নিরক্ষর লোকেরা। এই যে বিরাট বিরাট স্টিমার, গাধাবোট—কাদের এসব? আমাদের। কারা করেছে আবিষ্কার? আমরা। এখানকার সব কিছু আমাদের। সব কিছু আমাদের বুদ্ধির ফলে গড়ে উঠেছে। এসব আমাদের রুশ-চাতুর্যের, কর্মের প্রতি আমাদের ঐকান্তিক অনুরাগের ফল। কেউ আমাদের সাহায্য করেনি। নিজেরাই আমরা ভলগার বুক থেকে নির্মূল করেছি দস্যুদল। ভাড়া করেছি নিজেদের খরচায় সৈন্য। দস্যুতা নিশ্চিহ্ন করে ভলগার হাজার হাজার মাইল জলপথে চালাচ্ছি জাহাজ, স্টিমার, জলযান। ভলগার তীরে কোন শহরটা সবচাইতে সুন্দর? সব চাইতে ভালো? যে শহরের বেশির ভাগ বণিক। সব চাইতে কাদের বাড়িগুলো সুন্দর? বণিকদের। কারা গরিবের খিদমত করে? এই বণিকেরা। একটা একটা করে পয়সা তুলে কারা হাজার হাজার টাকা চাঁদা দেয়? কারা তৈরি করে দেয় গির্জা? আমরা। সরকারকে সবচাইতে বেশি টাকা জোগায় যারা? আমরা। ব্যবসায়ীরা। ভদ্রমহোদয়গণ! একমাত্র আমাদের কাছেই কাজ কাজের জন্যই সমাদৃত। জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্যে একমাত্র আমরাই জীবন ও শৃঙ্খলার অনুরাগী। কিন্তু যারা আমাদের সমালোচনা করে, তারা নিছক সমালোচনাই করে, ব্যস্। বলতে দাও তাদের। যখন বাতাস ওঠে তখন নলখাগড়া মর্মর শব্দ করে ওঠে। বাতাস থামলে ওগুলোও থেমে যায় নীরব হয়ে। কিন্তু নলখাগড়া দিয়ে ঝাঁটাও তৈরি করা যায় না। ওগুলো অকেজো গাছ। অকেজো হওয়ার জন্যেই ওরা সোরগোল তোলে বেশি। কী অর্জন করেছেন আমাদের বিচারকেরা? কেমন করে তারা জীবনকে সমাদর করছেন? আমরা তা জানি না! কিন্তু আমাদের কাজ স্পষ্ট। ব্যবসায়ী ভদ্রমহোদয়গণ! আপনাদের ভিতরে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষদের দেখে—সবচাইতে শ্রমশীল কর্মানুরাগী লোকদের দেখে,—যাঁরা উপার্জন করতে পারেন আর করছেন তাদের দেখে, আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় ভরপুর অন্তরে, বলিষ্ঠ-চেতা পরিশ্রমী মহান রুশ ব্যবসায়ী শ্রেণীর সম্মানে আমার পানপাত্র তুলে ধরছি! দীর্ঘজীবী হোন আপনারা! সফল হোন আপনারা রুশ মাতৃভূমির মহান গৌরব অর্জনে! হুর্‌রা!

বণিকদের বিজয় উল্লাসের উচ্চ কোলাহলে ডুবে গেল মায়াকিনের তীক্ষ্ণ কম্পিত কণ্ঠ। মদ ও বৃদ্ধের কথার উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়ে বিরাট মাংসল দেহগুলোর বুকের ভিতর আন্দোলিত হয়ে রূপান্তরিত হয়ে উঠল এমন সমবেত কোলাহলে যেন আশেপাশের সব কিছুই ঝন্‌ঝন্ করে বাজতে শুরু করল।

ইয়াকভ! তুমি প্রভুর জয়ঢাক!—চিৎকার করে বসে উঠল জুবভ তার হাতের পানপাত্রটা মায়াকিনের দিকে বাড়িয়ে ধরে। চেয়ার উল্‌টে, টেবিল সরিয়ে, ডিশ-বোতল ফেলে গড়িয়ে উত্তেজিত আনন্দোজ্জ্বল বণিকেরা—কারুর বা চোখে জল—পানপাত্র হাতে নিয়ে ছুটে এল মায়াকিনের কাছে।

আ! বুঝলে কী বলা হল?—রবুস্তভের কাঁধের উপরে হাত রেখে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলল কনোনভ। বোঝার চেষ্টা করো, দারুণ বক্তৃতা!

আমাকে আলিঙ্গন করতে দাও ইয়াকভ তারাশভিচ!

ব্যান্ড বাজাও!

সুন্দর কিছু একটা বাজাও! মার্চ!—পার্‌সিয়ান মার্চ!

না। বাজনায় কাজ নেই এখন। জাহান্নামে যাক!

এই তো সঙ্গীত! উঃ! ইয়াকভ তারাশভিচ! কী বুদ্ধি!

আমি ছিলাম ভাইদের ভিতরে ছোট, কিন্তু বুদ্ধি ছিল আমার বেশি।

মিথ্যা কথা বলছ ত্রফিম!

কী দুঃখের কথা! ইয়াকভ তুমি শিগ্‌গিরই মরবে!—ভাষায় প্রকাশ করা যায় না কী ভীষণ দুঃখিত আমরা।

এটা কি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হতে যাচ্ছে নাকি?

ভদ্রমহোদয়গণ! আসুন আমরা মায়াকিন তহবিল স্থাপন করি। আমি এক হাজার দিচ্ছি।

চুপ! থামো!

ভদ্রমহোদয়গণ!—আবার বলতে আরম্ভ করল মায়াকিন। তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপছে। —তাছাড়া আমরা জীবনে সবচাইতে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের মাতৃভূমির প্রকৃত মালিক আমরাই। কারণ আমরা চাষী।

ঠিক কথা।

চুপ! ওকে শেষ করতে দাও।

আমরা রুশিয়ার আদিম অধিবাসী। আর যা কিছু আমরা সৃষ্টি করি তা খাঁটি রুশীয়।

খুবই সত্য কথা। দুই-এ দুই-এ চারের মতো সত্য।

এমন সহজ!

লোকটা সাপের মতো ধূর্ত।

আর এমন নিরীহ যেন—

বাজপাখি। হা হা হা!

বণিকেরা ঘন হয়ে ঘিরে ধরেছে মায়াকিনকে। ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি মেলে দেখছে ওর দিকে তাকিয়ে। এত উত্তেজিত হয়েছে যে শান্ত হয়ে আর কথা শুনতে পারছে না। ওকে ঘিরে বিরাট কোলাহল বাতাস বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। আর তারই সঙ্গে ইঞ্জিনের গর্জন, চাকার ছপ্‌ছপানি মিশে জেগে উঠল এক অপূর্ব শব্দের ঘূর্ণি। আর সেই শব্দের ঘূর্ণির তলায় ডুবে গেল বৃদ্ধের কম্পিত কণ্ঠের সুর। প্রবল হতে প্রবলতর হয়ে উঠছে বণিকদের উত্তেজনা। সবার চোখে মুখে বিজয়োল্লাস—পানপাত্র বাড়িয়ে ধরেছে মায়াকিনের দিকে। কেউ তার পিঠ চাপড়াচ্ছে, কেউ খাচ্ছে চুমো, কেউ আবেগভরা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে। চিৎকার করছে!

কামারিনস্কি! জাতীয় নৃত্য!

সবকিছুই আমরা করছি!—নদীর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে উঠল মায়াকিন,—এ সব কিছু আমাদের। আমরাই গড়ে তুলেছি জীবন।

হঠাৎ সবকিছু ছাপিয়ে, সব কোলাহল ছাড়িয়ে জেগে উঠল একটা উচ্চ কণ্ঠের চিৎকার:

আ! আপনারা করেছেন এ সব? আপনারা?—পরক্ষণেই তীব্র বিদ্বেষভরা গম্ভীর সতেজ কণ্ঠের স্পষ্ট উচ্চারিত কুৎসিত গালাগালি বাতাস বিক্ষুব্ধ করে তুলল। নেমে এল এক কঠোর নিস্তব্ধতা। কেবল চোখ ফিরিয়ে দেখছে কে ওদের অমন করে গাল পাড়ল। সেইক্ষণে শুধু ইঞ্জিনের গভীর নিঃশ্বাস আর শিকলের ঠুন ঠুন শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দই নেই।

কে ওখানে ঘেউ ঘেউ করছে?—ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করল কনোনভ।

না, কেলেঙ্কারি কিছু একটা না ঘটলে যেন আমাদের চলেই না।—একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে উঠল রেজ্নিকভ।

কে ওখানে অমন করে গালাগাল করছে?

বণিকদের চোখে-মুখে জেগে উঠল ভয়, কৌতূহল, বিস্ময় আর ভর্ৎসনার মিলিত ব্যঞ্জনা। সবাই বোকার মতো সোরগোল তুলছে। কেবলমাত্র ইয়াকভ তারাশভিচের চোখ-মুখ শান্ত, নীরব। যেন খুশি হয়ে উঠেছে এই ঘটনায়। পায়ের বুড়ো আঙুলের উপরে ভর দিয়ে গলা বাড়িয়ে টেবিলের শেষ প্রান্তে তাকাতেই তার চোখ-দুটো অদ্ভুতভাবে চক্চক করে উঠল। যেন এমন কিছু একটা দেখতে পেয়েছে যাতে খুশি হয়ে উঠেছে মনে মনে।

গর্দিয়েফ!—মৃদু কণ্ঠে বলে উঠল ইওনা ইউশ্কভ।

সংগে সংগে ইয়াকভ তারাশভিচ যে দিকে তাকিয়েছিল সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সেই দিকে। টেবিলের উপরে হাত রেখে ফোমা দাঁড়িয়ে। নিদারুণ ক্রোধে বিকৃত হয়ে উঠেছে মুখ। দাঁত কিড়মিড় করছে। আর জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রয়েছে বণিকদের দিকে। নিচের চোয়াল কাঁপছে থর থর করে। কাঁধদুটো উঠছে কেঁপে। হাতের আঙুল দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরেছে টেবিলের ধার। ঢাকনার উপরে আঁচড় কাটছে। ওর ঐ নেকড়ের মতো ক্রুদ্ধ মুখ ও দেহভঙ্গির দিকে তাকিয়ে বণিকেরা আবার চুপ হয়ে গেল।

আপনারা অমন হাঁ করে রয়েছেন কেন?—আবার অশ্লীল গালাগালির সংগে প্রশ্ন করল ফোমা।

মাতাল হয়ে পড়েছে—মাথা নেড়ে বলে উঠল বব্রভ।

কেন ওকে এখানে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে?—ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠল রেজনিকভ।

ফোমা ইগনাতিচ্!—ধীর কণ্ঠে বলল কনোনভ,—কেলেঙ্কারি করো না। যদি তোমার মাথা ঘোরে তবে শান্ত হয়ে চুপচাপ কেবিনে ঢুকে শুয়ে পড়ো গে। শুয়ে শুয়ে—

চুপ করো!—গর্জে উঠল ফোমা, কনোনভের মুখের দিকে তাকাল,—খবরদার! আমার সংগে কথা বলবে না! মাতাল নই আমি, তোমাদের কারুর চাইতেই আমার মাথার ঠিক আছে। বুঝলে?

আচ্ছা দাঁড়াও বাছা! কে তোমাকে এখানে নিমন্ত্রণ করেছে?—ক্রুদ্ধ অপমানিত কনোনভ প্রশ্ন করল।

আমি এনেছি ওকে।—বেজে উঠল মায়াকিনের কণ্ঠ।

ও! বেশ বেশ তাহলে—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—মাপ করো ফোমা ইগনাতিয়েভিচ। কিন্তু তুমি যখন ওকে এনেছ ইয়াকভ, তোমার উচিত ওকে শান্ত করা।

চুপ করে গিয়ে ফোমা নীরবে হাসতে আরম্ভ করল। বণিকেরাও নীরবে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

এই ফোমকা! আবার তুই আমার এই বৃদ্ধ বয়সে কলঙ্কের কালিমা লেপন করছিস?

ধর্মবাবা!—দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল ফোমা,—এখনো তেমন কিছুই করিনি। এরই ভিতরে লেকচার ঝাড়তে শুরু করে দিলেন? মাতাল হইনি আমি —কিছুই এখনো পান করিনি। কিন্তু শুনলাম সব কিছু। ব্যবসায়ী ভদ্র-মহোদয়গণ! অনুমতি করুন আমিও দু'কথা বলি। আমার ধর্মবাবা—যাঁকে আপনারা এত শ্রদ্ধা করেন, তিনি বললেন। এবার শুনুন তাঁর ধর্মছেলের কথা।

কী, বক্তৃতা?—বলে উঠল রেজনিকভ।—কেন এসব ঝগড়াঝাটি, বাগবিতণ্ডা?

আমরা এসেছি একটু আমোদ-প্রমোদ করতে। এসো, কথা শোন! ওসব ছেড়ে দাও ফোমা ইগনাতিয়েভিচ! বরং একটু মদ খাও। এসো আমরা একটু পান করি। আঃ! কী চমৎকার বাপের ছেলে তুমি!

টেবিল ছেড়ে ফোমা লাফিয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল। উপদেশাত্মক কথাবার্তা শুনতে শুনতে হাসতে লাগল। উপস্থিত সমস্ত গম্ভীর ভারিক্কি লোকদের ভিতরে ফোমা সবচাইতে বয়ঃকনিষ্ঠ। সবচাইতে সুশ্রী। আঁটসাঁট ফ্রককোট-পরা ও পরিপূর্ণ তনুশ্রী ভুঁড়িওয়ালা মোটা লোকগুলির ভিতরে ওকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। বুক ফুলিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়াল।

তোশামোদ আর চাটুবাক্য দিয়ে আপনারা আমার মুখ বন্ধ করতে পারবেন না।—তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে কাঁধ সোজা করে দাঁড়িয়ে শান্তকণ্ঠে ঘোষণা করল : কিন্তু যদি কেউ আমার গায়ে হাত দিতে আসেন, একটা আঙুল দিয়েও যদি আমার দেহ স্পর্শ করেন, তাকে আমি খুন করব। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি—যত জনকে পারি খুন করব।

ওর সামনের ভিড় পিছন দিকে হেলে পড়ল, যেমন করে বাতাসে হেলে পড়ে ঝোপ। উত্তেজনাভরা অস্ফুট কণ্ঠে ওরা করছে আলোচনা। আরো কালো হয়ে উঠছে ফোমার মুখ। চোখদুটো উঠেছে গোল হয়ে।

বেশ, এখানে বলা হয়েছে যে, আপনারাই গড়ে তুলেছেন জীবন। যা-কিছু আপনারা করেছেন তা সব খাঁটি। সব কিছুই দরকারী।—একটা গভীর নিঃশ্বাস ছাড়ল ফোমা। তারপর বিদ্বেষভরা তীব্র দৃষ্টিতে শ্রোতাদের মুখের দিকে তাকাল। মনে হল ওদের মুখগুলো যেন অদ্ভুতভাবে ফুলে উঠেছে। ব্যবসায়ীরা নীরব—পরস্পরের গায়ে গায়ে মিশে দাঁড়িয়ে আছে। পিছনের সার থেকে কে যেন একজন বিড়বিড় করে বলে উঠল : কী সম্পর্কে বলছে? কাগজ থেকে না নিজের মন থেকে?

হায়! তোরা পাজীর দল!—মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠল ফোমা,—কী গড়েছিস তোরা? তোরা যা গড়েছিস তা জীবন নয় কারাগার। তোরা যা স্থাপন করেছিস তা শৃঙ্খল। শৃঙ্খলিত করেছিস মানুষকে। আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছিস মানুষকে। দম বন্ধ হয়ে আসে এত ছোট, এত অপরিসর। জীবন্ত মানুষের নড়াচড়া করার সাধ্য নেই তার ভিতরে। মানুষ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। শুনে তোরা! জানিস আজও যে তোরা বেঁচে আছিস তা মানুষের অসীম ধৈর্য আছে বলেই।

এর মানে কী?—রাগে ঘৃণায় হাত মুঠো করে বলে উঠল রেজনিকভ—ইলিয়া ইয়েফিমভ! কী এসব? সহ্য করতে পারছি না আমি এসব কথা।

গরদিয়েফ!—চিৎকার করে বলে উঠল ববুরভ,—সাবধান! অসামাজিক হয়ে পড়ছ তুমি।

এসব কথার জন্যে তোমাকে দেয়া উচিত—ঐ-ঐ-ঐ!—বলল জুবভ।

চুপ!—রক্ত-চোখে তাকিয়ে বলে উঠল ফোমা,—শুয়োরের মতো ঘোঁত্ ঘোঁত্ করছে দেখো!

ভদ্রমহোদয়গণ!—লোহার উপরে উকো ঘসার মতো শিরশিরে বিদ্বেষভরা তীক্ষ্ণ কণ্ঠ জেগে উঠল মায়াকিনের,—কেউ ওর গায়ে হাত দেবেন না। একান্তভাবে অনুরোধ করছি আমি, কেউ বাধা দেবেন না ওকে। ওকে ঘেউ ঘেউ করতে দিন। নিজের মনেই ও স্ফূর্তি করুক। ওর কথায় আপনাদের কোনো ক্ষতি হবে না।

বেশ, বেশ, না থাক! আপনাকে বিনীত ধন্যবাদ জানাচ্ছি!—চিৎকার করে বলে উঠল ইউশ্‌কভ।

ফোমার কাছে দাঁড়িয়ে স্মলিন। সে ওর কানে কানে বলল : থামো ভাই, থামো! হল কি তোমার? মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? ওরা তোমাকে—

দূর হও!—গর্জে উঠল ফোমা। রাগে ওর চোখদুটো জ্বলে উঠছে,—যাও মায়াকিনের কাছে গিয়ে তার তোশামোদ করো গে! কিছু মিলতে পারে।

একটা শিস্ দিয়ে উঠে স্মলিন একপাশে সরে দাঁড়াল। বণিকেরা একে একে এদিক-ওদিক সরে যেতে লাগল। তাতে ফোমা আরো চটে গেল। ইচ্ছে হল এমন কথা বলে যাতে শিকলের মতো বেঁধে রেখে বাধ্য করে ওদের কথা শুনতে। কিন্তু তেমন জোরালো কথা খুঁজে পেল না।

তোরা গড়ে তুলেছিস জীবন?—চিৎকার করে বলে উঠল ফোমা,—কে তোরা? জোচ্চোর ডাকাতের দল!

মুহূর্তে কয়েকটি লোক ঘুরে দাঁড়াল, যেন ফোমা ডেকে উঠেছে ওদের নাম ধরে।

কনোনভ! সেই কচি মেয়েটার ব্যাপারে না শিগ্‌গিরই তোর আদালতে বিচার হচ্ছে। ওরা তোকে কালাপানি পাঠিয়ে ঘানি টানাবে। বিদায় ইলিয়া! বৃথাই স্টিমারটা বানালে। সরকারী জাহাজে করেই তোকে সাইবেরিয়ায় চালান দেবে।

চেয়ারের ভিতরে ডুবে গেল কনোনভ। সমস্ত দেহের রক্ত যেন ওর মুখে উঠে এল। নীরবে মুষ্টিবদ্ধ হাতটা নাড়তে লাগল।

রুক্ষকণ্ঠে বলে চলেছে ফোমা।

বেশ ভালো, চমৎকার! একথা ভুলব না আমি কোনোদিন।

ফোমা দেখল ওর মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠেছে। ঠোঁটদুটো কাঁপছে। বুঝল কোন্ অস্ত্রে সে ঐ লোকগুলোকে ঘায়েল করতে পারবে।

হা হা হা! জীবন গড়নেওয়ালার দল! গুশ্চিন? তোর ভাইপো-ভাইঝিদের ভিক্ষে দিস তো? রোজ অন্তত একমুঠো করেও দিস। ওদের সাতষট্টি হাজার টাকা চুরি করেছিস! ববরভ কেন বাবা মিথ্যে হাওয়া উড়োলে তোমার রক্ষিতার সম্পর্কে যে সে তোমার টাকা চুরি করেছে? তাকে যখন আর ভালোই না লাগছিল, ছেড়ে দিলেই তো পারতে। যাক তোমার অন্য মেয়েমানুষটির সঙ্গে কে একটু আশনাই-টাশনাই করছে সে কি জানো না? ওরে মোটা শুয়োর! হা হা হা! আর তুমি লুপ! আবার গণিকালয় খুলে বসো আর তোমার অতিথিদের চুষতে আরম্ভ করে দাও। তারপর শয়তান একদিন তোমাকে চুষে চুষে খাবে। হা, হা! অমন ধার্মিক গোছের মুখ নিয়ে পেজোমি করা খুবই ভালো। কাকে যেন খুন করেছিলে লুপ?

বলছে আর হাসছে ফোমা—হিংস্র উচ্চকণ্ঠের বিদ্বেষভরা হাসি। আর দেখছে ওদের মুখের উপরে ওর কথার প্রতিক্রিয়া। প্রথম যখন বলছিল সবার উদ্দেশ্যে, ওরা চলে যাচ্ছিল আর দূর থেকে দলে দলে এক এক জায়গায় জটলা করতে করতে তীব্র ঘৃণাভরা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল অভিযোগকারীর দিকে। দেখছিল ওদের মুখে ফুটে উঠতে মৃদু হাসি। বুঝতে পারছিল ফোমা যে যদিও ওর কথায় ক্রুদ্ধ হয়েছে ওরা, তবুও যতটা হুল ফোটাতে চাইতে পারছে না ততটা। এতে ওর বিদ্বেষ কেমন যেন আসছিল ঠাণ্ডা হয়ে। আর একান্ত তিক্ততার সঙ্গে অনুভব করছিল ওর আক্রমণের ব্যর্থতা। কিন্তু যখন কনোনভ ঝুপ করে চেয়ারের ভিতরে বসে পড়ল, যেন কিছুতেই আর ফোমার কথাগুলো সহ্য করতে পারছিল না, ফোমা লক্ষ্য করল অন্যান্য বণিকদের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে বিদ্বেষভরা বিজাতীয় হাসির ক্ষীণ আভা। শুনল কারুর কারুর মুখে সমর্থনসূচক কথা :

খুব তাক্ করে ঝেড়েছে!

ঐ অনুচ্চ কণ্ঠ ফোমার সাহস ফিরিয়ে আনল। আরো জোরে জোরে ছুঁড়ে মারতে লাগল ভর্ৎসনা, বিদ্রূপ, গালাগাল, যার চোখেই ওর চোখ পড়তে লাগল। ফোমা তার নিজের কথার ফলাফল দেখে আনন্দে ঘোঁত্ ঘোঁত্ করে উঠল। সবাই নীরব—একান্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনছে ওর কথা। অনেকে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ওর কাছে।

থেকে থেকে জেগে উঠছে প্রতিবাদ। কিন্তু সংক্ষিপ্ত—অনুচ্চ। কিন্তু যখনই ফোমা কারুর নাম ধরে কিছু বলতে শুরু ক'র তখনই সবাই বিদ্বেষভরা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে অভিযুক্ত বন্ধুটির দিকে তাকায়।

বিব্রত মুখে হেসে উঠল বব্রভ। কিন্তু তার কুতকুতে চোখদুটো দিয়ে যেন ভ্রমরের মতো বিদ্ধ করে চলেছে ফোমাকে। আর লুপ, রেজনিকভ, হাত নেড়ে নেড়ে বিদঘুটেভাবে লাফালাফি জুড়ে দিয়েছে। অবশেষে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল : সবাই সাক্ষী। এসব কী? না, আমি কিছুতেই ক্ষমা করব না এসব। আদালতে নালিশ করব। এসব কী?—পরক্ষণেই সে ফোমার দিকে হাত বাড়িয়ে তীব্র কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল,—বেঁধে ফেলো ওকে!

ফোমা হাসছিল।

সত্যকে তোমরা বাঁধতে পারবে না—কিছুতেই পারবে না! বাঁধলেও যা সত্য তা বোবা হয়ে যাবে না।

ঈ-শ্ব-র!—ভাঙা গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে বলে উঠল কনোনভ।

দেখুন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ভদ্রমহোদয়গণ!—জেগে উঠল মায়াকিনের কণ্ঠ,—আমি অনুরোধ করছি, তারিফ করুন ওকে আপনারা। দেখুন কী ধরনের লোক সে।

একে একে ব্যবসায়ীরা এগিয়ে আসতে লাগল ফোমার কাছে। ওদের চোখে মুখে দেখল ফোমা নিদারুণ ক্রোধ, ঔৎসুক্য, বিদ্বেষভরা চাপা আনন্দ আর ভয়। যে সব শান্ত নিরীহ লোকদের ভিতরে বসেছিল ফোমা তাদের ভিতর থেকে একজন ফিস্ ফিস্ করে বলল,—দাও না আরো খানিকটা, ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করবেন। চালাও!

রবুস্তভ!—চিৎকার করে বলে উঠল ফোমা,—তুমি দাঁত বের করে হাসছ কেন? কিসে তোমার অত আনন্দ হল? তুমিও ঘানি টানবে!

হঠাৎ তিং করে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বলল রবুস্তভ : ওকে পাড়ে নামিয়ে দিয়ে এসো!

সঙ্গে সঙ্গে কনোনভ চিৎকার করে হুকুম দিল ক্যাপটেনকে : ফেরাও জাহাজ! শহরে চলো প্রদেশপালের কাছে।

ভিড়ের ভিতর দিয়ে কে যেন অজ্ঞাতসারে আবেগভরা কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠল : ওকে সাহস দেবার জন্যে উত্তেজিত করা হয়েছে—মাতাল করা হয়েছে।

না, এ বিদ্রোহ।

বাঁধো! বেঁধে ফেল ওকে!

একটা মদের বোতল টেনে নিয়ে ফোমা মাথার উপরে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল : এসো না! এসো এগিয়ে! না, মনে হচ্ছে তোমাদের আরো কিছু শুনতে হবে।

ওর কথার আঘাতে লোকগুলো সাহস হারিয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে দেখে আনন্দে আত্মহারা ফোমা নতুন উদ্যমে আবার কুৎসিত ভাষায় গাল পাড়তে লাগল। থেমে গেল ওদের চিৎকার। যাদের ফোমা চেনে না সমর্থনসূচক ভঙ্গিতে তাকিয়ে রয়েছে তারা ফোমার মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টি মেলে। কারুর চোখে

আনন্দ মেশানো বিস্ময়। পাকাচুল, গোলাপী গাল আর ইঁদুরের মতো চোখ এক ভদ্রলোক হঠাৎ বণিকদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি গলায় বলে উঠল : এসব হচ্ছে বিবেকের কথা। আর কিছু নয়। এটা আপনাদের সহ্য করা উচিত। এ হচ্ছে মহাপুরুষের ভর্ৎসনার বাণী। আমরা পাপী। সত্যি বলতে কি—

সবাই মিলে তাকে থামিয়ে দিল। এমনকি জুবভ তার কাঁধের উপরে একটা খোঁচা পর্যন্ত দিল। ভদ্রলোক একটু ঝুঁকে ভিড়ের ভিতরে মিশে গেল।

জুবভ!—চিৎকার করে বলে উঠল ফোমা,—কতগুলো মানুষের তুমি সর্বনাশ করেছ—পথের ভিখারী বানিয়েছ? স্বপ্নেও ভাবো একবার ইভান পেত্রভ্ মিয়াকিন্নিকভের কথা? তোমার জন্যেই যাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে? একথা কি সত্য যে প্রত্যেক প্রার্থনা-সভার গির্জার বাক্‌স থেকে দশটাকা করে তুমি চুরি করো?

এ আক্রমণ আশা করেনি জুবভ। হাত উপরের দিকে তুলে পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু পরক্ষণেই লাফিয়ে উঠে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করতে শুরু করল : আঃ! আমার পেছনেও লেগেছিস? আমার বিরুদ্ধে?—তারপর গাল ফুলিয়ে দারুণভাবে হাতের মুঠো নাড়তে বলতে লাগল : মূর্খেরা বলে অন্তরে ভগবান নেই! যাবো আমি বিশপের কাছে। তোকে ঘানি টানাব তবে ছাড়ব—ব্যাটা নাস্তিক!

জাহাজের উপরে সোরগোল দারুণ বেড়ে গেল। ক্রুদ্ধ বিব্রত অপমানিত লোক-গুলোর দিকে তাকিয়ে ফোমা নিজেকে ভাবল রূপকথার সেই হত্যাকারী দৈত্য। হাতমুখ নেড়ে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে, জটলা করছে। কেউ রাগে লাল হয়ে উঠেছে। কারুর মুখ পাংশু। কিন্তু ঐ তীব্র গালাগালের স্রোতকে বাধা দিতে সবাই একই রকমের অসহায়।

নাবিকদের ডাক!—চিৎকার করে উঠল রেজনিকভ।

কনোনভের কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠল জুবভ—কি হল তোমার ইলিয়া? অ্যাঁ? আমাদের অপমান করাবার জন্যেই কি তুমি আমাদের নিমন্ত্রণ করে-ছিলে? একটা কুত্তার ছানা দিয়ে?

একদল লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে মায়াকিনকে ঘিরে। ক্রুদ্ধ মুখে শুনছে তার শান্ত কণ্ঠের কথা। তারপর সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

তাই করো ইয়াকভ!—উচ্চকণ্ঠে বলল রবুস্তভ,—সবাই সাক্ষী আছি আমরা চলো।

সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে জেগে উঠল ফোমার অভিযোগভরা উচ্চ কণ্ঠ : তোরা জীবন গড়ে তুলিসনি, গড়ে তুলেছিস আস্তাকুঁড়! নোংরা পচা-গলা অবস্থার সৃষ্টি করেছিস তোরা তোদের কাজ দিয়ে। বিবেক বলে কোনো বস্তু আছে তোদের? ভুলেও ঈশ্বরকে স্মরণ করিস? টাকা—টাকাই হচ্ছে তোদের ঈশ্বর। বিবেককে তোরা দূর করে দিয়েছিস। কোথায় নির্বাসিত করেছিস রক্তচোষার দল? তোরা বেঁচে আছিস অন্যের শক্তিতে। অন্য লোকের হাতে তোরা করছিস কাজ। এর জন্যে মূল্য দিতে হবে তোদের। যখন ধ্বংস হয়ে যাবি—এ সব কিছুর হিসেব-নিকেশের জন্যে ডাক পড়বে তোদের। সবকিছুর জন্যে—এমনকি একফোঁটা চোখের জলের জন্যেও। তোদের ঐ মহান কীর্তির জন্যে কত মানুষ চোখের রক্ত বন্যায়ই যে কেঁদে কেঁদে মরেছে। তোদের কৃতকর্মের পুরস্কার হিসেবে নরকও ভালো স্থান তোদের মতো পাজীর পক্ষে। আগুনে নয়, তোদের সিদ্ধ করতে হবে ফুটন্ত কাদায়। আর তোদের সে দুর্ভোগ চলতে থাকবে শতবর্ষব্যাপী। শয়তানেরা একটা

কড়ার ভিতরে ফেলে ঢেলে দেবে তার মধ্যে—হা, হা,—ওরা ঢেলে দেবে তার মধ্যে—হা হা! সম্মানিত ব্যবসায়ী শ্রেণী! জীবনের স্রষ্টা! ও! শয়তানের দল!—প্রবল হাসির ধমকে ফেটে পড়ল ফোমা।

সেই মুহূর্তে কয়েকজন লোকের ভিতরে কেমন যেন একটু অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। পরক্ষণেই একই সঙ্গে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ফোমার উপরে। শুরু হল হুটোপুটি।

এবার ধরা পড়ে গেছ বাছাধন!—হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল একজন।

আ! অমন করছ কেন?—কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ফোমা।

সমস্ত কালো দেহগুলো মিনিটখানেক ধরে জড়াজড়ি করল, পা আছড়াল, জেগে উঠল অনুচ্চ কণ্ঠ,—ওকে মাটিতে পেড়ে ফেল!

হাতটা চেপে ধরো, হাতটা, ওঃ!

দাড়ি ধরে!

তোয়ালে আনো। বেঁধে ফেল তোয়ালে দিয়ে।

কামড়াবে? কামড়াবে তুমি আর?

বটে? এখন কেমন লাগছে? অ্যাঁ?

মেরো না বলছি! খবরদার!

ঠিক হয়েছে।

উঃ! গায়ে কী জোর!

একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখি চল।

খোলা বাতাসে—হা হা!

ওরা ফোমাকে একপাশে টেনে এনে ফেলে রাখল। ক্যাপটেনের কেবিনের দেয়ালের উপরে। তারপর পোশাক ঠিক করতে করতে সরে গেল। হুটোপুটি করার শ্রমে আর অপমানে ক্লান্ত হয়ে ফোমা নীরবে সেখানে পড়ে রইল। কাপড় জামা গেছে ছিঁড়ে, সর্বাঙ্গে ধুলো। গামছা আর তোয়ালে দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হাত পা। গোল গোল রক্তাক্ত চোখ মেলে নির্বোধের মতো তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। শুধু কষ্টজনিত ভারি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে বুকখানা ওঠানামা করছে।

এবার ওদের বিদ্রূপ করার পালা। শুরু করল জুবভ। ফোমার কাছে এগিয়ে এসে ওর কোঁকে একটা লাথি মেরে প্রতিহিংসা চরিতার্থতার আনন্দে কাঁপতে কাঁপতে বলল : কিহে বজ্রের মতো কঠিন ভবিষ্যতবক্তা মহাপুরুষ! কেমন লাগছে এখন? বসে বসে এখন ব্যাবিলনের বন্দীত্বের মধুর আস্বাদ উপভোগ করো! হিঃ হিঃ!

দাঁড়া! বজ্রকণ্ঠে বলে উঠল ফোমা,—দাঁড়া একটু বিশ্রাম করেনি আমার জিভ তো আর বাঁধতে পারিসনি!

কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করল ফোমা যে আর কিছুই ওর করবার ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা নেই কিছু বলবার। কিন্তু সেটা এজন্যে নয় যে ওরা ওকে বেঁধে ফেলেছে। কী যেন নিঃশেষ হয়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ওর ভিতরে আর ওর অন্তর কালো হয়ে শূন্য হয়ে গেছে। জুবভের সঙ্গে এসে মিলল রেজনিকভ। তারপর একে একে সবাই এগিয়ে এসে দাঁড়াল ফোমার সামনে। মায়াকিনের পিছু পিছু বব্রভ, কনোনভ নিচুকণ্ঠে কি যেন আলোচনা করতে করতে কেবিনের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। ওদের চোখেমুখে উদবেগভরা দুশ্চিন্তার ছাপ।

পূর্ণ বেগে স্টিমার ছুটে চলেছে শহরের দিকে। গতির প্রাবল্যে টেবিলের উপরের বোতলগুলো কাঁপছে ঝন্ঝন্ করে। সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে বিলাপ

ধ্বনির মতো ঐ শ্রুতি কঠোর ঝন্‌ঝনানি এসে বাজছে ফোমার কানে। ওর সামনে দাঁড়িয়ে একদল লোক তীব্র বিদ্বেষভরা কুৎসিত ভাষায় ওকে করছে গালাগাল। করছে অপমান।

কিন্তু যেন এক অস্পষ্ট কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেখছে ওদের ফোমা। ওদের কথা যেন পারছে না ওকে স্পর্শ করতে। ওর অন্তরের অন্তস্তল থেকে জেগে উঠছে এক তীব্র তিক্ত অনুভূতি। ক্রমেই চলেছে বেড়ে। কিন্তু কী তা বুঝে উঠতে পারছে না ফোমা। তবুও এক নিদারুণ বিষাদময়তা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে ওর দেহ মন।

ভেবে দেখ দেখি ব্যাটা জুয়াচোর! কী হাল করেছিস তুই তোর নিজের?—বলল রেজ্‌নিকভ,—কী ধরনের জীবন এখন তোর পক্ষে সম্ভব? জানিস আমাদের কেউই আর তোর গায়ে থুথু দেয়ার মতো মর্যাদাও তোকে দেবে না?

কী করেছি আমি?—অনুধাবন করার চেষ্টা করতে লাগল ফোমা। একটা ঘন কালো বস্তুর মতো ওরা ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওকে।

আচ্ছা—বলল ইয়াশ্চুরভ—এবার তোমার খেলা শেষ।

দাঁড়া, দেখাচ্ছি তোকে!—অনুচ্চ কণ্ঠে বলে উঠল জুবভ।

আমাকে ছেড়ে দাও!—বলল ফোমা।

বটে? উহু! ধন্যবাদ!

বাঁধন খুলে দাও!

ঠিক আছে, বেশ শুতে পারবে ওভাবে।

আমার ধর্মবাবাকে ডেকে দাও!

ঠিক সেই মুহূর্তে মায়াকিন এসে দাঁড়াল ফোমার কাছে। তারপর কঠোর দৃষ্টিতে ধর্মছেলের শায়িত দেহের দিকে তাকিয়ে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল।

আচ্ছা ফোমকা!—বলতে শুরু করল তারাশভিচ।

বলুন ওদের আমার বাঁধন খুলে দিতে!—মিনতিভরা শোকার্ত কণ্ঠে বলল ফোমা।

আবার যদি তুই গোলমাল করিস? না, বরং ঐভাবেই শুয়ে থাক।—প্রত্যুত্তরে বলল ধর্মবাবা।

আর একটি কথাও বলব না আমি। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি। আমাকে খুলে দিন। খুবই লজ্জিত আমি। দোহাই খ্রীষ্টের! দেখুন আপনি আমি মাতাল হইনি। বেশ, না হয় হাত না-ই খুললেন!

শপথ করছিস তো—আর গোলমাল করবি না?—বলল মায়াকিন।

হা ঈশ্বর! করব না, করব না।—কাতর কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল ফোমা।

ওর পায়ের বাঁধন খুলে দিল। ফোমা উঠে দাঁড়িয়ে সবার দিকে তাকিয়ে একটু করুন হাসি হেসে মৃদুকণ্ঠে বলল: তোমরাই জিতেছ।

আমরা সব সময়েই জিতব।—কঠোর হাসি হেসে প্রত্যুত্তরে বলল ওর ধর্মবাবা।

পিঠমোড়া করে হাত বাঁধা থাকায় নীরবে কুঁজো হয়ে হেঁটে টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল ফোমা। চোখ তুলে একবার চারদিকে তাকাল। মনে হচ্ছে ছোট হয়ে গেছে ওর দেহ—গেছে চুপসে, শীর্ণ হয়ে। অবিন্যস্ত এলোমেলো চুল। কতগুলি পড়েছে কপালে, কতগুলি রগের উপরে। বুকের কাছে শার্টটা ছিঁড়ে কুঁচকে ভিতরের ফতুয়াটা পড়েছে বেরিয়ে। কলারটা ঠোঁটের উপরে এসে পড়েছে।

ওটাকে থুতনির নিচে সরিয়ে দেবার জন্যে মাথা নাড়ল ফোমা। কিন্তু পারল না। তখন সেই ক্ষীণকায় পাকাচুল ভদ্রলোকটি ওর জামা-কাপড় ঠিক করে দিল। তারপর ওর চোখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল ঃ এটুকু সহ্য করতে হবে তোমাকে।

যারা ওকে বিদ্রূপ করছিল এতক্ষণ, মায়াকিনের সামনে এখন তারা চুপ করে রয়েছে। উৎসুক প্রত্যাশাভরা দৃষ্টি মেলে তারা তাকিয়ে আছে মায়াকিনের মুখের দিকে। মায়াকিনের মুখের ভাব শান্ত। কিন্তু চোখদুটো এমন দারুণ আনন্দে জ্বলজ্বল করছে যা নাকি এমনি একটা পরিস্থিতিতে অস্বাভাবিক।

আমাকে একটু ভদকা দিন!—টেবিলে বুকটা ঠেকিয়ে প্রার্থনা জানাল ফোমা। কুঁজো হয়ে পড়েছে ওর দেহ। ফুটে উঠেছে কেমন যেন একটা করুণ অসহায় ভাব। ওকে ঘিরে জেগে উঠেছে অস্ফুট গুঞ্জন—অবিরাম লোকজনের চলাফেরার শব্দ। সবাই একবার ওর দিকে তাকিয়েই তাকাচ্ছে মুখোমুখি বসা মায়াকিনের দিকে। বৃদ্ধ তক্ষুনি ভদকা দিল না ফোমাকে। প্রথমে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর আপাদমস্তক পরীক্ষা করে দেখল তারপর ধীরে একটা গ্লাসে করে ভদকা ঢেলে নীরবে ফোমার মুখের কাছে তুলে ধরল। গ্লাসের মদটুকু খেয়ে ফেলে ফোমা বলল ঃ আর একটু।

যথেষ্ট, আর না।—প্রত্যুত্তরে বলল মায়াকিন।

পরক্ষণেই নেমে এল এক বেদনাদায়ক অসাড় নিস্তব্ধতা। নিঃশব্দে পা টিপে টিপে সবাই এসে দাঁড়াচ্ছে টেবিলের পাশে। যখন কাছে এসে পড়ছে, গলা বাড়িয়ে দেখছে ফোমাকে।

কিরে ফোমা, এখন বুঝতে পেরেছিস কী করেছিস?—অনুচ্চ কণ্ঠে প্রশ্ন করল মায়াকিন। কিন্তু সবাই শুনতে পেল সেকথা।

নীরবে ফোমা মাথা নাড়ল। তারপর চুপ করে রইল।

তোমার এ কাজের জন্যে আর ক্ষমা পেতে পারো না।—গলার সুর চড়িয়ে দৃঢ়-কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করল মায়াকিন,—যদিও আমরা সবাই খৃষ্টান, তবুও আমাদের কাছ থেকে এতটুকুও ক্ষমা পাবি না তুই। জেনে রাখিস এ কথা।

ফোমা মুখ তুলল। তারপর চিন্তিত দৃষ্টি মেলে মায়াকিনের মুখের দিকে তাকাল।—আপনার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম ধর্মবাবা। আপনাকে তো বলিনি কিছু আমি।

দেখো, সবাই দেখে নাও—ধর্মছেলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠল মায়াকিন,—দেখলে তো?

জেগে উঠল প্রতিবাদের অস্পষ্ট গুঞ্জন।

যাক, এখন আর ভেবে লাভ কি? একই কথা এখন!—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলে উঠল ফোমা,—কিছু না—কোনো লাভই হলনা এতে!

আবার ফোমা টেবিলের উপরে ঝুঁকে পড়ল।

কী চেয়েছিলি তুই?—কঠোর স্বরে প্রশ্ন করল মায়াকিন।

কী চেয়েছিলাম?—মাথা তুলে ফোমা ব্যবসায়ীদের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে নীরবে একটু হাসল,—আমি চেয়েছিলাম—

মাতাল—পাজী বদমাশ।

মাতাল নই আমি।—সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ করল ফোমা,—মাত্র দুটি গ্লাস খেয়েছি আমি। সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্ক আমি।

তাই বটে।—বলল ববুরভ,—তোমার কথাই ঠিক ইয়াকভ তারাশভিচ্! ওর মাথাই খারাপ—পাগল।

আমি ?—চিৎকার করে বলে উঠল ফোমা প্রতিবাদের সুরে।

কিন্তু কেউই ওর কথায় কান দিল না। ভ্রূক্ষেপ করল না। রেজনিকভ, জুবভ, বব্‌রভ আর মায়াকিন অনুচ্চ কণ্ঠে পরামর্শ করতে লাগল।

অভিভাবকত্ব!—এই একটিমাত্র কথাই শুনতে পেল ফোমা।

সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্ক আমি—চেয়ারের উপরে পিঠ হেলিয়ে বলে উঠল ফোমা। তারপর উদ্‌বেগভরা দৃষ্টিতে বণিকদের দিকে তাকিয়ে রইল।

যা আমি প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম তা সত্য। চেয়েছিলাম আমি আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে—অভিযোগ করতে।—আবার ফোমার অন্তরে জেগে উঠল আবেগ। হঠাৎ সে হাতদুটোকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে হিঁচড়া-হিঁচড়ি করতে লাগল।

ধরো! ধরো!—ফোমার ঘাড় চেপে ধরে চিৎকার করে উঠল বব্‌রভ,—ধরো ওকে!

বেশ ধরো!—বিষাদভরা তিক্ত হতাশায় ভেঙে পড়ল ফোমা,—ধরো আমাকে। কিন্তু কী প্রয়োজন তোমাদের আমাকে দিয়ে?

চুপ করে বসে থাক!—কঠোর সুরে ধমকে উঠল ওর ধর্মবাবা।

ফোমা বসে রইল চুপ করে। এতক্ষণে বুঝতে পারল কোনো ফলই হয়নি ওর কাজে। এতটুকুও সংশয় জাগেনি ঐ বণিকদের মনে। এখানে ওকে ঘিরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। কিন্তু কোনো ভাবান্তরই দেখতে পেল না ওদের চোখে-মুখে। তেমনি গম্ভীর, তেমনি দৃঢ়। ওর সঙ্গে ব্যবহার করছে যেন ও একটা উন্মত্ত মাতাল—আর কী যেন চক্রান্ত করছে ওর বিরুদ্ধে। নিজেকে মনে হল যেন একটা নগণ্য কৃপার পাত্র। ঐ যে কালো পোশাক-পরা বলিষ্ঠ-স্কন্ধ মোটা লোক-গুলো যেন ওকে গুঁড়িয়ে ফেলেছে। ওর মনে হল, বহুদিন আগে যেন সে ওদের অপমান করেছে। এত দীর্ঘ সময় অতীত হয়ে গেছে যে নিজেকেই এখন ওর মনে হচ্ছে ওদের কাছে অপরিচিত। কী করেছে, কেন করেছে সেসব ওদের বিরুদ্ধে—তা যেন কিছুতেই ওর বোধগম্য হচ্ছে না। এমনকি কেমন যেন অপমানিত মনে হতে লাগল নিজেকে। নিজের কাছেই যেন লজ্জিত হয়ে উঠল। নিজের চোখেই যেন নিজে ছোট হয়ে গেছে। গলার ভিতরটা কেমন যেন সর সর করে উঠল। কেমন যেন এক বিজাতীয় অনুভূতি জেগে উঠেছে বুকের ভিতরে। যেন মুঠো মুঠো ধুলো বা ছাই কে যেন ছড়িয়ে দিচ্ছে ওর বুকের ভিতরে। নিজের কাছেই নিজের কাজের কৈফিয়ত দেবার জন্যে চিন্তা করতে করতে কারুর দিকে না তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলতে লাগল :

আমি প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম সত্য। এই কি জীবন?

মূর্খ!—ঘৃণাভরা কণ্ঠে বলে উঠল মায়াকিন,—কী সত্য তুই পারিস প্রকাশ করতে? কী বুঝিস তুই?

আমার অন্তর ক্ষতবিক্ষত। সেটা আমি বুঝি। ঈশ্বরের চোখে কী কৈফিয়ত আছে আপনাদের? কী উদ্দেশ্যে বেঁচে আছেন আপনারা? হাঁ আমি অনুভব করি—সত্যকে উপলব্ধি করি আমি।

ঐ আবার শুরু করল।

করুক গে!—প্রত্যুত্তরে ঘৃণাভরা কুঞ্চিত মুখে বলল বব্‌রভ।

ওর কথাবার্তা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে ওর বুদ্ধি লোপ পেয়েছে।—কে একজন বলল।

সত্যি বলতে কি, ও বস্তুটি সবার মেলে না।—কঠোর সুরে উপদেশের ছলে বলল মায়াকিন আকাশের দিকে মুখ তুলে।—হৃদয় দিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করা যায় না—যায় বুদ্ধি দিয়ে। সেটা বোঝো? আর তোমার ঐ অনুভূতি—ওটা নেহাত বাজে। গোরুও অনুভব করে যখন তার লেজে মোচড় পড়ে। কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে—বুঝতে হবে সব কিছু। শত্রুকেও বুঝতে হবে। সে স্বপ্নেও কী ভাবে তা অনুমান করতে হবে। তারপর চলো এগিয়ে।—নিজের ধারায় মায়াকিন তার দার্শনিকতায় ভেসে চলল। কিন্তু পর'-ণেই খেয়াল হল, পরাজিত শত্রুকে রণ-কৌশল শেখানো অনুচিত। তাই সে চুপ করে গেল। নির্বোধ দৃষ্টি মেলে ফোমা তার মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে লাগল।

ভেড়া!—বলে উঠল মায়াকিন।

আমাকে একটু একা থাকতে দিন।—মিনতিভরা কণ্ঠে বলল ফোমা,—সব কিছুই আপনার। হল তো? আর কী চান? বেশ, আপনারা আমাকে গাল দিয়েছেন, মেরে কালশিরা ফেলে ফুলিয়ে দিয়েছেন। উপযুক্ত শিক্ষাই দিয়েছেন আমাকে। কে আমি? হে ঈশ্বর! হে প্রভু!

একান্ত মনোযোগের সঙ্গে সবাই শুনতে লাগল ফোমার কথা। কিন্তু ওদের ঐ মনোযোগের ভিতরে কেমন যেন রয়েছে বিজাতীয় বিদ্বেষ। রয়েছে প্রতিহিংসা-পরায়ণতা।

আমি বেঁচে থাকলাম, দেখলাম,—গম্ভীর কণ্ঠে বলতে লাগল ফোমা,—ভাবলাম। ভাবতে ভাবতে ক্ষতবিক্ষত হয় গেল আমার অন্তর। আর এখন ফোঁড়া ফেটে গেছে! আমি সম্পূর্ণ শক্তিহীন। যেন আমার দেহের সবটুকু রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আজকের দিনটি পর্যন্ত আমি বেঁচেছিলাম আর ভেবেছিলাম, প্রকাশ করব সত্য। হাঁ, তা করেছি।

একঘেয়ে সুরে বলে চলেছে ফোমা। যেন বলছে ও বিকারের ঘোরে।

সব কথা বলেছি আমার—নিঃশেষে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছি নিজেকে। কোনো কথা আর এতটুকুও রাখিনি পিছনে বলবার মতো। কী যেন জ্বলে উঠেছে আমার অন্তরে। ভিতরটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আর কিছু অবশিষ্ট নেই সেখানে। কী আশা করবার আছে আমার এখন? সব কিছুই রয়েছে যেমনকার তেমনি।

তিক্ত হাসির ধমকে ফেটে পড়ল মায়াকিন।

তারপর? ভেবেছিলি জিভ দিয়ে চেটে পাহাড় খেয়ে ফেলবি? বিদ্বেষের সঙ্গে যে হাতিয়ার তুলে নিয়েছিলি তাতে ছারপোকাই মারা চলে। কিন্তু তা নিয়ে তুই তাড়া করলি ভল্লুককে। তাই না? পাগল! তোর বাবা যদি একটিবার দেখত তোকে!

কিন্তু তবুও—হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে জোর দিয়ে বলে উঠল ফোমা—এ সব কিছুর জন্যে দায়ী আপনারা—আপনারই দোষে ঘটেছে এ সব। আপনারা জীবন নষ্ট করে দিয়েছেন। সংকীর্ণ করে দিয়েছেন সব কিছু। আপনাদের জন্যেই আজ আমরা দম আটকে মরে যাচ্ছি। অভিশপ্ত নাস্তিকের দল! জাহান্নামে যাক সবাই।

হাতের বাঁধন খোলার জন্যে চেয়ারের ভিতরে মোড়ামুড়ি করতে শুরু করে দিল ফোমা। তারপর ক্রুদ্ধ জ্বলন্ত চোখে চিৎকার করে বলে উঠল ঃ হাত খুলে দে আমার!

সবাই এগিয়ে এল। আরো কঠোর হয়ে উঠল বণিকদের মুখ। দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল রেজনিকভ ঃ গোল করিস না। উৎপাত করিস না! এক্ষুনি আমরা শহরে

গিয়ে পৌছব। আর অপমানিত করিস না নিজেকে। আমাদেরও না। জেটি থেকেই সোজা তোকে পাগলা গারদে নিয়ে যাচ্ছি না।

বটে? আমাকে পাগলা গারদে পোরার ব্যবস্থা করেছিস তোরা?

প্রত্যুত্তরে কেউ কোনো কথা বলল না। ওদের মুখের দিকে একবার তাকাল ফোমা তারপর মাথা নিচু করল।

শান্ত হয়ে থাক, তোর বাঁধন খুলে দেবো।—কে যেন বলে উঠল।

দরকার নেই। কোনো মানেই হয় না এখন আর।—মৃদু কণ্ঠে বলল ফোমা,—তোদের খুলে দেবার মুখে থুথু ফেলি। কিছুই হবে না।

আবার ওর কথাবার্তায় নেমে এল বিকারের ভাব।

আমি তো গেছি—তা আমি জানি। কেবল তোদের শক্তির জন্যেই নয়, আমার নিজের দুর্বলতার জন্যে। হাঁ, ঈশ্বরের চোখে তোরা ক্রিমিকীট। দাঁড়া একটু অপেক্ষা কর! গলা টিপে দেবো। অন্ধত্বের জন্যেই আমার এই সর্বনাশ হল। অনেক দেখে দেখে অন্ধ হয়ে গেছি। প্যাঁচার মতো। মনে পড়ে ছেলেবেলায় একবার একটা প্যাঁচাকে তাড়া করেছিলাম। খাদের ভিতর উড়তে উড়তে বার বার ধাক্কা খাচ্ছিল কোনো না কোনো কিছুতে। সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। তারপর চলে গেল। তখন বাবা বলেছিলেন: মানুষের বেলায়ও এমনি হয়। কোনো কোনো লোক এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে। ঠোক্কর খায়। তারপর ক্ষতবিক্ষত হয়ে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলে। একটু বিশ্রামের জন্যে শেষে নিজেকে যে কোনো স্থানে ছুঁড়ে দেয়। এই খুলে দে আমাকে।!—পাংশু হয়ে উঠেছে ফোমার মুখ। বুজে এসেছে চোখ। কাঁধদুটো কাঁপছে। বিশৃংখল চেহারায় টেবিলের কিনারায় বুক রেখে দুলছে আর কি যেন বলে চলেছে বিড়বিড় করে।

ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে ব্যবসায়ীরা দৃষ্টি বিনিময় করল। একে অন্যের কোঁকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে দেখাল ফোমার দিকে।

ইয়াকভ মায়াকিনের মুখখানা কালো, স্থির গম্ভীর। যেন পাথরে কোঁদা।

এখন বোধহয় খুলে দেয়া যায়?—অনুচ্চ কণ্ঠে বলে উঠল বব্রভ।

আর একটু কাছে এসে নেয়া যাক।

তার দরকার নেই।—আস্তে আস্তে বলল মায়াকিন,—এখানেই থাক, তারপর গাড়ি এনে সোজা পাগলা গারদে নিয়ে যাবো।

কিন্তু কোথায় গিয়ে আমি বিশ্রাম করব?—বিড়বিড় করে বলে উঠল ফোমা।—কোথায় ছুঁড়ে দেবো নিজেকে?—এক নিদারণ অস্বস্তিকর হতাশায় ভেঙে পড়ে পাথরের মতো অনড় হয়ে বসে রইল। ওর সর্বাঙ্গ বিকৃত হয়ে মুখের উপরে ফুটে উঠল এক অব্যক্ত বেদনার তীব্র ছায়া।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মায়াকিন। তারপর কেবিনের ভিতরে চলে যেতে যেতে ধীরে ধীরে বলল,—নজর রেখো। ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে জাহাজ থেকে।

দুঃখ হয় ছেলেটার জন্যে।—মায়াকিনের গমনপথের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল বব্রভ।

পাগলামোর জন্যে কেউ তো আর দায়ী নয়?—প্রত্যুত্তরে বলল রেজনিকভ।

আর ইয়াকভ?—ইঙ্গিতে মায়াকিনকে দেখিয়ে বলল অনুচ্চ কণ্ঠে।

ইয়াকভের আবার কি? এতে তো তার লোকসান নেই!

হাঁ এখন সে-ই তো হবে—হা, হা, হা!

সে হবে ওর অভিভাবক, হা, হা হা!

ফিস্ ফিস্ হাসি আর কথার সঙ্গে জাহাজের ইঞ্জিনের শব্দ মিশে একটি কথাও সে পৌঁছল না ফোমার কানে। স্থির অচঞ্চল ম্লান চোখের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রয়েছে। ওর ঠোঁটদুটো মৃদু মৃদু কাঁপছে।

ছেলে ফিরে এসেছে।—ফিসফিস্ করে বলল বব্‌রভ।

নি ওর ছেলেকে—বলল ইয়াশচুরভ।—পেরম-এ দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে।

কমন লোক?

ব্যবসায়ী চতুর লোক।

বটে? তাই নাকি?

উসোলিয়েতে একটা বড়ো ব্যবসা দেখাশোনা করে।

তাই ইয়াকভের আর একে দরকার নেই। তাই বলো, হাঁ।

দেখ, কাঁদছে।

অ্যাঁ?

চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে ফোমা। মাথাটা ঝুলে পড়েছে কাঁধের উপর। চোখ বোজা। চোখের পাতার তলা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে নেমে আসছে। গাল বেয়ে নেমে এসে পড়ছে গোঁফের উপরে। থেকে থেকে ঠোঁটদুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে। আর গোঁফের উপর থেকে চোখের জল ঝরে পড়ছে বুকে। নীরব, নিশ্চল। শুধু অসমভাবে বুকটা ওঠা-নামা করছে। ওর অশ্রু-কলঙ্কিত শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের ঝুলে-পড়া ঠোঁটের কোণের দিকে তাকিয়ে নীরবে বণিকেরা নিঃশব্দে ওর কাছ থেকে সরে যেতে লাগল।

এতক্ষণে ফোমা একা। ভোজশেষের নোংরা উচ্ছিষ্ট থালা-প্লেটভরা টেবিলের সামনে হাত পিছমোড়া বাঁধা অবস্থায় রয়েছে বসে। এক সময় ধীরে সে তার ফুলে ভারি-হয়ে-ওঠা চোখের পাতা মেলে অশ্রুসজল ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে তাকাল এঁটো-কাঁটা ছড়ানো টেবিলের দিকে।

*   *   *

তিন বছর অতীত হয়ে গেছে।

বছরখানেক আগে মারা গেছে ইয়াকভ তারাশভিচ। মরেছে সজ্ঞানে। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে ছেলেমেয়ে আর জামাইকে ডেকে বলল :

শোনো ছেলে-মেয়েরা! বাঁচবে ঐশ্বর্যের মধ্যে। সব কিছুরই আস্বাদ গ্রহণ করেছে ইয়াকভ, আর এখন সময় হয়েছে তার চলে যাবার। তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। তবুও আমি হতাশ হয়ে পড়িনি। আর ঈশ্বর এটা আমার জমার ঘরেই লিখে রাখবেন। আমি তাঁকে বিরক্ত করেছি—পরম দয়ালু প্রভুকে। কিন্তু তা কেবলমাত্র ঠাট্টা করে। কিন্তু কখনো কাতর প্রার্থনা বা অভিযোগ নিয়ে তাঁকে বিরক্ত করিনি।

হে প্রভু! আমি আনন্দিত যে তোমার করুণায় আমি বেঁচেছি বুদ্ধির সঙ্গে। বিদায়! আমার স্নেহের সন্তানেরা! বিদায়! শান্তিতে বাস করো মিলেমিশে। আর কখনো বেশি দার্শনিকতা করতে যেও না। জেনে রেখো, যে পাপ দূরে সরে থাকে—শান্ত হয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকে সে-ই পবিত্র নয়। ভীরুতার দ্বারা তুমি পাপের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারো না।—এই কথাই বলেছে জ্ঞানীদের গল্পে। কিন্তু যে তার জীবনের লক্ষ্যপথে পৌঁছতে চায়, সে পাপকে ভয় করে না। ঈশ্বর তার একটা ভুল ক্ষমা করবেন। ঈশ্বর মানুষকে নিয়োজিত করেছেন জীবন গড়ে তুলতে। কিন্তু তাকে উপযুক্ত বুদ্ধি দেননি। সুতরাং তিনি মানুষের দেনাকে

খুব কঠোরভাবে গ্রহণ করবেন না। কারণ, তিনি পবিত্র। তিনি করুণাময়

কিছুক্ষণ পরেই সে মারা গেল দারুণ কষ্ট পেয়ে।

সেই দিনের সেই জাহাজের ঘটনার পরে কি যেন এক কারণে ইয়ধভের [illegible] খারিজের আদেশ হল।

শহরের বুকে গড়ে উঠল এক বিরাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান—তারাস মায়াকিন [illegible] আফ্রিকান স্মলিনের নামে।

বছরখানেক আর ফোমার কথা আর কিছু শোনা যায়নি। জনশ্রুতি—পাগ গারদ থেকে ছাড়া পাবার পরে মায়াকিন তাকে তার মায়ের দিকের কোনো এ আত্মীয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে উরাল অঞ্চলে।

মাত্র কিছুদিন হল ফোমাকে আবার দেখা গেল শহরের পথে। শীর্ণ কুৎসিত চেহারা। আধ-পাগলা, নির্বোধ। প্রায় সব সময়েই থাকে মাতাল হয়ে। কখনো গম্ভীর ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টিতে মাথা নিচু করে থাকে। কখনো বা বিষাদভরা করুণ নির্বোধ হাসি ফুটে ওঠে ওর মুখে। কখনো আবার দারুণ উন্মত্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু তা খুবই ক্বচিৎ।

ধর্মবোনের উঠোনের এক কোণে পড়ে থাকে ফোমা। পরিচিত ব্যবসায়ীরা আর শহরবাসীরা ওকে লাঞ্ছিত করে, বিদ্রুপ করে। ফোমা যখন রাস্তা দিয়ে চলে তখন হয়তো কেউ হঠাৎ ওকে চিৎকার করে ডাকে ঃ

এই প্রফেট! এদিকে আয়।

খুব কমই সাড়া দেয় ফোমা সে ডাকে। মানুষের সঙ্গ এড়িয়ে চলে। কারুর সঙ্গেই বড়ো একটা কথা বলে না। কিন্তু যদি কখনো ওদের ডাক শুনে এগিয়ে যায়, ওরা বলে ঃ আচ্ছা মহাপ্রলয়ের দিন সম্পর্কে কিছু বলো তো শুনি? বলবে না? হাঃ হাঃ হাঃ! প্রফেট!